বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দশম বর্ষ

শ্রাবণ ১৩৫৮ - আষাঢ় ১৩৫৯

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দশম বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৫৮ - আষাঢ় ১৩৫৯

রচনাসূচী

চিত্রসূচী

'সাগর উঠে তরঙ্গিয়া'

গোপালপুর স্কেচ : শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮

স্বাক্ষর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চাঁদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী
চীন-লণ্ঠন ঢুলায়ে
চলেছ সাগরপারে।
আমি যে উদাসী একেলা প্রবাসী,
নিয়ে গেলে মন ভুলায়ে
দূর জানালার ধারে॥

২

অজানা ভাষা দিয়ে
পড়েছ ঢাকা তুমি, চিনিতে নারি, প্রিয়ে।
কুহেলি আছে ঘিরি,
মেঘের মতো তাই দেখিতে হয় গিরি॥

৩

যে তারা আমার তারা
সে নাকি কখন ভোরে
আকাশ হইতে নেমে
খুঁজিতে এসেছে মোরে।
শত শত যুগ ধরি
আলোকের পথ ঘুরে
আজ সে না জানি কোথা
ধরার গোধূলিপুরে॥

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত

ওঁ

ভ্রাতঃ

কাল কালিগ্রামে রওনা আজ যাত্রার উদ্যোগে ব্যতিব্যস্ত আছি। এবং মাসখানেকের মত সমস্ত কাজ-কর্ম্মের বন্দোবস্ত করে যেতে হচ্চে তাতেও কিছু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। এবারে আমাদের বাড়িতে অনেক ক্রিয়াকর্ম্ম আসন্ন। প্রথমতঃ শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ— তার পরে ১১ই মাঘ— তার পরে ১৮ই মাঘ ক্ষিতির বিবাহ— তার পর ২২শে মাঘ বলুর বিবাহ— তুমি মাঘ মাসে এতদঞ্চলে আস্‌তে পারবে না ?

সাধনা গেছে আপদ গেছে। আমার স্কন্ধ থেকে ভূত নেমে গেছে— আমি মনের আনন্দে আছি— সাধনায় আমার হাড়গুলো সুদ্ধ সিদ্ধ হয়ে যাবার যো হয়েছিল— এ রকম সিদ্ধিলাভ প্রার্থনীয় নয়। এই চার বৎসরে আমাদের চার হাজার টাকার বেশি দণ্ড দিতে হয়েছে— তার উপরে খাটুনি এবং দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। তুমি বোধ হয় জান, সম্প্রতি আমি লক্ষ্মীর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী— আমিও বাণিজ্য অবলম্বন করেছি। অতএব সম্প্রতি আমার কোথাও নড়বার যো নেই— নড়বার মধ্যে কালিগ্রাম সাজাদ্‌পুর এবং বিরাহিমপুর। তোমার আতিথ্য গ্রহণ করবার আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল— কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা দেখিনে। কিন্তু তাই বলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পাঠাতে ভুলোনা— যদি সংগ্রহ করতে পার তাহলে নিশ্চয় আমাকে এক আধ খণ্ড পাঠিয়ো— অদূরে বৃদ্ধ বয়স আসন্ন, যদি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করি ত ওগুলো কাজে লাগবে— আর যদি গৃহস্থ ধর্ম্মেই টিকে যাই তাহলে আমার বসবার ঘরের মেজেয় পেতে রেখে দেব। তোমার নবজাত সন্তানটি কি রকম অবস্থায় আছে— এবং প্রসূতিই বা কেমন ? আমাদের সমস্ত সংবাদ ভাল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৩০২]

ওঁ

ভ্রাতঃ

আজকাল চিঠিপত্র লেখা অত্যন্ত বিরল হইয়া আসিয়াছে। বোধ হয় কতকটা বয়সের গুণে। যে লেখা না লিখিলে নয় আজকাল তাহার উর্দ্ধে আর কলম চলে না। সেইজন্য বলিতেছি একবার মুকাবিলা করিয়া যাও না। বাঙ্গালা মুলুকে কি পদার্পণ করিবে না ?

কখনো দায়ে পড়িয়া কখনো সখের উৎপীড়নে এটা ওটা সেটা লেখা চলিতেছেই। যতটা কাজ করিয়াছি এখন পেন্সন লইবার অধিকার জন্মিয়াছে। সরস্বতী মহারাণীর অধীনে ২৫ বৎসরের উর্দ্ধকাল

সার্ভিস হইয়া গেছে-- কিন্তু খাটুনি ক্রমেই যেন বাড়িতেছে। তুমি ত তাঁহার দরবারে একেবারে নাম কাটাইয়া লক্ষ্মীর সেরেস্তায় ভিড়িয়াছ।

আমার উপর যে ভারটি অর্পণ করিয়াছ সেটা দুঃসাধ্য। এখন হয় লিখি পড়ি কাজ করি, নয় বিশ্রাম করি— এই বহুল কাজ এবং স্বল্প বিশ্রামের কোন অংশ আমি বাজে খরচ করিতে পারিব না। বরঞ্চ কাজ ফাঁকি দিয়া বিশ্রাম বাড়াইতে রাজি আছি কিন্তু বিশ্রাম ফাঁকি দিয়া কাজ বাড়াইতে পারিব না। অতএব তোমার বন্ধুর বহি সংশোধনের ভার আমার উপর দিয়ো না।

অপত্য কলত্রাদির খবর কি? শুনিলাম কন্যার বিবাহের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছ। পাত্রের সন্ধান পাইয়াছ কি? শ্রীশানী ভাল আছেন ত? তাঁহাকে আমাদের সাদর অভিবাদন জানাইবে।

নগেন্দ্রবাবু "প্রভাত" কাগজটার জন্য আমাকে সর্ব্বদাই তাড়া দিতেছেন। ভারতীরও তাগিদ আসিতেছে। এদিকে নিজের অন্তঃকরণলক্ষ্মীও নিস্তব্ধ নাই। সকলকেই সন্তুষ্ট রাখা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

নববর্ষের প্রিয়সম্ভাষণ গ্রহণ করিবে। তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি ১লা বৈশাখ ১৩০৭।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভ্রাতঃ হাজারিবাগ

আমি বোধ হয় আর দিন চার পাঁচের মধ্যেই বোলপুরে যাইতেছি। অতএব এখন এখানে আসিবার চেষ্টা করিয়োনা। রেণুকাকে তাহার মাতুলের তত্বাবধানে এখানে রাখিয়া আমি বোলপুরে যাইতে চাই— বিদ্যালয়ের জন্য উদ্বিগ্ন আছি।

রথীকে কোথায় রাখিয়া এফ্, এ দেওয়াইব তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। বোলপুর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় রাখিয়া প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়াইবার কোন বাধা আছে কিনা খবর লইবার জন্য কিছুকাল হইতে সুবোধকে বলিতেছি এখনো তাহার কোন উত্তর পাই নাই। যদি বোলপুরে রাখিয়া প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়াইবার কোন বাধা না থাকে তবে আমি নিশ্চিন্ত হইব নতুবা কি কর্ত্তব্য তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে হইবে। অবশ্য সন্তোষ রথীর সঙ্গেই পড়িবে।

বিদ্যালয়ের জন্য কিছু মৃগচর্ম্ম যদি সংগ্রহ করিতে পার তবে চেষ্টা করিয়ো। বোধ হয় পালামৌ অঞ্চল হইতে পাওয়া সহজ হইতে পারে।

বোলপুরে দুগ্ধের বড়ই টানাটানি। এখান হইতে একটা গাভী ও একটা মহিষ সেখানকার ছাত্রদের জন্য কিনিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি। পথের খরচ অনেক লাগিবে— প্রায় প্রত্যেক জন্তুটাতে কুড়ি টাকা— কিন্তু সেও স্বীকার করিতে হইতেছে— বোলপুরে বহু চেষ্টায় পয়স্বিনী গাভী জুটাইতে পারি নাই। আশ্রম আছে অথচ ধেনুর অভাব ইহা অসঙ্গত।

বৈশাখের বঙ্গদর্শনের জন্য একটা বড় গল্পের প্রথমাংশ লিখিয়া পাঠাইতেছি। তুমিও কিছু লিখিবার উদ্যোগ করিয়ো।

শান্তিনিকেতনে ভোলার পড়াশুনা বেশ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। অল্প দিনে সে যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহাতে বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি।

এখান হইতে বিদ্যালয়ে রোপণের জন্য কয়েকটি Eucalyptus গাছ লইয়া যা· ·সেখানে ছেলেরা বাগান কর ·অত্যন্ত উৎসাহিত। তোমার ভোলা ভবিষ্যতে আর যদি কিছু না হয় ত মালী হইতে পারিবে। গাছপালা সংগ্রহ করিতে পারিলে ছাত্ররা ভারি উৎসাহিত হইয়া উঠে। তাহারা এক এক দল এক একটি বাগান করিয়াছে।

যদি পার ত দুই চারি দিনের জন্য মজঃফরপুরে একবার বেলার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিয়ো।

আমার শরীর ভাল নাই। বোলপুরে বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া যদি সুবিধা বুঝি তবে একবার কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে বেড়াইয়া পরমায়ুর lease বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিব— অনেক কাজ এখনো বাকি রহিয়াছে— সেগুলা মুল্‌তুবি রাখিয়া মরিতে চাহি না। ইতি ২১শে চৈত্র ১৩০৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

· ·চিহ্নিত অংশ কীটদষ্ট

ওঁ

ভ্রাতঃ

আলমোড়া

তোমার চিঠি পড়িয়া বড় বেদনা বোধ করিলাম। মৃত্যুতে প্রিয়জনকে স্নেহের ধনকে গভীরতর নিবিড়তর ভাবে আপনার করিয়া দেয়— সে যেন দেহত্যাগ করিয়া আমাদেরই জীবনের মধ্যে একাত্মভাবে লোকান্তর গ্রহণ করে। তখন একদিকে তাহার সহিত মিলন যেমন নিগূঢ় নিরতিশয় হইয়া উঠে অন্যদিকে তেমনি তাহার সহিত প্রত্যক্ষ মিলনের অভাব আমাদিগকে ব্যথিত করিতে থাকে। অন্তরের মধ্যে সে তখন অত্যন্ত ব্যাপ্ত হয় বলিয়াই বাহিরে তাহার একান্ত অভাব বাহিরকে আমাদের কাছে এত শূন্যময় এত অসম্পূর্ণ করিয়া তোলে।

রেণুকার শরীর ভাল নয়। সে এখান হইতে যাইবার জন্য অস্থির হইয়াছে— এ অবস্থায় এখানে আর তাহাকে রাখা উচিত হইবে না। তাই মনে করিয়াছি আগামী সোমবারে যাত্রা করিব। মাঝে কাশীতে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া সম্ভবত তাহার পরের সোমবারেই কলিকাতা পৌঁছিতে পারিব।

তোমার "বীর কুণ্ডর" আমার বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। তোমরা নিয়মিত প্রবন্ধ না লিখিলে বঙ্গদর্শন নামিয়া যাইবে। আমার অবস্থায় আমার কাছে বেশি কিছু প্রত্যাশা করিয়ো না— তবু যেমন তেমন করিয়া গল্পটা এবং দুই একটা প্রবন্ধও লিখিতেছি।

হাজারিবাগের কাজ যদি তুমি পাও আমার জন্য বড়াকর নদীতীরে শালবনবেষ্টিত একটি বৃহৎ ভূখণ্ড সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ একটি জমি আছে— নিবারণবাবু ও গিরীন্দ্রবাবু তাহা আমার জন্য যোগাড় করিবেন আশা দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের নীরবতা ও নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া সন্দিহান হইয়াছি। ১০০।২০০ বিঘা জমি যদি পাই তবে আমি সেখানে আমাদের একটি বন্ধুপল্লী বসাইব। তাহা আমাদের তপোবন হইবে। তোমারও একটা কুটীর তাহার মধ্যে থাকিবে। সকলে মিলিয়া চাষবাস করিয়া

গোরুবাছুর রাখিয়া বিশ্রব্ধ আলাপে এবং ভাবের চর্চ্চায় সুখে থাকিব। যদি এরূপ ভাল জায়গা অল্প নিরিখে স্বাস্থ্যকর নির্জ্জন স্থানে তোমার জানা থাকে তবে নিশ্চয় আমার কথা স্মরণ করিয়ো— আমি এইরূপ আশ্রমের জন্য ব্যাকুল হইয়া আছি।

✓ আমার যে বৈষ্ণব কবিতা সংগ্রহ একটা খাতায় আছে তাহা মিলাইয়া পদরত্নাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়ো— তাহা হইলে কোন অসম্পূর্ণতা থাকিবে না। সে খাতা বোলপুরে আছে। আমি সেখানে গিয়া একটা ব্যবস্থা করিব।✓তোমার সঙ্গে কবে দেখা হইতে পারিবে? পূজার ছুটির পূর্ব্বে বোধ হয় না। এখন তোমার দুটি ছেলে আমার কাছে বন্ধক আছে— যখন খুসি তোমাকে টান দিয়া আনিতে পারি। ইতি ৩রা ভাদ্র ১৩১০

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রসুহৃদ্-গোষ্ঠীর মধ্যে আজীবন একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। চিরকাল রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে সাহিত্যসাধনায় উৎসাহিত করিয়াছেন; ইঁহাদের যুগ্ম-সম্পাদনায় বৈষ্ণব-পদাবলীর একটি সংকলন প্রকাশিত হইয়াছিল; শ্রীশচন্দ্রের আগ্রহাতিশয়েই রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শ্রীশচন্দ্রের অনুজ শৈলেশচন্দ্র দীর্ঘকাল 'মজুমদার লাইব্রেরি' হইতে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশ-ভার লইয়াছিলেন; শ্রীশচন্দ্রের খুল্লতাত-ভ্রাতা সুবোধচন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রারম্ভযুগে ইহার শিক্ষক ছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহিত রবীন্দ্রনাথের সৌহৃদ্য শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুতেই অবসিত হয় নাই; শ্রীশচন্দ্রের পুত্রকন্যাগণ অনেকেই রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, আজীবন তাঁহাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহদৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল; তাঁহাদের মধ্যে সন্তোষচন্দ্র ও রমা দেবীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, পরজীবনেও তাঁহারা শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

শ্রীশচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি চিঠি ছিন্নপত্রের গোড়ায় মুদ্রিত হইয়াছে; আরও অনেকগুলি চিঠি রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহে আছে।

—

সাধনা— মহর্ষি-পরিবারের উদ্‌যোগে প্রকাশিত মাসিকপত্র। কাগজটি চার বৎসর (১২৯৮-১৩০২) চলিয়াছিল, প্রথম তিন বৎসর সুধীন্দ্রনাথ, চতুর্থ বর্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক ছিলেন।

ক্ষিতী—ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বলু—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর; নগেন্দ্রবাবু—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত; ভোলা—শ্রীশচন্দ্রের পুত্র]

ভারতীয় সাজাত্য

শ্রীরাজশেখর বসু

ভারতবাসী মুসলমানের বিরুদ্ধে এই নালিশ মাঝে মাঝে শোনা যায় যে যদিও তাদের উৎপত্তি ও নিবাস এই দেশে এবং হিন্দুদের সঙ্গেই রক্তের যোগ বেশী তথাপি তারা আরব-ইরান-তুর্কিকে পিতৃভূমি এবং ওইসব দেশের লোককে নিকটতর আত্মীয় মনে করে। তাদের দৃষ্টিতে ধর্মের ঐক্যই মিলনের প্রধান সেতু। মাতৃভূমি ভারতের সঙ্গে তারা সম্বন্ধ গণনা করে গজনির সুলতানদের আক্রমণকাল থেকে, তার আগেকার ভারতকে তারা স্বদেশ মনে করে না। এদেশের অন্যধর্মী লোকের সঙ্গে তাদের শুধু রাজনীতির সম্পর্ক আছে, সাজাত্যবোধ এবং সংস্কৃতির যোগ নেই।

উক্ত নালিশের বিরুদ্ধে মুসলমানরা হিন্দুদের বলতে পারে— তোমাদের আলাদা পিতৃভূমি নেই তথাপি তোমরা একটা কাল্পনিক পিতৃলোক বানিয়েছ এবং তা থেকেই ধর্ম আর সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করেছ। ভারতের যারা অতিপ্রাচীন অধিবাসী তাদের তোমরা অসভ্য অস্পৃশ্য বলে উপেক্ষা করেছ। তোমরা প্রচার করে থাক যে ভারতীয় মুসলমান হিন্দুরই সজাতি, অথচ তাদের ম্লেচ্ছ বলে দূরে ঠেলে রেখেছ, অপমানও করেছ। যাদের সঙ্গে তোমাদের বংশগত সম্পর্ক নগণ্য সেই আর্য জাতি এবং বেদপুরাণোক্ত ঋষিগণকেই তোমরা আপন জন মনে কর। কোনও ভারতীয় মুসলমান যদি নিজেকে সৈয়দ অর্থাৎ পয়গম্বরের বংশধর বলে তবে তোমরা মনে মনে হাস, অথচ তোমাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্যরা অম্লানবদনে বলে থাকে যে তারা কশ্যপ ভরদ্বাজ শক্তি প্রভৃতি আর্য ঋষিদের গোত্রজাত, তোমাদের ক্ষত্রিয়রা মনে করে তারা চন্দ্রসূর্যবংশের সন্তান। আসল কথা, আমাদের ধর্ম ঐতিহ্য সংস্কার রুচি আদর্শ ও রীতিনীতি যেমন বহু অংশে বিজাতীয়, তোমাদেরও তেমনি। তফাত এই যে, আমাদের ইতিহাসের একটা সুনির্দিষ্ট আরম্ভ আছে— ইসলামের অভ্যুদয়, কিন্তু তোমাদের তা নেই। সেজন্য পুরাকালে পিছিয়ে গিয়ে বেদপুরাণের উপকথার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে তোমরা নিজেদের ইতিহাস খুঁজছ।

কোনও জাতি যদি চিরকাল অভেদ্য প্রাচীরের মধ্যে বাস করে তবেই তার ধর্ম সমাজব্যবস্থা সংস্কৃতি ইত্যাদি স্বতন্ত্র ও অনন্য ভাবে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সাধারণত তা দেখা যায় না, এক জাতির উপর অন্যান্য জাতির প্রভাব নানা ভাবে এসে পড়ে। রক্তের মিশ্রণ, বিজাতির অধীনতা বা বিধর্ম গ্রহণ যদি নাও হয় তথাপি পরিবর্তন আসতে পারে। আরব জাতি মুসলমান হবার পরেও প্রাচীন গ্রীসের দর্শন-বিজ্ঞান বিনা দ্বিধায় আত্মসাৎ করেছিল এবং মধ্যযুগের ইওরোপ আরবদের কাছ থেকেই গ্রীক বিদ্যা লাভ করেছিল। বর্তমান ইওরোপীয় ও আমেরিকান জাতিসকল প্রধানত খ্রীষ্টান, পেগান গ্রীক ও রোমানদের সঙ্গে তাদের ধর্মগত যোগ নেই, বংশগত যোগও বিশেষ কিছু নেই, তথাপি তাদের সংস্কৃতির উপর প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জাতির অপরিসীম প্রভাব এসে পড়েছে। ইওরোপ আমেরিকার শিক্ষিত জন সকলেই স্বীকার করেন যে অতিপ্রাচীন বিভিন্ন জাতি থেকে তাঁদের উৎপত্তি হয়েছে, পশ্চিম এশিয়া থেকে তাঁরা খ্রীষ্টধর্ম পেয়েছেন, গ্রীস রোম থেকে সভ্যতার বীজ স্বরূপ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য স্থাপত্য প্রভৃতি বিদ্যা পেয়েছেন, এবং তাঁদের সংস্কৃতির অবশিষ্ট অংশ তাঁরা নিজের যত্নে এবং প্রতিবেশী জাতিদের সহায়তায় গড়ে তুলেছেন।

সেকালের ভারতবাসী পুরাণোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বে ও জাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করত। ষাট-সত্তর বৎসর আগেকার বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় ম্যাক্সমুলার প্রভৃতির লেখা পড়ে স্থির করেছিলেন যে আর্যাবর্তের অন্যান্য অধিবাসীর ন্যায় বাঙালী (বিশেষত ভদ্র বাঙালী) আর্যজাতিসম্ভূত। তাঁদের পূর্বপুরুষরা দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পিঙ্গলকেশ নীলচক্ষু খাঁটী আর্য ছিলেন, এই বাংলা দেশের রোদ-বৃষ্টিতে এখনকার বাঙালীর চেহারা বদলে গেছে। ইংরেজ জার্মন তাঁদেরই প্রাচীন জ্ঞাতি, কিন্তু তারা ভ্রষ্ট আর্য, বৈদিক আর্যই আদি আর্য। সেই আর্যতা পাকা করবার জন্য এবং উচ্চ বর্ণে প্রমোশন পাবার জন্য তাঁদের উৎকট আগ্রহ ছিল। অব্রাহ্মণরা পইতা নিয়ে ধন্য হতেন, কেউ কেউ অগ্নিহোত্রী হতেন। এখনও অনেকে কৌলিক পদবীতে তুষ্ট নন, নামের শেষে শর্মা বর্মা জুড়ে দিয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন।

আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুর আর্যতার মোহ দূর হয়েছে। জাতিবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে অনেকে এখন বুঝেছেন যে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সকলেই সংকর, অতিপ্রাচীন অস্ট্রাল মোঙ্গল ভূমধ্য প্রভৃতি জাতি থেকে তাদের উৎপত্তি, কিঞ্চিৎ নর্ডিক রক্তও কারও কারও দেহে আছে। এই সংকরত্ব সর্বত্র সমান নয়, বিভিন্ন মিশ্রণের ফলে এবং বংশগতির নিয়মে ভারতবাসী নানাপ্রকার দেহলক্ষণ পেয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন নরজাতি থেকে তারা শুধু দৈহিক উপাদান পায় নি, তাদের সংস্কার অর্থাৎ জাতকর্ম বিবাহ অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতির রীতি, নানাপ্রকার সামাজিক বিধিনিষেধ, ভারতীয় লিপি, জ্যোতিষ, দার্শনিক মত, কৃষিপদ্ধতি, বাস্তুকর্ম, মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরি, লোহাপাথর থেকে লোহা তৈরি, বন্য ঘোড়া বশ করে তার পিঠে চড়া আর রথে জোতা, কাপড় সেলাই করে জামা-ইজার তৈরি, প্রভৃতি অসংখ্য প্রথা বিদ্যা আর কৌশল লাভ করেছে।

ভারতীয় হিন্দুর পৃথক পিতৃভূমি নেই, অর্থাৎ ভারতের বাইরে এমন কোনও দেশ নেই যেখানে হিন্দুধর্ম প্রথমে উদ্‌ভূত হয়েছিল এবং যেখানে এখনও হিন্দু আছে। বৈদিক আর্যগণের আদিভূমি উত্তরমেরুর কাছে বা চীন-তুর্কিস্থানে বা উত্তরপারস্যে হতে পারে, কিন্তু এখন সেখানে হিন্দু নেই। মুসলমানের যেমন আরব ইরান তুর্কী আছে হিন্দুর সেরকম কিছু নেই, তার ফলে হিন্দুর সাজাত্যবোধ এবং সমস্ত ঐতিহ্য ভারতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। হিন্দুর ধর্ম ভারতেই উৎপন্ন হয়েছে, তার উপাদান শুধু বেদ আর তন্ত্র নয়, বৌদ্ধ জৈন মুসলমান খ্রীষ্টান এবং বহু অদিম জাতির ধর্মও তাকে প্রভাবিত করেছে। হিন্দুর রক্ত, সংস্কার, ধর্ম কিছুই অবিমিশ্র নয়। ভারতে উদ্‌ভূত অতি জটিল হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে গত দেড় শ বৎসরে ইওরোপীয় সংস্কৃতিরও যোগ হয়েছে, এবং ভবিষ্যতে আরও হবে।

স্বধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে স্বধর্মচ্যুতির অকারণ আশঙ্কা জড়িত থাকে। গোঁড়া হিন্দু ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, কৃত্য-অকৃত্য, কাল-অকাল প্রভৃতি বিচার করে সাবধানে জীবনযাপন করে। মিথ্যা কথা, প্রতারণা বা পরস্বাপহরণে ধর্মচ্যুতি হয় না, কিন্তু গ্রহণের সময় খেলে বা বিধবাকে গহনা পরতে দিলে হয়। সাধুতার চেয়ে লোকাচার বড় এই ধারণা সকল ধর্মের গোঁড়া লোকের মধ্যে আছে। যারা স্মরণীয় কালের মধ্যে ধর্মান্তর নিয়েছে অথবা সমাজের এক স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উঠেছে তাদের মধ্যে পূর্বধর্মের ছোঁয়াচ লাগবার প্রবল আশঙ্কা দেখা যায়। পৌত্তলিকতা প্রতিরোধের জন্য মুসলমান ধর্মে যত কঠিন বিধি আছে খ্রীষ্টধর্মের কোনও শাখায় ততটা দেখা যায় না। এইসব বিধিনিষেধের আদিকারণ মুসলমান সমাজবিজ্ঞানীরা বলতে পারেন। এর মূলে এই আশঙ্কা থাকতে পারে যে পূর্বপুরুষদের সরস ধর্মের প্রতি লোকের একটা

প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ আছে, একটু অসতর্ক হলেই পতন হবে। হিন্দুর অনেক নিয়মের মূলেও হয়তো এই ধারণা আছে যে লঙ্ঘন করলেই অনার্যতার মোহময় পঙ্কে পড়তে হবে। শিক্ষিত বাঙালী খ্রীষ্টানদের মধ্যেও এই শুচিবাতিক দেখা যেত, কিন্তু এখন বোধ হয় কমে গেছে। এককালে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের উপর অনেক সামাজিক নির্যাতন হয়েছে। দেশী খ্রীষ্টানদের উপর তেমন কিছু হয় নি, কারণ তাঁরা সাহেব পাদরীর আশ্রিত। অসহায় ব্রাহ্মরা আত্মরক্ষার জন্য গোঁড়া হিন্দুদের সংশ্রব যথাসম্ভব পরিহার করতেন এবং স্বধর্মচ্যুতির ভয়ে পৌত্তলিকতার সকল চিহ্ন এড়িয়ে চলতেন। সুখের বিষয়, শিক্ষিত হিন্দুর গোঁড়ামি আর অনুদারতা আজকাল অনেক কমে গেছে, ব্রাহ্মদেরও স্বতন্ত্রভাব এবং ধর্মচ্যুতির আতঙ্ক পূর্বের মতন নেই।

রবীন্দ্রনাথ 'সমাজ' পুস্তকে 'আত্মপরিচয়' নামক প্রবন্ধে হিন্দুত্বের এই অর্থ দিয়েছেন—

> হিন্দুসমাজে যে-সম্প্রদায় কিছুদিন ধরিয়া যে-ধর্ম এবং যে আচারকেই হিন্দু বলিয়া মানিয়া আসিয়াছে তাহাই তাহার পক্ষে হিন্দুত্ব এবং তাহার ব্যতিক্রম তাহার পক্ষেই হিন্দুত্বের ব্যতিক্রম।

সাধারণ বা সনাতনী হিন্দুর একটি বৈশিষ্ট্য আছে— বৌদ্ধ জৈন শিখ ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতির তুল্য তার কোনও সুনির্দিষ্ট ক্রীড নেই। বেদে বিশ্বাস, জাতিভেদ, মূর্তিপূজা ও পুনর্জন্মে আস্থা, খাদ্যাখাদ্য বিচার ইত্যাদির কোনওটি হিন্দুত্বের অপরিহার্য লক্ষণ নয়, আজকাল এসব না মানলেও হিন্দুত্ব নষ্ট হয় না। যে নিজেকে হিন্দু বলে, শ্রাদ্ধাদি দু-একটি নৈমিত্তিক কর্ম সনাতন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে, এবং যার সঙ্গে অন্যান্য হিন্দুর অল্পাধিক সামাজিক সম্বন্ধ থাকে সেই হিন্দু। আচার-ব্যবহার, ঈশ্বরবিষয়ক মত, অথবা উপাসনা-পদ্ধতি হিন্দুত্বের সাধারণ লক্ষণ নয়। নিত্য নিষিদ্ধ খাদ্য খেলে, বিজাতীয় পোষাক পরলে, সিভিল বিবাহ বা মেম বিবাহ করলে, এবং সম্পূর্ণ নাস্তিক হলেও হিন্দুত্ব বজায় থাকে। শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুসমাজে এখন ধর্মবিপর্যয় চলছে, এক দিকে প্রবীণ লোকদের নিষ্ঠা ক্ষয় পাচ্ছে, আর এক দিকে অল্পবয়স্করা পূজাপার্বণে (যেমন সরস্বতীপূজায় আর সর্বজনীন দুর্গাপূজায়) নব নব বর্বরতা আমদানি করছে।

এডোআর্ড গিবন তাঁর রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাসে লিখেছেন—

> The philosophers of antiquity· ·viewing with a smile of pity and indulgence the various errors of the vulgar, practised the ceremonies of their fathers, devoutly frequented the temples of the gods; and sometimes condescending to act a part on the theatre of superstition, they concealed the sentiments of an atheist under the sacerdotal robes. · ·It was indifferent to them what shape the folly of the multitude might choose to assume.

প্রাচীন রোমান ফিলসফারদের ধর্মমত সম্বন্ধে গিবনের এই উক্তি অসংখ্য আধুনিক হিন্দুর সম্বন্ধেও খাটে, কারণ রোমান আর হিন্দু নাগরিক দুইই পেগান, কারও বাঁধাধরা ধর্মমত নেই।

পূর্বোক্ত 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি— ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি, কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কি করিয়া। সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নয়। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে, কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কি করিয়া। তবে কি মুসলমান বা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পারো। নিশ্চয়ই পারি।· ·বাংলা দেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে, এবং তাহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রীষ্টান, আর এক ভাই মুসলমান, ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে

একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কথনই দুঃসাধ্য নহে, · ·কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল ও সুন্দর।· · মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনও বিশেষ ধর্ম নহে।

রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপক অর্থে হিন্দু শব্দ প্রয়োগ করেছেন সে অর্থ এখন চলবার কোনও সম্ভাবনা নেই। হিন্দু শব্দের আধুনিক অর্থ দাঁড়িয়েছে— ভারতজাত-ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ জৈন শিখ ব্রাহ্ম সনাতনী— এরা হিন্দু, কিন্তু মুসলমান খ্রীষ্টান হিন্দু নয়। যদি এই সংকীর্ণ সংজ্ঞার্থের প্রচলন নাও হত তথাপি কোনও মুসলমান হিন্দু নামের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইত না। রবীন্দ্রনাথ যে সাজাত্যবোধ কামনা করেছিলেন তা এখন 'ভারতীয়' নামের উপর গড়ে উঠতে পারে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে nationality বা সাজাত্যের কারণ— নিবাস, উৎপত্তি (origin), ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য (traditions), সংস্কৃতি ও স্বার্থের ঐক্য। কোনও রাষ্ট্রে উক্ত কারণের সবগুলি না থাকলেও সাজাত্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। মার্কিন রাষ্ট্রে উৎপত্তি আর ঐতিহ্যের ঐক্য নেই, ধর্মও সমান নয় (প্রোটেস্টান্ট, ক্যাথলিক, ইহুদী), ভাষার ঐক্য প্রয়োজনের বশে হয়েছে। কানাডারও ওই অবস্থা, সেখানে ভাষারও ঐক্য নেই। স্বইটজারল্যাণ্ডেও উৎপত্তি ভাষা আর ধর্ম সমান নয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে নিবাস আর স্বার্থ ছাড়া আর কিছুর ঐক্য নেই, ধর্ম সেখানে দুর্বল সেজন্য গণ্য নয়। তথাপি এইসব রাষ্ট্রের অধিবাসীরা সাজাত্য লাভ করেছে। সমগ্র ভারতরাষ্ট্রে উৎপত্তি আর ভাষার যতই ভেদ থাকুক, প্রদেশের (রাজ্যের বা স্টেটের) মধ্যে ভেদ সর্বত্র নেই, পশ্চিমবঙ্গে মোটেই নেই, স্বার্থও সকলের সমান।

ভারত-পাকিস্থানের বিরোধ মিটতে হয়তো অনেক সময় লাগবে, কিন্তু ভারতী প্রজার মধ্যে প্রীতি ও সাজাত্যবোধ প্রতিষ্ঠায় দেরি করা চলবে না। হিন্দু আর মুসলমান পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখে এ কথা চাপা দিয়ে লাভ নেই। এই অপ্রীতির কারণ নিয়ে দুই পক্ষের অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। কার দোষ কত তার আলোচনা না করে এখন মিলনের উপায় খোঁজাই দরকার। পরিবার গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র সর্বত্রই মিলনের সূত্র প্রধানত মানসিক বা ভাবগত— সমান মন্ত্র, সমান উদ্দেশ্য, সমান মন, সমান আকূতি। যদি ধর্ম সমান হয় এবং নিষ্ঠা মোহমুক্ত হয় তবে মিলন সহজেই হতে পারে। কিন্তু যেখানে ধর্ম পৃথক এবং নিষ্ঠা মোহগ্রস্ত সেখানে বিরোধ আসে। মধ্যযুগের ইওরোপে প্রায় সমস্ত বিরোধের মূলে ছিল ধর্মান্ধতা। সেই ধর্মান্ধতা এখন নেই, তার স্থানে এসেছে স্বার্থান্ধতা।

বেদ স্মৃতি কোরান শরিয়ত প্রভৃতিতে যা লেখা আছে তাই ধর্ম— এ কথা সত্য নয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে লোকে যেমন আচরণ করে তাই তার ধর্ম। মূঢ় হিন্দুর ধর্মে বলে, মুসলমানরা দেশের কণ্টক, তাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রেখো না; ভগবান কল্কী যথাকালে অবতীর্ণ হয়ে ধূমকেতুর ন্যায় করাল করবাল দিয়ে ম্লেচ্ছনিবহ সংহার করবেন। মূঢ় মুসলমানের ধর্মে বলে, কাফেরকে বধ করলে বা জোর করে কলমা পড়ালে বা তাদের মেয়ে কেড়ে নিলে পাপ হয় না, পুণ্যই হয়। শিক্ষাবিস্তারের ফলে হিন্দুর ধর্মান্ধতা অনেক কমেছে, মুসলমানেরও ক্রমশ কমবে। সংস্কারমুক্ত হিন্দু মুসলমান যদি পুরোহিত আর মোল্লার আসন অধিকার করে উদার ধর্মমত প্রচার করেন তবে শীঘ্রই সুফল দেখা দিতে পারে।

সাজাত্যের যেসকল কারণ পূর্বে বলা হয়েছে তার মধ্যে দুটি প্রধান কারণ ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি। এই দুটির দ্বারা ধর্ম বিশেষরূপে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের সংস্কৃতির অনেক

ঐক্য আছে, অনৈক্য যা দেখা যায় তার মূলে আছে ঐতিহ্যের ভিন্নতা। ঐতিহ্যের যদি সমন্বয় ও প্রসার হয় তবে সংস্কৃতির ভেদ কমে যাবে, ধর্মের নামে যে অপধর্ম চলছে তারও সংস্কার হবে।

ভারতের পরম্পরাগত যে ঐতিহ্য তাতে হিন্দু আর মুসলমানের সমান অধিকার। ভ্রান্তির বশে মুসলমান তার পূর্বপুরুষদের এই ঋক্‌থ বর্জন করছে। এই ভ্রান্তি দূর করতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যায় আর সাহিত্যে শুধু হিন্দুর ওয়ারিসী স্বত্ব নেই, তাতে শুধু বহুদেববাদ আর পৌত্তলিকতা আছে এ কথাও সত্য নয়। মিশ্রণ থাকলেই তা পরিত্যাজ্য হতে পারে না। নিষ্ঠাবান পাশ্চাত্ত্য খ্রীষ্টানও সাগ্রহে গ্রীক রোমান ঐতিহ্য চর্চা করেন, এমন মনে করেন না যে পেগান শাস্ত্র পড়লে বা পেগান কলা চর্চা করলে তাঁর ধর্মনাশ হবে। মিশর ও ইরান দেশের পণ্ডিতরা তাঁদের অমুসলমান পূর্বপুরুষদের কীর্তি ও ঐতিহ্য আলোচনা করে গৌরব বোধ করেন, এ ভয় তাঁদের নেই যে এতে ইসলামের হানি হবে। বলা যেতে পারে যে পেগান গ্রীক আর রোমান এখন নেই, মিশরের বহুদেববাদীরাও লোপ পেয়েছে, ইরানের অতিপ্রাচীন ধর্মের লেশমাত্র নেই, সেখানে জরথুস্ত্রপন্থী যারা আছে তারা সংখ্যায় নগণ্য; সুতরাং এইসব দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের চর্চা করলে মুসলমানের আদর্শনাশের ভয় নেই। কিন্তু ভারত? এখানে যে হিন্দুরা জলজীয়ন্ত হয়ে বর্তমান রয়েছে, পুরাকালের সমস্ত বিষয় আঁকড়ে ধরে আছে। মুসলমান যদি তার পূর্বপুরুষদের সম্পদে হাত দিতে যায় তবে মাছির মতন মাকঁড়সার জালে জড়িয়ে পড়বে।

এই যুক্তিহীন আতঙ্ক শিক্ষিত মুসলমানরা দূর করতে পারেন। হিন্দু যখন ভারতীয় বিদ্যার বা কলার চর্চা করে তখন নির্বিচারে করে না, তার আধুনিক রুচি আর শিক্ষা অনুসারেই করে। মুসলমানও তাই করবে। হিন্দুর দৃষ্টিতে যা অনবদ্য মুসলমান তা অবদ্য মনে করতে পারে। হিন্দুর বিশ্বাস থাকতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁর চার হাত ছিল, তিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। মুসলমানের কাছে এসব কথা অশ্রদ্ধেয় হতে পারে, কিন্তু তার জন্য গীতা পড়া চলবে না কেন? আরব্য উপন্যাস আর ওমর খৈয়াম পড়ে হিন্দু আনন্দ পায়, সুফী সাহিত্য তার ভাল লাগে; প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পড়েও মুসলমান আনন্দ পেতে পারে।

কয়েকজন উদারস্বভাব বাঙালী মুসলমান তাঁদের রচনার দ্বারা হিন্দুর চিত্ত জয় করেছেন। কবি কাইকোবাদ তাঁর একটি কাব্যে হিন্দু নায়িকার মুখে কালীর স্তব দিয়েছেন। তাতে কবির ধর্মনাশ হয় নি, উদারতাই প্রকাশ পেয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সর্বজনপ্রিয় কবিতায় হিন্দু আর ইসলামী ভাবের সমন্বয় করে যশস্বী হয়েছেন। সৈয়দ মুজতাবা আলী তাঁর লেখার নূতন ভঙ্গীর জন্য অল্পকালের মধ্যে অসংখ্য পাঠকের প্রিয় হয়েছেন। তিনি নিজে যেমন সংস্কারমুক্ত বিশ্বনাগরিক তাঁর রচনাও সেই রকম; সংস্কৃত ফারসী আরবী ইংরেজী জার্মন প্রভৃতি নানা ভাষা থেকে শব্দ আর বাক্য চয়ন করে সচ্ছন্দ নিপুণতায় তাঁর লেখায় সন্নিবিষ্ট করেছেন, অথচ মাতৃভাষার জাতিনাশ করেন নি।

মুসলমান এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের চর্চা করলেই যথেষ্ট হবে না। ভারতের বাইরে থেকে মুসলমান যে ঐতিহ্য নিয়েছে, যার ফলে তার সংস্কৃতি বিশেষ রূপ পেয়েছে, হিন্দুকে তা অবশ্যই জানতে হবে, নতুবা ব্যবধান দূর হবে না। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই এই প্রকার পরস্পর পরিচয় আবশ্যক। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এই বিষয়ে উদ্‌যোগী হতে পারেন।

৯.৯.৫১

কর্তাভজার কথা ও গান

শ্রীসুকুমার সেন

অধ্যাত্মসাধনায় আচার-অনুষ্ঠান-তন্ত্রমন্ত্রকে উপেক্ষা করে হৃদয়বৃত্তিকে সবার উপরে স্থান দিয়ে শ্রীচৈতন্য বাঙালির ব্যক্তি ও সমাজ চেতনায় নূতন প্রেরণা জাগালেন। মুসলমান অধিকার কায়েমি হবার আগে থেকেই দেশে অধ্যাত্মচিন্তায় এবং সমাজশাসনে ব্রাহ্মণের সার্বভৌমতা স্বীকৃত হয়ে এসেছিল। মুসলমান অধিকারের ফলে ব্রাহ্মণ সমাজে প্রায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণের আনুগত্য ছাড়া দেশের ও দশের কাছে বড়ো হবার কোনো পথ রইল না। এমন অবস্থায় যারা নির্ধন, অশিক্ষিত, সমাজবহির্ভূত, সদাচারহীন তারা বৃহত্তর সমাজের পরিধিপ্রান্তে নির্বাসিত হল, অনেকে বাধ্য হল অন্য সমাজ আশ্রয় করতে। হিন্দুসমাজের এই আত্মঘাতী উৎকেন্দ্রিক ও বিস্রংসনশীল প্রবণতা যখন প্রকটতম সেই সংকটের দিনে শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণ-ম্লেচ্ছ, স্ত্রী-শূদ্র, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মুর্খ ভেদ গ্রাহ্য না ক'রে সকলকে ডাক দিলেন নিঃসীম উদার আকাশের তলে হরি-সংকীর্তনে। তাঁর চরিত্রমহিমায়, তাঁর ভাবতন্ময়তায় হিন্দুসমাজের বড়ো বড়ো সংস্কার-ব্যবধান ঘুচে গেল। মানুষ-মানুষে কোনো তফাত রইল না ধর্মের আসরে, যেখানে ভেদাভেদের গণ্ডী ছিল নির্মমতম। ভক্তিকে তপশ্চর্যার উপরে স্থান দিলেন শ্রীচৈতন্য, ভক্তকে ভগবানের উঁচুতে। ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্যশালী, ভক্ত দীন। কিন্তু সে ভগবানের মহিমা নয়, ভক্তেরই সর্বত্যাগী প্রেম। ভগবান্‌কে রাজসিংহাসনে বসিয়ে ভক্ত স্বেচ্ছায় ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়েছে। দারিদ্র্যের এই মহনীয়তা অধ্যাত্মচিন্তায় নবীন বেগ এনে দিলে ষোড়শ শতাব্দীতে।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর ধীরে ধীরে উদার বৃহৎ বৈষ্ণব সমাজে আচার-বিচার-অনুষ্ঠান-সংস্কারের ছোট-বড়ো দেওয়াল উঠতে লাগল। শ্রীচৈতন্যের সহজভক্তিরসধারা নতুন শাস্ত্রের ও নব নৈষ্ঠিকতার ভাঁড়ে মুদো-চাপা পড়ল। গুরু আগে ছিলেন দূতী, এখন হলেন তিনি মহাপ্রতীহার। বংশীবটের তটে নিত্য ধেনুচরানো রাখাল অচলায়তনের গর্ভগৃহে জব্দ হলেন, তাঁর খেলুড়ি নজরবন্দী হয়ে রইল বাইরের উঠানে। ভগবানের প্রাপ্য অধিকার করলেন গুরু, গোঁসাই উপাধি তাঁরই কায়েম হল।

শ্রীচৈতন্যের প্রাণবান্ সত্য ধর্ম মানুষের মনকে জাগিয়ে দিয়েছিল। সে মনকে আর একেবারে ঘুমপাড়ানো গেল না। ভক্তিরসের প্রশস্ত নদীর মুখে বাঁধ পড়ল, জল ছাড়া হতে লাগল কাটা খালে। কিন্তু এই বাহ্য সহজ-রসধারা অবিচ্ছেদে বইতে লাগল তলে তলে সমাজবহির্ভূত অনাচারলাঞ্ছিত সুদরিদ্র সাধকগোষ্ঠীর চিত্তক্ষেত্রকে সরস-উর্বর ক'রে দিয়ে। আউল-বাউল-দরবেশ-সাঁই নামাঙ্কিত এই "সহজ" সাধকগোষ্ঠীই চৈতন্য-সাধনার স্বাভাবিক অধরসাধক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে যখন কালের হাওয়ার দিক-পাল্‌টানোর সূচনা হচ্ছে তখন এমন একজন "সহজ" সাধক আবার উদার ভক্তিসাধনাকে গোষ্ঠীগুহা থেকে বাইরে টেনে এনে ধর্মসাধনায় সকল মানুষের সমান অধিকারের দাবি মেনে নিতে চেষ্টা করলেন। ইনিই কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের আদিগুরু "সত্য মহাপ্রভু" আউলেচাঁদ। এঁর সম্বন্ধে জনশ্রুতিই সম্বল। সে জনশ্রুতি কিছু কিছু সংগ্রহ করে গেছেন

হোরেস হেম্যান উইলসন তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধে, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর বাংলা বইয়ে। অন্যত্রও টুকিটাকি খবর পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধি আছে, উলাগ্রামবাসী মহাদেব বারুই তার পানের বরোজে নামগোত্রহীন শিশুকে পেয়ে মানুষ করেন। ইনিই আউলেচাঁদ। এই নামকরণের হেতু সঠিক বলা যায় না। বাল্যকাল থেকেই এঁর ধরন ছিল পাগলাটে। সেজন্য "আউলে" (আকুল) নাম হতে পারে। আর আউলেচাঁদ মুসলমান কলন্দর-ফকীরের মত বেশ করতেন। সে কারণেও "আউলে" (আউলিয়া স্থফী সাধকের উপাধি) নাম সম্ভব। আউলেচাঁদের গুরুর হদিশ মেলে না। এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নয় যে তিনি হয়তো কোনো মুসলমান সহজ-সাধকের শিষ্য ছিলেন। আউলেচাঁদের মুসলমান শিষ্যও অনেক ছিল। কর্তাভজাদের সম্প্রদায়ে মুসলমান গুরু ("মহাশয়") অজ্ঞাত ছিল না। আউলেচাঁদের শিষ্যরাও অনেকে ফকীরের মত থাকতেন। ছড়ায় আছে—

আউলেচাঁদ দোয়া গরু সঙ্গে বাইশ ফকীর বাছুর তার।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মসাধনায় ও ধর্মানুষ্ঠানে যেখানে হিন্দু-মুসলমান মত নিরপেক্ষ উদার সমন্বয়ের প্রকাশ হয়েছে সেখানেই "সত্য" কথাটি একটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। স্থফী সাধকেরা আল্লাহ্‌কে যখন পার্সন্যাল ঈশ্বর বলে ভাবতেন তখন তাঁকে নাম দিতেন "হক্", সত্য। এই "হক্"এরই প্রতিধ্বনি পাই সত্যপীর-সত্যনারায়ণে[১] আর সত্য-মহাপ্রভুতে। কর্তাভজারা সত্যের উপর খুব ঝোঁক দিয়েছেন। তাঁদের এ সত্য নীতিকথার ব্যবহারিক সত্য-মিথ্যার সত্য নয়, এ সত্য দেশকালাতিশায়ী অদ্বয় অটল সত্তা, সৎ।

চিন্তায় বাক্যে কর্মে সত্য ও সহজ আচরণ আউলেচাঁদের প্রধান উপদেশ। পুরানো একটি গানে আউলেচাঁদের সত্যনিষ্ঠার, সহজ-স্থিতির ও ভাবনির্ভরতার ছবি ফুটেছে—

এ ভাবের মানুষ কোথা হতে এল
এর নাইক রোষ সদাই তোষ মুখে বলে সত্য বল।
এর সঙ্গে বাইশ জন
সবার একটি মন
'জয় কর্তা' বলি বাহু তুলি করলে প্রেমে ঢলাঢল
এ যে হারা দেওয়ায় মরা বাঁচায় এর হুকুমে গঙ্গা শুখোল॥

অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কে কঠোর সংযমের উপরেও খুব জোর দিয়েছিলেন কর্তাভজা সাধকেরা। তাই ছড়ায় বলে—

মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা
তবে হয় কর্তাভজা।

আউলেচাঁদকে তাঁর ভক্তরা শ্রীচৈতন্যের অবতার বলে মানতেন। চৈতন্যচরিতামৃত তাঁদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে প্রধান ছিল। বৈষ্ণব-ধর্মের সঙ্গে কর্তাভজার নাড়ীর যোগ কখনো ছিন্ন হয় নি। তবুও কর্তাভজারা সাম্প্রদায়িকতা সযত্নে এড়িয়ে চলেছিলেন। তাঁরা উপাস্যকে নাম দিয়েছিলেন কর্তা, যেমন কোনো কোনো সাধক সম্প্রদায় বলত সাঁই ("স্বামী")। এই কর্তা, ঘরের কর্তা, আর সাধক সেখানে গিন্নী; স্থতরাং

১ মানিকপীরের মানিক বোধ করি প্রাচীন ঈরানীয় খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তক মানিকি (গ্রীক মানিখোইওস্ Manikhoios)। ঈরানে একদা (তৃতীয়-পঞ্চম শতাব্দী) এই ধর্মের প্রসার হয়েছিল। স্থফীরা এঁকে পীর স্বীকার নিয়েছেন।

সম্প্রদায়ে সাধক ছাড়া ব্যক্তির নাম হল "বরাতি" (বরযাত্রী)। শুধু মুসলমান বাঙালি কবিরাই ঈশ্বরকে "কতা" বলেছেন রীতিমত। এও বোধ করি কর্তাভজার সঙ্গে সূফীসাধনার আর-একটা যোগসূত্র। "কর্তা" এই নাম দিয়ে ঈশ্বরকে এবং তাঁদের ইষ্টগুরুকে ভজনা করত বলেই বাইরের লোকে এই সাধনা ও সাধকগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছিল "কর্তাভজা" নাম দিয়ে।

আউলেচাঁদ বলতেন "সত্য বল", তাঁর অনুচর ভক্তরা যোগ করলেন "গুরু ধর"— "সত্য বল গুরু ধর সঙ্গে চল", "সত্য বল সঙ্গে চল এই সার কথা"[২]। ভক্তদের কাছে সত্য আর গুরু এক হয়ে গেল।[৩] গুরুর উপর অটল নিষ্ঠায় তাঁদের চরিত্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হল। "গুরু সত্য বিপদ্ মিথ্যা"— এই হল কর্তাভজার সাবিত্রী মন্ত্র।

আউলেচাঁদের প্রধান শিষ্য ছিল বাইশ জন। তাঁদের নাম— আন্দিরাম (আনন্দরাম), মনোহর দাস, নিত্যানন্দ দাস, নয়ান দাস, লক্ষ্মীকান্ত, প্যালারাম (বা খেলারাম), কৃষ্ণদাস, কিনু, গোবিন্দ (মতান্তরে কিনু-গোবিন্দ ও রামনাথ), শ্যাম কাঁসারি, ভীমরায় রজপুত, পাঁচকড়ি (বা পাঁচু রুইদাস), শিশুরাম, বিষ্ণুদাস, শঙ্কর, হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, হরি ঘোষ, কানাই ঘোষ, নিতাই ঘোষ, রামশরণ পাল। আউলেচাঁদের মৃত্যু হয় সম্ভবত ১৬৯১ শকাব্দে (১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে)। মৃত্যুর পর শিষ্যদের মধ্যে দু-মত হয়েছিল গুরুর সমাধি-ব্যবস্থা নিয়ে। শেষে দু জায়গায় দু রকম সমাধি দিয়ে মীমাংসা হল। আউলেচাঁদের কাঁথার সমাধি দেওয়া হল বোয়ালে গ্রামে, তাঁর দেহ সমাহিত হল চাকদার কাছে পরারি গ্রামে। শেষ পর্যন্ত শিষ্যদের মধ্যে প্রধান হলেন আট জন— হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, হরি ঘোষ, কানাই ঘোষ, নিধিরাম (মতান্তরে সহস্ররাম) ঘোষ, ভীমরায় রজপুত, শ্যাম বৈরাগী ও রামশরণ পাল। রামশরণ পাল এই দলের নেতা হন এবং ইনি ও এঁর স্ত্রী সতীমা ঘোষপাড়ায় পীঠ স্থাপন করেন। আউলেচাঁদের প্রত্যেক শিষ্যের নিজের নিজের দল ছিল, কিন্তু প্রায় সকলেই ঘোষপাড়ার সর্বাধিনায়কত্ব স্বীকার করে নিলে। রামশরণ পালের পর সতীমা, তার পর পুত্র রামদুলাল পাল ("শ্রীযুত দুলালচন্দ্র") এবং তার পর পুত্রবধূ ঘোষপাড়ার গদি পেয়েছিলেন। গুরু তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করতেন। কর্তাভজা গুরুরা "মহাশয়" এবং শিষ্যরা "বরাতি" নামে পরস্পর উল্লিখিত হতেন। ঘোষপাড়ার পীঠাধিকারী ছিলেন প্রধান মহাশয়, "শ্রীযুত"।

জনশ্রুতি বলে যে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে (১৭৬৯-৭০) সুখসাগরের হাটে চাল কিনতে গিয়ে রামশরণ আউলেচাঁদের দেখা ও কৃপা পান। এ কথা সত্য হলে রামশরণ আউলেচাঁদের শেষবয়সের শিষ্য ছিলেন। কর্তাভজাদের সঙ্ঘ-সৃষ্টি রামশরণেরই কাজ। এই সঙ্ঘের প্রার্থনা হল পুরাপুরি আত্মসমর্পণের—

কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু
তোমার সুখে চলি বুলি
যা বলাও তাই বলি
যা খাওয়াও তাই খাই
তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ নই
গুরু সত্য বিপদ মিথ্যা।

---

২ জয়নারায়ণ ঘোষালের করুণানিধানবিলাস, পৃ ২৯৮।

৩ "কৃষ্ণ বলে সত্য কর্ত্তা আছে একজন", "সত্য মহাপ্রভু বলি ডাকিল সকলে", ঐ পৃ ১২৯।

অথবা

ঠাকুর কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু,
আমি তোমার তুমি আমার
দয়া কর ঠাকুর।
গুরু সত্য বিপদ মিথ্যা।

শীল হল তিনটি, কায়মনোবাক্যে কর্তাভজার— সত্য, অব্যভিচার এবং অস্তেয়।

রামশরণ পালের প্রভাব ক্রমশ গুরুর গৌরব আচ্ছন্ন করে ফেললে। কলিকাতার ধনী ও শিক্ষিত সমাজের সদরে ও অন্দরে এঁর ও এঁর গোষ্ঠীর অধিকার বিস্তৃত হতে লাগল। ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে কলিকাতার বোধ করি সবচেয়ে প্রগতিশীল ব্যক্তি ছিলেন।[৪] এঁরা বৈষ্ণব বংশের ছেলে, তবুও ইনি কর্তাভজার মাহাত্ম্য অস্বীকার করতে পারেন নি। বাংলায় সবচেয়ে বড়ো কৃষ্ণলীলা-কাব্য লিখেছিলেন জয়নারায়ণ কাশীতে বসে ১২২১ খ্রীষ্টাব্দে। এতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্‌বাণীরূপে দিক্‌পাল ধর্মাচার্যদের মধ্যে রামশরণ পালের নাম করেছেন যীশু খ্রীষ্ট, কবীর, নানক, বল্লভ ও লামার সঙ্গে।

পশ্চিমেতে ইচ্ছা মণি[৫] উত্তরে কবীর গুণী
পূর্ব্বদিগে শ্রীরামশরণ
দক্ষিণে বল্লভ নামে মনোরম গুণধামে
মোর তত্ত্ব কবিরা বাখানে।[৬]
উত্তরেতে লামা গুরু নানক দক্ষিণে[৭]
রামশরণ নামে এক হবে পূর্বধামে।
পুত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে
ইষু ক্রাইষ্ট নাম তার রাখিবেক জনে।
তিন দেশী তিন পন্থ করিয়া মিলন
ইষুকে সকলে তারা করিবে প্রধান।
ইষু বিনা গতি নাই হইবে মন্ত্রণা।[৮]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাবের গুরুত্ব বোঝা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কোনো কোনো শিক্ষিত ভক্ত খ্রীষ্টধর্মের মুসলমান ধর্মের ও রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রহ্ম-উপাসনার মিলন ঘটিয়ে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের গুরুর নাম রামবল্লভ, তাই সম্প্রদায়ের নাম হল রামবল্লভী। ভক্তদের নাম হল বল্লভ-বল্লভী। রামবল্লভী গোষ্ঠীর প্রার্থনায় খ্রীষ্টীয় ধর্মের তথা "ব্রহ্ম"মতের প্রার্থনার স্পষ্ট ছাপ আছে—

৪ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে খ্রীষ্টাব্দে ইনি এবং এর পিতা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল বড়োলাটের কাছে এক স্বরচিত দরখাস্ত দিয়েছিলেন কলিকাতার অনাথ আতুরদের অন্নবস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা সৎকার ইত্যাদির সুব্যবস্থার জন্য। এই জন্যে এঁরা কলিকাতার অনাথ আতুরদের আদমসুমারীও করেছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলিত প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন দ্রষ্টব্য।

৫ অর্থাৎ Manichee (পূর্বে দ্রষ্টব্য)। ৬ পৃ ২৯৪। ৭ পাঠ "পশ্চিমে"। ৮ উপসংহার।

হে দেহ আত্মার সৃষ্টিকর্ত্তা অদ্বিতীয় পরমাত্মা সচ্চিদানন্দময় সত্য ও তোমার নিত্যদাস জগৎগুরু নির্গুণ শিব শ্রীশ্রীরামবল্লভ ঠাকুর, উভয়ের ধন্যবাদ পূর্বক নিবেদন করিতেছি অধমাধম বল্লভবল্লভী সকল, ইহাদিগের প্রার্থনা এই যেন কোন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা যে তোমার তত্ত্ব বোধ হয় এমন যুক্তিসিদ্ধ হয় না, যেহেতু এক শাস্ত্রে এক মত সিদ্ধ হয়, দ্বিতীয় শাস্ত্রে তদ্ভিন্ন। অতএব মত হইতে মতান্তর যদ্যপি হইল, তবে কি প্রকারে স্থির হইতে পারে?

হে কর্ত্তা, আমরা অজ্ঞানী ও অবোধ, আমাদিগকে কৃপা করিয়া সত্য বোধ করাইয়া প্রবোধ দিতে আজ্ঞা হউক।

হে মহাপ্রভো, মন্দ হইতে রক্ষা করুন, এবং সৎকর্ম করিতে প্রবৃত্তি ও সাহস ও সম্পত্তি প্রদান করুন। ইহা করিতে যদ্যপি আপনকার সন্তোষ হয়, তবে সিদ্ধ হউক।[৯]

বাঁশবেড়ের শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিঙ্কর গুণসাগর (বা গুণাকর) ও মতিলালবাবু রামবল্লভী গোষ্ঠীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এঁরা ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে কাঁচড়াপাড়ার কাছে পাঁচঘরা গ্রামে এক বিরাট উৎসব অনুষ্ঠান করেছিলেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রে এক প্রত্যক্ষদর্শী[১০] এ উৎসবের কৌতুকাবহ বিবরণ দিয়েছিলেন—

এই কএকজন বাবু একত্র হইয়া মোর কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচঘরা সাকিনে একজন পোদের ভবনে এক ইষ্টকনির্মিত বেদি তদুপর চৌকী এবং তদুপরে কুসুমমাল্য প্রদানপূর্বক পরম সুখে পরম সত্য নামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজন-পূর্বক বিবিধবর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহর নিবাসী একশত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেসাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং ঐ পরম সত্য বিষয়ক দুই নহবত দুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একটা গুস্তের খালের সম্মুখে আর একটা ঐ বেদির নিকটে আর দুই ইশতেহার কথিত দুই স্থানে রাখিয়াছিলেন তাহাতে পরম সত্য বিষয়ের অনেক বিবরণ লেখা ছিল· ·

অক্ষয়কুমার দত্ত বলেন, "শ্রুত হওয়া গিয়াছে, ইহারা খেচরান্ন ও গোমাংসাদি সকল দ্রব্যেরই ভোগ দিয়া থাকেন। ইশু খৃষ্ট, মহম্মদ ও নানকের এক এক ভোগ হয় এবং এক এক জন এতৎ মহাজন স্বরূপ হইয়া তদীয় ভোগের সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকেন।"

৩

কর্তাভজাদের বাঁধাধরা কোনো শাস্ত্রগ্রন্থ নেই। তাঁদের সাধারণ পাঠ্য ছিল চৈতন্যচরিতামৃত, নরোত্তমের প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ও বৈষ্ণব সহজমতের বিবিধ নিবন্ধ। কর্তাভজাদের নিজের কথায় তাঁদের মত ও তত্ত্ব পাওয়া যায়, শুধু লালশশীর গানে। গানগুলি সংখ্যায় প্রায় পাঁচ শ।[১১] গানের ভনিতায় কবির নাম পাই "লালশশী", ক্বচিৎ "শশীলাল" ও "শশী লালন"। "লালশশী"র আসল নাম দুলালচন্দ্র।[১২] "দুলাল"এর "দু" ছেড়ে দিয়ে "চন্দ্র"এর প্রতিশব্দ "শশী" নিয়ে লালশশী নামের উৎপত্তি। ইনি ছিলেন রামশরণ পালের পুত্র রামদুলাল পাল। লালশশীর জন্ম ১১৮২ সালের আষাঢ় মাসে[১৩], মৃত্যু ১২৫৯ সালের পরে নয়।[১৪] অনেকগুলি গান ১২৩১ থেকে ১২৩৫ সালের মধ্যে লেখা ঘোষপাড়ায়

---

৯ উপদেশক পত্রিকা, ১৮৪৭ পৃ ২৫৪।

১০ জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদ প্রভাকর ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ (সংবাদপত্রে সেকালের কথা। দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ ৩১৯)।

১১ 'কর্তাভজার গীতাবলী' (প্রথম খণ্ড ১২৭৭) ও 'শ্রীশ্রীযুতের পদ' (দ্বিতীয় খণ্ড ১৩০০) নামে মুদ্রিত।

১২ 'শ্রীযুত দুলালচন্দ্র গান প্রকাশিয়া' (কর্তাভজার গীতাবলী পৃ ২)।

১৩ শ্রীশ্রীযুতের পদাবলী পৃ ২২৩।

১৪ শ্রীশ্রীযুতের পদাবলীর শেষ গানে এই তারিখ পাই। এটি লালশশীর রচনা নয়, তাঁর মৃত্যুর পরে কোন ভক্তের লেখা বলে মনে করি।

ফাল্গুন ও আষাঢ় উৎসব উপলক্ষ্যে।[১৫] অনেকগুলি গান কবিগানের মত "সওয়াল-জবাব" রূপে লেখা। এগুলিকে কবি "লহর" নামে উল্লেখ করেছেন। অন্য গানগুলির নাম "ঢেউ"। লহর ভারতরঙ্গিণীর, ঢেউ ভাবসমুদ্রের।

গানগুলির মধ্যে তত্ত্বকথা আছে, কিন্তু সে তত্ত্বকথার দাম তত বেশি নয় যত রচনার অভাবনীয় সরল নবীনতার। অপরিচিত দুরূহ শব্দ একেবারেই নেই। চলিত বিদেশী শব্দ বর্জনের চেষ্টা নেই। সাধু-ভাষার ব্যাকরণের কোনো উদাহরণ এর থেকে মিলবে না। যে কথা মুখের সবচেয়ে কাছাকাছি যে ভাব মনের অন্তরঙ্গ কর্তাভজা কবির কারবার তাই নিয়ে। ছন্দেও মুখের সরল ভাষার ও মনের সহজ ভাবের অবাধগতি। মোটকথা সেকালের পোষাকি কাব্যকলার সাজ গানগুলিতে একেবারেই নেই। অধিকাংশ গানে সেকালের জনগণের পরিচিত ও অনুমোদিত তত্ত্বকথার নিরর্থ বাগাড়ম্বর আছে। তবুও বলব এই গানগুলিতে সেকালের বাংলা গীতিকবিতার প্রাণস্পন্দন আছে, যা রবীন্দ্রনাথের আগে আর কোথাও পাই নি। সুতরাং লালশশীর বিশিষ্ট কয়েকটি গান বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকের "আধুনিক কবিতা"। লালশশীর গানে এমন ছত্র দুর্লভ নয় যা পড়লে অনপেক্ষিত অভিনবত্বে রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি ভেবে চম্‌কে উঠতে হয়। যেমন, "রাস্তার উপর বাসাঘর নাগর দোলনা", "তোমার মনের কথা আমারে শুনালে তুমি", "তুমি ভাবচ মনে ক্ষণে ক্ষণে যে ভাবনা", "আস্‌তে আর যেতে পথে পথেতে কাল গেল", "অপরাধ মার্জ্জনা কর প্রভু", "ভাবতে লেগেছি ব'সে করব কি এখন", "আমার এখন মনে হলো," "যারা দায়ে ঠেকিলে কাঁদে, দায় কাটালে কথার বোলে ঢাল তলোয়ার বাঁধে," "এসে এসে এসে না কেন সে বড় কঠিন", "কাজ কি সেই মনের মানুষ বাইরে বার করে"।

ভাবের অগম্য ভাষার অধৃষ্য অধ্যাত্ম-অনুভূতি কবি যে প্রকাশ করতে পারেন নি সে জন্যে ব্যাকুলতা জানিয়েছেন বারে বারে, "লালশশী রচে যা ভাবে সে বলতে পাচ্ছে না মুখে"। তবুও চেষ্টা করেছেন সাধ্যমত সহজ করে অনক্ষর শ্রোতার বোধগম্য করতে—

ভাই নাগাড়ের তদ্‌বিরে কেউ পারে না এড়াতে,
বিবেচনা করে বিধিমতে দেখ তা সাক্ষাতে,
দেখ সন্তান আদি যে নারীর হয়নি হবার নয়,
তবু সেই দোষে তারে বন্ধ্যা সবে কয়,
গর্ভে ধল্লে না,
কোলেও কল্লে না,
ছেলেপিলের জননী সে হতে পাল্লে না,
তবু বন্ধ্যাদোষ খেদ নিন্দিত তার সেই জড়িয়ে রয়েছে নাড়ে,
লালশশী কয় সে নৌকা চালায় হাল ঠেলা পাল গুণ দাঁড়ে॥

ভালোমন্দর দোটানা এড়িয়ে প্রয়োজন-আয়োজনের বোঝা নামিয়ে দিলে তবেই চিত্তে সহজ আনন্দের উদয় হয়। এই কথাটাও কবি ফিরে ফিরে বলেছেন—

পিছে ভয় গিয়েছে ঘুচে ইচ্ছে যা হতেছে অনায়াসে গাছতলাতে ব'সে পাই।

পরমসাধ্য বস্তু সাধনলভ্য নয়, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—

---

১৫ শ্রীশ্রীযুতের পদাবলী, পৃ ৫৭, ৬৩, ৮২, ৮৩, ৯৮, ৩৩২।

গোপালপুর-সমুদ্রতটের জেলে
স্কেচ : শ্রীনন্দলাল বসু

গোপালপুরের সমুদ্র

স্কেচ : শ্রীনন্দলাল বসু

ভাব্‌লে কি ভাবের মানুষ পাবে,
তার আপ্‌না থেকে ইচ্ছেটি না হলে কি কর্‌তে এসে দেখা দেবে।
তাই ভাবচি সে কি রাজি হবে।
ভাই রে অভাবিত অবারিত ভাবতে হয় যারে
তাব গরজি হয়ে রাজি করতে হয় তারে,
যদি দেশভ্রমণে এসে কোনক্রমে মনভ্রমে অমনি ফিরে যাবে।

অহং-কারের আড়াল ঘুচে গেলে অন্তরে সহজভাবের প্রবেশ হয় অবারিত।—

যারা নেকড়া পরে আথড়া করে কাঙ্গাল বেশে,
সহজে তার হিয়ার মাঝে বিরাজে সেই সহজে এসে,
এই যে ব্রহ্মপদ পদার্থ তত্ত্ব না করে
নির্বচ অনির্বচ অর্থ তার ধরে,
লালশশী বলে যে আদেশে উড়ছে খুশির নিশানা॥

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে"—

যদি ভিক্ষা মেগে খেতে যাই এই ভবের বাজারে,
মালসা হাতে ক'রে পথে পথে ডোর-কপনি পরে,
আমি যে লোকের সাক্ষাতে জানাইগে জিগির,
তখনি সে দেখতে পেয়ে বলে তুই কোনদেশী ফকীর,
বলে "তাক্‌তা তাগুড় লাগ্‌ঝুড়াঝুড়" না বাজাস না গাস.
অমনি কি আমার কাছে থামকা ভিক্ষা নিতে চাস।
আমি সেই অবধি ভেবে দেখি পোষায় না ভাই কিছুইতে,
লালশশী বলে ভেবে দেখি পোষায় না ভাই কিছুইতে॥

হঠাৎ-আলোর ঝলকানি যে কখন্ চিত্তগুহাকে উদ্‌ভাসিত ক'রে দেয় তার ঠিকঠিকানা নেই—

কিন্তু ভাই মনের মানুষ চিনতে পারিনে।
আমি তখতে ব'সে ব'সে
ফিরছি ঐ উল্লাসে
সকলকে দেখতে পাচ্ছি এখানে,
হবে কি তাই ভাবতেছি শয়নে স্বপনে।
আমি আপ্‌না হতে কোন মতে বুদ্ধিমন্ত নই,
দেখতে যে না পায় চক্ষে সাক্ষাতে দেখিয়ে বলে ঐ,
যত আশ্‌মানেতে পাখী ওড়ে অমনি পাখা দিই গুণে।· ·
একবার অগ্রদ্বীপের মহোৎসবে দেখ্‌তে গেলাম একা,
আখড়াধারী কত পুরুষ নারী হয়না লেখা জোখা।
হ'ল দেখ্‌তে গিয়ে বারেক চেয়ে আপ্‌নাতে ভুল,
বল্‌ব কি ভুল হ'য়ে দেখি আজ বুঝি বাদল আরম্ভল[১৬]।
জানি আদ্যোপান্ত অবিশ্রান্ত মন্ত[১৭] বিচক্ষণ,
অমনি সে গুণমণি আপনি[১৮] কল্লেন স্মরণ।

১৬ পাঠান্তর 'বাঁদিল আর তুল'। ১৭ ঐ 'আদি অন্ত ধরে তন্ত্রসারে মন্ত্র'। ১৮ ঐ 'তখনি'।

যা হারিয়েছিলাম বল্তে গেলাম দেখ্‌তে পেলাম দর্পণে।
লালশশী বলে বল্তে গেলাম দেখ্‌তে পেলাম দর্পণে॥

দাস্যভাব ভক্তের স্বাভাবিক। বৈষ্ণবকবি প্রেমাতিশয্যে ভক্তকে ভগবানের উপরে তুলেছেন, ভগবান্ ভক্তের মহিমার কাছে নতশির হয়েছেন, তা দেখেছি। আমাদের কর্তাভজা কবি ভক্তভগবানের সম্পর্কে ছোট-বড়ো ভেদাভেদ একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন। নিজেদের নিঃসীম দৈন্যের জন্যে কোনোরকম কৈফিয়ত নেই। গরীব সংসারের গিন্নির মত তিনি জানেন যে এর বেশি কর্তার মুরোদ নেই—

বল্‌ব কি আমা সবার দশার কথা,
কাঙালের পলটনকে যে বানালে সে ত গরীব বিধাতা,
শুনিলে পাছে মনে পায় ব্যথা।
দশার কথা মনে করিলে
তখনি ভাই বহে ধারা নয়নের[১৯] জলে,
ভেবে কুটে কর্‌তে কর্‌তে অম্‌নি ভাই ধরে মাথা।
তোমরা গড়নদারকে জান না এ বড় বিষম,
আওএল আর দোয়েম যত ছিয়েম চাহারম,
সবে মাত্র বিধি এই চার জন,
চার বর্ণে হচ্ছে দেখ ত্রিকুল সৃজন,
যদি ফিরে তাকিয়ে না দেখিবে দেখবে গিয়ে কি কোথা।
এই বিধাতার ভোগাভোগ যোগান সবারে,
বিষয় বুঝে দিচ্ছে বারে বারে,
যে যত সহিতে পারে।
দেখ খোস খোরাক পোষাক আদি যার যত আশা[২০],
খুব সে ঘটায় অট্টালিকায়[২১] সকলের বাসা,
মণিমুক্তা প্রবালে খচিত;
কোন সুখে কেহ ত ভাই নহেকো বঞ্চিত,
ভাই আচারে ব্যবহারে দেখ কোন বিধি কেমন[২২] দাতা।
দেখ আমাদিগের গড়নদার জোড়েন নেকড়া-কানি,
চাইলে পরে তাই করেন আমদানি
ভাই দেখ তার নিশানি।
এই খুদের সরা জলের ভাঁড় নিকড়ে[২৩] যত
চাইতে না চাইতে রে ভাই পাই অবিরত,
কুঁড়ে বই আর গড়নদারে গড়তে পারেন না,
আর শশীলালে হেসে বলে শয্যে খেজুরের পাতা॥

এ কথা এমনভাবে এর আগে আর কে বলেছে।

---

১৯ ঐ 'নয়ন'। ২০ ঐ 'সকলি খাসা'। ২১ ঐ 'খুব ঘটা অট্টালিকে'।
২২ ঐ 'যে বিধি যেমন'। ২৩ ঐ 'আকড়ে'।

যুগগুরু রামমোহন

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

বহুদিনের কথা। জলপথে যাত্রা করিযাছি। দিনরাত্রি জাহাজ চলে। মাঝে মাঝে বন্দরে থামে। বিঘ্নবিপদসংকুল স্থানেও মাঝে মাঝে জাহাজ দাঁড়ায়। এক-এক জন পথপ্রদর্শক বিশেষজ্ঞ উঠিয়া সংকট-স্থানটুকু পার করিয়া দেন। তাঁহাকে পাইলট বলে। বিপদময় পথে তাঁহার নির্দেশ না মানিলে বহু অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা।

ভারত-ইতিহাসের জাহাজেও বিঘ্নসংকুল যুগে বিধাতা কোনো-না-কোনো যোগ্য পথপ্রদর্শক পাঠান। তাঁহার নির্দেশ না মানিলেও সমূহ বিপদের ভয় রহিয়া যায়।

ভারত-ইতিহাসের ধারাপথও আবার বিচিত্র। এই ধারাপথে বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির নানা ধারা আসিয়া মিলিয়াছে। ভারত কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করে নাই। কিন্তু সংস্কৃতির সংগমস্থলগুলি নদীর মোহানার মতই সংকটময়। সেসব স্থানে সুপরিচালিত করিতে বিধাতা যুগে যুগে যোগ্য যোগ্য পথপ্রদর্শককে পাঠাইয়াছেন। তাঁহারাই আমাদের মহাপুরুষ। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাপুরুষেরাই আর্য ও অনার্যের সংস্কৃতিকে মিলাইতে পারিয়াছিলেন। আর্য ও অনার্যদিগের মধ্যে যে প্রীতির ও মৈত্রীর সেতু রামচন্দ্র বাঁধিলেন তাহা তাঁহার সাগর-সেতু বন্ধনের অপেক্ষাও মহত্তর কীর্তি। বিষমসমর-বিজয়ীদের আমরা ভুলিয়াছি। কত সম্রাটের কথাও আমাদের মনে নাই। কিন্তু এইসব মহাপুরুষ আজও আমাদের চির-নমস্য। মৈত্রীই তাঁহাদের শক্তি, উদারতাই তাঁহাদের সাধনা।

ইহার বহুকাল পরে ভারতে আসিল মুসলমান ধর্ম। উভয় দেশের পণ্ডিতেরা হিন্দু মুসলমানের সাধনাকে মৈত্রী-বন্ধনে বাঁধিতে চাহিলেন, কিন্তু পারিলেন না। একে একে পণ্ডিতেরা সকলেই হার মানিলেন। তখন আসিলেন রামানন্দ রবিদাস কবীর দাদূ নানক প্রভৃতি উদার ভক্তি-সাধক সহজ মানুষদের দল। তাঁহারা অনেকেই ধনমানবিদ্যাজাতিকুলমানহীন। তাঁহারাই অসাধ্য সাধন করিয়া গেলেন। তাই তাঁহাদের আজও আমরা প্রণাম করি।

ইহার পরে আসিল য়ুরোপ হইতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বহুমুখী ধারা লইয়া স্পেন পর্তুগাল দিনেমার ফরাসি ইংরেজের দল। তখন শুধু ধর্ম বা সাধনার মিলন-সমস্যা নহে, তখন সমস্যার আর অন্ত নাই। জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য কলা শিক্ষা রাজনীতি সমাজনীতি বাণিজ্যনীতি শিল্পনীতি সব কিছুরই তখন বোঝাপড়া দরকার। কাজেই সমস্যার আর পার নাই। এবার সমস্যা সহজ নয়। শুধু ধর্মের বিরোধ মেটানোই এক দারুণ ব্যাপার, আর এতগুলি সমস্যা মেটাইবেন কে এবং কোন্ উপায়ে?

শুধু ধর্মসাধক হইলে চলিবে না, আবার ধর্মের উদার প্রতিভা না থাকিলেও চলিবে না। সংস্কৃতির ও জ্ঞানের সব দিকেই তাঁহার গভীর দৃষ্টি ও অধিকার থাকা চাই। শুধু ধর্মগুরু অনেকে আসিলেন, কিন্তু এই কঠিন কাজে হার মানিলেন। এই মহাগুরু কে হইবেন? তাঁহাকেই এই সংকটময় যুগে ভারত চাহিতেছিল।

এমন সময় বিধাতা পাঠাইলেন বাংলাদেশে রাজা রামমোহন রায়কে। নিঃশব্দে তিনি আসিলেন। কখন যে আসিলেন তাহা কেহ টেরই পাইল না। কেহ বলেন ১৭৭২ সাল, কেহ বলেন ১৭৭৪। তবে জ্যৈষ্ঠ বা মে মাসে তাঁহার জন্ম, ইহা জানা গিয়াছে। আর ১৮৩৩ সালে ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ২-২৫ মিনিটে তিনি ইংলণ্ডে ব্রিস্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্যকে মুক্ত করিয়া গেলেন। সেই প্রয়াণ-দিনকে আশ্রয় করিয়াই এখন আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারি। জন্মদিন ঠিক পাইবার উপায় নাই। জন্মদিন-ক্ষণ জানা যাউক না যাউক তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই আমরা ধন্য হইব।

যেমন বহুধাবিচিত্র কাজের জন্য পথপ্রদর্শক প্রয়োজন তেমনি অশেষমুখী প্রতিভা ও উৎসাহ দিয়া যে বিধাতা তাঁহাকে সেই অন্ধকার যুগে এই দেশে পাঠাইলেন সে কথা কি ঠিকমত আমরা এখনো বুঝিয়াছি ?

আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব মানদণ্ডে তাঁহার মহত্ত্বের একটা ধারণাই করা যায় না। বহুদিন আগে আমি কিছুকাল হিমালয়ে বাস করিতাম। সেখানকার সরল পর্বতবাসীরা কুড়ির বেশি সংখ্যাই বোঝে না। একদিন নক্ষত্রমণ্ডলীর বিশালতা ও দূরত্বের কথা উঠিল। কিছুতেই বোঝানো গেল না। পর্বতবাসীরা সরল, না বুঝিলেও তাহারা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। আর আমাদের ধারণাশক্তি বিশাল না হইলেও আমরা যে সুচতুর ; তাই বিস্ময়ের বদলে এইরূপ ক্ষেত্রে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠি, "তিনি এমনি কি বড় ছিলেন ?" সরল পর্বতবাসীর মত বিস্ময় প্রকাশ করিবার মহত্ত্বও যে আমাদের নাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বহু স্থানের ও বহু কালের সম্পদের যোগে বিচিত্র, ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারেও বহু যুগের বহু সাধনার বৈভব সংগৃহীত। কিরূপ বহুমুখী প্রতিভা হইলে এই দুইয়ের মধ্যে যথার্থভাবে সর্বতোমুখ যোগ সাধন করা যায় ? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহা না বুঝিতে পারিলেও বিধাতা তাঁহার যোগ্যতম সাধককেই যথাকালে পাঠাইলেন। বুদ্ধদেবের এক নাম তথাগত, আমরা রামমোহনকেও তথাগত বলিতে পারি। যখন যেভাবে তাঁহার আসা উচিত ঠিক সেই ভাবেই তিনি আসিয়াছিলেন।

বাংলা সংস্কৃত ও পারসি-আরবি দিয়া তাঁহার শিক্ষার আরম্ভ। বাধ্য হইয়া বেশি বয়সে তিনি ইংরেজিও শিখিলেন, অথচ তাঁহার ইংরেজিরচনার শক্তিও বিস্ময়কর। ভারতের নবজাগরণে সর্বদিক দিয়া তিনি ডাক দিলেন। তাহার উপযুক্ত শিক্ষার ভিত্তিভূমি তাঁহার ছিল। বিরাট নদীর সেতুর দুই কূলই সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক।

দেশের সকলকে সর্বাধিক সত্যের চেতনায় উদ্বোধিত করিতে তিনি বাংলা ভাষা ও গদ্যসাহিত্যের উন্নতির কাজে হাত দিলেন। এইজন্য গৌড়ীয় ভাষায় গোটা ব্যাকরণই তাঁহাকে রচনা করিতে হইল। চলতি ভাষা, তাহার আবার ব্যাকরণ ! এই তুচ্ছ কাজ কি পণ্ডিতজনের ? ইহার পূর্বে, অর্থাৎ ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দেরও পূর্বে, আর-এক জন এই অদ্ভুত কাজে হাত দিলেন। তিনি বিদেশী অর্থাৎ পারশ্যদেশবাসী। তাঁহার নাম মির্জা খাঁ ইব্‌ন ফকরুদ্দীন মহম্মদ। তিনি তুহফতুল হিংদ নামে ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিশ্বকোষ রচনা করেন। তিনি তাহাতে যে ব্রজভাষায় এক ব্যাকরণ লেখেন তাহার চেয়ে ব্রজভাষায় পুরাতন আর কোনো ব্যাকরণ ভারতবাসীর রচিত পাওয়া যায় নাই। ১৮২৬ সালে রামমোহনের

এই অদ্ভুত কাজের মহত্ত্ব কি আজ আমরা বুঝিব? সংস্কৃত বা প্রাকৃতের ব্যাকরণ পণ্ডিতেরা তখন মনে করিতেন অনর্থক। চল্‌তি ভাষায় আবার ব্যাকরণ!

ইহারও পূর্বে রামমোহন বাংলা ভাষায় সংবাদকৌমুদী ও পারসি ভাষায় মীরাত অল অখবার (সংবাদ-দর্পণ) বাহির করেন। এই দেশের সাংবাদিকদেরও তিনি একজন মহা পথিকৃৎ। বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য তিনি ভূগোল খগোল ও জ্যামিতি শাস্ত্র বাংলায় রচনা করেন। 'জ্যামিতি' নামটি তাঁহারই দেওয়া। এই দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষারও আদিগুরু তিনি।

আইনের ক্ষেত্রে তিনি উত্তরাধিকার-বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। লাখেরাজ ভূমিস্বত্ব ও প্রজাস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়েও তিনি রীতিমত কাজ করিয়াছিলেন। এখানেও তিনি পথিকৃৎ।

ইহার পূর্বে তিনি রাজনীতি-বিষয়ে নানা আন্দোলন উপস্থিত করেন। তখনকার দিনেও তিনি দেশশাসকদের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হন। বিলাতে গিয়াও তিনি প্রজাদের অধিকারবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। বিলাতের রিফর্ম বিলের জয়ের জন্য তিনি সদাই জাগ্রত ছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও আদিগুরুর স্থান তাঁহারই প্রাপ্য।

রামমোহনের যুগে কয়জন-বা স্বাধীনতার কথা বুঝিতেন। কিন্তু সেই দিনেও তিনি এই বিষয়ে অতিশয় সচেতন ছিলেন। ১৮২১ সালে যখন স্পেনে নিয়মতন্ত্র-শাসন প্রবর্তিত হইল তখন খুশি হইয়া কলিকাতায় টাউনহলে তিনি ভোজ দিলেন। তুর্কীদের অধীন গ্রীসের জন্য তাঁহার অন্তরে গভীর বেদনা ছিল। স্বাধীনতাকামী নেপলস যখন পরাজিত হইল তখন ম্রিয়মাণ হইয়া রাজা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখাশুনা পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৮৩০ সাল, ইংলণ্ডে যাইতেছেন। নেটাল বন্দরে ফরাসি জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড়িতেছে শুনিয়া ব্যাকুলভাবে দেখিতে গিয়া আছাড় খাইয়া রাজা পা ভাঙিলেন। এই ভাঙা পায়ের দুঃখ সারা জীবন তিনি বহন করিয়াছেন। সেই বৎসরই রোমান ক্যাথলিকেরা ধর্মগত স্বাধীনতা পাইলে রাজা পরম আনন্দলাভ করেন। ১৮৩০ সালে ফরাসি বিদ্রোহেও তাঁহার অতিশয় উৎসাহ ছিল।

বাল্যকালেই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিয়া তিনি গুরুজনের বিরাগভাজন হন। সর্বধর্মের প্রতিই তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সর্বধর্ম মিলাইয়া একাকার করিতে তিনি চাহেন নাই। সর্বধর্মের মধ্যে মৈত্রী সৌহার্দ্য ও ভাবের আদান-প্রদানই ছিল তাঁহার কাম্য। ঐক্য-দৃষ্টিই রামমোহনের বিশেষত্ব। তাই সর্বধর্মের মৈত্রী তাঁহার কাম্য ছিল। ধর্মবিরোধ দূর করিতে তিনি তুলনামূলক ধর্মের প্রথম প্রবর্তন করেন। জগতে রাজনৈতিক বিরোধ দূর করিতে তিনি যে বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা করিয়াছেন তাহা League of Nationsএর কতকাল পূর্বে! ভারতে সম্প্রদায়বিরোধ দূর করিতে গিয়া বাধ্য হইয়া তিনি সর্বশাস্ত্রের পূর্বতন উপনিষদের আলোচনা ও সর্বপ্রতিমা-সমন্বয়ের জন্য অপ্রতিম নিরাকারের উপাসনা প্রচার করেন।

সেই যুগে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন-চেষ্টায় বুঝা যায় তাঁহার শিক্ষানুরাগের গভীরতা। সেই বিষয় তাঁহার বহু কথাই এখন লোকে জানেন না। তাঁহার সময়কার লোকের মুখেও যাহা শুনিয়াছি, তাহা বিস্ময়কর।

প্রাদেশিকতা তাঁহার চক্ষুশূল ছিল। ইংরেজি ভাষা ভারতকে সম্মিলিত ও পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত করিবে, বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া সত্যকে মুক্ত করিবে তাই ছিল তাঁহার কাম্য। অথচ সর্বভারত এক ভাষায় যাহাতে যুক্ত হয় তাই হিন্দীর তিনি সমর্থন করেন।

জাতীয় অর্থনীতির দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া যুদ্ধব্যয় সংক্ষেপ করিয়া প্রজাদের করভার হ্রাস করাই তাঁহার কাম্য ছিল। ধনীদের বিলাসোপকরণের কর বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদের ভূমি-কর তিনি কমাইতে চাহিতেন। যাহাতে অসহায় ও দরিদ্রদের দুঃখ ঘোচে তাহাই ছিল তাঁহার প্রার্থিত। বীরত্বের লক্ষণই হইল দুবলের প্রতি স্নেহ ও সুবিচার-বুদ্ধি। সেইজন্য অধিকারহীন নারী ও শ্রমিকদের কল্যাণচিন্তা তাঁহার মনে সদা জাগ্রত ছিল।

শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে ও সমাজের অবিচারে তখন নারীদের অনেক দুঃখ-দুর্গতি ছিল। এখন সেইসব দুঃখ-দুর্গতি স্মরণ করাও কঠিন। তাঁহার বলিষ্ঠ মন ইহা সহিতে পারিত না। বহু বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়িয়া তিনি সতীদাহপ্রথা ১৮২৯ সালে আইনত রহিত করান। পুরুষের মধ্যে তখন বহুবিবাহ চলিত ছিল, তিনি সেজন্যও বহু আন্দোলন করেন। হিন্দুনারীর দায়াধিকার বিষয়ে তিনি সে যুগেও কম কাজ করেন নাই। বিবাহে পণপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি বহু শ্রম করিয়াছেন। বালবিধবাদের বিবাহ তাঁহার কাম্য ছিল, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার কোনো লেখা এখন পাওয়া যায় না।

সব বিষয়ে তিনি সাম্যবাদী ছিলেন। সেই যুগে যে তিনি কলিকাতায় শ্রমিকদের সুখদুঃখের খবর লইয়া কাজ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। পথ চলিতে তিনি তরকারীওয়ালার মোট তুলিয়া দিয়া শ্রমিককে সাহায্য করিয়াছেন দেখা গিয়াছে। এইসব বিষয়ে হরিনাভিবাসী আনন্দচন্দ্র শিরোমণি সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। শ্রমিক-আন্দোলনেরও রামমোহন আদিগুরু।

জাতিভেদপ্রথার অসারতা দেখাইতে গিয়া তিনি বজ্রসূচি নামে উপনিষৎ প্রকাশিত করেন। পশু-পক্ষীর প্রতি তাঁহার অশেষ দয়া ছিল। বালকদের তিনি কত ভালবাসিতেন তাহা মহর্ষির আত্মচরিত দেখিলেই বুঝা যায়।

উপনিষৎ ও বেদান্তের প্রতি তিনিই প্রথম লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই বিষয়ে বহু গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। বাংলাতে বেদান্তসূত্র প্রকাশ করিবার পূর্বেই হিন্দীতে বেদান্ত ভাষায় অনুবাদ রচনাও তিনি প্রকাশ করেন। বাঙালি হইলেও তিনি সারা ভারতে হিন্দীভাষা প্রচারের একজন অগ্রদূত ছিলেন। সারা ভারতে সাধারণ ভাষা প্রবর্তনের প্রেরণা তাঁহার মনেই সর্বাগ্রে আসে। এজন্য তিনি বাঙালি হইয়াও হিন্দীর সমর্থন করেন। প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা তাঁহার মনে কোথাও ছিল না।

বর্তমান যুগে হিন্দী সাহিত্য রচনার আদিতম লেখক চতুষ্টয়ের মধ্যেও তিনি একজন। আর তিন জন ছিলেন সদল মিশ্র, লল্লূজী লাল, ইন্‌শা অল্লা খাঁ। ইঁহাদের মধ্যে সদল মিশ্রই ছিলেন হিন্দুস্থানী। লল্লূজী লাল আগরাবাসী গুজরাটি, ইন্‌শা অল্লা ও রাজা রামমোহন ছিলেন বাঙালি। অর্থাৎ চারি জনের তিন জনই অ-হিন্দুস্থানী। রাজার বেদান্তভাষ্যের হিন্দী এখন দুর্লভ। বাল্যকালে মির্জাপুরে অভয়চরণ ভট্টাচার্যের গৃহে তাহা আমি দেখিয়াছি। তবু রাজার যে হিন্দী লেখা এখন মেলে তাহা দেখিয়া পরম পণ্ডিত শ্রীমান হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী অতি সমাদরের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। রাজার

সর্বতোমুখী দৃষ্টি ও প্রতিভায় বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। সার্বভৌম ভারতের জন্য সেই যুগেও তাঁহার কী দৃষ্টি ছিল। তাই সর্বভারতের জন্য তিনি চাহিয়াছিলেন হিন্দী ভাষা।

রাজার পারসি লেখায়ও যথেষ্ট সুনাম আছে। তাঁহার সংস্কৃত রচনা অতিশয় প্রৌঢ় রীতির। পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারে তাঁহার রচনার ভঙ্গি ও গাম্ভীর্য বিস্ময়কর। তিনি এই যুগের ইংরেজিসর্বস্ব রাজনীতিওয়ালা ছিলেন না। ভারতের প্রাচীন নবীন সব ভাষাতেই তাহার প্রগাঢ় দখল ছিল। পাদরীদের সঙ্গে বিচারের ও রাজনীতির কাজের জন্য বেশি বয়সে তিনি ইংরেজি শেখেন। খৃষ্টীয় ধর্মের সর্বসত্য জানিবার জন্য তিনি ল্যাটিন গ্রীক ও হিব্রু ভাষাও শেখেন। খৃষ্টীয় ধর্ম বুঝিতে গিয়া তিনি পাদরীদের বাক্যকেই অভ্রান্ত মনে করেন নাই। পশ্চিম দেশে গিয়া ইংরেজ ও ফরাসি বহু মনীষী পণ্ডিত ও দার্শনিকের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ ভাবে যুক্ত হন। জেরেমি বেনথাম, ডলনি, ভলটেয়ার, টমাস পেন প্রভৃতির ভাবধারার সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় পরিচয় ঘটে। সে দেশের বহু বিদ্বজ্জনের তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সে দেশে যিনি রাজাকে জানিয়াছেন তিনিই তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিয়াছেন। ইহাতে রাজার মহত্ত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও মহত্ত্ব বুঝা যায়।

১৮৩০ সালের ১৫ই নবেম্বর তিনি বিলাতযাত্রা করেন। তখনকার দিনের দুঃসাধ্য বিলাতযাত্রায় তাঁহার প্রায় পাঁচ মাস সময় লাগিয়াছিল। পথে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা তাঁহাকে পার হইতে হয়। ইংলণ্ডে তিনি রাজসম্মান লাভ করিয়া বৈদেশিক দূতদের মধ্যে আসন পান। ফরাসি সম্রাট তাঁহাকে সমাদরে নিমন্ত্রণ করেন। এইসব কথা তুচ্ছ। সেখানে যে ধার্মিক ও জনসেবকদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল তাহাই বড় কথা। মিস কার্পেণ্টার প্রভৃতি রাজার মহত্ত্বে মুগ্ধ ছিলেন।

যেমন ছিল তাঁহার দৈহিক শক্তি তেমনই ছিল তাঁহার অন্তরের প্রতিভা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে এমন ভক্তি ও শ্রদ্ধার সমাবেশ কচিৎই কখনো দেখা যায়। তাঁহার তর্কপ্রণালীতেও চিন্তার গভীরতা, মনের সংযম ও চিত্তের সরসতা সবই দেখা যায়।

সকল ধর্মের ও সাধকদের প্রতিই এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পূর্বে বাংলাদেশে উপনিষৎ বেদান্ত মহানির্বাণতন্ত্র প্রভৃতির কথা কয় জন জানিতেন? কেহ কেহ তো এগুলি রামমোহনের রচনা মনে করিয়াই বিরুদ্ধতা করিতে গেলেন। গীতার প্রতি রাজার এত শ্রদ্ধা ছিল যে গীতা-মাহাত্ম্য বুঝাইতে তিনি গ্রন্থই রচনা করিয়াছিলেন।

যে ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি রাজা প্রবর্তিত করিতে চাহিলেন তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করা বস্তু নহে। উপনিষদাদি গ্রন্থের ব্রহ্মমন্ত্রগুলিই তাহার ভিত্তি। ১৮২৩ সালে রাজা তাঁহার প্রার্থনাপত্র লেখেন। তখন ব্রহ্মোপাসনায় উপনিষৎ-পাঠই হইত। সংগীতের সহায়তায় উপাসনাও ভারতে নূতন নহে। মধ্যযুগে এই দেশে সংগীতেই উপাসনা হইত। কীর্তন তো আগাগোড়াই সংগীত। ব্রজভূমির নিকটে শূরসেন প্রদেশে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে ভক্ত ঢেঢরাজের প্রবর্তিত সম্মিলিত উপাসনায় নরনারী দুই দলই যোগ দিতেন। ঢেঢরাজের প্রবর্তিত সম্প্রদায়ে পুরুষদের প্রার্থনার সঙ্গে নারীদের সংগীত হইত। সেই সাধক-মণ্ডলীতে বহু নারীই ছিলেন সুগায়িকা। তাঁহাদের সামাজিক উপাসনায় পুরুষ ও নারী একত্র উপাসনা করিতেন। তাহাতে প্রাচীন মন্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যানের রীতি ছিল। তাহাতে জাতি-পংক্তির ভেদ মানা হইত না। ঢেঢরাজ রাজার অল্প পূর্ববর্তী এবং তিনি রাজার পরে মারা গিয়াছেন যদিও রাজার সঙ্গে তাঁহার

পরিচয় ঘটে নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনারীতির সঙ্গে ঢেচরাজের সমাজের প্রভেদ কোথায়? ইঁহারাও নিরাকার অসীম অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন।

ঢেচরাজও কিছু নূতন কীর্তি করেন নাই। এখন হইতে চারি শত বৎসর পূর্বেকার (১৫৪৪ খৃঃ) ভক্ত দাদূ ব্রহ্মসম্প্রদায় নামে এক সাধনার মণ্ডলী প্রবর্তিত করেন। সেই যুগেও তাঁহাদের সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও মৈত্রীর আদর্শ ছিল। তাঁহারাও জাতি পংক্তি মানিতেন না। তীর্থ-মন্দির, ব্রত-উপবাস, বিগ্রহ ও শাস্ত্রাদিও তাঁহারা মানিতেন না। অপার অনন্ত ঈশ্বরেরই তাঁহারা উপাসক ছিলেন। উপাসনাতে ধ্যান ধারণা ব্যাখ্যান ও গান হইত। এখন হইতে প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বেকার প্রাণনাথ ও শিবনারায়ণ সন্তরাম মুন্নাদাস প্রভৃতি বহু সন্তসাধকদেরও সাধনাপ্রণালী ও আদর্শ সেই একই রূপ। প্রাণনাথ ও শিবনারায়ণ তো খৃষ্টের প্রতিও শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন এবং খৃষ্টের বাণীও নিজেদের উপাসনায় ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা হইলে রাজাকে দোষ দিই কিসে? আর ব্রাহ্মসমাজেই বা নূতন কি অদ্ভুত কীর্তি করা হইল?

রাজার প্রবর্তিত উপাসনা বিজাতীয় না হইবার নানা কারণ আছে। এক তো রাজা ছিলেন অতিশয় ভারতীয় এবং ভারতের প্রাচীন সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তাহা ছাড়া তাঁহার সহায় ছিলেন ভারতীয় সাধনায় বৃহস্পতিতুল্য মহানির্বাণ-তন্ত্রমতের সাধক শ্রীমৎ হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী। রাজার বিলাতযাত্রার পরে এই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীরই ছোট ভাই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বহুকাল রাজার প্রবর্তিত উপাসনা চালাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার হাত হইতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মোপাসনার ভার গ্রহণ করেন। কাজেই রাজার প্রবর্তিত উপাসনারীতিতে সাধনা ও আদর্শের দিক দিয়া ভারতীয় ভাব হারাইয়া ফেলার কোনো ভয় ছিল না। রাজা প্রাচীনতম সব বড় আদর্শ ও রীতিকেই এই যুগের উপযোগী করিয়া বহু লোকের বিরুদ্ধতার মধ্যেও যে পুনঃপ্রবর্তিত করিতে পারিলেন তাহাতেই তাঁহার প্রতিভা ও মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক উপাসনা ছাড়া যে সামাজিক সংহতি হয় না, ইহা রাজা বুঝিয়াছিলেন। তাই সমবেত উপাসনা তাঁহার এত কাম্য ছিল। রাজার সমাজে যে ব্রহ্মসংগীত গান হইত তাহার প্রথম রচয়িতাও স্বয়ং রাজা; এই যুগে ব্রহ্মসংগীতের আদিরচয়িতার সম্মানও রাজারই প্রাপ্য। এই ব্রহ্ম-সংগীতের চরম উৎকর্ষ হইল রবীন্দ্রনাথের ভক্তি-সংগীতে।

উপাসনাতে বাংলা ভাষা প্রবর্তন করায় যে ভাষার কতখানি উপকার করা হইল তাহা বলিয়া বুঝানো যায় না। মহর্ষির আত্মচরিতের ভাষায় অপূর্বত্ব'র মূল উৎসও এইখানে। মহর্ষির ভাষার প্রভাব বিদ্যাসাগর এবং কেশবচন্দ্রের মধ্যেও দেখা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুদিন পর্যন্ত মহর্ষিদের তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু লেখাই মহর্ষি সরল ও সুন্দর করিয়া দিতেন। কেশববাবুর উপাসনা ও বক্তৃতায় বাংলা এক অপূর্ব বস্তু ছিল। শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী যদিও হিন্দুধর্মের প্রচারের জন্য ব্রাহ্মদের আক্রমণ করিতেন তবু তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমার বক্তৃতার ভাষা ও রীতির জন্য আমি কেশববাবুর কাছেই ঋণী। ওরূপ ভাষা আমি কোথাও শুনি নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রও কেশবচন্দ্রের ভাষাকে আদর্শস্বরূপ মনে করিতেন।

রাজার প্রবর্তিত ব্রাহ্মসভার যে দলিল পাওয়া যায় তাহা ১৮২৯ সালে সম্পাদিত। সেই বৎসরই ব্রাহ্মসভার গৃহ নির্মিত হয়। ইহার পূর্বে ভগবদনুরাগীদের গৃহে-গৃহেই উপাসনার্থ সকলে সমবেত হইতেন।

অথর্ব বেদে আছে (১০. ৮. ৩২)— "যাহাকে হারাই নাই তাহাকে কখনো দেখি নাই।" কিন্তু

হারাইবার এত কাল পরেও আমরা রাজাকে কি দেখিয়াছি? য়ুরোপের মনীষীদের কথা আমরা না-ই মানিলাম, মৃত্যুর পরে সেই দেশীয় মস্তকতত্ত্বজ্ঞানের (phrenologist) কথা না-ই গ্রাহ্য করিলাম কিন্তু আমাদের দেশের পণ্ডিতদেরও অনেকে তাঁহার মহত্ত্বের কথা বার বার জানাইয়া গিয়াছেন। আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি রাজার মহত্ত্বের বিষয়ে বার বার বলিয়াছেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত তো ভারতীয় হইলেও ছিলেন বৈজ্ঞানিক মানুষ। রাজার মৃত্যুর পরে মুদ্রিত ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী যে একটি স্মরণলিপি তিনি লেখেন তাহার তুলনা হয় না। তাহার সার হইল, "জ্ঞানে ও ধর্মে, হে মহাপুরুষ, তুমি তোমার জন্মভূমিকে গেলে ধন্য করিয়া, আর মানবকল্যাণের জন্য বিদেশে দিলে প্রাণ। তুমি আপন দেশের ও আপন কালের অতীত মানবগুরু। স্বদেশের ও বিদেশের সকল মহাপুরুষকেই যেন তোমার মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু কেহ কি আজও তোমাকে চিনিল? জীবদ্দশায় তোমাকে আমরা স্বীকার করি নাই, মৃত্যুর পরেও আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব না। এমনই কি অপদার্থ আমরা!"

রাজার জীবনী লইয়া স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে কাজ করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহারা আমাদের নমস্য। তবু রাজার জীবনের বহু উপকরণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এমন কিছু কিছু খবর আমাদেরও জানা আছে।

১৯০০ সাল, আগস্ট মাস। ঢাকা হইতে নব বিধানসমাজের প্রচারক স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র সেন কুকুরের কামড়ের চিকিৎসার জন্য কসৌলী গেলেন। ফিরিবার পথে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কাশীতে নামিলেন এবং আত্মীয় বলিয়া এবং আমার কাকার বন্ধু বলিয়া তিনি আমাদের গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। আমার পিতামাতা তীর্থযাত্রায় তখন দক্ষিণভারতে গিয়াছেন, তাঁহার আতিথ্যের ভার আমাকেই লইতে হইল। ঈশানবাবু ব্রাহ্ম বলিয়া একটু ভয় হইল। কারণ ব্রাহ্মদের রীতিনীতি জানিতাম না। কিন্তু পরে দেখিলাম, ঈশানবাবুর আহারে-বিহারে নিষ্ঠাবান বিধবাদের মতই আচার। তাঁহাকে কাশীর মঠ মন্দির ও সাধু-সন্ন্যাসী দেখাইতে লাগিলাম। শ্রদ্ধার সহিত তিনিও দেখিতে লাগিলেন। জন্মকাল হইতে কাশীতে আছি, কাশীর ছোটবড় সব কিছুই আমার জানা— এই ধারণা আমার মনে ছিল।

একদিন ঈশানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে শ্রী রামচন্দ্র মৌলিক নামে রাজা রামমোহনের সমকালীন একজন শিক্ষাগুরু বাস করেন?" আমি তো এই নাম কখনো শুনি নাই। তাই বলিলাম, "না এই নামে কেহ কাশীতে নাই।" ঈশানবাবু বলিলেন, "আছেন, খুঁজিয়া দেখ।"

মনে মনে একটু ক্ষুন্ন হইলাম। কাশীর খবর আমি জানি না! তবু খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরে দেখি হাতী-ফটকায় শম্ভুমৌলিকের এক জেঠামহাশয় আছেন। ১০৪ বৎসর বয়স, পা ভাঙিয়া কুড়ি-পঁচিশ বছর শয্যাগত। তিনি পণ্ডিত লোক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন। রাজার কুড়ি-বাইশ বৎসর পরে মৌলিক মহাশয়ের জন্ম, দীর্ঘকাল রাজার তিনি সহচর ছিলেন। দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকিয়াও পড়াশুনা করেন, তবে বাহির হইতে পারেন না। তাই তাঁহাকে কখনো দেখি নাই।

ঈশান সেন মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহাকে কয়দিন দেখিতে গিয়া ও তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। রামমোহনরায় বিষয়ক বহু কাগজপত্র তাঁহার কাছে ছিল। রামমোহন রায়ের পত্রাদিও ছিল। তত্ত্ব-বোধিনীর বোধ হয় সমগ্র সংগ্রহই তাঁহার কাছে ছিল। রাজা সম্বন্ধে বহু কথা তিনি জানিতেন ও বলিতেন।

মাঝে মাঝে তত্ত্ববোধিনী বা পুরাতন সব গ্রন্থ নামাইয়া তিনি দেখিতে বলিতেন। কোন্ পুস্তকে কি আছে সব তাঁহার নখদর্পণে ছিল। অনেক কথা শুনিয়া শুনিয়া ঈশানবাবু টুকিয়া লইলেন। তিনি ঢাকাতে গিয়া তাহার কিছু কিছু তাঁহাদের নববিধান সমাজের 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকায় বাহিরও করিয়াছিলেন। গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার (১৯৪৬) পরে সেগুলি কোথাও আছে কি না জানি না। মৌলিক মহাশয়ের কাছে অনেক কথা শুনিলাম। তাহার সব কথা আজ বলিবার অবসর নাই। কিছু কিছু বলিতেছি। সব কথা মনেও নাই। তখন বয়স অল্প ছিল, সব কথার মর্মও তখন বুঝিতাম না, আর বহুদিন ইতিমধ্যে বিগত হইয়াছে। যাহা শুনিয়াছি তাহার কিছু নিষ্কর্ষ এখানে দিতেছি।

মৌলিক মহাশয়েরা জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও বিশেষ কিছু শিক্ষা পান নাই। বলিষ্ঠ দেহ লইয়া তিনি গ্রামেই বাস করিতেছিলেন। যখন বয়স কুড়ি-পঁচিশ বৎসর তখন শুনিলেন রাজা হিন্দুধর্ম ধ্বংস করিতেছেন। রাজাকে কিছু শিক্ষা দিবার জন্য দীর্ঘ বাঁশের সুদৃঢ় লাঠি লইয়া মৌলিক মহাশয় কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় রাজা কোথায় থাকেন জানা নাই। শুনিলেন, মানিকতলায় আত্মীয় সভা না কোন্ এক সভায় রাজা ও অনেকে মাঝে মাঝে সমবেত হন ; সেখানে সন্ধ্যাকালে গোহত্যা করা হয়।

খোঁজ করিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে সেখানে গেলেন। গিয়া শোনেন এক হিন্দুস্থানী পণ্ডিত কি যেন সুর করিয়া পড়িতেছেন। পরে শুনিলেন তাহাই নাকি বেদপাঠ। এই কি বেদ নাকি !

রাজা আছেন, তাঁহার শরীর দেখিয়াই মৌলিক মহাশয় মুগ্ধ হইলেন। দূর হইতে তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া তাঁহার মন আরও বিস্ময়াপন্ন হইল। রাজাকে মারাটা মুলতুবি রাখিয়া সেদিন তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এইরূপে পর পর কয়েকদিন সভাতে রাজাকে দেখিয়া ও তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া মৌলিক মহাশয় রাজার কাছে আপন লাঠিসহ ধরা দিয়া সব অপরাধ স্বীকার করিয়া একেবারে আত্মনিবেদন করিলেন।

রাজা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ তো বেরাদর, সে তো বীরের মত কথা। কাপুরুষের মত তুমি যে পরোক্ষে নিন্দা করিয়াই বেড়াও নাই, ইহাতেই আমি তৃপ্ত। পারো তো, বেরাদর, আমাকে লাঠি দিয়াই শিক্ষা দাও।" রাজার শরীরের শক্তি ও বীর্য দেখিয়া মৌলিক অভিভূত হইলেন। বুঝিলেন, রামমোহনকে কাবু করা সহজ ব্যাপার নহে। তিনি রাজার চরণে প্রণত হইলেন। রাজা তাঁহাকে আপন করিয়া লইলেন।

মৌলিক মহাশয়ের শিক্ষা কিছুই ছিল না। অনেক ব্যবস্থা করিয়া রাজা তাঁহাকে বাংলা সংস্কৃত ও ইংরেজিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। রাজা বিলাত যাওয়া পর্যন্ত তিনি রাজার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় থাকিতেন। যখন রাজা বিলাত যান তখন মৌলিক মহাশয়ের বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবে।

রাজা বিদেশে গেলে তাহার পরে মৌলিক মহাশয়ের কি করা কর্তব্য এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা বলিলেন, "এখন হইতে সকলের কল্যাণ করাই তোমার কর্তব্য হইবে। দেশের লোকের তো অভাবের অন্ত নাই। সকল অভাবের মূলে হইল শিক্ষার অভাব। আলোক বিনা কোনো কাজই অগ্রসর হয় না। শিক্ষাই হইল সেই আলোক। ইংরেজেরা তো শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই করিবেন না। সব আমাদেরই করিতে হইবে। সেই আমি বিদেশে চলিয়া গেলে ভারতের কোনো অখ্যাত অজ্ঞাত দূর প্রদেশে গিয়া তুমি শিক্ষার বিস্তার করিও। বাংলাদেশের শিক্ষাবিস্তারের জন্য আর ভাবি না। এখানে শিক্ষা এখন দিন-

দিন অগ্রসর হইবে। সেখানে অজ্ঞান ও নিম্নতম শ্রেণী লইয়াই কাজ আরম্ভ করিও। হাঁড়ীর তলায় আঁচ না দিলে তো রান্না হয় না।”

তখন সরকারী কোনো শিক্ষাবিভাগ হয় নাই। রাজাকে বিলাতযাত্রার দিনে বিদায় দিয়া পায়ে হাঁটিয়া মৌলিক মহাশয় মধ্যভারতের না কোথাকার এক অখ্যাত স্থানে গিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। নানা কাজ করিয়া তিনি জীবিকা অর্জন করিতেন ও অজ্ঞান অশিক্ষিতদিগকে শিক্ষা দিতেন। বহুকাল তাঁহার এই ব্রত তিনি নিষ্কামভাবে চালাইয়া যান। পরে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ যখন প্রতিষ্ঠিত হইল তখন তিনি বৃদ্ধ। তাঁহার পুরাতন কাজের জন্যই শিক্ষাবিভাগ তাঁহাকে একটি বিশেষ বৃত্তি দেন। সংসার-বন্ধনহীন মৌলিক মহাশয় ছিলেন নিঃসন্তান। কাশীতে তাঁহার ভাইপোর কাছে আসিয়া পরে তিনি থাকেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত পেন্সন ভোগ করেন।

রাজার ও রাজার সময়কার বহু কথাই তাঁহার জানা ছিল। ঈশানবাবু অনেক প্রশ্ন করিয়া বহু তথ্য তাঁহার কাছে সংগ্রহ করেন। পরে আমিও তাঁহার কাছে যাইয়া পুরাতন যুগের বহু কথা শুনিতাম। তাঁহার সব কথাতেই ফুটিয়া উঠিত রাজার অপূর্ব ব্যক্তিত্ব, রাজার প্রতি তাঁহার অপার শ্রদ্ধা। রাজা মনে করিতেন শিক্ষার সমান আর কিছুই এদেশে আবশ্যক নাই। এখনকার দিনের সুচতুর রাজনীতি-বিদ্‌গণের মত তিনি শিক্ষার প্রসাদেই সব কিছু পাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই—“Education may wait” প্রভৃতি অপূর্ব বুলি আওড়াইতে জানিতেন না।

তখন ১৯০০ সাল, রাজার বিষয়ে প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া যেসব পুঁথিপত্র ও পত্রিকাদি ছাপা হইয়াছিল তাহার একটি অপূর্ব সংগ্রহ মৌলিক মহাশয়ের কাছে ছিল। তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি পত্রিকার সংগ্রহও তাঁহার ছিল। মহর্ষি হইতে মৌলিক মহাশয় প্রায় বিশ বছরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের কিছুকাল পরেই ১০৪ কি ১০৫ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। আমার তখন বয়স অল্প হইলেও মৌলিক মহাশয়ের কাছে শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম রাজা একজন লোকোত্তর মহাপুরুষ ছিলেন।

রাজার বহু পূর্বে দিল্লী প্রদেশে বাউরী সাহেব এক সাধনা-ধারা প্রবর্তিত করেন। বাউরীর উত্তর-সাধকেরা রাজার সময়েও ভারতে সাধনা করিতেছিলেন। সিন্ধুতেও শাহলতীফের উত্তরপুরুষেরা রাজার সময়েও সাধনা করিতেছেন। বাংলাতেও বাউল গঙ্গারাম ও মদন প্রভৃতির অপূর্ব বাণী ও গান রাজার সময়েও উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। কবীর রবিদাস দাদূ নানক প্রভৃতির ধারা তখনও জীবন্ত ছিল। তাঁহাদের চালচিত্র রাজার পিছনে না থাকিলে রাজাকে চিনিব কি করিয়া?

পুরাতন ধারারই এমন-সব সাধক রাজার সময়েও ছিলেন যাঁহারা মূর্তি ও বিগ্রহ মানেন নাই। তীর্থশাস্ত্র মানেন নাই। জাতিভেদ বা সাধনায় স্ত্রীপুরুষের অধিকার-তারতম্য মানেন নাই। আদর্শ ও সাধনাতে যাঁহারা রামমোহন হইতে একেবারে অভিন্ন ছিলেন তাঁহাদেরই আজ কয়েকজনের কথা বলিতে চাই। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজার পরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। রাজা ও তাঁহারা একই সময়ে একই দেশে ছিলেন কিন্তু যোগাযোগের অভাবে তখন পরস্পরকে জানিতে পারেন নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, কেন একই সাধনার জন্য বিধাতা বার বার এত সাধক একই দেশে পাঠাইলেন। ভারতের সাধনার ইতিহাস বিচিত্র। সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বহু জাতি ও বহু সাধনা এদেশে আসিয়াছে। কেহ প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। তাঁহারাই এদেশে মহাপুরুষ যাঁহারা জাতির সঙ্গে জাতিকে

এবং সাধনার সঙ্গে সাধনাকে যুক্ত করিয়াছেন। আর্য-অনার্য মিলনের কাজ করিলেন শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবুদ্ধদেব প্রভৃতি। হিন্দুমুসলমান-মিলনে কবীর প্রভৃতি কাজ করিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা বহুবিচিত্র সাধনা লইয়া যখন আসিল তখন বিধাতা এই দেশে পাঠাইলেন রামমোহনকে। তিনি কাজে প্রবৃত্তও হইলেন, কিন্তু কাজ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই বিদেশে যাইতে বাধ্য হইলেন এবং অকালে দেহত্যাগ করিলেন। ঋগ্বেদের বিরাট পুরুষের মতই তাঁহার অন্তহীন শক্তি ছিল হাজার দিকে—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥

কিন্তু সাধনাও ছিল যে বিশাল। সেই সাধনা এখনও পূর্ণ হয় নাই, তাই পরে পরেও ক্রমাগত ভারতে সাধকের পর সাধক আসিতেছেনই। একই দেশে পর-পর এত সাধক আসা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। রাজার পরে তাঁহার নামে যে সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইল তাহাদের পরিচয় ও ইতিহাস সবাই জানেন। রাজার পরে তাঁহার সম্প্রদায়ের বাহিরেও ভারতের আর-সব মহাপুরুষেরা যে জন্মিয়াছেন তাঁহাদের কথাও সুপরিচিত। রাজার অব্যবহিত পূর্বে এমনকি রাজার সময়ে রাজার অগোচরে তাঁহার যেসব সগোত্র, অর্থাৎ একই ভাব ও আদর্শের ভাবুক সাধক বিরাজ করিতেছিলেন তাঁহাদের কথাই আজ বলিতে চাই। তাহাতেই রাজার প্রতিভার চালচিত্র রচনা হইবে।

রাজার অসমাপ্ত কার্যগুলি তাঁহার পরে কত লোক কত ভাবে লইয়াও যে এখনো পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাহাতেই তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব বুঝা যাইবে। আর তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী সমসাধকদের সাধনার পরিচয়ও জানা দরকার। তাঁহাদের সাধনা সত্ত্বেও কেন রাজার আসিবার প্রয়োজন ঘটিল ইহা বুঝিলেও তাঁহার বিরাটত্বের ধারণা কতক পরিমাণে করা যাইবে। তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্রহ্মবাদী সাধকের সংখ্যা তো অল্প নহে।

এইবার রাজার সাধনা-প্রতিভার চালচিত্র দিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার পূর্বে তাঁহার ভাবে ভাবুক অগণিত সাধক ভারতে হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সমস্যা ও সমাধান ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। আমরা এখন বলিব তাঁহার আপন জীবৎকালে যেসব মহাপুরুষ ও সন্তসাধক ভারতে বিদ্যমান ছিলেন অথচ যাঁহাদের পরিচয় রাজা পাইয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহাদের কথা। রাজার পূর্বেকার সময়ে যাঁহাদের জন্ম হইলেও যাঁহাদের মৃত্যু রাজার জন্মের পরে ঘটিয়াছে তাঁহাদের কথাই এখন বলিব। সেইসব সাধকের মৃত্যুর পরেই তো তাঁহাদের সাধনা ও সাধকমণ্ডলী ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছে। আমি এমন-সব সাধকেরই নাম করিব যাঁহাদের নাম সন্তধারায় প্রখ্যাত, যাঁহাদের অনুবর্তী সাধকমণ্ডলী এখনো লুপ্ত হয় নাই এবং যাঁহাদের ভাব ও সাধনার সঙ্গে রামমোহনের ভাব ও সাধনায় মিল আছে। অর্থাৎ যাঁহারা এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসক। যাঁহারা মূর্তি বা মন্দির তীর্থ জাতি বা অভ্রান্ত শাস্ত্রাচার মানেন না। যাঁহাদের মধ্যে সাধনায় নরনারীর অধিকারের তারতম্য নাই। যাঁহারা সংগীত ও বাখ্যানাদি দ্বারা সমবেত উপাসনা করেন। সকল ধর্মের প্রতিই যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, কোনো মানুষকেই যাঁহার জন্মগত বা সেইরূপ কোনো কারণে ধর্মসাধনায় অযোগ্য মনে করেন না।

এইরূপ সাধকদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে কাঠিয়াওয়াড়ের ভান (Bhan) সাহেবের নাম। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁহার জন্ম। তাঁহার শিষ্য রবিসাহেব তো রাজারই সমকালীন সাধক। ইঁহার রচিত

বাণী অতিশয় গভীর ও শক্তিশালী। জীবনদাস ও ত্রিকমদাস নামে তাঁহার দুইজন অন্ত্যজজাতির শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের রচিত ভজন-সংগীতও খুব উচ্চ দরের। ইঁহারা সবাই ব্রহ্মবাদী।

প্রায় এই রকম সময়েই কাঠিয়াওয়াড়ে সাধক প্রাণনাথের জন্ম। তাঁহার সাধনা ও ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্র হইল বুন্দেলখণ্ড। রাজা ছত্রশাল তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণ করেন (১৭৩২)। ইঁহার সম্প্রদায়কে ধামী বলে। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সব সাধনার সারকেই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ইনিও ব্রহ্মবাদী।

এই সময়ের কাছাকাছিই বিহারে ধারকান্দার ব্রহ্মবাদী দারিয়া সাহেব মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমান বংশীয় হইলেও ইঁহার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বিক্রমাদিত্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। রাজার জীবদ্দশায় ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার ধর্মগত আদর্শ ও সাধনা রাজারই মত।

১৭১০ সালে যুক্তপ্রদেশে বালিয়া জেলায় রাজপুতবংশে নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরপরায়ণ সাধক শিবনারায়ণের জন্ম হয়। দারা শিকোহের প্রচারিত আদর্শই তাঁহার খুব ভালো লাগিত। ইঁহার সম্প্রদায়ে বহু হিন্দু ও খ্রীষ্টানও গৃহীত হইয়াছেন। সাধক বলীউল্লা আবরু নাজি প্রভৃতির ভাবধারার সঙ্গে তাঁহার সম্প্রদায়ের যথেষ্ট যোগ আছে। ইঁহার মতকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ বলা চলে।

১৭২০ সালের কাছাকাছি জয়পুরের কাছে ব্রজভূমির সংলগ্ন শূরসেন প্রদেশে সাধক সন্তরাম বা রামচরণের জন্ম। রাজার জন্মের পরেও ইনি ব্রহ্মসাধনা ও সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছেন। গুজরাট প্রদেশে ইঁহাদের বহু মঠ আছে। ১৯২০ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের নাডিয়াদস্থিত মঠের সাধকের সঙ্গে আলাপ করেন। গীতাঞ্জলির গান শুনিয়া তাঁহারাও মুগ্ধ হন। কবিগুরুও ইঁহাদের ভজন শুনিয়া বলেন— ইঁহারা তো আমাদেরই লোক।

১৭২০ সালের কাছাকাছি আজমগড় জেলায় খানপুর বোহনা গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে সাধক ভীখার জন্ম হয়। ইঁহার গুরু ছিলেন শূদ্র জাতীয় মহাসাধক গুলাল। ইঁহার গুরুধারাতে আদিগুরুদের মধ্যে অনেক মুসলমান বংশীয় সাধকও আছেন। ইঁহারা সাধনায় হিন্দু বা মুসলমান বংশীয় বলিয়া কোনো তারতম্য করেন না। রাজার সময় পর্যন্ত ইনি সাধনা ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশে রায়বেরিলির অন্তর্গত সীতাপুরে স্বর্ণকার বংশে সাধক মুন্নাদাসের জন্ম। ইনি আপন অন্তরে ভগবৎপ্রেরণা পান। ইনি সম্প্রদায়গত বন্ধন স্বীকার করেন না। ইঁহাদের নাম আপাপন্থী। রাজার জীবৎকালেও মুন্নাদাস জীবিত ছিলেন। পরিচয় হইলে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদী বলিয়া রাজা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেন।

১৭৫৭ সালে ফৈজাবাদ জেলায় নাগপুর-জালালপুরে বানিয়া বংশে সাধক পলটুর জন্ম। অনেকে বলেন ইনি কবীরেরই অবতার। ইঁহার বাণী ও কবিত্বশক্তি অতিশয় উচ্চদরের। পলটুর কুণ্ডলিয়া কবিতাগুলি অতি প্রখ্যাত। তাহার বাণীর দুই একটির মর্ম দেওয়া যাইতেছে :

'উচ্চ জাতিরা লোকেরা মারিল নীচ জাতির লোককে এবং সঙ্গেসঙ্গে নিজেদেরও মারিল। ব্রাহ্মণ ঘৃণা করিয়া মারিল শূদ্রকে তার চেয়ে অযোগ্যক্ষেত্রে ভক্তি করিয়া ব্রাহ্মণকে মারিল শূদ্র।'

'চোখে দেখা সত্যের চেয়ে অন্তরে পাওয়া সত্য মহত্তর।' 'সত্যকে যে জন দেখিয়াছে সে সকল দেশকেই স্বদেশ মনে করে সকল লোককেই আপন জন মনে করে।'

'ভগবান কোনো দল-বিশেষের সম্পত্তি নহেন।'

'মৈত্রী আশ্রয় কর, সেবার দ্বারা আপনার যথার্থ পরিচয় দাও এবং আত্মপরিচয় লাভ কর। নিজেকে নিবেদন না করিলে আত্মপরিচয়ও মেলে না।'

'সহজ না হইলে কি করিয়া সত্যের পরিচয় পাইবে?'

'অন্তরে রহিল সার সত্য, বাহিরে তোমরা কোথায় বৃথা মরিতেছ খুঁজিয়া?'

'মানুষের মধ্যে যে ব্রহ্মকে না দেখিল সে মন্দির হইতে দেবতাকেই করিল নির্বাসিত।'

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি অর্থাৎ রাজার জন্মের বার-চৌদ্দ বৎসর পূর্বে মহারাষ্ট্র দেশে অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশে তুলসী সাহেবের জন্ম। অতুল বৈভব ও রাজ্যভোগ ত্যাগ করিয়া তিনি সাধনার জন্য বাহির হন। হাথরসে তিনি সাধনা করেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় হাথরসী। ১৮৪২ সালে, অর্থাৎ রাজার মৃত্যুর নয় বৎসর পরে, তুলসী সাহেব দেহত্যাগ করেন। ইনি যেমন ছিলেন সংস্কৃতে তেমনি ছিলেন আরবি পারসিতে পণ্ডিত।

দেশের জন্য সেই যুগে রাজা যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। তাঁহার সকল সেবার মূলে ছিল তাহার অপূর্ব ও বহুমুখী প্রতিভা। তাঁহার সহায় ছিল এই ভারতেরই জ্ঞান ও সাধনার ভাণ্ডার, ভারতেরই বেদ-উপনিষাদি শাস্ত্র।

কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, তাঁহার আর-একটি মহাসহায়কমণ্ডলীর খবর তিনি পাইয়া যাইতে পারেন নাই। তাহা জানিতে পারিলে তিনি বহুগুণে শক্তিলাভ করিতেন। কাজে নামিয়াই অগণিত বিরুদ্ধতার সঙ্গে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, তাহার পরে ভালো করিয়া কাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই তাঁহাকে দেশ ছাড়িয়া বিলাতে যাত্রা করিতে হইল। না হইলে তিনি এই সহায়ক-ধারার খবর পাইতেন।

আর কিছু দিন দেশে থাকিয়া কাজ করিতে পারিলে তিনি দেখিতেন ভারতের সাধনা শুধু শাস্ত্রে ও শাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে আবদ্ধ নহে। ভারতীয় সাধকদের অনেকেই নিরক্ষর নিম্নজাতির মানুষ। কবীর রবিদাস দাদূ প্রভৃতির সাধনার সঙ্গে তাঁহার ঠিক পরিচয় ঘটে নাই। তাঁহার পূর্বে ভারতের মধ্যযুগে প্রায় চারি পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া যে প্রায় আড়াই শত তিন শত বড় বড় সাধক সাধনা করিয়া নির্ভয়ে সব সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, সেখবর তাঁহার ভালো করিয়া জানা ছিল না।

চালচিত্র ছাড়া যেমন দুর্গাপ্রতিমা অসম্পূর্ণ, তেমনি রাজার পশ্চাতে এইসব সাধকের পরিচয় ছাড়া রাজার স্বরূপও অসম্পূর্ণ। ভারতের সাধনাকালে রাজা আকস্মিক ধূমকেতু নহেন। ভারতীয় সাধনার একটি রীতিমত সৌরমণ্ডলীর মধ্যেকার তিনি একজন দীপ্ত সূর্য।

তুলসী সাহেব ছিলেন বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদী। সর্বত্র সমদৃষ্টি ও সমবুদ্ধিই ইঁহার আদর্শ ও সাধনা ছিল। ব্রাহ্মণ হইলেও জাতি-পংক্তির ভেদ ইনি স্বীকার করিতেন না। একবার গঙ্গাতে স্নান করার সময় এক শূদ্রের জলের ছিটা এক ব্রাহ্মণের গায়ে লাগাতে ব্রাহ্মণ অগ্নিমূর্তি হইয়া শূদ্রকে যারপরনাই নিগ্রহ করিতে থাকেন। তুলসী সাহেব ব্রাহ্মণকে তাঁহার ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "পবিত্র গঙ্গায় আসিলাম স্নান করিতে। আর আমায় অপবিত্র করিল কি না এই শূদ্রটা!" তুলসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "শূদ্র অপবিত্র কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সে যে ভগবানের পায়ে জন্মিয়াছে।" তুলসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "গঙ্গা পবিত্র কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "গঙ্গা যে তাঁর চরণসম্ভবা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা তাই গঙ্গা

সর্বপাবনী।" তুলসী বলিলেন, "হায়, যেই চরণে জন্মিয়া জল হইল সর্বপাতকহর সেই চরণে জন্মিয়াই জন হইল সর্ব অশুচিতার আধার অর্থাৎ শূদ্র, যাহাকে ছুঁইলেও সর্ব সুকৃত নষ্ট হয়।"—

জেহি চরণ সোঁ জনম গহি জল
তারৈ জগত নিস দিন।
সোঈ চরণ সোঁ জনম গহি জন
নীচ শুদ্র তুচ্ছ মলীন।

ব্রাহ্মণ ক্রোধন হইলেও সরল ছিলেন। এখনকার তথাকথিত শিক্ষিত লোক হইলে তিনি যে কত তর্কই করিতেন তাহা বলা কঠিন। কিন্তু ঐ কথাতে ব্রাহ্মণের দৃষ্টি খুলিয়া গেল। তিনি তুলসীর সাধনার আশ্রয় লইলেন। চতুরতার দ্বারা সরল সত্যকে এড়াইবার চেষ্টামাত্রও করিলেন না।

একবার তুলসী হাথরসীর সম্প্রদায়ের এক গুরুকে রামমোহন রচিত একখানা গ্রন্থ দেখাই। তিনি দেখিয়া বলিলেন, "আমার গুরুতে ও ইঁহাতে ভেদ কোথায়? তাঁহাকেও আমি গুরু বলিয়া মান্য করিতে পারি।"

ভক্তসাধক ঢেঢরাজের সঙ্গে রামমোহনের আদর্শ ও সাধনারীতির আশ্চর্য মিল দেখা যায়। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ রামমোহনের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে, পাঞ্জাব-রাজপুতানার মাঝখানটিতে নারনৌল জেলায় ধারসু গ্রামে তাঁহার জন্ম। রাজার মৃত্যুর উনিশ বৎসর পরে ১৮৫২ সালে ঢেঢরাজ দেহত্যাগ করেন। কাজেই রাজার জন্মের পূর্ব হইতে এবং মৃত্যুর পরে উনিশ বৎসর পর্যন্ত ঢেঢরাজ বিরাজ করিয়াছেন।

সন্তদের প্রায়ই নিম্নশ্রেণীতে জন্ম। তুলসী ও ঢেঢরাজ কিন্তু ছিলেন ব্রাহ্মণ। ঢেঢরাজের পিতার নাম পূরণ শর্মা। পণ্ডিত হইলেও পূরণ বড দরিদ্র ছিলেন। পুত্রকে সংস্কৃত ছাড়া অর্থকরী উর্দু পারশি পড়াইতে তিনি পারেন নাই। দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া ঢেঢরাজ চাকুরির জন্য আগরাতে আসেন এবং পারশি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তখন আগরায় মাধবজী সিন্ধিয়ারই আধিপত্য। দেওয়ান ধরমদাসের অধীনে ঢেঢরাজ একটি চাকুরি সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু চাকুরির জন্য তাঁহাকে বিধাতা পাঠান নাই। তিনি হিন্দু ও মুসলমান বংশজাত অসাম্প্রদায়িক ব্রহ্মবাদী সাধকদের সঙ্গে গভীর ভাবে মিলিতে লাগিলেন।

উদার মতামতের জন্য তাঁহাকে আপন চাকুরি ছাড়িতে হইল। ১৮০৪ সালে অর্থাৎ ৩৩ বৎসর বয়সে তিনি খোলাখুলিভাবে আপন উদার স্বাধীন মতামত প্রচার করিতে লাগিলেন।

অনেক বিষয়ে সেই যুগের পক্ষে তিনি যে কিরূপ অগ্রগামী ছিলেন তাহাই দেখান যাউক—

ব্রাহ্মণ হইয়াও ঢেঢরাজ জাতিভেদকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করেন। লোকে বলিল, "এইসব কথা মুখে বলা সহজ, কাজে দেখাও দেখি!" তিনি অবিবাহিত ছিলেন, বিবাহের ইচ্ছাও ছিল না। তখন ঢেঢরাজ এক বাণিয়ার কন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার পত্নীও স্বামীর আদর্শের জন্য অনেক দুঃখ সহিতে রাজি ছিলেন।

লোকে বলিল, "আগরা তো তোমার দেশ নহে। বিদেশে অনেক কিছুই বলা চলে। আপন দেশে গিয়া এইসব মত প্রচার কর দেখি।" ঢেঢরাজ দেশে গেলেন, এবং প্রচণ্ড জোরের সহিত প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন এবং বহু দুঃখ দিলেন। চাকুরিত্যাগী সর্বজন বহিষ্কৃত ঢেঢরাজ কিছুতে দমিলেন না।

নারনৌলের মুসলমান নবাবের কাছে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গেল। আগরা হইতেও অনেক লোক তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। আগরার লোকেরা সেখানেও নালিশ জানাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কূটচক্রী কেহ কেহ বলিলেন, "ঢেঢরাজ তো উপাসনাতে নারীদেরও গ্রহণ করেন। কোনো নারীকে জড়াইয়া ইঁহার নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ কর। উদার ও দয়ালু বলিয়া ইনি তো অনেক হীনবর্ণ ও বিধর্মী শিশুদের পালন করেন। সেইসব শিশুদের কেহ কেহ তাঁহারই জারজ সন্তান বলিয়া অভিযোগ কর। দেখিবে, ইঁহার প্রভাব অমনি শক্তিহীন হইয়া পড়িবে।"[১] এইসব চাতুরির কূটপন্থার বিষয়েও নারনৌলের নবাব নজাবত আলির সঙ্গে তাঁহারা আলাপ করিলেন। নজাবত আলি এতটা নীচতা করিতে রাজি হইলেন না। তবে তিনি অহিন্দু ও সমাজবিরুদ্ধ আচারের জন্য ব্রাহ্মণ ঢেঢরাজকে কারারুদ্ধ করেন। অহিন্দু আচারের জন্য ব্রাহ্মণকে দণ্ড দিলেন মুসলমান, ইহাই এক মজার কথা।

আট বৎসর কারাগারে ঢেঢরাজ অশেষ দুঃখ পাইয়াছেন। তখনকার দিনের কারাগার। তাহাতে 'এ' ক্লাস 'বি' ক্লাস প্রভৃতির আবদার চলিত না। তবু আপন আদর্শ হইতে ঢেঢরাজ বিন্দুমাত্র টলেন নাই। তিনি বলিলেন, "মানুষের উৎপীড়নে সমাজের বিরুদ্ধতায় কি বিধাতার ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইব? মানুষের সঙ্গে পরিচয় আমার কয় দিনের? আমার নিত্যকারের প্রভুর কাছে তবে মুখ দেখাইব কেমন করিয়া?" ইহাতে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতাটি মনে পড়ে—

তুমি সর্বাশ্রয়, একি শুধু শূন্য কথা?
ভয় শুধু তোমা-'পরে বিশ্বাসহীনতা
হে রাজন্। লোকভয়? কেন লোকভয়,
লোকপাল। চিরদিবসের পরিচয়
কোন্ লোক-সাথে?
রাজভয় কার তরে
হে রাজেন্দ্র। তুমি যার বিরাজ অন্তরে
লভে সে কারার মাঝে ত্রিভুবনময়
তব ক্রোড়, স্বাধীন সে বন্দীশালে। মৃত্যুভয়
কী লাগিয়া হে অমৃত? দুদিনের প্রাণ
লুপ্ত হ'লে তখনি কি ফুরাইবে দান—
এত প্রাণদৈন্য প্রভু ভাণ্ডারেতে তব?
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রব?
কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার।
তুমি নিত্য আ[ছ], আমি নিত্য সে তোমার। নৈবেদ্য, ৫৩নং

কারাগারে হয়তো চিরদিনই নিপীড়ন সহিতে হইত। কিন্তু বৎসর আটেক পরে নানা রাজনীতির ঘটনা-বিপ্লবে রাজ্য যখন যায় যায়, নবাবও যখন পালাইতেছেন, তখন একদিন কারারক্ষক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বন্দীদের মুক্তি দিলেন। বিদায়ের কালেও তিনি ঢেঢরাজকে শাসাইয়া দিলেন যেন বাহিরে

---

১ এইখানে রামমোহনের পালিত সন্তান রাজারামের জন্য রামমোহনের নিগ্রহের কথা মনে হয়। ঢেঢরাজের সৌভাগ্যক্রমে সেই যুগের সকলেই এতটা নীচ ছিলেন না।

গিয়া তিনি আর ধর্ম প্রচার না করেন। ঢেঢরাজ তাহাতে রাজি হইলেন না। তবু তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেই হইল। ধরিয়া রাখিবে কে? সবাই তো পালাইতেছে। মুক্তি পাইয়াই ঢেঢরাজ খেতরী জেলায় ছুরিনা গ্রামে বসিযা প্রচার চালাইলেন। দিনে দিনে চারি দিকে তাঁহার প্রভাব ছড়াইতে লাগিল।

যে নূতন ধর্মমণ্ডলীটি তাঁহারা গড়িয়া তুলিলেন তাহার মতবাদ মাত্র বাংলা করিয়া তাঁহাদেরই ভাষায় একে একে দেওয়া যাইতেছে—

১ ঈশ্বর, এক, রূপাতীত, অপ্রতিষ্ঠ, নিত্য, সর্বব্যাপী।

২ মূর্তি প্রতীক লিঙ্গ শিলা প্রভৃতির পূজায় পরমদেবতারই অবমাননা।

৩ শাস্ত্রের ভাল অংশ শ্রদ্ধেয় হইলেও শাস্ত্র অভ্রান্ত নহে।

৪ জাতিভেদ অর্থহীন।

৫ সাধনাতে নরনারীর সমান অধিকার।

৬ নারীদের পরদা বা অবরোধ মানা অনুচিত।

৭ পুরুষ ও নারী সবাই ভাই ভগ্নীর মত।

৮ সকল ধর্মই শ্রদ্ধার যোগ্য। সব সাধনার মধ্যে একটি ভ্রাতৃত্ব আছে।

ইহারা আপন মণ্ডলীতে সকল ধর্মের উপাসককেই গ্রহণ করিতেন—

৯ ধর্ম সাধনাতে চলিত ভাষাই ব্যবহার করা উচিত: সংস্কৃত ও আরবীকে পবিত্র মানাও একরূপ পৌত্তলিকতা।

১০ ধ্যান ধারণা উপদেশাদির মত সংগীতও সাধনার সহায়।

ইঁহাদের ধর্মমন্দিরে নারীরাই প্রায় গান করিতেন। তাঁহারা অনেকেই সুকণ্ঠ। বহু বৎসর পূর্বে J. W. Parry নামে এক সাহেব এক প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে তিনি এই সম্প্রদায়ের নারীদের গানের প্রশংসা করিয়াছেন। নারীরা পরদা মানেন না বলিয়া এই সম্প্রদায়কে "নাংগীপথ" বলে। পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ ইঁহাদের গানের কিছু অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

ঢেঢরাজের সম্প্রদায়ের মতামত ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিলিলেও অনেক বিষয়ে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় হইতে এই মণ্ডলী অগ্রসর ছিল। রামমোহনের সময়েও তাঁহার প্রবর্তিত সমাজে একটা উদারতা চলে নাই। ধর্মমন্দিরে নারীর অধিকার-স্থান প্রবর্তিত করেন কেশবচন্দ্র। তিনিও সেখানে পরদাপ্রথা সম্পূর্ণ দূর করিতে পারেন নাই। মনে রাখিতে হইবে ঢেঢরাজ তাঁহার কত পূর্বের, এবং সেই দেশে পরদা-প্রথা আরও কত কঠিন ছিল।

পরস্পরে পরিচয় না থাকিলেও ঢেঢরাজ ও রামমোহন উভয়েই সমসাময়িক, উভয়েই একই রকম আদর্শে ও সাধনায় অনুপ্রাণিত। তবে কেন ঢেঢরাজকে এই যুগের মহাগুরু না বলিয়া রামমোহনকেই যুগগুরু বলিতেছি?

তাহার কারণ তখনকার সমস্যা-সমাধান ছিল শুধু ধর্ম ও সমাজ লইয়া। রামমোহন হইতে ঢেঢরাজ দুই তিন বৎসরের জ্যেষ্ঠ হইলেও এবং মতামতে রামমোহন হইতে ঢেঢরাজ অগ্রগামী হইলেও এই যুগের আর-সব কঠিন সমস্যার সমাধানে তিনি কোথায়? শিক্ষায় দীক্ষায় সাহিত্যে বিজ্ঞানে অর্থনীতিতে রাজনীতিতে লোকসেবায় এবং আরও অসংখ্য ক্ষেত্রে রামমোহনই এই যুগে আদিগুরু। রামমোহনের পূর্বে বা পরে

এমন কোনো লোক তো নাই যিনি এই যুগে প্রাচ্য-প্রতীচ্য মিলনক্ষেত্রে এতগুলি সমস্তার সার্বভৌম সাধনা করিয়াছেন। সমাজ ও ধর্মের সীমায় আবদ্ধ মধ্যযুগবন্ধনকে (medievalism) রামমোহনই প্রথম অতিক্রম করিলেন। তাঁহার পূর্বে বা পরে কেহই এমন সার্বভৌম হয়েন নাই। তাঁহার পরে ভারতে অনেক আধুনিক নেতা আধুনিকতায় অনেক পরিমাণে অগ্রগামী হইলেও রামমোহনের মত তাঁহাদের ভারতীয় পুরাতনের গভীর জ্ঞান কোথায়? আবার কেহ কেহ পুরাতনের বহু ঢং করিয়াছেন কিন্তু আসলে তাঁহাদের সনাতনতাও প্রচ্ছন্ন আধুনিকতারই নামান্তর। ভারতীয় সনাতনের সঙ্গে তাঁহাদের সেই গভীর যোগ কোথাও নাই। তাই আজ প্রাচ্য-প্রতীচ্য ধারাসঙ্গমের বিপদসংকুল মোহানায় যোগ্যতম পাইলট বা লোকনেতা বা যুগগুরুরূপে রামমোহনের কথাই মনে পড়ে।

দেখা যাইতেছে রামমোহন ভারতের সাধনাকালে এক আকস্মিক উপদ্রব নহেন। ভারতীয় সনাতন ধারারই তিনি যুগগত পরিপূর্ণতা। রামমোহনকে দিয়াই বিধাতা ভারতীয় সেই শাশ্বত ধারাকেই সার্থক ও পরিপূর্ণ করিয়াছেন।

রামমোহনের সমকালীন তুলসী সাহেবের কিছু বাণীও সেই যুগের সাহিত্য হিসাবে আলোচনার যোগ্য। তাহাতে বুঝা যায় রামমোহনের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ কতখানি। তুলসী বলেন, সত্যের তিনি সাধক, তিনি বেদ ও ভেদের মর্যাদা উঠাইয়া দিতে চাহেন, স্মৃতি ও শাস্ত্রকে অপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে চাহেন, পূজা পাতি নিয়ম ও ধারা সবই তিনি বলেন ঝুঠা—

বেদ ভেদ মরজাদ উঠাঁরৈ।
সিম্রিতি শাস্তর না ঠহরাবৈ॥
পূজা পাতী নেম সব ধারা।

তাঁহার এইরূপ বহু বাণী আরও আছে—

কাঠ পখান জান জেত পূজা।
অংদর মেঁ আতম নহিঁ সুঝা॥

জানিয়া শুনিয়াও যাঁহারা কাঠ পাষাণের পূজা করিলেন তাঁহারা অন্তরস্থিত আত্মাকে দেখিতেই পাইলেন না।—

উঁচ নীচ সব প্রভুময়
সব কে মাহিঁ সমান।

উচ্চ নীচ সবই প্রভুময়। সকলের মধ্যে সমভাবে তিনি বিরাজমান। ক্ষুদ্রও ক্ষুদ্র নহে। জীবনের মহত্ত্ব বাহিরের ক্ষুদ্রতা দিয়া ধারণা করা যায় না।

খসখসকে দানে কে অংদর
অনংত লোক বসতা হৈ॥

পোস্তর অতি সূক্ষ্ম একটি দানার মধ্যে আছে জীবনের অনন্তলোক। ইহারা বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে দেখিতে জানেন।

সব মেঁ পরমাতম এক হৈ
কহো কহাঁ ছুত রহী॥

সবার মধ্যেই তো এক পরমাত্মা। তবে বল কেমন করিয়া অস্পৃশ্যতা থাকে?

পৈঠ মন পৈঠ রে জরু অপূর্ব মেঁ তিমির টারি পৈঠ কাবে মাহি ॥

প্রবেশ কর প্রবেশ কর অপূর্ব অন্তরজগতের মধ্যে। সকল অন্ধকার দূর করিয়া আপন ঘরের মধ্যে কর প্রবেশ।

ক্ষণ ঔর নিমেষকা পরদা হঠ গয়া হমেশকী নজর খোল জাহি ॥

ক্ষণ ও নিমেষের পরদা গেল সরিয়া। শাশ্বতের দৃষ্টি গেল খুলিয়া।

তুলসীর লেখা দেখিয়া এক এক সময় মনে হয় যেন তিনি মুসলমান, মুসলমান সুফীদের সংস্কৃতির সঙ্গে এই ব্রাহ্মণ সন্তানের এমনি গভীর যোগ ঘটিয়াছিল।—

দিলকা হুজরা সাফ কর জানঁকে আনে কে লিয়ে।
ধ্যান গৈরোঁ কা উঠা উসকে বিঠানে কে লিয়ে॥··
নকলী মন্দির মস্‌জিদোঁ মেঁ জায় সদ অফসোস হৈ।
কুদরতী মসজিদ কা সাকিন দুখ উঠানে কে লিয়ে॥··
কুদরতী কাবে কী তু মিহরাব সে সুন গৌর সে।
আ রহী ধ্বসে সদা তেরে বুলানে কে লিয়ে॥··
গোশী বাতিন হো কুশাদা জো কুছ দিন করে অমল।
লা ইলাহ ইল্লাহ হো অকবর পৈ জানে কে লিয়ে॥··

প্রেমময় প্রিয়তম আসিবেন। হৃদয়মন্দির পবিত্র কর। অন্তরে তাঁহাকে বসাইতে হইবে আর সকলকে এখন আর অন্তরে ভিড় করিতে দিলে চলিবে না।

কৃত্রিম মসজিদ-মন্দিরে দুঃখের আর অবধি নাই। অন্তরের এই অকৃত্রিম মন্দির হইল সেইসব দুঃখকে শান্ত করিতে।

জীবনমন্দিরের দিব্যপীঠে ধ্যান ধরিয়া শোনো কান পাতিয়া। প্রতি ধূলিকণার মধ্য দিয়া আসিতেছে তোমার জন্য তাঁর ব্যাকুল আহ্বান।

কিছুদিন সাধনা কর। ক্রমে যাহা গুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন তাহাও হইয়া উঠিবে প্রত্যক্ষ। সকল দেবতার অতীত যিনি দেবতা তাঁহার কাছে হইবে পৌছিতে।

তুলসী সাহেবের কবিতার (lyrial) গীত ভাব রসও অদ্ভুত। এক এক সময়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কোনো লিরিক্যাল কবিতা।

উংঘ নাসৈ চেও উদাসৈ সুনি গৈলমেঁ
কোই চুড়িয়া লোরী বহুরিয়া।
চুড়িয়া মেরা মণিহার পুকারৈ।
চৌঁকে চিত্ত বিসারিয়াঁ।

ফুল মালা যহী দিয়ো মলিয়াঁ।
পহিনুঁ প্রেম পিয়রিয়াঁ॥
জনম জনম কী ধূণী সুনারৈ
গৈল গৈল চংটি ফিরিয়াঁ॥

ধূপ থাকা দুখা মোপৈ ধুনি সুন
কোই চুড়িয়া লোরী বহুরিয়াঁ॥

তন্দ্রা বাহিয়া চিত্ত উদাসিয়া আসে তার কণ্ঠস্বর। শুনিলাম গলির পথে সেই ডাক—"ওগো তরুণী বধূ, কেউ কি লইবে আমার চুড়ি? 'লও চুড়ি' পুকারে আমার মনোহারী (মণিহারী)। চমকিয়া উঠে আমার উদাসী বিস্মৃতি চিত্ত।"

একদিন এই মালীই না দিয়াছিল প্রেমের পুষ্পমালা? প্রিয়তমের সেই প্রেমহার শুকাইয়া গেলেও আজও দেখি রহিয়াছে আমার গলায়।
জনম জনমের সুর যেন আজ সে যায় শুনাইয়া। শুনাইয়া যেন যায় আমার জনম জনমের বিস্মৃত ধ্বনি। শুনিলাম তার ক্লান্ত ব্যথিত রৌদ্রতপ্ত সুর। কত কাল যেন সে বেড়াইতেছে খুঁজিয়া আমাকে। ঐ শুনা যায় তার ডাক— কেউ কি লইবে আমার চুড়ি, ওগো তরুণী বধূ!

তুলসীর গানে একেবারে ব্রহ্মরস যেন হয় ধ্বনিত। যেমন এই গানটিতে—

খোজত খোজত খলক সব খপ গয়া।
অন্তরা বাহরা গয়া বিলাঈ॥
তুলসী কহে সব খোদা ভরপুর হৈ।
রূহ মেঁ নিরখ সব দেখ আঈ॥

খুঁজিতে খুঁজিতে চরাচর যেন সব গেল লুপ্ত হইয়া, অন্তর বাহির সব যেন গেল বিলীন হইয়া। তুলসী বলেন, চাহিয়া দেখ অন্তরের মাঝে। নিরখিয়া দেখ আত্মার মধ্যে সব আছে ভরপুর হইয়া, সকল আত্মা আজ আমার ভগবানে ভরপুর।

রাজার সময়কার শুধু হিন্দুস্থানী সন্তদের কথা বলিব কেন। বাংলাদেশেও তখন কৈবর্ত বলা, ভূইমালী বিশা প্রভৃতির গান শুনিলে চমকিয়া উঠিতেছে। নমশূদ্র গঙ্গারামের সিদ্ধি বহু ব্রাহ্মণেরও ভাগ্যের অতীত। তাঁহার বন্ধু মুসলমানবংশীয় মদনের একটিমাত্র গান বাউলতত্ত্বের নমুনারূপে এখানে দেওয়া গেল:

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে।
তোমার ডাক শুনি সাঈঁ চলতে না পাই
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মরসদে।
ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায়, তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়
বল তো গুরু কোথায় দাঁড়ায়,
তোমার অভেদ সাধন মরলো ভেদে।
তোর দুয়ারেই নানান তালা, পুরাণ কোরাণ তসবী মালা
ভেখ পথই তো প্রধান জ্বালা কাঁইদে মদন মরে খেদে॥

পণ্ডিত ও শাস্ত্রওয়ালার দল না হইলেও তাঁহার এত বড় সহায় নিরক্ষর অপণ্ডিত সহজ নিম্নজাতির মানুষদের মধ্যে ছিল তাহার খবর রামমোহন পাইলে তিনি কত বড় শক্তিলাভ করিতেন। ইঁহাদের সমর্থনের কথা জানিতে পারিলে সকলকে বুঝাইতে পারিতেন তিনি যাহা করিতেছেন তাহা ভারতেরই চিরন্তন বস্তু। বাহির হইতে আমদানী করা তাহা কোনো নূতন আজগুবি বস্তু নয়। বরং যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তাঁহারাই ভারতের প্রদেশে-প্রদেশে সাধকদের নানামণ্ডলীতে সাধিত শত শত বৎসরের সাধনার কোনো খবরই রাখেন না।

তবু তিনি ১৮৩৩ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর বিদেশে এই ভাবিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন যে ভারতের চিরন্তন যে সমস্যা অর্থাৎ সর্ব সাধনাকে ও সর্ব সংস্কৃতিকে স্বাগত করিয়া যে সমন্বয়-সাধনা তাহার তিনি গোড়াপত্তন করিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি কি তখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন তাহার শতাধিক বৎসর পরেই নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য বিদেশী সব রাজনীতিওয়ালারা ভারতকে ধর্মের নামে দ্বিখণ্ডিত করিয়া প্রচণ্ড ধর্মবিরোধের আমদানী করিবেন, ভারতের চিরন্তন মৈত্রী ও ধর্ম সমন্বয়ের সাধনা রক্তের বন্যায় অসম্ভব করিয়া তুলিবেন। কিন্তু ভারতে বিধাতার চিরন্তন অভিপ্রায় দেখা যায় মৈত্রী ও সমন্বয়। ভারতের তাহাই বিশেষত্ব। বিধাতার সেই অভিপ্রায় কি নিত্যকালের জন্য ক্ষুদ্রাত্মাদের দল নিষ্ফল করিয়া রাখিতে পারিবে? হয়তো সেই বিশ্বাস রামমোহনের অন্তরেও ছিল। এই মহাদিনে নবযুগের মহাপিতাকে ভক্তিভরে স্মরণ করি।

।শচন্দ্র মজুমদার

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

১৮৬০-১৯০৮

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : বিদ্যাশিক্ষা

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে[১] বর্ধমানের নপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-পরিবারে শ্রীশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম প্রসন্নকুমার মজুমদার। প্রসন্নকুমার ছিলেন পুঠিয়া স্টেটের দেওয়ান।

শ্রীশচন্দ্র সাত-আট বৎসর বয়স পর্যন্ত দেশেই ছিলেন। তাঁহার বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবন প্রধানতঃ পুঠিয়ায় মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর অপত্যনির্বিশেষ স্নেহে ও তাঁহার অলৌকিক পবিত্র জীবনের ছায়ায় অতিবাহিত হইয়াছিল ; তাঁহার নিজের ভাষায়: "পুঠিয়া রাজধানীর সঙ্গে আমার প্রাথমিক জীবন অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট।"

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বোয়ালিয়া (রাজশাহী) স্কুল হইতে শ্রীশচন্দ্র তৃতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাস করেন।

সাহিত্যানুরাগ

কৈশোর হইতেই মাতৃভাষার প্রতি শ্রীশচন্দ্রের অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন :

"প্রথম-প্রথম পুঠিয়ায় গিয়া দেখিতাম, জ্যোৎস্নারাত্রে ছাদে বসিয়া তিনি [মহারাণী] বাঙ্‌লা সাপ্তাহিক কি মাসিক পত্র অথবা কোন পুস্তক চন্দ্রালোকে পাঠ করিতেছেন,·· এইরূপ পড়ার অভ্যাস ৪।৫ বৎসর আমি নিজে দেখিয়াছি।·· সংস্কৃত এবং বাঙলা গ্রন্থের তাঁহার যে সংগ্রহ ছিল তাহা রাজধানীর কোন বৃহৎ পুস্তকালয়ের পক্ষেও গৌরবজনক। সংস্কৃত তিনি সামান্য বুঝিতেন, কিন্তু বাঙ্‌লায় উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ তাঁহার অপঠিত ছিল না। কোন নূতন গ্রন্থ প্রকাশ হইলে সংগ্রহ করিয়া উত্তমরূপে বাঁধাইয়া লওয়া ও গ্লাসকেসে সাজাইয়া রাখা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান আনন্দ ছিল। কলিকাতায় যখন কলেজে পড়ি, তখন একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে পুঠিয়ায় আসিয়া বইগুলি আমি শৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া দিয়াছিলাম এবং একটি তালিকাও প্রস্তুত করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, কৈশোরে মাতৃভাষার পুস্তকরাশির সংস্পর্শে এইরূপে আসিয়া আমি বাঙ্‌লা সাহিত্যের স্বাদ পাইয়াছিলাম। ভাল বই হাতে আসিলেই মাতা [মহারাণী] আমায় পড়িতে দিতেন এবং পাঠ সাঙ্গ হইলে মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন। আমিও কবিতা লিখিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে পড়িতে দিতাম। তাঁহার অনুমোদন ও উৎসাহ চিরদিন আমায় সাহিত্যালোচনায় অগ্রসর করিয়াছে।

"মহারাণীমাতার সহিত আমার বাঙ্‌লা সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইত।··"—'রাজ-তপস্বিনী', পৃ ১২-১৪

---

১ Hist. of Services of Gazetted and other Officers under Government of Bengal— Corrected up to July 1908.

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণের পর শ্রীশচন্দ্র পাকাপাকিভাবে পুঠিয়াতেই অবস্থান করিতেন। তিনি "জীবনের সেই পূর্ব্বাহ্নে সচরাচর সাহিত্যালোচনা এবং স্বদেশের এক আধটু কাজ লইয়া" থাকিতেন।

শ্রীশচন্দ্রের প্রাথমিক রচনাগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটির সন্ধান আমরা পাইয়াছি; উহা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মাসিক সমালোচকে'র ৭ম-৮ম যুগ্ম-সংখ্যায় (কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮৬) প্রকাশিত "বর্তমান বঙ্গসমাজ ও চারি জন সংস্কারক"। ইহাতে বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। আলোচনায় চিন্তাশীলতা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র আপনা হইতে লেখককে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্রাটের আহ্বানে শ্রীশচন্দ্র সোৎসাহে ১৮৮০ সনের রথযাত্রার দিন চুঁচুড়ায় উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রীত হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্র নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন:

"১৮৭৯।৮০ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকালে চুঁচুড়ায় প্রথম বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মনে পড়িতেছে, সে দিন রথযাত্রা। ··আমার জীবনে সে একটা নবযুগ। সাহিত্যচর্চ্চার সেই নবীন উৎসাহের সময় আপনা হইতে বঙ্কিমবাবু আমায় দেখিতে চাহিয়াছিলেন।··কথায় কথায় বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'এখন আর ইংরেজীতে চিঠিপত্র আদৌ লিখি না— ইংরেজী ভাষাটা ভারি insincere বলিয়া আমার মনে হয়।' আমায় বিশেষ করিয়া বলিলেন, 'মাসিক সমালোচকে' আপনার একটি প্রবন্ধ পড়িয়া এর আগে আপনাকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তাতে আমার কথা বেশী করিয়া বলায়, লিখিতে পারি নাই।' প্রবন্ধটিতে আমি বলিয়াছিলাম, 'ইদানীন্তন কালে বঙ্কিমবাবু দেশের সর্ব্বপ্রধান সংস্কারক, তাঁহার সৃষ্ট সৌন্দর্য্যে এবং তৎকৃত সমালোচনায় বঙ্গসমাজের যে মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, আর কিছুতে ততটা নহে।'··

"ইহার পর মনে হইতেছে, কলিকাতায় প্রায় দুই বৎসর পরে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাঁর বাসা বহুবাজারে। আমি প্রিয় সুহৃৎ বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যাইতাম। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' প্রণেতা বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন গিয়াছিলাম।·· কিছু দিন আমি রীতিমত ডায়েরী রাখিতাম। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে প্রায় দুই বৎসর সে ব্রত পালন করিয়াছিলাম। এই কালের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে অনেক বার আমার দেখাশুনা হইয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ যোগ সঞ্চার হয়। বন্ধুত্ব বলিতে পারি না। গুরু-শিষ্যের যে সম্বন্ধ, এক দিকে গাঢ় স্নেহ এবং প্রীতি, অন্যত্র গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা— প্রেমের সেই সম্বন্ধকেই আমি যোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।"— 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ', ১ম প্রস্তাব

এই সময়ে শ্রীশচন্দ্র "সাহিত্যকে জীবিকাস্বরূপ করিয়া" কলিকাতায় স্থায়ী হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন; তিনি লিখিয়াছেন:

"১২৯০ সালের বৈশাখ মাসে রাজকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ায় মহারাণী বিষয়ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে হইতেই আমি পারিবারিক পীড়াদির জন্য কলিকাতায় ছিলাম এবং পরে বঙ্কিমবাবু প্রমুখ হিতৈষী বন্ধুবান্ধবগণের পরামর্শে সাহিত্যকে জীবিকাস্বরূপ করিয়া তথায় স্থায়ী হইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম।"— 'রাজ-তপস্বিনী', পৃ. ২২৯

তখন ৯ম বর্ষের (১২৮৯) 'বঙ্গদর্শন' কোনোরূপে প্রকাশিত হইয়া উহার প্রচার বন্ধ হইয়াছে। এই

সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মতিলাভ করিয়া, চন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহেও বটে, শ্রীশচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের হস্ত হইতে 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন :

"আমার 'বঙ্গদর্শন'-গ্রহণ স্থির হইয়া গেলে বঙ্কিমবাবু একদিন বলিলেন, 'শ্রীশবাবু, তোমার সঙ্গে আমার একটি কথা আছে। তুমি যে আমায় লেখার জন্ম ঘন ঘন পীড়াপীড়ি করিবে, তা হবে না।' আমি বলিলাম, 'বঙ্গদর্শন আপনার নামের সঙ্গে অভিন্ন, আপনি না লিখিলে কি বঙ্গদর্শন চলে? নবেল বরাবর ত চলিবেই, প্রবন্ধও মাঝে মাঝে দিতে হবে।' উত্তর— 'নবেল লেখা থাকে, চলিবে। কিন্তু প্রবন্ধ দিব ন-মাসে ছ-মাসে। ইদানীং প্রবন্ধ বড় একটা লিখি নাই, কেবল মাঝে মাঝে ভাঁড়ামি করেছি। তোমরা যুবাপুরুষ, অনেক লিখিতে পারিবে, আর আমার কাছে বঙ্গদর্শনের জন্য মাঝে মাঝে গালি খাবে। মেজ্‌দাদাও খান।·· সে-বারে দুই মাস বঙ্গদর্শনের টৌন্‌ বড় নীচু করা হয়েছিল। বিরক্ত হয়ে ৬।৭ মাস লিখি নাই।' আমি বলিলাম, 'আপনি কেন সম্পাদক হোন না?' উত্তর— 'আর আমার সে উৎসাহ নাই।'·· আর একদিন চন্দ্রনাথবাবু বঙ্গদর্শনের কথা তুলিলেন। বঙ্কিমবাবুকে বলিলেন, 'শ্রীশের ইচ্ছা, আমারও ইচ্ছা, তুমি সম্পাদক হও।' বঙ্কিমবাবু অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, 'তা হ'লে বঙ্গদর্শন ছাড়িব কেন? তা হ'লে আর কাহারও সহায়তা লইতাম না।'

শ্রীশচন্দ্রের পরিচালনায় বঙ্গদর্শনের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইল— ১২৯০ সালের কার্তিক মাসে (অক্টোবর ১৮৮৩)। বউবাজার স্ট্রীটের বরাট প্রেসের অঘোরনাথ বরাট ইহার প্রকাশক হন। বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিল না; পরবর্তী মাঘ মাসে উহা একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও বঙ্গদর্শনের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন; তাঁহার আদেশেই বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখেন :

"শ্রীচরণেষু—অঘোর বরাটকে একটু পত্র লিখিবেন, যে, মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির করার পক্ষে আপত্তি নাই, ভবিষ্যৎ সংখ্যার প্রতি আপত্তি আছে। অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা ভিন্ন আর বাহির করিতে দিবেন না। ইহা লিখিবেন।

"পত্রপাঠ মাত্র ইহা লিখিবেন। চন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতেছে।[২] কিন্তু এটুকু লইলে বিবাদ সম্পূর্ণ মিটিবে না। ইতি তাং ২৩ ফেব্রুয়ারি [১৮৮৪]।"

১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভে শ্রীশচন্দ্র "নিবেদনে" যাহা লিখিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহাও উদ্ধারযোগ্য; তিনি লেখেন :

"১২৯০ সালের কার্ত্তিক মাসে বঙ্কিমবাবুর যত্নে সঞ্জীববাবুর হস্ত হইতে বঙ্গদর্শন যখন আমি গ্রহণ করি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তখন ইহার সম্পাদনকার্য্যে প্রধান সহায় ছিলেন। ইহা সাধারণতঃ সকলের জানা নাই, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিনে সে কথা স্বীকার করিয়া চন্দ্রনাথ-বাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমি আমার প্রধান কর্ত্তব্য মনে করি। বঙ্গদর্শন স্থায়ী হইলে তিনিই তখন প্রকাশ্যে সম্পাদকতা গ্রহণ করিতেন এবং সেজন্য বঙ্কিমবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া

২ অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত চন্দ্রনাথ বসুর "পশুপতি-সম্বাদ" বঙ্কিমচন্দ্রকে ক্ষুণ্ন করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

গবর্ণমেণ্টের অনুমতিও লইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অকালে আমি বঙ্গদর্শন বন্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

"বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িকপত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম। ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এত দিনে আমি সাহিত্যসংসারে একটি ঋণমুক্ত হইলাম। সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি যে উপকার করিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।··

"এক্ষণে রাজকার্য্যোপলক্ষে আমি কলিকাতা হইতে বহু দূরে অবস্থিতি করিতেছি, পূর্ব্ববৎ স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করিতে পারিব না। সেই জন্য অনুজ শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম।

ডালটনগঞ্জ ; পালামৌ
১লা বৈশাখ। সন ১৩০৮

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।"

প্রথম পর্যায় বঙ্গদর্শন লুপ্ত হইবার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। গানে সাহিত্য-সমালোচনা প্রভৃতিতে তাঁহাদের দিনগুলি গভীর আনন্দেই কাটিতেছিল। কিন্তু শীঘ্রই এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-স্রোতে বাধা পড়িল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে সাব্-ডেপুটি কলেক্টরের পদ লাভ করিয়া শ্রীশচন্দ্রকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া নদীয়া যাত্রা করিতে হইল। অতঃপর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাজকার্যে তাঁহাকে গয়া, সীতামাঢ়ী, কাঁথি, বীরভূম, সিংহভূম, লোহারডাগা, পালামৌ ও সাঁওতাল পরগণায় কাটাইতে হইয়াছে।

শ্রীশচন্দ্রের সাহচর্য-বিরহে রবীন্দ্রনাথের মনে কিরূপ রেখাপাত করিয়াছিল, 'ছিন্নপত্রে' মুদ্রিত কয়েকখানি পত্র তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

মৃত্যু

শ্রীশচন্দ্র ১৯০৮ সনের ৮ই নবেম্বর (২৩ কার্তিক ১৩১৫), ৪৮ বৎসর বয়সে, পরলোকগমন করেন। 'বঙ্গদর্শন' (কার্তিক ১৩১৫) লেখেন:

"পুরাতন বঙ্গদর্শনের শেষ পরিচালক এবং নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনের প্রবর্ত্তক ও প্রধান সহায় ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার আর ইহলোকে নাই! গত ২৩ শে কার্ত্তিক রবিবারে রাস পূর্ণিমার রজনীতে দুম্‌কায় তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে।"

রচনাবলী

শ্রীশচন্দ্রের গ্রন্থের তালিকা মোটেই দীর্ঘ নহে ; একখানি সম্পাদিত গ্রন্থের কথা বাদ দিলে তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র ৫ খানি ; এগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে যে ইংরেজি প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে তাহা বঙ্গীয় সরকারের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সংকলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত :

১ **পদরত্নাবলী** (সম্পাদিত)। বৈশাখ ১২৯২ (২৫ জুন ১৮৮৫)। পৃ. ১০৮।

"মহাজন পদাবলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির একত্র সংগ্রহ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত।"

২ **শক্তি-কানন** (উপন্যাস)। বৈশাখ ১৮০৯ শক (৯ মে ১৮৮৭)। পৃ. ১৯৯।

ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'ভারতী ও বালক' (আশ্বিন ১২৯৪) লিখিয়াছিলেন: "দেড় শত বৎসর আগেকার বাঙ্গলা লইয়া শক্তিকানন রচিত। শক্তিকাননের সমস্তই গ্রাম্য দৃশ্য, গ্রাম্য লোকের জীবন-কাহিনী। সহরের সঙ্গে বইখানির বড় সংস্রব নাই। লেখক এই গ্রাম্য দৃশ্যে বাঙ্গলার প্রাকৃতিক দৃশ্য এমন সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন যে বইখানি পড়িতে পড়িতে তরুলতা-হিল্লোলিত বিহগ-বিহগী-কূজিত বাঙ্গলার শ্যামসুন্দর চিত্রখানি আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই, এবং তাহার মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সহরের মধ্যে বসিয়া সহর ভুলিয়া যাই।··বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের ন্যায় বাঙ্গলার মনের দৃশ্যও সাধারণতঃ লেখক বেশ আঁকিয়াছেন,··শক্তিকানন একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস—ইহার ভাষা চমৎকার, বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী, চরিত্রও সাধারণত প্রস্ফুট।"

৩ **ফুলজানি** (উপন্যাস)। ১৩০০ সাল (১৩ মার্চ ১৮৯৪)। পৃ. ১৬৭।

১২৯৫-৯৬ সালের 'ভারতী ও বালকে' প্রথম প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় (অগ্রহায়ণ ১৩০১) উপন্যাসখানির যে সমালোচনা করেন তাহাই তাঁহার 'আধুনিক সাহিত্যে' স্থান পাইয়াছে।

৪ **কৃতজ্ঞতা** (উপন্যাস)। ১৩০২ সাল (২২ মার্চ ১৮৯৬)। পৃ. ১১৯।

ইহা প্রথমে ৩য় বর্ষের 'সাধনা'য় (১৩০০-১৩০১) মুদ্রিত হইয়াছিল।

৫ **বিশ্বনাথ** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ইং ১৮৯৬ (১২ই অক্টোবর)। পৃ. ১২৭+৪।

"গ্রন্থকারের নিবেদনে" প্রকাশ: "'সাহিত্যে' [১৩০১-১৩০২] এই উপন্যাস 'প্রতিশোধ' নামে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার আগাগোড়া বিশে ডাকাতের কথায় পূর্ণ বলিয়া নামটি পরিবর্ত্তিত হইল। গল্পাংশেও স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছি। খৃঃ ১৮৮৫ অব্দের শরৎকালে প্রথম রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আমি নদীয়া জেলায় প্রেরিত হই। সেই সময়ে বিশ্বনাথের সংবাদ কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলাম। 'বালক' নামক মাসিক পত্রে নদীয়া ভ্রমণ সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহাতে বিশ্বনাথের কথা কিছু ছিল। কিন্তু সে সামান্য মাত্র। অধিকাংশ কাহিনী গত দুই বৎসরে·· সংগৃহীত।··রাঁচি; ভাদ্র ১৩০৩।"

[মৃত্যুর পরে]

৬ **রাজ-তপস্বিনী।** ১৩১৯ সাল (ইং ১৯১২)। পৃ. ২৬০।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার গ্রন্থের "নিবেদনে" লিখিয়াছেন: "স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার অগ্রজ মহাশয়, গ্রন্থকার, বঙ্গদর্শনে [১৩১৩-১৫] ৺মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর জীবনী-প্রসঙ্গ যে পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন, পুস্তকাকারে তাহাই প্রকাশিত হইল।"

শ্রীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। ? (২০ অক্টোবর ১৯১৯)। পৃ. ২০০ (বসুমতী)

সূচী: ১। শক্তিকানন; ২। ফুলজানি; ৩। স্বয়ংবর, সদানন্দ, রাজয়-বিজয়, জামাই-ষষ্ঠী, রায়-গৃহিণী, ভীমচুলহা, ভট্টাচার্য্য-মহাশয়।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা: শ্রীশচন্দ্রের লিখিত কবিতা, গল্প-উপন্যাস, চিত্র, প্রবন্ধাদি মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এগুলি সংখ্যায় বেশি নহে; আমরা এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনার নির্দেশ দিতেছি:

১২৮৬,	কার্তিক-অগ্রহায়ণ	'মাসিক সমালোচক'	বর্তমান বঙ্গসমাজ ও চারি জন সংস্কারক
১২৯২,	আশ্বিন	'বালক'	পাঠশালা (গল্প)
	মাঘ, ফাল্গুন	„	নদীয়া-ভ্রমণ
	চৈত্র	„	বাঙ্গালার বসন্তোৎসব
১২৯৯,	আষাঢ়	'সাধনা'	পুরুৎ ঠাকুরুণ (চিত্র)
১৩০০,	বৈশাখ	„	মেলা-দর্শন
	শ্রাবণ	„	রোপণীর গান
	মাঘ	„	পৌষ-পার্ব্বণ (চিত্র)
১৩০১,	শ্রাবণ	„	* বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ, ১ম প্রস্তাব
১৩০২,	বৈশাখ	„	লোরিকের গান, ১ম প্রস্তাব
	পৌষ	'ভারতী'	„ ২য় „
১২৯৯,	ভাদ্র	'সাহিত্য'	চৌকিদার (গল্প)
১৩০৬,	বৈশাখ	'প্রদীপ'	* বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ, ২য় প্রস্তাব (লেখকের চিত্র সহ)
১৩০৮,	আষাঢ়	'বঙ্গদর্শন'	সদানন্দ (গল্প)
	মাঘ	„	কালিকানন্দ (গল্প)
১৩০৯,	জ্যৈষ্ঠ	„	জামাই-ষষ্ঠী (গল্প)
	ভাদ্র	„	স্বয়ম্বর (গল্প)
১৩১০,	শ্রাবণ	„	শ্মশানতলা (চিত্র)
১৩১২,	বৈশাখ	„	ভট্টাচার্য্য-মহাশয় (গল্প)
	শ্রাবণ	„	গহেলী ও মতিরাম (চিত্র)
	ভাদ্র	„	রায়গৃহিণী (গল্প)
	অগ্রহায়ণ	„	কারুদাস (চিত্র)
	মাঘ	„	ভীমচুল্হা (গল্প)
১৩১৩,	বৈশাখ—১৩১৪	„	রায়বনী-দুর্গ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)
১৩১৫,	জ্যৈষ্ঠ	„	রাজয় বিজয় (গল্প)
১৩১৫,	মাঘ-ফাল্গুন	'সমালোচনী'	* বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ, ৩য় প্রস্তাব

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে তারকা-চিহ্নিত প্রবন্ধ তিনটি অচিরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

শ্রীশচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনকে তাঁহার সমসাময়িক যে-কয়জন বন্ধু পুষ্ট করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একমাত্র শ্রীশচন্দ্রেরই কথাসাহিত্যিক হিসাবে কিছু খ্যাতি আছে; এই খ্যাতিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'আধুনিক

সাহিত্যে' 'ফুলজানি' প্রবন্ধে স্থায়িত্ব দান করিয়াছেন। শ্রীশচন্দ্রের বাংলা-সাহিত্যে স্থান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আমরা এই প্রবন্ধে কিছু পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :

"উপন্যাসের মধ্যেও সেইরূপ শহর পল্লীগ্রামের প্রভেদ আছে। কোনো উপন্যাসে অসাধারণ মানবপ্রকৃতি, জটিল ঘটনাবলী, এবং প্রচণ্ড হৃদয়বৃত্তির সংঘর্ষ বর্ণিত হইয়া থাকে— সেখানে সাধারণ মনুষ্যের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ অণু-আকারে দৃষ্টির অতীত হইয়া যায়; আবার কোনো উপন্যাস উন্মত্ত ঘটনাবর্তের কোলাহল হইতে, উত্তুঙ্গ কীর্তিস্তম্ভমালার দিগন্তপ্রসারিত ছায়া হইতে, ঘনজনতাবন্যার সর্বগ্রাসী প্রলয়বেগ হইতে বহু দূরে ধূলিশূন্য নির্মল নীলাকাশতলে শস্যপূর্ণ শ্যামল প্রান্তরপ্রান্তে ছায়াময় বিহঙ্গকূজিত নিভৃত গ্রামের মধ্যে আপন রঙ্গভূমি স্থাপন করে, যেখানে মানবসাধারণের সকল কথাই কানে আসিয়া প্রবেশ করে এবং সকল সুখদুঃখই মমতা আকর্ষণ করিয়া আনে।

"শ্রীশবাবুর ফুলজানি এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্যাস। ইহার স্বচ্ছতা, সরলতা, ইহার ঘটনার বিরলতাই ইহার প্রধান সৌন্দর্য। এবং পল্লীর বাগানের উপর প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্যকিরণ যেমন করিয়া পড়ে— কোথাও বা চিকণ পাতার উপরে ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া উঠে, কোথাও বা পাতার ছিদ্র বাহিয়া অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে চুম্‌কি বসাইয়া দেয়, কোথাও বা জীর্ণ গোয়ালঘরের প্রাঙ্গণের মধ্যে পড়িয়া মলিনতাকে ভূষিত করিতে চেষ্টা করে, কোথাও বা ঘনছায়াবেষ্টিত দীর্ঘকাজলের একটিমাত্র প্রান্তে নিকষের উপর সোনার রেখা কষিয়া দেয়— তেমনি এই উপন্যাসের ইতস্তত যেখানে একটু অবকাশ পাইয়াছে সেইখানেই লেখকের একটি নির্মল স্নিগ্ধ হাস্য সকৌতুকে প্রবেশ করিয়া সমস্ত লোকালয়দৃশ্যটিকে উজ্জ্বলতায় অঙ্কিত করিয়াছে।

"শ্রীশবাবু আমাদিগকে বাংলাদেশের যে একটি পল্লীতে লইয়া গিয়াছেন সেখানে আমরা সকলের সকল খবর রাখিতে চাই, সকল লোকের সহিত আলাপ করিতে চাই, বিশ্রব্ধভাবে সকল স্থানে প্রবেশ করিতে চাই— তদপেক্ষা গুরুতর কিছুই প্রত্যাশা করি না। আমরা অভ্রভেদী এমন একটা কিছু ব্যাপার চাহি না যাহাতে আর সকলকেই তুচ্ছ করিয়া দেয়, যাহাতে একটি বিস্তীর্ণ শান্তিময় শ্যামল সমগ্রতাকে বিদীর্ণ ও খর্ব করিয়া ফেলে। এখানে সুগুনির মা এবং নিস্তারিণী, ফজু সেখ এবং নায়েবমহাশয় সকলেই আমাদের প্রতিবেশী— পরস্পরের মধ্যে ছোটোবড়ো-ভেদ যতই থাক্, তথাপি সকলেরই ঘরের কথা আমাদের জিজ্ঞাস্য, প্রতিদিনের সংবাদ আমাদের আলোচ্য বিষয়। এরূপ উপন্যাস সুপরিচিত স্থানের ন্যায় আমাদের মনের পক্ষে অত্যন্ত বিরামদায়ক; এখানে অপ্রত্যাশিত কিছু নাই, মনকে কিছুতেই বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় না, প্রত্যেক পদক্ষেপে এক-একটা দুরূহ সমস্যা জাগ্রত হইয়া উঠে না, সৌন্দর্যরস এত সহজে সম্ভোগ করা যায় যে, তাহার জন্য কোনোরূপ কৃত্রিম মালমসলার আবশ্যক করে না।"

রবীন্দ্রনাথ আরও সংক্ষেপে একটি বাক্যের মধ্যে শ্রীশচন্দ্রকে আমাদের নিকট ধরিয়া দিয়াছেন—

"পরিচিত সহজ সৌন্দর্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয়সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য ক্ষমতার কাজ; বাংলার লেখকসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশবাবুর সেই অসামান্য ক্ষমতাটি আছে· ·"

পুরাতন গ্রামীণ বাংলাদেশকে, শিরোমণি-সার্বভৌম-শাসিত বাংলাদেশের স্নিগ্ধছায়াঘন পল্লীর সমাজকে শ্রীশচন্দ্র জানিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার 'শক্তি-কানন', 'ফুলজানি', 'বিশ্বনাথ' ও 'কৃতজ্ঞতা'র

পাঠকদের চিত্তে তিনি অত্যন্ত সহজে তাঁহার নিজের দরদ ও শ্রদ্ধা সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন, ইহাই বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার সর্ব্বাধিক কৃতিত্ব। একটা মহৎ আদর্শে তাঁহার যাবতীয় রচনাই বিধৃত হইয়া শিল্পের দিক দিয়াও সরস ও প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই সরসতা ও প্রসন্নতা যে তাঁহার প্রকৃতিগত, রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে' তাহার প্রমাণ পাই। শ্রীশচন্দ্র শিল্পী হিসাবে সম্পূর্ণ ও সার্থক হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে দিয়াছেন :

"আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকার নিজের প্রতিভায় নিজে সন্তুষ্ট নহেন, তিনি আপনাকে আপনি অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন। অরসিকের চক্ষে যাহা সহজ তাহা তুচ্ছ; গ্রন্থকার ক্ষমতাশালী লেখক হইয়াও সেই অরসিকমণ্ডলীর নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভনটুকু কাটাইতে পারেন নাই। তিনি হঠাৎ এক সময় আপন প্রতিভার স্বাভাবিক গতিকে বলপূর্ব্বক প্রতিহত করিয়া তাহাকে অসাধারণ চরিত্র ও রোমহর্ষণ ঘটনাবলীর মধ্যে অসহায়ভাবে নিক্ষেপ করিয়াছেন।"

এই দোষ তাঁহার প্রায় প্রত্যেকটি বৃহৎ গল্পকে খণ্ডিত করিয়াছে ; যে সামান্য কয়েকটি ছোট গল্প[৩] তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার কয়েকটিতে আমরা শিল্পী শ্রীশচন্দ্রের সার্থক পরিচয় পাই।

---

৩ ১৩১৯ সালে প্রকাশিত 'রাজ-তপস্বিনী'তে শৈলেশচন্দ্র অগ্রজের পুস্তকগুলির বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিয়াছেন। উহাতে শ্রীশচন্দ্রের গল্প-সংগ্রহ 'দুর্ব্বাদল' "যন্ত্রস্থ" এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা 'দুর্ব্বাদল' খুঁজিয়া পাই নাই ; হয়ত শেষ পর্যন্ত উহা প্রকাশিত হয় নাই।

কমলা

শ্রীকানাই সামন্ত

'প্রণাম করিয়া উঠিয়া পাথরের মূর্তির মতো স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে রহিল না যে, তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেছে। সে যেন দেখিতে পাইল না, নলিনাক্ষ অনিমেষ স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত ; সে একটি অন্তরের চৈতন্য-আভায় অপূর্বরূপে দীপ্ত হইয়া অবিচলিত কণ্ঠে কহিল : আমি কমলা।'

নলিনাক্ষ চিনিল এবং আমরাও চিনিলাম। প্রলয়ঙ্করী পদ্মার অমাবস্যাঘন গূঢ় গর্ভ হইতে বাত্যাত্রাসিত তরঙ্গের আন্দোলনে তৃণতরুশূন্য জনহীন শুভ্র চরে যে অপরিস্ফুট জীবন এক দিন উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহারই অশ্রুধৌত সৌন্দর্যের জ্যোতির্বিভাসিত পূর্ণস্ফুট পরিচয় আজ পাওয়া গেল।

উন্মথিত বিশ্বসমুদ্রের অতল রহস্য ভেদ করিয়া দেবাসুরের নির্নিমেষ দৃষ্টির বিস্ময়ে এক দিন উঠিয়া আসিয়াছিল এক অপ্সরী, আর-এক দেবী। ভুবনমোহিনী উর্বশী, আর নিখিলকল্যাণরূপিণী লক্ষ্মী। পৃথিবীর জরামরণশীল হর্ষশোকচঞ্চল সামান্য মানুষের সহিত তাহাদের জ্ঞাতিত্বের বা দৈনন্দিন ব্যবহারের কোনো সম্ভাবনা নাই। উর্বশীর সম্পর্কে কবি তো বলিয়াই দিয়াছেন, সে মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয়— কোনো গৃহপ্রান্তে কোনো দিন সন্ধ্যার দীপখানি যে জ্বালে, লজ্জায় সুখে সম্ভ্রমে কম্প্রবক্ষে আর নম্রনেত্রপাতে নিস্তব্ধ নিশীথে যে যায় বাসরশয্যামুখে। বৃন্তহীন পুষ্প সে। নিরবগুণ্ঠিতা সে উষা। আর, বিষ্ণুবক্ষো-বাসিনী বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রী? তাঁহার অলৌকিক রূপের কোনো বর্ণনা হয় কিনা জানি না। তাঁহার চরণকমলের লাবণ্য, তাঁহার স্মিতনয়নের দৃষ্টি এই নিখিল আলোকে।

সর্বনাশিনী পদ্মা সকল পূর্বপরিচয় ধৌত করিয়া আমাদের নিকটে এই যাহাকে আনিয়া দিয়াছে সে সামান্যা নারী ; এমনকি, নারীও নয়, যে দিন তাহাকে প্রথম দেখিলাম শৈশবোত্তীর্ণা সে কিশোরী, আপনাকে বা সংসারকে কতটুকুই বা জানে? সেই স্বল্প পরিচয়টুকু পদ্মা আপন নির্দয়করুণ তরঙ্গে তরঙ্গে ধৌত করিয়া দিয়াছে সত্য ; নিশ্চিহ্ন করিয়া লোপ করে নাই। অর্থাৎ, কমলা রামায়ণবর্ণিতা অহল্যাও নয়, যুগ-যুগান্তরের জড়ত্বতন্দ্রা হইতে এক দিন কোন্ নরদেবের পাবনস্পর্শে জাগিয়া উঠিতেই যাহাকে দেখা গেল—

> অপূর্বরহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
> নবীনশৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন—
> পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
> শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে
> এক বৃন্তে। বিস্মৃতিসাগর-নীল-নীরে
> প্রথম উষার মতো।

না, এ দেবী নয়, অপ্সরী নয়, নিসর্গসম্ভূতা অনৈসর্গিক ও অকলঙ্ক সম্পূর্ণতাও নয়, এ আমাদের ঘরের

মেয়ে, এমনকি, সাধারণ বাঙালি ঘরেরই মেয়ে। ইহার আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, দুঃখ সুখ শঙ্কা আছে, সাধ্বস সম্ভ্রম সংশয় সব-কিছু আছে, রক্তমাংসের ক্ষুদ্র দেহে ধুক্-ধুক্-ধ্বনিত প্রাণের একটি উৎস, প্রজ্ঞার একটি আসন এবং প্রণয়-প্রীতির একটি ডায়্‌নামো অধিষ্ঠিত থাকিলে যা না থাকিয়া উপায় নাই।

এই কমলাকে তাহার স্রষ্টা কোনো ছক কাটিয়া নয়, কোনো পূর্বাপর-ভাবনা হইতে নয়, কোনো নীতিশিক্ষা দেওয়ার দুর্মর অভ্যাসে বা আয়াসেও নয়, স্বতঃই যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন বা সৃষ্ট হইতে দিয়াছেন দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে, তাহার কোনো সংক্ষেপসার দেওয়া সম্ভব নয়; আর, তাহাকে ফুলাইয়া ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া বর্ণনের বা ব্যাখ্যানের চেষ্টা করিবে, সেও তো বদ্ধপাগল। তা হোক, তবু, বিরুদ্ধ বা দ্বিধাগ্রস্ত সমালোচনার সকল আপত্তি ও সংশয় ঠেলিয়া কমলা-চরিত্রের যে অনিন্দ্য সৌন্দর্য, নৌকাডুবি-গল্পের যে কাব্যরমণীয় কল্পনা আজ আমাদের এত ভালো লাগিতেছে (হয়তো নূতন করিয়াই ভালো লাগিতেছে; কারণ, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচনা তো পুরাতন হয় না, তাহাকে ভূয়ঃ ভূয়ঃ আবিষ্কারের আর শেষ নাই) তাহার সম্পর্কে দু-চারিটা বিশেষ কথার অবতারণা হয়তো অসংগত হইবে না। হৃদ্‌গত ভাব ও উপলব্ধিকে ব্যক্ত করিয়া বলাই কঠিন; তবুও চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কী ?

দুই বিপরীতমুখী দৃষ্টিতে দেখিয়া নৌকাডুবি আখ্যান সম্পর্কে দুই-প্রকার আপত্তি বা অনুযোগ উঠিয়া থাকে। ১৩৪৭ সালের অগ্রহায়ণে, অর্থাৎ প্রায় অস্তাচলতটে আসিয়া, রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের যে ভূমিকাটুকু লিখিয়াছেন তাহাতেই আপন সর্বান্তর্যামিত্বের পরিচয় দিয়া এই-সব আপত্তিরও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু নিজের সৃষ্টির ওকালতি নিজের করা চলে না। সংসারনাট্যের যিনি সূত্রধার তিনি তো প্রথম হইতে শেষ পর্যন্তই চুপ করিয়া থাকেন; আর, কাব্য নাটক কথার যিনি স্রষ্টা তাঁহাকেও যথেষ্ট বিনয় করিয়া, হয়তো প্রচ্ছন্ন কৌতুককে নানা বাক্যালংকারে সাজাইয়া, ঈষৎ আত্মনিন্দার ছলেই আত্মসমর্থন করিতে হয়।

যাঁহারা পাশ্চাত্যসাহিত্যের উগ্র রসের রসিক, নববাস্তবতার আবিষ্কারে উল্লসিত এবং আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার অভিমানে অভিমানী, তাঁহারা বলিবেন, রমেশ হেমনলিনী ও কমলার জীবন লইয়া ভাগ্যের এমন যে নিষ্ঠুর পরিহাস দিয়া গ্রন্থের সূচনা ও অগ্রগতি, কৈ, তাহার পরিণাম তো তেমন ভয়াবহ হইল না এবং সরল গ্রন্থি সহজেই খুলিয়া গেল। দয়াহীন ক্ষমাশূন্য ঘাতপ্রতিঘাতনিদারুণ সর্বনাশ হইল না কেন ? রমেশ ও হেমনলিনীর ভাগ্যে পরিণামে কী ঘটিল জানি না (সর্বনাশ যে ঘটে নাই বা ঘটিতে পারিবে না, ইহা একরূপ কল্পনা করিয়া লওয়া যায়)— একটা গূঢ়-অশ্রু দীর্ঘশ্বাস-ভরা বৈরাগ্যবিধুরতার পানে অথবা একটি বিষাদসন্ধ্যার অন্ধকার -অভিমুখে হয়তো তাহাদের নিঃসঙ্গ নিরুদ্দেশ জীবনপথ হারাইয়া গেল— ঠিক বলা যায় না— কিন্তু, কমলা আর নলিনাক্ষ যে পরস্পরের দ্বারা সার্থক হইল, সম্পূর্ণ হইল, তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই। কমলার মনে যে কোনো গ্লানি বা কোনো কলঙ্ক রহিল না, সকল দুঃখের ও সকল দ্বন্দ্বের নিঃশেষ অবসান হইল অশ্রুবিধৌত এক মিলনের প্রভাতে, ইহা এমন সুন্দর, এমন সহজ, আর এমন সম্পূর্ণ যে শিশুমনোহর রূপকথায় চলিলেও, আধুনিক গল্পে উপন্যাসে চলিবে কি ? ফলতঃ, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য না বাস্তব ?

বিশ্বাস করিবার ও বিশ্বাস করাইবার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। আর, কবির মুখের কথাই কাড়িয়া লইয়া বলিতে হয় : ঘটে যা তা সব সত্য নয়। অর্থাৎ, যাহা-কিছু বাস্তব তাই শুধু সত্য নয়।

মনুষ্যজীবনে অবশ্যম্ভাবী সার্থকতা নাই এমন বলা যায় না। কিন্তু সেই নিশ্চিত সার্থকতাও সহজে ধরা দেয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনন্ত দেশে কালে, অনন্ত জীবনে, জীবনের বা চেতনার বহুবিচিত্র স্তরে অনুসরণ করিয়া, তবে হয়তো তাহার অকুণ্ঠিত অগুণ্ঠিত সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত কিছুই ব্যর্থ হয় না, কিছুই তমসাচ্ছন্ন থাকে না, কিছুই নষ্ট হয় না। সত্য ; কিন্তু এ কথার ষোলো-আনা সত্যতা কেবল সমগ্রের মধ্যে, অখণ্ডের মধ্যে, একের মধ্যে। অন্য ভূমিতে দাঁড়াইয়া অন্য চোখে দেখিলে মায়া-ছায়ার বহু বাধা, বহু ব্যবধান আছে। বাস্তব দৃষ্টি, বাস্তব শিল্প, বাস্তব সাহিত্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ড ক্ষুদ্রগুলির গণনায় ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া সমগ্রের দিশা হারায় ; ক্ষুদ্র দিয়া বৃহৎকে, খণ্ড দিয়া অখণ্ড এককে, ক্ষণিক দিয়া চিরন্তনকে আবরণ করে। কিন্তু, সাহিত্য বা শিল্পের ইহাই কি কাজ ? ইহাই কি বিশেষ কৃতিত্ব ? প্রাচ্য, বিশেষতঃ ভারতীয় মানস, সেরূপ মনে করে না। যে রেখাকে আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন ও অর্থহীন দেখা যায়, যাহাকে হয়তো অন্যান্য রেখার বিরুদ্ধ ও প্রতিবাদী মনে হয়, অনন্তে প্রসারিত হইলে তাহাই একটি অপরূপ বৃত্ত অঙ্কিত করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কী ? অন্যান্য রেখাবলয়াবলীর সহিত নানা ভাবে মিলিয়া মিশিয়া অপূর্ব এক রেখাছন্দ, রূপালংকার, রচনা না করিয়া পারিবে কি ?

অথচ, বাস্তবে অনন্ত অবধি কোনো-কিছুরই অনুসরণ করা যায় না। সাহিত্যেও যায় কিনা সন্দেহ ; তবে ইচ্ছা থাকিলে ও কৌশল জানিলে তাহারই ইশারা দেওয়া যায়। সম্পূর্ণ বৃত্তটি আঁকিয়া দেখাইবার ক্ষেত্র না থাকুক, খানিকটা বৃত্তচাপ বা বৃত্তাভাস দেখানো যায় বৈকি এবং যে বুঝিবার সে উহাতেই সবটা বুঝিয়া লয়। ইহাকে কি অবাস্তব বলিব ? যদি বা অবাস্তব বলা যায়, অসত্য বলিব কেমন করিয়া ? য়ুরোপীয় গল্পে উপন্যাসে ট্রাজেডিতে যেরূপ ভাগ্যবিপর্যয়ের, যেরূপ মানুষে মানুষে তথা মনুষ্যে ও সমাজে ঘাতপ্রতিঘাতের, নিশ্চিত পরিণাম হয় বধ নয় বন্ধন, নয় আত্মঘাত, নয় তো ঘোর উন্মত্ততা, প্রাচ্য কল্পনায় তেমন তো কিছু দেখা যায় না। একটি বৈরাগ্যের বিষাদে, একটি আত্মনিবেদনের শমরসে, একটি ক্ষমার মাধুরীতে, একটি মর্মবিগলিত অশ্রুধারায়, অশ্রুধৌত হাসিতে ও চেতনার নিঃশব্দ সঞ্চারে, এক কথায়, কোনো-একটা সার্থকতায় ও সমে, না পৌঁছিয়া কোনো বৃহৎ সৃষ্টিই শেষ হয় না। অভিজ্ঞানশকুন্তলের কথাই ধরা যাক, পাশ্চাত্য মনীষী গ্যেটেও যার রসের ও সৌন্দর্যের পূর্ণতায় চমৎকৃত। পৃথিবীতে যাহা ভগ্ন, যাহা ছিন্ন, যাহা ধূলিকীর্ণ, যাহা অসম্পন্ন ও শূন্যতায় অবসিত হইতে পারিত, তাহা স্বর্গে কি পূর্ণতা পায় নাই ? প্রণয়স্বর্গচ্যুত দুষ্মন্তের স্মৃতি-উদ্‌বোধের উপায় বা উপলক্ষ্যটাই বা কী ? মাছের পেট চিরিয়া পাওয়া অঙ্গুরীয় ! দুর্বাসার শাপও যেমন অহেতুক, আকস্মিক, অর্থাৎ বহির্জগৎ হইতে প্রক্ষিপ্ত একটা ঘটনা, এই অঙ্গুরীয়-উদ্ধারও কি তেমনি নয় ? সে তো বটেই। তবে এগুলি হইল শুধু ছল, রূপলক্ষণা, সাঁঘল। ইহারই সাহায্যে কালিদাস দুইটি হৃদয়ের গূঢ়তম গভীরতম আলোড়ন ও উদ্‌বোধ, দুইটি সত্তার বুঝি অনন্তজীবনব্যাপী একটি ইতিহাস, একটি অন্ধ আকর্ষণের কামনা হইতে প্রেম পর্যন্ত উত্তরণের কল্পনাতীত আশ্চর্য কাহিনী, অতি সংক্ষেপে আর অতি সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জীবনকে, প্রেমকে, সত্যকে এভাবে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা বাস্তবের নাই।

সুতরাং, কমলার হৃদয় যে ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত-বিভ্রান্ত না হইয়া পারে না, তাহার জীবন যে ছারখার

হইয়া যাওয়াই চাই, এ কথায় আমাদের অনুমাত্র আস্থা নাই। তার পর দেখিতে হইবে, আশৈশবের শিক্ষা আর সামাজিক ও সাংসারিক পরিবেশ, কমলার মনের গঠন। কমলার চরিত্রটি বা তাহার বিকাশ যে ভাবে আঁকা হইয়াছে তাহা অনেকটা অপ্রত্যাশিত, অসংগত, এটা যেন মানিয়া লইয়াই রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত ভূমিকায় কৈফিয়ত দিয়াছেন, 'কোনো-একজন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবাররূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদমাত্রেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে।' তা দিন্, ইহাতে আসলে কিন্তু কোনোরূপ লজ্জার বা ক্ষুণ্ণতার কারণ নাই। সংস্কারমুক্ত মানবমন, সে এমন এক 'সোনার পাথর-বাটি' যাহা কোনো দেশকালপাত্রে হয় নাই, হইবেও না। একরূপ সংস্কারের পরিবর্তে অন্যরূপ সংস্কার, এইমাত্র সম্ভব। কমলার সংস্কারটি এ ক্ষেত্রে কিরূপ? যে সংস্কারে হিমালয়নন্দিনী গৌরী বলিয়াছিলেন: মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্। 'আমার মন তাঁহাতে ভাবের একরসে অবিচল'। মানুষকে তো আমরা কেবল চোখ দিয়া দেখি না; কেবল স্থূল ব্যবহারে চিনিয়া লই না; যুক্তিবিচারে সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, অনেকটা অনুমান করিয়া, অনেকটা কল্পনা করিয়া, অনেকটা আশা আকাঙ্ক্ষা মিশাইয়া ও মনোভব আদর্শের প্রক্ষেপ করিয়া, ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুকে নিজে নূতন করিয়া সৃষ্টি করি, এবং অবশ্যই সেই চেষ্টায়, সেই সাধনায়, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নূতন হইয়া উঠি। এই পদ্ধতির একান্ত সত্যমিথ্যা জানিবার অন্য কোনো উপায় নাই; ফলের দ্বারা, কল্যাণপ্রসূ বা অকল্যাণকর পরিণামের দ্বারা জানিতে হইবে।

ইহা কেবল আপাতদৃষ্টিতেই আশ্চর্যের বিষয় যে, কমলা 'নলিনাক্ষ' এই নামটিকে বীজমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, 'স্বামী'-রূপ একটা আইডিয়ার আহ্বানে, তাহার পদতলের মাটি, তাহার যা-কিছু এত দিনের জানা চেনা, সমস্তই এক মুহূর্তে ত্যাগ করিয়া একেবারে অচেনা অজানাতে ঝাঁপ দিল। এমনই হইয়া থাকে। প্রাণী হইতে মানুষের ইহাতেই বিশিষ্টতা। সে কেবল দেহ ও প্রাণ নয়। বিশেষ করিয়াই সে হৃদয়, মন, বুদ্ধি। সুতরাং তাহার জীবনে যা-কিছু সার্থকতা, যে-কিছু মহান্ পরিণাম, তাহার মূলে থাকে একটা আদর্শের ভাবনা, একটা আইডিয়ার ইশারা, এবং তাহারই উদ্দেশে অসীম সাহস, অক্লান্ত উদ্যম, অশেষ ত্যাগ। 'ঈশ্বর' এরূপ একটা আইডিয়া, 'দেশ' এরূপ একটা আইডিয়া, আমাদের দেশের মেয়েদের কথাই বলিতে পারি—'স্বামী' তাহাদের পক্ষে এরূপই একটা আইডিয়া। আশ্চর্য এই যে, যাহা একটা ভাব, একটা অবচ্ছিন্ন বা বিমূর্ত তত্ত্ব, ব্যবহারতঃ তাহাকে জানা ও পাওয়ার সাধনায় কী অক্লান্ত যত্ন, প্রতি দিনের প্রত্যেক মুহূর্তে স্থূল ও প্রত্যক্ষ কত অজস্র খুঁটিনাটির প্রতি কী অভিনিবেশ। বাহির হইতে যে আইডিয়া দেখে সে স্থূল ব্যবহার দেখে না, যে ব্যবহার দেখে সে আইডিয়া বা ভাব দেখে না এবং উভয়েই সমান ভ্রমে পতিত হয়। (এই ভ্রমের নিরসনে সাকার-উপাসনার মর্ম বুঝা যায়; সে কথার বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আর্ট সম্পর্কে বলা যায়— তাহার একটা বিগৃহীত[১] বক্তব্য আছে, রূপ আছে; তেমনি আছে আবার বিমূর্ত ভাব, রস, ছন্দ, সুর; উভয়েরই উপযোগিতা এবং পূর্বাপরসম্বন্ধ যে বোঝে সেই বোঝে বিমূর্ত রসের বিগ্রহ-রূপী আর্ট জিনিসটা কী।)

কাজেই, হিন্দুর দাম্পত্যজীবনের যে আদর্শ হরগৌরী-রূপে বা রামসীতার জীবনে দীপ্যমান— যে

১ concrete। বিগ্রহ শব্দটিকে বিশেষণরূপে ব্যবহার করিতে অভ্যাসের বাধা আছে।

আদর্শের অনুশীলনে পরস্পর শ্রদ্ধা আছে, প্রীতি আছে, পূজা আছে, অন্তর্নিহিত দেবত্বের সন্ধান ও পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন আছে, তাহাকে স্থূল-ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের প্রমাণে বা দৈনন্দিন জীবনের ধূলিলিপ্ত ছদ্মবেশ-হেতু অলীক ও অহেতুক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পতিব্রতা সতীর প্রেমের সাধনায়, একাগ্রতার শক্তিতে, পুরুষের অন্তরে শিবত্বের তথা দেবত্বের উদ্‌বোধ সম্ভব। কারণ, দেবত্ব মনুষ্যত্বেরই অন্তর্নিহিত বস্তু। তাহা নি র্থ কল্পনা বা আকাশকুসুম নয়। এই উজ্জ্বল আদর্শ এবং তাহাতে সরল অথচ সবল নিষ্ঠা কমলার অন্তরে ছিল। সর্বশরীরে সঞ্চারিত রক্তের প্রবাহেই ছিল। নানা পরস্পরবিরুদ্ধ প্রভাবে ও শিক্ষায়, নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতায়, ইহা নষ্ট হয় নাই। মাতুলের সংসারে অনাদরে মানুষ হইয়াছে সত্য, কষ্ট সহিয়াছে, ক্লেশ করিয়াছে, তাহাতে চরিত্রের দৃঢ়তাই বাড়িয়াছে। ব্রত লইয়া ভোরে যখন স্বহস্তে মাটির শিব গড়িয়া পূজা করিয়াছে তখন এক অপরূপ ভাব তাহার মনে জাগিয়াছে। স্তব্ধ হইয়া কোনো সন্ধ্যায় কথকের মুখে রামায়ণকথা, পুরাণকথা শুনিয়াছে যে দিন, অন্তরের নির্নিমেষ দৃষ্টিতে এক অলৌকিকের সাক্ষাৎ তার মিলিয়াছে। অন্তর্নিহিত সেই শিক্ষা, সেই স্বপ্ন, সেই বিশ্বাস ও সেই নিষ্ঠা লইয়া আত্মদানোৎসুক পরিপূর্ণ নির্ভরে স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে, লজ্জায় যে স্বামীকে সে বাসররাত্রের হাস্যালাপ পুষ্পগন্ধ স্নিগ্ধোজ্জ্বলদীপালোক এ-সকলের মধ্যে চাহিয়া দেখে নাই— কিন্তু, তাহার অন্তরে থাকিয়া আর-একজন নির্নিমেষ দুটি চোখে আরতি জ্বালাইয়া দেখে নাই তাহা কে বলিতে পারে?

যাহা হউক, ঝড় বহিয়া গেল এবং কূলগ্রাসিনী পদ্মার তরঙ্গতাড়নে দুটি দিগ্‌ভ্রষ্ট জীবন দুই দিক হইতে ভাসিয়া নির্জন চরে আসিয়া মিলিল। বয়সের হিসাব অনাবশ্যক; মনের দিক দিয়া কমলা তখনো বালিকা, পরিপূর্ণ নারী নয়, বর্ষণ-ভরা মেঘের মতো হৃদয়ভারাবনতা রমণী নয়। ইহার পর অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে দেখিতে পাই এই অনভিজ্ঞা বালিকা, স্বামী-বোধে, সহজ সরল বিশ্বাসে, কিভাবে দ্বিধাগ্রস্ত ও অন্য-মনস্ক রমেশকে আশ্রয় করিতে গিয়াছে আর কিভাবে বারে বারেই বাধা পাইয়াছে। তাই, রমেশের সহিত তাহার সম্পর্ক ক্ষণে-ক্ষণে-সংশয়াবিষ্ট এক-প্রকার বন্ধুত্বের পর্যায়েই থাকিয়া গিয়াছে; সুপ্তিচারী পথিকের মতো সে যে কোথায় আছে, কোথায় চলা-ফেরা করিতেছে, কমলা তাহা ভালো বুঝিতে পারে নাই। একটা কোনো আদর্শ মনে থাকিতে পারে, কিন্তু বাহিরে তাহা রাখিবার যোগ্য একটি বেদীও চাই; তার পর নাহয় সাধনায় ও আরাধনায় বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যাইবে। বর্ষণফুল্ল নির্বোধ বল্লরী দেখি, খড়্‌খড়ির ফাঁকে দোতলার আপিস-ঘরেও প্রবেশ করে এবং অধিকর্তাকে স্থিরাসনে না পাইয়া তাঁহার অধিকৃত কুর্শিখানার পায়া জড়াইয়া উঠিতে চায়, কোন্ দিন আচমকা এক-গুচ্ছ ফুল ফুটাইয়া তাঁহাকে হতবুদ্ধি করিবার হয়তো চেষ্টা— যদি না ইতিমধ্যে বেচারি খরধার কাঁচিতে কাটা পড়ে। শাস্ত্রকাররা যাই বলুন, মানুষের হৃদয় এমন শুকনো কাঠের খুঁটি জড়াইয়া উঠিতে পারে না। অন্য একটা সংবেদনশীল হৃদয়ের প্রয়োজন হয়। সেই হৃদয়ের একটা স্বীকৃতি, একটু আভিমুখ্য, খানিকটা প্রশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। রমেশের নিকট কমলা তাহা পায় নাই। যতটুকু পাইয়াছে তাহাও ক্ষণে ক্ষণে দ্বিধায় সংশয়ে ও নৈতিক নিষেধের গ্লানিতে খণ্ড, ছিন্ন। অথচ, মা বলিয়া, মেয়ে বলিয়া, ভগিনী বলিয়া, যে কেহই কমলাকে একবার স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহারই কাছে তাহার আত্মদান ও হৃদয়দান কত সহজ সে জানে উমেশ-ছেলেটা, জানেন পশ্চিম অঞ্চলের খুড়ামহাশয়, জানে তাঁহার মেয়ে শৈল। এ ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস ও সেই বিশ্বাস-

সম্ভূত দৃঢ়তারও যে অভাব নাই তাহার প্রমাণ সে দিয়াছে রমেশকে, গাজিপুরে বসবাসের সংকল্পে ও উমেশের অত্যাগে।

গাজিপুরে আসিয়া শৈলজার বন্ধুত্বে ও শৈলজার প্রেমতপ্ত হৃদয়ের সংস্পর্শে কমলা প্রথম সেই বুঝিল নিজের জীবনের ব্যর্থতা ও শূন্যতা, পদ্মার চরেরই মতো— তাহাকে বেষ্টন করিয়া নিশিদিন জীবনপ্রবাহ বহিতেছে, সে তৃষিত; তৃণ নাই, ফলশস্য নাই, কোনো প্রিয়জনের পদপাত নাই। অথচ শৈলজার জীবন কতই ভিন্ন, নারীজীবনের চিরকাঙ্ক্ষিত দুঃখে সুখে কতই পরিপূর্ণ। দূর কক্ষে বা অঙ্গনে যে পদক্ষেপের বার্তা আর কেহ জানিতে পারে না শৈলজার উৎকর্ণ হৃদয় কেমন করিয়া তাহা জানিতে পায়, যেন সে তাহার নিত্য-আন্দোলিত হৃদয়েই পড়ে। বঞ্চিত জীবনের, যৌবনের, নিঃশব্দ হাহাকার লইয়া এত দিনে কমলার বুভুক্ষু নারীত্ব তাহার অন্তরের গোপন অন্তরে সুপ্তি ও স্বপ্ন হারাইয়া সম্পূর্ণই জাগিয়া বসিল। কে তাহার আপন জন? সে কি এই মানুষ যে তাহার কাছে থাকিয়াও নাই। সে কি এই লোক যাহার শিক্ষিত মনের যুক্তিবদ্ধ ভাষা, 'যদি' 'তবে' ইত্যাদি ন্যায়ের সূত্র, নবপ্রণয়ের প্রথম চিঠি, শৈলজা তো বুঝিতে পারে নাই, আর কমলা বুঝিয়াছে যে দিন, আকস্মিক ঘটনায়, বুঝিয়া লজ্জায় ঘৃণায় আত্মধিক্কারে মাটিতে মিশাইতে চাহিয়াছে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট কুড়ানো একখানা চিঠিতে আর-এক দিন আর-একটা ঝড় বহিয়া গেল। আকাশে নয়, অরণ্যে নয়, তরঙ্গ-উত্তাল পদ্মাবক্ষেও নয়, কমলার অনাথ জীবনের উপর দিয়া, কমলার নবজাগরূক নারীত্বের পঞ্জর ভেদ করিয়া, তাহার সকল সুখ ও স্বপ্ন জীর্ণ দীর্ণ পত্ররাজির মতো দিগ্‌বিদিকে উড়াইয়া ছড়াইয়া। অবশেষে কমলা যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল, মৃত্যুর কবল হইতে প্রাণপণ বলে জাগিয়া উঠিয়া যেন নূতন এক জীবন পাইল, তাহার নূতন জন্ম হইল। পদ্মাগর্ভ হইতে এক দিন প্রভাতে এক কিশোরী উঠিয়াছিল, গঙ্গাতটে এক রমণী আসিয়া দাঁড়াইল আজ সন্ধ্যামুখে—

'কমলা আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখীন সেই অস্তগামী সূর্যকে প্রণাম করিল। তাহার পরে মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া নদীর মধ্যে কিছুদূর নামিল এবং জোড়করপুটে গঙ্গায় জলগণ্ডূষ অঞ্জলি দান করিয়া ফুল ভাসাইয়া দিল। তার পর সমস্ত গুরুজনদের উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই আর-একটি প্রণম্য ব্যক্তির কথা সে মনে করিল। কোনো দিন মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে সে চাহে নাই; যখন এক দিন রাত্রে সে তাঁহার পাশে বসিয়াছিল তখন তাঁহার পায়ের দিকেও তাহার চোখ পড়ে নাই। বাসর-ঘরে অন্য মেয়েদের সঙ্গে তিনি যে দুই-চারিটি কথা কহিয়াছিলেন তাহাও সে যেন ঘোমটার মধ্য দিয়া, লজ্জার মধ্য দিয়া, তেমন সুস্পষ্ট শুনিতে পায় নাই। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর স্মরণে আনিবার জন্য আজ এই জলের ধারে দাঁড়াইয়া সে একান্তমনে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনো মতেই মনে আসিল না।'

ইহা নূতন জন্ম নয় তো কী? পুরাতনের তর্পণ সারিয়া, পুরাতনকে শেষ প্রণাম জানাইয়া, কমলা তাহার নিকট বিদায় লইল। না, সে আত্মহত্যা করিল না। তেমন আশাহীন নয় তার হৃদয়, তেমন মেরুদণ্ডহীন দুর্বল চরিত্র নয় তার। কুসুমসুকুমার যদিও কমলার রূপ ও কান্তি, বজ্রসার তার গূঢ় অন্তর। এই সন্ধ্যায় যে একলক্ষ্য অভিসারে সে বাহির হইয়া পড়িল তাহাতে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথেরই কল্পিত সন্ধ্যাসতীর বর্ণনা—

'একটি সোনার-চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে;

ধীরে ধীরে কত শতসহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ-যুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে।... কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ!'

মনে হয়, কমলাও যেন তার অদৃষ্টপূর্ব স্বামীর সন্ধানে শতবার পৃথিবী-প্রদক্ষিণের শক্তি বিশ্বাস ও ধৈর্য রাখে। কারণ, চিরদুঃখিনী বৈদেহী যেমন বলিয়াছিলেন—

তিষ্ঠেল্লোকা বিনা সূর্যং শস্যং বা সলিলং বিনা।
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেৎ তু মম জীবিতম্॥

তেমন কমলাও যে বলিতে পারে; স্বামীকে না পাইয়া, তাহারই চরণে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন না করিয়া, সে বাঁচিবে কেন!

যাহা হউক, ইহার পর হইতে শুরু হইল কমলার একাগ্র সন্ধান, কমলার একনিষ্ঠ তপশ্চর্যা। সে সন্ধান বহির্জগতের পথে পথে নয় বটে, সে তপস্যা নয় পাঁচ দিকে পঞ্চাগ্নি জ্বালিয়া, তবু তাহার ঋজুতা তীব্রতা ও সিদ্ধিদায়িনী শক্তি কিছুমাত্র কম নয়। বাহিরে তাহার তেমন পরিচয় নাই, অন্তরে তাহা সংহত সত্তার ও জাগ্রত চেতনার আকর্ষণে আপন প্রেমাস্পদকে আপনি টানিয়া আনিয়াছে। একটির পর একটি যে-সব ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে কেবল চোখের দেখাতেই তাহা কাকতালীয়বৎ মনে হইতে পারে, বস্তুতঃ কি তাই? অন্তরের আহ্বানে বাহির হইতে সাড়া আদায় করিয়া লওয়া, আত্মার শক্তিতেই আত্মীয়কে লাভ করা, এমন তো সংসারেও ঘটিয়া থাকে বহু ক্ষেত্রে বহুজনের জীবনে। আর, সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি— সেখানে তো অবান্তরকে আকস্মিককে মায়িককে লইয়া কারবার নয়; না, অসত্য কল্পনার কোনো এলেকাই নাই; সত্তার উদ্দেশে সত্তার আহ্বানে ও সত্যের জোরে এরূপ না ঘটিয়া পারে কি?

'নলিনাক্ষ' এই পুণ্য নামটি কানের ভিতর দিয়া কমলার 'মরমে পশিয়াছিল'। প্রথম যে ভাবে সে স্বামীকে দেখিল, নিষ্পলক দৃষ্টিতে, সর্বদেহমনে বুঝি নেত্রময় হইয়া, তাহার বর্ণনাটুকু তুলিয়া না দিলে কমলাকে সম্পূর্ণ জানা যাইবে না—

'কমলার নিশ্বাস প্রবল হইয়া তাহার বুকের মধ্যে কষ্ট হইতেছিল।... বিক্ষুব্ধ বক্ষকে শান্ত করিবার জন্য তাহাকে সেইখানে বসিয়া পড়িতে হইল।... অন্ধকারের ভিতর হইতে বেপথুমতী কমলা নলিনাক্ষের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার দুই চক্ষে জল আসিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি জল মুছিয়া ফেলিয়া সে তাহার একাগ্র দৃষ্টির দ্বারা নলিনাক্ষকে যেন আপনার অন্তঃকরণের গভীরতম অভ্যন্তরদেশে আকর্ষণ করিয়া লইল। ওই-যে উন্নতললাট স্তব্ধ মুখখানির উপরে দীপালোক মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, ওই মুখ যতই কমলার অন্তরের মধ্যে মুদ্রিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সমস্ত শরীর যেন ক্রমে অবশ হইয়া চারি দিকের আকাশের সহিত মিলাইয়া যাইতে লাগিল; বিশ্বজগতের মধ্যে আর-কিছুই রহিল না, কেবল ওই আলোকিত মুখখানি রহিল, যাহার সম্মুখে রহিল সেও ওই মুখের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেল।'

যোগী ও সাধকেরা হয়তো ইহাকেই ভাবসমাধি বলিবেন। ইহাতে কেবল বাস্তবতা নাই, আছে অপরিমেয় ও অনির্বচনীয় সত্যতা। ইহাতে বুঝিতে পারি, কমলা অসংখ্য সাধারণের অন্যতমা মাত্র নয়;

সে বিশেষ একজন, যাহার তুলনা পাওয়া মুশকিল। সে পরাবলম্বিনী আত্মবিস্মৃতা আশা[২] নয়, যাহার আর্তি ও বেদনা দেখিয়া মনে পড়ে বৈষ্ণব কবির উক্তি: শিশিরের লতা-হেন বিনি অবলম্বনে উঠইতে কত করু সাধ। কমলার অপরিসীম ত্যাগের শক্তি আছে বলিয়াই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণেরও সামর্থ্য ও সৌভাগ্য আছে। যখন সে ভাবিল, হেমনলিনী আসিয়া নলিনাক্ষের ঘরনী হইবে, তখন তো ব্যাকুল ভাবে হাহাকার করিয়া উঠিল না, আশাভিন্নহৃদয়া হইয়া মূর্ছিত হইল না, নলিনাক্ষকে হেমনলিনীকে বা নিজের ভাগ্যকে ক্ষিপ্তের মতো হইয়া ধিক্কার বা অভিশাপ দিল না, সে আপন অবিরল-অশ্রু-কলঙ্কিত মুখখানি ঊর্ধ্বে তুলিয়া প্রার্থনা জানাইল: আমি কোনো কামনা মনের মধ্যে রাখিব না। 'কেবল সেবা করিব। যত দিন জীবন আছে কেবল সেবা করিব। আর কিছু চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না।

'রাত্রে দুই তিন বার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভাঙিবা মাত্রই সে মন্ত্রের মতো আওড়াইতে লাগিল: আমি কিছুই চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না। ভোরের বেলায় সে বিছানা হইতে উঠিয়াই জোড়হাত করিয়া বসিল এবং সমস্ত চিত্ত প্রয়োগ করিয়া কহিল: আমি আমরণকাল তোমার সেবা করিব, আর-কিছু চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না।'

হেমনলিনীকে কায়মনোবাক্যে সে আত্মীয় বলিয়া, বন্ধু বলিয়া, গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল এবং প্রফুল্ল-মুখে ক্ষুদ্র সংসারের শত কাজে ফিরিতে লাগিল। পরিপূর্ণভাবে আত্মনিবেদনের সুদুর্লভ শক্তি তাহার আছে; বৈষ্ণবী ভাষায় বলিতে গেলে তাহার প্রেম যে 'কৃষ্ণপ্রীতি-ইচ্ছা', আত্মসুখ-ইচ্ছা নয়।

এরূপ নিখাদ নিষ্কলঙ্ক প্রেম ব্যর্থ হইতে পারে না। কমলার প্রীতি ও পূজার লক্ষ্য যদি নলিনাক্ষ না হইয়া আর কেহ হইত, ঘটনা যদি এ পথে না গিয়া অন্য পথে ধাবিত হইত— এ-সকল প্রশ্ন অবান্তর। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সংসারে অনেক অবান্তর, অসংগত, প্রক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে; কিন্তু অনন্ত জীবনে সব কিছুই একটি সুসংগতিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। এখানে যাহাকে কোলাহল বলিয়া মনে হয় তাহাও অপরিসীম এক সংগীতের অংশবিশেষ; এ লোকে বা লোকান্তরে একটি সমে পৌঁছিলে তাহার অর্থ ও সুষমা বুঝা যাইবে। যে জীবন আজ ভগ্ন ও খণ্ড বলিয়া মনে হইতেছে সেও জানি অন্য অগণ্য ঘটনা-পরম্পরায়, অন্য অজ্ঞেয় উপায়ে ও উপকরণে, এক দিন নীল শূন্যে একটি গুম্বজের শোভায় ও গৌরবে জাগিয়া উঠিবে, একটি অটুট সুন্দর খিলানের অবকাশে সেই অনন্তকেই যেন একটি ফ্রেমে বাঁধিয়া আমাদের গোচর করিবে। সুতরাং, অন্যরূপ ঘটনায় কমলার জীবন হয়তো অন্য রূপ ধারণ করিত, কিন্তু স্বরূপের বদল হইত না এবং তাহার আত্মস্থিত সার্থকতা কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না।

যাহা হউক, অনুকূল ভাগ্যের প্রসন্নস্মিত দৃষ্টিতলে ক্রমে কমলার জীবনলতায় একটি 'রাঙা-মুকুল', একটি 'প্রেমের মঞ্জরী' জাগিয়া উঠিল। প্রথম স্বামী-সন্দর্শনের অনির্বচনীয় উপলব্ধির শেষে কমলা যখন সম্বিৎ ফিরিয়া পায় তাহার সমস্ত প্রাণ মন ভরিয়া দিয়াছিল একটি বিমুগ্ধ বিস্ময়। সেবার অধিকার প্রথম লাভ করিবার পরে যে দিন সে নলিনাক্ষের এক-জোড়া খড়ম আবিষ্কার করিল, 'তাড়াতাড়ি সেই খড়ম-জোড়াটি তুলিয়া লইয়া কমলা মাথায় ঠেকাইল এবং ছোটো শিশুটির মতো বুকের কাছে ধরিয়া অঞ্চল দিয়া বার বার তাহার ধুলা মুছাইয়া দিল', সে দিন কি আপনার অন্তরে এক স্বামী-সোহাগিনীরও

২ চোখের বালি।

সাক্ষাৎ সে পাইল না? পরে আর-এক দিন, নলিনাক্ষের ঘরের কুলুঙ্গিতে প্রফুল্ল গোলাপ সাজাইয়া, স্বহস্তে তাহার শয্যা পাতিয়া, সহসা নলিনাক্ষের পদশব্দে চকিত হইয়া 'অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশাইতে চাহিল' যখন, তাহার ওই মধুর লজ্জায় নিজের কাছেও নিজে সে ধরা পড়িল, আর অন্য-একজনের কাছেও কিছুই তো লুকাইয়া রাখা গেল না। (পূজারিনী উমাও কিভাবে ধীরে ধীরে এক দিন আপন আরাধ্যের প্রিয়তমা হইয়া উঠিয়াছিলেন, কালিদাস সে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।)

অবশেষে সকল দ্বিধা সংশয় সংকোচ শঙ্কা সবলে পরিহার করিয়া, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া, অন্তরের একটি চৈতন্য-আভায় অপরূপ-দীপ্তি-মণ্ডিতা হইয়া, যে দিন সে অগুন্ঠিত আননে ও অকুন্ঠিত স্বরে বলিতে পারিল 'আমি কমলা', সে দিন তাহার সকল আবরণ ঘুচিল এবং তাহাকে নিঃশেষে চিনিলাম। 'আমি কমলা' এই দুটি কথাই যথেষ্ট। অতল অকুল বিশ্বসমুদ্রের পঙ্ক ত্যাগ করিয়া, সলিল ভেদ করিয়া, তরঙ্গ-আক্ষেপের ঊর্ধ্বে ভাবের ও রূপের অম্লান অপরূপ একটি পদ্ম। একাগ্র চেতনার নিবাত নিষ্কম্প একটি শিখা। 'আমি কমলা'। এই দুটি কথা বলিতেই কমলা আপনার সকল শক্তি সংহত করিয়াছিল; ইহার 'পরেই তাহার আপনার কণ্ঠস্বরে তাহার যেন ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল, তাহার একাগ্র চেতনা বাহিরে ব্যাপ্ত হইল।... তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মাথা নত হইয়া গেল... নড়িবারও শক্তি রহিল না, দাঁড়াইয়া থাকাও যেন অসাধ্য হইয়া উঠিল।... নলিনাক্ষ আস্তে আস্তে তাহার হাতটি আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইয়া কহিল: আমি জানি তুমি আমার কমলা। এসো আমার ঘরে এসো। উপাসনা-ঘরে তাহাকে লইয়া গিয়া তাহার গলায় কমলার গাঁথা সেই মালাটি পরাইয়া দিল এবং কহিল: এসো আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি। দুইজনে পাশাপাশি যখন সেই শ্বেত-পাথরের মেজের উপরে নত হইল, জানালা হইতে প্রভাতের রৌদ্র দুইজনের মাথার উপরে আসিয়া পড়িল।'

আমাদের আলোচনা এইখানেই শেষ করা গেল। যেরূপ সংক্ষেপে গুছাইয়া বলিবার ইচ্ছা ছিল, হয়তো তাহা সম্ভব হয় নাই। রবীন্দ্র-রচনার নানা অংশ সংকলন করিবার লোভও সংবরণ করা যায় নাই। অথচ আগাগোড়া গল্পটি উদ্ধৃত না করিয়া উহার সকল সৌন্দর্য কেহ কি বুঝাইতে পারিবে? উমেশ ছেলেটা, উমি, যে কচি হাত-দুটিতে ঢল্‌ঢলে সোনার বালা দুটি পরিয়া হাত ঘুরায় আর বলে 'মাসি গ-গ গেছে', তবে দুধ খায়, শৈলজা, হেমনলিনী, পুত্র-গরবিনী ক্ষেমংকরী, পশ্চিম অঞ্চলের খুড়ামহাশয়, বৃদ্ধ অন্নদাবাবু, যোগেন্দ্র, যাহার স্পষ্টবক্তৃত্বে আর সহৃদয় অধৈর্যে প্রায় অতিপরিচিত জনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইতেছি, গোরা উপন্যাসের পানুবাবুর সহোদর-হেন অক্ষয়, নবীনকালী, যাঁর ছেলের কাছে দু মাস অন্তর লাট-সাহেবের চিঠি আসে এবং যাহার হুকুমে কত লোকের ফাঁসি হইয়াছে— প্রত্যেকটি চরিত্র আপন অনন্য স্বভাবে বা প্রকৃতিতে আমাদের জানা ও চেনা হইয়াছে। (অবশ্য, কমলার মতো ধীরে ধীরে আপনার অকলঙ্ক স্বরূপ সম্পূর্ণ উন্মোচন করিয়া আর-কেহই আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়ায় নাই। সংসারে অধিকাংশ মানুষের স্বভাব[৩] শুধু জানা যায়; স্বরূপে ফুটিয়া ওঠে লক্ষের মধ্যে বুঝি একজনই।)

রমেশ? তাহার কথাও ভুলি নাই। নৌকাডুবি গল্প লইয়া পাশ্চাত্যসাহিত্যরসিক এক পক্ষের

---

৩ ব্যুৎপত্তিগত দার্শনিক অর্থ ধরা হয় নাই।

মনে যে আপত্তি উঠিতে পারে, আমরা এ প্রবন্ধে তাহারই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। অন্য করুণহৃদয় পাঠক, বিশেষতঃ পাঠিকা -মণ্ডলী, অনুযোগ করিতে পারেন, রমেশ ও হেমনলিনীর জীবনের এ ব্যর্থতা কেন ? রবীন্দ্রনাথের মনে কি দয়া নাই ? তা, আছে বৈকি। নহিলে, রমেশের নিকট কমলার শেষ-বিদায়-গ্রহণ দৃশ্যটির অবতারণা তিনি করিতেন না। সেই সাক্ষাতের আরম্ভে ও শেষে ভূমিষ্ঠ প্রণামের দ্বারা কমলা নিজের দিক হইতে সকল ক্ষোভ ক্ষতির চিহ্ন মুছিয়া দিয়াছে, সকল অপরাধের 'পরে ক্ষমা বর্ষণ করিয়াছে। (স্বয়ংবরসভায় রাজনন্দিনী সুদর্শনার এক-একটি প্রণামের দ্বারা এক-একজন নরপতির নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণ, সহসা মনে পড়ে বৈকি। অবশ্য, বাহ্য সাদৃশ্যের বেশি কিছু আশা করা যায় না। বরং আর-একটি কথা মনে পড়ে, কোনো সাহিত্যে যাহা পড়ি নাই, শাস্ত্রে থাকিতে পারে, তাহার উপযোগিতা সহৃদয় সমজ্দার বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন : ইষ্টসাধনার পথে অনেক-কিছু দেখিবে, অনেক-কিছু উপলব্ধি করিবে, প্রত্যেককেই প্রণাম করিবে, কিছুই নিজে হইতে গ্রহণ করিবে না, তোমার ইষ্ট আপনি তোমার অন্তরে ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।) ভূমিষ্ঠ প্রণামে নত হইয়া কমলা মুক্তি দিয়াছে, মুক্ত হইয়াছে। ইহার পরেও রমেশের আপনাকে খুঁজিয়া পাইতে সময় লাগিবে সত্য, হয়তো এ জীবনে তাহার সম্পূর্ণ সার্থকতা না'ও মিলিতে পারে, তা বলিয়া চিরজীবনের জন্য ব্যর্থ হইবে কেন ? তা ছাড়া, সার্থকতা ও সুখ এক নয়। সাধারণতঃ যাহাকে সুখ বলা যায় তাহাই সার্থকতা নয় ; সার্থকতাই সুখ এ কথা সত্য বটে। সেই সার্থকতার অধিকতর সম্ভাবনা হেমনলিনীর অন্তরে আছে ; তাহার মহত্ত্ব কিছু কম নয় ; কেবল প্রতিকূল ঘটনা-ঘাতে, বহু দিকের বহু কৃত্রিমতার অবরোধে ও আবরণে বিষণ্ণ, ম্লান। তাহার প্রেমের নিষ্ঠা, তাহার অন্তরাত্মার বল সামান্য নয় ; সে যে ব্যর্থ হইবে, আপন সত্তা মন্থন করিয়া আপন সুধা আহরণ করিতে পারিবে না, এরূপ কল্পনা করা যায় না। হয়তো অন্যকেও সার্থক করিবে।

হেমনলিনীর দুঃখ অনেকটাই রমেশের সৃষ্ট। রমেশের দুঃখ ও আপাতব্যর্থতা তাহার নিজের সৃষ্টি। মেটারলিঙ্ক্ তাঁহার একটি লেখায় বলিয়াছেন, প্রজ্ঞাবান্ সাধুব্যক্তির সন্নিহিত দেশকালের সীমানায় কোনো ট্রাজেডি ঘটিতে পারে না। রমেশকে তো প্রজ্ঞাবান্ বলা যায় না— সে কখনোই আপন মনকে আপনি জানিতে পারে নাই, জানিতে চাহে নাই। অনুরাগ, আসক্তি, দ্বিধা, সংশয়— পরস্পরবিরুদ্ধ নানা ভাবের আন্দোলনে কেবলই কেন্দ্র হারাইয়া, সত্যের সাহস ও চারিত্রিক ঋজুতা হারাইয়া, অসহায়ের মতো ভাসিয়া গিয়াছে ঘটনাস্রোতে। কাহিনী উপস্থিত যেখানে শেষ হইল তাহার পরে সে যে সম্বিৎ পাইবে না, আপনাকে পাইবে না, সকল আঘাত সকল দুঃখ বৃথা হইবে, এ কথা কে বলিল ? এবং আপনাকে পাইলেই সব পাওয়া যাইবে।

কমলা-চরিত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের অন্য কয়েকটি চরিত্রসৃষ্টির তুলনা লোভনীয় সন্দেহ নাই। চোখের বালির বিনোদিনী ও আশা, ঘরে-বাইরের বিমলা, চতুরঙ্গের দামিনী, শেষের কবিতার লাবণ্য, সব শেষে, যোগাযোগের কুমু বা কুমুদিনী— এই কয়টি নাম রূপ চরিত্র স্বতঃই মনে ভাসিয়া উঠে। উপমান ও উপমেয়ে তুলনাটা পাঠকেরা নিজে নিজে সারিয়া লইবেন। কার্যকারী সম্পাদকের ভ্রূকুটিভয়ে এইখানেই ক্ষান্ত হওয়া গেল।

স্বরলিপি

আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি সেথায় চরণ পড়ে,
তোমার সেথায় চরণ পড়ে।
তাই তো আমার সকল পরান কাঁপছে ব্যথার ভরে গো,
কাঁপছে থরোথরে॥
ব্যথাপথের পথিক তুমি, চরণ চলে ব্যথা চুমি—
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার চিরদিনের তরে গো
চিরজীবন ধ'রে॥
নয়নজলের বন্যা দেখে ভয় করি নে আর,
আমি ভয় করি নে আর।
মরণ-টানে টেনে আমায় করিয়ে দেবে পার,
আমি তরব পারাবার।
ঝড়ের হাওয়া আকুল গানে বইছে আজি তোমার পানে—
ডুবিয়ে তরী ঝাঁপিয়ে পড়ি ঠেকব চরণ-'পরে,
আমি বাঁচব চরণ ধরে॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

সা সা II ন্‌া ন্‌া -া । ন্‌প্‌া ন্‌া -সা I সা -া রসা । ন্‌া সা -া I
আ মি হৃ দ ০ য়ে০ তে ০ প থ্‌ কে০ টে ছি ০

I সন্‌া সা -রজ্ঞা । জ্ঞরা জ্ঞা -া I রা রা -জ্ঞা । মা পা -ধপা I
সে থা ০য়্‌ চ০ র ণ্‌ প ড়ে ০ তো মা ০র্‌

I পমা মজ্ঞা -া । রা মজ্ঞা -রজ্ঞা I রা সা -া । -া -া -া I
সে থা০ য় চ র ০ণ্‌ প ড়ে ০ ০ ০ ০

I মা -পা পা । পা পা -া I পধা ধপা -মা । মগা মা -া I
তা ই তো আ মা র্‌ স০ ক ল্‌ প০ রা ন্‌

I মা -গপা ^পমা । জ্ঞরা জ্ঞা -া I রা রা -জ্ঞা । মা -পা -ধপা I
কাঁ ০প্ ছে ব্য০ থা র্ ভ রে ০ গো ০ ০০

I মা -পা ^পমা । জ্ঞরা মজ্ঞা -রজ্ঞা I রা সা -া । -া সা সা II
কাঁ প্ ছে থ০ রো০ ০০ থ রে ০ ০ "আ মি"

II {মা পা -া । পা পা -র্সা I র্সা র্সা -া । সর্না র্সা -া I
ব্য থা ০ প থে র্ প থি ক্ তু০ মি ০

I র্সর্রা ^র্র্সা -ণা । ণধা ণা -া I ধর্সা ^র্সণা -া । ধা পা (-ধা) }I-মা I
চ০ র ণ্ চ০ লে ০ ব্য০ থা ০ চু মি ০ ০

I ^পণা ণা -া । ধা ণা -া I ধর্সা ^র্সণা -া । ধা পা -া I
কাঁ দ ন্ দি য়ে ০ সা০ ধ ন্ আ মা র্

I পা পা -ধা । পা মা -গা I গা গা -মা । পা -দা -^দপা I
চি র ০ দি নে র্ ত রে ০ গো ০ ০

I মপা ^পমা -জ্ঞা । রা মজ্ঞা -রজ্ঞা I রা সা -া । -া সা ^রসা II
চি০ র ০ জী ব০ ০ন্ ধ রে ০ ০ "আ মি"

II {মা মা -পা । পা পা -ধা I পা -র্সা ^র্সণা । ধা পা -া I
ন য় ন্ জ লে র্ ব ন্ না দে খে ০

I পা -ধা ^ধপা । মগা মগা -রগা I মা -া -া । পদা পা -দপা I
ভ য়্ ক রি০ নে০ ০০ আ ০ র্ আ০ মি ০০

I মা -পা ^পমা । জ্ঞরা মজ্ঞা -রা I সা -া -া । -া -া -া I
ভ য়্ ক রি০ নে০ ০ আ ০ ০ ০ ০ র্

I সপা পা -া । পা পা -মা I পণা ণা -া । ণধা র্সণা -ধপা I
মং র ণ্ টা নে ॰ টেং নে ॰ আং মা ॰য়্

I পা ধা ধপা । মগা মগা -রগা I মা -া -া । পদা পা -দপা I
ক রি য়ে দে বেং ॰॰ পা ॰ র্ আং মি ॰॰

I মা -পা পমা । জ্ঞরা মজ্ঞা -রা I সা -া -া । -া -া -া } I
ত র্ ব পাং রাং ॰ বা ॰ ॰ ॰ ॰ র্

I { মা পা -া । পা পা -র্সা I র্সা র্সা -া । র্সনা র্রর্সা -া I
ঝ ড়ে র্ হাও য়া ॰ আ কু ল্ গাং নে ॰

I র্সা -নর্রা র্রর্সা । ণধা ণা -া I ধর্সা র্সণা -া । ধা পা (-ধা) }I-মাI
ব ॰ই ছে আং জি ॰ তোং মা র্ পা নে ॰ ॰

I পা ণা ণা । ণধা ণা -া I ধর্সা ণা ণা । ধা পা -া I
ডু বি য়ে ত রী ॰ ঝাঁং পি য়ে প ড়ি ॰

I পা -ধা ধপা । মগা মা -া I গা গা -মা । পদা পা -দপা I
ঠে ক্ ব চং র ণ্ প রে ॰ আং মি ॰॰

I মা -পা পমা । জ্ঞরা মজ্ঞা -রজ্ঞা I রা সা -া । -া সা রসা II II
বাঁ চ ব চ॰ র॰ ॰ণ্ ধ রে ॰ ॰ "আ মি"

এই সংখ্যার চিত্রাবলী

১৯৪৭ ও '৪৮ সালে শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু উড়িষ্যা প্রদেশের গোপালপুরে কিছুকাল বাস করেন। সেই সময়ে তিনি চীনা কালী তুলির রীতিতে, প্রধানতঃ কার্ডে, বহু শত চিত্র অঙ্কিত করেন। সেই সব চিত্রের বিষয় বিচিত্র; এক দিকে সেখানকার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চলচ্ছবি, যে অসংখ্য আকার ইঙ্গিত ভাব ও ভঙ্গীর প্রত্যেকটি প্রতি মুহূর্তে দেখিতে না দেখিতে মিলাইয়া যায়, ভোল বদলাইয়া আবার হয়তো দেখা দেয়, আবার মিলাইতে বিলম্ব করে না; আর-এক দিকে সেখানকার সমুদ্র, যাহা বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনার আনন্ত্যে 'জড়' প্রকৃতিতে অন্য-সকলকেই তো হার মানায়, হয়তো মনুষ্য-জীবনেরও প্রতিস্পর্ধী মনে হয়। শিল্পাচার্যের গোপালপুরের সেই-সব কাজ হইতে কয়েকটি বাছিয়া লইয়া বিশ্বভারতী পত্রিকার পূর্ববর্তী এক সংখ্যায় (মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬) প্রকাশ করা হইয়াছে, আর বর্তমান সংখ্যার ছবিগুলিও সেই চিত্রমালার অন্তর্গত। পূর্বোক্ত সংখ্যার আর এই সংখ্যারও মুখপাতের ছবি দুটি বড়ো আকারে চিত্ররচনার রীতিতে কতকটা পূর্বাপরভাবনা ও কল্পনার যোগে আঁকা হইয়াছিল। অন্য কার্ডে আঁকা ছবিগুলিকে স্কেচ বলিতে হয়, ছবি নয়, চলচ্ছবি; যে জীবন, যে রূপ কেবলই ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে বিলীয়মান মুহূর্তেই তাহার দ্রুত রূপায়ণ। এ ক্ষেত্রে আকার অপেক্ষা ইঙ্গিত বেশি, স্থিতির তুলনায় গতি ফুটিয়া উঠে। তবে, আচার্যের কাজ দেখিয়া বলিতে হয়, স্কেচেরও হয়তো প্রধান দুইটি রীতি এবং দুইটি জাতি আছে। পাশ্চাত্য শিল্পীরা কোনো বস্তু যখন দেখেন তখনই তাহার রূপ ধরিয়া লন; দেরি করেন না, স্মৃতির সাহায্য নেন না; কতকটা ছায়া-ধরা ক্যামেরারই মতো। ক্যামেরা জড় যন্ত্র বলিয়া তাহাতে যোগ-বিয়োগের অবকাশ অল্প; সত্য সাক্ষ্যের দিক দিয়া সে তো ধর্মপুত্রের অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। আর্টিস্টের মন-ক্যামেরায় সব-কিছু ধরা পড়িতে চায় না, আর্টিস্ট্-ভেদে, তাঁহার তৎকালীন রুচি বা মেজাজ -ভেদে অনেক 'অপ্রধান' বস্তু বাদ পড়ে, কিছু যে মনের মায়া যুক্ত হয় না তাহাও বলিতে পারি না। যখনকার তখন ছবি না আঁকিলে এরূপ বর্জন গ্রহণ এবং এরূপ মনের মায়া বুলাইয়া পুরাতনকে নূতন করিয়া তুলিবার সুযোগ তথা চেনা-অচেনার মালা-বদল ও চারি চোখের চাওয়া যাহাতে ঘটে সেই অবসর— অনায়াসেই ঘটিয়া থাকে এবং বেশি করিয়া ঘটে। আচার্য নন্দলাল যে-সব স্কেচ করেন তাহার বহুলাংশই এইরূপ অনতিদূর কালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা। তাহা কল্পিত না হইলেও কল্পনার একটি মণিদর্পণে প্রতিভাসিত, এরূপ বলা যায়। ঘরে বাহিরে যাহা দেখিয়াছেন তাহা হয়তো দিবা দ্বিপ্রহরে, হয়তো ভোর-রাত্রে লণ্ঠনের আলো জ্বালিয়া, যখন সব দিক নিস্তব্ধ এবং সকলেই নিদ্রিত, আপন-মনে একটার পর একটা কার্ড লইয়া আঁকিয়া চলিয়াছেন, আচার্যের সহিত শীতকালীন ক্যাম্পে বা প্রবাসে যাঁহারা বাস করিয়াছেন তাঁহাদেরই এরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। ইংরেজ কবি বলিয়াছেন, আবেগ অনুভূতি থিতাইয়া কবিতা হয়; দেখা যাইতেছে ছবি হওয়ার রীতিও ভিন্ন নয়।

বিশ্বভারতী পত্রিকার পরবর্তী কয়েক সংখ্যায় শিল্পাচার্যের আঁকা আরও কতকগুলি কালী তুলির কাজ প্রকাশিত হইবে। এগুলি করণকৌশলের দিক দিয়া যেমন এ দেশে অল্পপরিচিত, বিষয়ের দিক দিয়া তেমনি একেবারেই নূতন।

কানাই সামন্ত

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক-পৌষ ১৩৫৮

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে লিখিত

শান্তিনিকেতন
বোলপুর
১২ই ফাল্গুন ১৩০৮

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনাকে পঞ্চভূত পাঠাইবার পরে আপনার *Intellectual Ideal* বইখানি পড়িয়া শেষ করিয়াছি। পড়িয়া আপনার প্রতি যেমন কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছি তেমনি লজ্জা বোধ করিলাম। পঞ্চভূতে আমি নানাবিধ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, অথচ সে সকল কথা বলিবার কোন অধিকার লাভ করি নাই। যখন যাহা মনে হইয়াছে তাহাই বকিয়া গেছি— সত্য আহরণ করিবার যে মূল্য তাহা দিই নাই। আপনার বই পড়িয়া মনে হইতে লাগিল পঞ্চভূত এতক্ষণে হয়ত আপনার কাছে বিস্তর জ্যাঠামি করিতেছে— সে জ্যাঠামির শূন্য প্রগল্‌ভতা আপনার দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে না। আমি নিজের সেই লজ্জা প্রকাশ করিয়া আপনার কাছে চিঠি লিখিতে যাইতেছিলাম এমন সময় আপনার পত্র পাইলাম।

আপনার বইখানি আমাকে অত্যন্ত সুগভীরভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। আপনি যদি কেবল দার্শনিকের মত লিখিতেন তবে আমি আনন্দ ও শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতাম কারণ দর্শনশাস্ত্রে আমি অনভিজ্ঞ। জ্ঞানের কথাকে আপনি কল্পনার দ্বারা দীপ্যমান করিয়া তুলিয়াছেন। আপনি যে বেদান্তের মধ্যে কেবল পথ করিয়া চলিয়াছেন তাহা নহে, প্রদীপও ধরিয়াছেন। শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে কঠোর তপস্যা চাই তাহাও আপনার আছে এবং সেই শাস্ত্রকে নিজের করিয়া লইবার যে সহজ প্রতিভা তাহারও অভাব আপনাতে নাই, এবং যাহা লাভ করিলেন তাহাকে আলোকের ন্যায় বিকীর্ণ করিবার শক্তিও আপনি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আপনার সঙ্গ আমার কাছে বড় লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, আমি অলসবুদ্ধি লোক; আমি লাভ করিতে চাই কিন্তু উপার্জন করিবার শক্তি আমার নাই। আপনাদিগকে কোন সুযোগে নিকটবর্তী করিতে পারিলে মশাল হইতে মশাল জ্বালার ন্যায় জ্ঞানকে হয়ত একদমে আহরণ করিবার উপায় লাভ করি— আপনারা যেমন করিয়া চিন্তা করেন সেটা আমার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে।

শুভদৈবক্রমে মোহিতবাবুর সহিত আমার আলাপ হইয়াছে— আলাপের চেয়ে অনেক বেশি হইয়াছে বলিতে পারি। তিনি আমাকে আপনাদের সকলের দিকেই আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার

সহিত সম্বন্ধেই আপনাদের সকলের সহিত আমার সম্বন্ধ হইয়াছে— সেই সম্বন্ধ পাকা করিবার জন্য আমি সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলাম। আপনাদিগকে আমার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে ভাবুকশ্রেণী বিরল— জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের সঙ্গে একেবারে নাড়ীর সম্পর্ক এমন লোক অল্প বলিয়া আমার মানসপ্রকৃতি যেন ক্ষুধিত হইয়া থাকে। ভাবকে মানুষের মধ্য হইতে গতিবিশিষ্ট সজীব প্রত্যক্ষ আকারে গ্রহণ করিবার যে ক্ষুধা তাহা বাতি জ্বালিয়া কোণে বসিয়া লাইব্রেরির মধ্যে নিজেকে জীর্ণ করিয়া কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। বাহিরের প্রকৃতি হইতে যেমন অব্যবহিত নিগূঢ়ভাবে আনন্দ পাই তেমনি মানুষের মনের অব্যবহিত সংস্পর্শ হইতে জ্ঞান ও ভাব সহজে লাভ করিবার জন্য আমার পিপাসা। আমি অধ্যয়নপরায়ণ তপস্বী সম্প্রদায়ভুক্ত নহি। আপনার গ্রন্থের মধ্যে আপনি নিজেকে বর্ত্তমান রাখিয়াছেন বলিয়া, ইহার মধ্যে আপনার মানবহৃদয়ের সংশ্রব পাইয়াছি বলিয়া এই গ্রন্থ হইতে এত উপকার পাইলাম। মাঝে মাঝে দয়া করিয়া আপনারা আমার নিকটে আসিবেন এবং আমার সঙ্গে কথা কহিবেন। অত্যন্ত লুব্ধ ক্ষুধিতের মত আমি আপনাদিগকে চাহিতেছি— আপনাদের দ্বারা আমার এই শান্তিনিকেতনের নিভৃত উদার প্রান্তরকে সজীব ও শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত-অনাময় সমীরণের মধ্যে রসহিল্লোল সমীরিত করিতে ইচ্ছা করিতেছি। নব্যভারতের তপোবন আপনারা রচনা করিবেন সেখানে নব্যভারতের নবীন ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র উচ্চারিত ও নবীন দ্বৈপায়নের নবমহাভারত গীত হইবে— সেখানে সকল প্রকার চিত্তবিক্ষেপবিহীন উদার শান্তির মধ্যে তপস্যা ও প্রতিভা সৌন্দর্য্যে সম্মিলিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখী হোমশিখার ন্যায় অনন্তের অভিমুখে উচ্ছ্বসিত হইবে।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি পড়ে মনে হল একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে মিল্‌চে। নিজেকে বাইরে এনে দান করবার জন্যে আমার একটিমাত্র বড় দরজা আছে সেটি হচ্চে লেখা— আর কিছুতে আমি যেন নিজেকে প্রকাশ করতে পারিনে। অনেকে সেটাতে আমার অহঙ্কারের লক্ষণ কল্পনা করেন, কিন্তু অন্তর্যামী জানেন সেটা আমার দীনতা, অক্ষমতা। আমাকে আকর্ষণ করে বাইরে টেনে নেবার জন্যে আমি আমার বন্ধুদের প্রতিই সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকি— নিজেকে বাইরে প্রয়োগ করতে পারিনে। আমার এক এক সময় সন্দেহ হয় বিধাতা যাকে লেখক পদে নিযুক্ত করেন, কেবল তার কল্পনা এবং রচনার জানালা দুটো খুলে রেখে দিয়ে তার বাইরে বেরবার আর সমস্ত দরজাগুলো বন্ধ করে দেন। তাকে দায়ে পড়ে লিখ্‌তেই হয়— তার সকলপ্রকার হৃদয়বন্ধনে বাধা— অন্তর অন্তঃপুরের লোহার গরাদেগুলো পার হবার শক্তি তার নেই— কেবল তার কল্পনা এবং ভাষা এবং দৃষ্টি উন্মুক্ত। মানুষের সহবাস তার একান্ত কামনার সামগ্রী, লোকালয় তার ব্যগ্র কল্পনাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে জনসঙ্গ ভোগ করা থেকে সে বঞ্চিত। শিকারী-কুকুরকে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় রেখে দিতে হয় লেখকদেরও বোধ হয় সম্পূর্ণ

ক্ষুধাতৃপ্তি বিধির বিধান নয়। আপনি যে আশঙ্কা প্রকাশ করেচেন নিজের সম্বন্ধে আমারও সেই আশঙ্কা। আমার ভয় হয় কাছে এলে পাছে আমার পরিচয় না পান— পাছে আমাকে সুদূরবর্ত্তী বলে মনে করেন। আমার বোধ হয় নিজের মনটাকে যদি কোথাও তুলে রেখে আস্‌তে পারি তাহলেই সকল লোকেরই পাশে অত্যন্ত সহজভাবে স্থান গ্রহণ করা যায়। বিশেষ কিছু আশা না করে কল্পনা না করে ব্যক্ত করবার চেষ্টা না করে কেবলমাত্র সঙ্গ দেওয়া এবং নেওয়া, এ একটা ক্ষমতা।—এই অতি সহজ জিনিষটি মনে করলেই পাওয়া যায় না। কিন্তু আপনি আমাকে ভয় করবেন না— আমি আপনার কাছে কিছুমাত্র দাবী করব না— আপনি নিতান্ত চুপ করে থাকলেও আমি আপনার কথা শুনতে পাব— আপনি নিশ্চেষ্ট থাকলেও আমি আপনাকে গ্রহণ করতে পারব। আমাদের পরস্পরে দেখা শুনার অবকাশ বোধ হয় বেশি না হতে পারে কিন্তু আপনি আর আমার অগোচরে থাক্‌তে পারবেন না। মোহিতবাবুকেও আমি অল্পদিনমাত্র দেখেছি এবং ঘন ঘন তাঁকে দেখাও সম্ভব না হতে পারে কিন্তু আমার চিত্ত তাঁকে চিহ্নিত করে নিয়েছে— এখন আমি নিশ্চিন্ত। জানিনে তিনি কি রকম করে আমাকে আপনাদের পংক্তির মধ্যে বসিয়ে দিয়েছেন— এখন আমি আপনাদের আমার পার্শ্বে সমাগত দেখে আর কিছুমাত্র বিস্মিত হচ্চিনে। এখন আপনাদের সঙ্গে আমার যে সকল পার্থক্য আছে তাতে ঐক্যের কোন ব্যাঘাত করচেনা বরঞ্চ সেই ঐক্যের আনন্দকে আরো সংঘাতের দ্বারা নিবিড়তর করে দিচ্চে। অতএব আপনি এক কাজ করবেন— আমাকে বিশেষ কিছু মনে করবেন না, আমাকে আপনাদের পুরাতনের মধ্যে গণ্য করে নেবেন, নূতন কিছুরই প্রত্যাশা করবেন না। যদি আমাকে হাৎড়ে বেড়ান তবেই আমার ভয় হবে কি জানি আপনার হাতে কি ঠেকবে। কিন্তু যদি আমাকে নিতান্তই সহজভাবে গ্রহণ করেন তবেই আপনাদের প্রীতিতে আমি নিজেকে পরিপূর্ণতর জ্ঞান করব। ইতি ২৮শে ফাল্গুন ১৩০৮

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

জোড়াসাঁকো

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকপদ পরিত্যাগ করিয়াছি। তথাপি আপনার প্রেরিত প্রবন্ধটি আপনার পত্রসহ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আমি শৈলেশকে বলিয়াছি প্রবন্ধটি বিশেষ সমাদরযোগ্য হইয়াছে এবং আমার মতের সঙ্গে ইহার কোনো অনৈক্য নাই। আমি বিরোধ ও বিদ্বেষপরবশ জাতীয় ভাবের পক্ষপাতী নই—আমি বিধাতার নির্দিষ্ট স্বাভাবিক অধিকার ও অনুরাগমূলক জাতীয় ভাবের সমর্থন করিয়া থাকি। প্রত্যেক জাতির বিশেষত্ব সমস্ত মানবের সম্পত্তি— এই জন্যই গৌরবের সহিত সেই বিশেষত্বকে উজ্জ্বল করিয়া তোলা আবশ্যক। উজ্জ্বল করিতে গেলে সঙ্কীর্ণতাই যে তাহার সহায়তা করে তাহা নহে ঔদার্য্যের প্রয়োজন— কিন্তু ঔদার্য্যের নামধারী সঙ্কীর্ণতা যাহা নিকটের প্রতি অন্ধ ও অসাড় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্‌জনক। বরঞ্চ যেখানে অনুরাগের গতি স্বাভাবিক সেখানে পক্ষপাত মার্জনীয়—

কারণ সে পক্ষপাতে অনিষ্ট করিলেও আনুকূল্য করে এবং এই পক্ষপাতের ইষ্টীমে জগতের অনেক কাজ অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু অনুরাগের স্বাভাবিক ক্ষেত্রেই অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা যত অনিষ্টকর এমন আর কিছু নয়। কারণ, এই ক্ষেত্রই আমাদের কর্মক্ষেত্র— আমাদের যথার্থ উপযোগিতা এই ক্ষেত্রেই। যদি স্বদেশ-পক্ষপাতের প্রতি বেশি ঝোঁক দিয়া কিছু লিখিয়া থাকি তবে এই স্বাভাবিক মমত্বের অপরাধ মার্জনা করিবেন— কিন্তু বিদেশ-বিদ্বেষকে আমি শ্রেয়স্কর বলিয়া জ্ঞান করি না। আমরা কি, আমরা কিসের উপযুক্ত, আমরা কোন্ পথে গেলে জগতের মধ্যে সার্থক হইব দেশকে ভালবাসিয়া ইহাই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। যদি ভুল বুঝিতেও থাকি তবে ভালবাসার গুণে মার্জনার অধিকারী হইব। ইতি ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের নাম এখন একরূপ বিস্মৃত, কিন্তু একদা তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্য ও চরিত্রগুণে কলিকাতার সুধীমণ্ডলীর সুগভীর শ্রদ্ধা ও ছাত্রসমাজের ঐকান্তিক প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন— ১৯১৩ সালে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তিনি যখন পরলোকগমন করেন তখন দেশের প্রধানবর্গ একবাক্যে সেই শ্রদ্ধার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশন বক্তৃতা, ১৯১৪; গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; আশুতোষ চৌধুরী, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে বিনয়েন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি-প্রতিষ্ঠাকালে; দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী; সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ)। লর্ড রোনাল্ডসে তাঁহার THE HEART OF ARYAVARTA গ্রন্থে, এই পত্রাবলীতে উল্লিখিত বিনয়েন্দ্রনাথের THE INTELLECTUAL IDEAL পুস্তকের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ১৯০৫ সালে জেনীভাতে অনুষ্ঠিত একেশ্বরবাদী-সম্মেলনে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে যোগ দান উপলক্ষ্যে তিনি যখন ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন তখন বিদেশে তিনি যেসকল ধর্মপ্রবক্তা ও পণ্ডিতবর্গের সংস্পর্শে আসেন তাঁহারাও তাঁহার গভীর ধর্মচেতনা পাণ্ডিত্য ও চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নববিধান ট্রাস্ট তাঁহার LECTURES AND ESSAYS—Literary, Theological ও Sermons এই তিন খণ্ডে সংকলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, 'আরতি' 'গীতা অধ্যয়ন' নামে তাঁহার দুইখানি বাংলা পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের সহিত বিনয়েন্দ্রনাথের স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত। ১৮৯৫ সাল হইতে সিনিয়র সদস্যরূপে তিনি ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন, ১৯০০ সালে তিনি ইহার সহকারী সম্পাদক ও ১৯০৬ সালে সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার পরিচালনাকালে ইনস্টিট্যুট সকল দিক দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল; তাঁহার উদ্যোগে ইহার স্থায়ী বাড়ি হয়; মৃত্যুশয্যায় তিনি এই উপলক্ষ্যে গবর্মেন্টের দুই লক্ষ টাকা দানের কথা শুনিয়া গিয়াছেন। দরিদ্র ছাত্রভাণ্ডার তাঁহারই চেষ্টায় পুষ্টিলাভ করে। বহু দিকে ইনস্টিট্যুটের কর্তব্যসূচী বিস্তারিত করিয়া তিনি ইহাকে ছাত্রসমাজের একটি প্রধান প্রাণ-কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিলেন; নানা বিষয়ে এখানে বহু বক্তৃতা দিয়া তিনি ছাত্রদিগকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার যে যোগ হইয়াছিল বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত পত্রাবলীতে তাহার কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ রহিল। একই ধর্মসাধকগোষ্ঠীভুক্ত প্রমথলাল সেন (বিলাতে ইঁহার ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রদেনস্টাইনের আলোচনা হয়, এবং রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে আসিতে অনুরোধ করিয়া ইঁহারা পত্র লেখেন), মোহিতচন্দ্র সেন (রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের সম্পাদক, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ) প্রভৃতির ন্যায় তিনি কবির একান্ত অনুরাগী ছিলেন; য়ুরোপ ভ্রমণের সঙ্গীরূপে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ লন নাই দেখিয়া অবিলম্বে তাহা পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেছেন তাঁহার চিঠিপত্রে এ কথার উল্লেখ দেখি। ব্রাহ্মসমাজের কাজেও রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ঘটিয়াছিল; ১৮৯৬ সালে ভারতবন্ধু জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড যখন ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়শনের প্রতিনিধিরূপে ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁহার প্রস্তাবক্রমে, ঐ অ্যাসোসিয়শনের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধি লইয়া যে ব্রাহ্মসমাজ কমিটি গঠিত হইয়া দীর্ঘকাল কাজ করিয়াছিল রবীন্দ্রনাথ ও বিনয়েন্দ্রনাথ উভয়েই তাহার সদস্য ছিলেন; ১৯১১ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজ তত্ত্ববোধিনী সভা প্রভৃতি পুনঃ সংগঠন করিতে ব্রতী হন তখন এই উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধি লইয়া যে একটি সমিতি গঠিত হয় বিনয়েন্দ্রনাথ তাহার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ তারিখের পত্রে উল্লিখিত বিনয়েন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, ১৩১৩ আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গদর্শনে 'বর্তমান যুগের স্বাধীন চিন্তা' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। শৈলেশ=শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সহকারী সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথের পদত্যাগের পরে সম্পাদক। মোহিত=মোহিতচন্দ্র সেন।

বাঙলা বৈষ্ণব-সাহিত্য ও হিন্দী বৈষ্ণব-সাহিত্য

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতা এবং বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতা একই দার্শনিক ধারা এবং সাহিত্যিক ধারা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, তথাপি উভয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের ভিতরে বেশ কতগুলি পার্থক্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে। হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণ (আমরা এখানে প্রধানতঃ বল্লভী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অষ্টছাপ বৈষ্ণব কবিগণের কথাই বলিতেছি) মুখ্যভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণলীলাকেই অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু বাঙলাদেশে আমরা রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া নিরন্তর লীলাবিস্তার দেখিতে পাইতেছি। এই লীলা-উপাখ্যানের উৎপত্তি ও বিস্তার প্রথমাবধিই কবি-কল্পনায়। প্রত্যেক যুগের কবি-কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া লীলা-উপাখ্যান নিত্যনূতন শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, মানুষের এক প্রেমকে নিত্যনূতন অবস্থানের ভিতর দিয়া আমরা নূতন করিয়া লই। সকল বৈষ্ণব কবিগণকেই গোপী-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, এবং মুখ্যভাবে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, লইয়াই গীত রচনা করিতে হইয়াছে। এই এক রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকে বিচিত্র করিয়া না লইতে পারিলে তাহাকে লইয়া নিত্যনূতন কাব্য-কবিতা রচনা করা সম্ভব নহে; এই জন্য বিভিন্ন যুগের কবিগণকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে লইয়া দেশোচিত ও যুগোচিত বিচিত্র অবস্থান সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে।

বাঙলাদেশের বৈষ্ণব কবিতার ভিতরে আমরা রাধা-কৃষ্ণলীলার যত উপখ্যান-প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিতে পারি, হিন্দী কবিতার ভিতরে আমরা সেরূপ প্রাচুর্য দেখিতে পাই না। ইহার প্রধান কারণ এই, মধ্যযুগে হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতা যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা অধিকাংশই ছিলেন বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত, নিম্বার্কাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াও কেহ কেহ কথিত হন। এই উভয় সম্প্রদায়ের ভিতরেই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার সহিত শ্রীরাধার উপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাঙলার চৈতন্য-সম্প্রদায়ের ভিতরে এই যুগল-উপাসনা এবং তাহার সঙ্গে লীলাবাদকে যেরূপ সমস্ত সাধ্য-সাধনের মূলীভূত তত্ত্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে বা বল্লভী সম্প্রদায়ের ভিতরে যুগল-লীলাবাদের উপরে এতখানি প্রাধান্য আমরা দেখিতে পাই না। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে জয়দেব চণ্ডীদাস প্রভৃতির কবিতায় এবং পুরবীয় কবি বিদ্যাপতির কবিতায় আমরা লীলাবাদের প্রধান্য এবং বিচিত্র বিস্তার লক্ষ্য করিতে পারি; কিন্তু মধ্যযুগের হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতায়— বিশেষ করিয়া অষ্টছাপের সুপ্রসিদ্ধ কবিতায়— আমরা শ্রীকৃষ্ণের লীলার উপরে যেটুকু জোর দেখিতে পাই তাহা সবটুকুই কান্তাপ্রেমের উপরে নহে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতির উপরেও সমভাবেই জোর দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দী বৈষ্ণব-কবিগণের মধ্যে রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের কবিগণ ব্যতীত আর অষ্টছাপের কবিগণের প্রায় সমকালবর্তী উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব-কবি হইলেন মীরাবাঈ। মীরাবাঈ সম্বন্ধে যেসকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহাতে দেখিতে পাই, বৃন্দাবনবাসী কোনো কোনো গৌড়ীয় গোস্বামীর (রূপ গোস্বামী? জীব গোস্বামী?) সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাবের আদানপ্রদান হইয়াছিল। কিন্তু

মীরাবাঈএর কবিতা এবং তাহার ভিতর দিয়া যে প্রেমধর্মের প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ন্যায় কোনো অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের যুগল-লীলাবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। মীরাবাঈ কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের অন্তর্ভুক্ত ভক্ত বা কবি ছিলেন না, স্বাধীনভাবেই তিনি তাঁহার 'পিতমে'র গান করিয়াছেন। মীরাবাঈএর নামে যত গান প্রচলিত রহিয়াছে তাহার ভিতরে রাধার উল্লেখ খুবই কম রহিয়াছে। দুই-একটি পদে মাত্র রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়— দু-একটি পদে রাধার অভাস রহিয়াছে। যেখানে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানেও রাধা-কৃষ্ণ-লীলা-আস্বাদনের কোনো প্রশ্ন নাই— শুধু গিরিধরলাল গোপাল-কৃষ্ণের বিবিধ লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গেই রাধার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—

আলী ম্হাঁনে লাগে বৃন্দাবন নীকো। · ·
কুংজন কুংজন ফিরত রাধিকা সবদ সুনত মুরলী কো।
মীরাকে প্রভু গিরধর-নাগর ভজন বিনা নর ফীকো॥

'সখী, আমার লাগে বৃন্দাবন ভালো। · ·কুঞ্জে কুঞ্জে ফেরে রাধিকা, শব্দ শুনে মুরলীর। মীরার প্রভু গিরিধর নাগর, (তাঁহার) ভজন বিনা মানুষ ফিকা (মলিন, রসহীন)।'

অথবা,—

হমরো প্রণাম বাঁকে বিহারী কো। · ·
অধর মধুর পর বংশী বজাবৈ রীঝ রীঝাবৈ রাধা প্যারী কো।
ইহ ছবি দেখ মগন ভঈ মীরাঁ মোহন গিরবরধারী কো॥

'আমার প্রণাম বাঁকা বিহারীকে। · ·মধুর অধরে বাঁশী বাজায়, রাধা প্যারীর হৃদয় করে মোহিত; মোহন গিরিবরধারীর এই শোভা দেখিয়া মগ্ন হইয়া গেল মীরা।'

দুই-একটি পদ রহিয়াছে যেখানে মীরা রাধার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ করে নাই, শুধু আপনার প্রেম-বিহ্বলতাই বর্ণনা করিয়াছে, কিন্তু মীরার নিজের সেই প্রেমবিহ্বলতা প্রকাশের ভিতরেই শ্রীরাধার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন—

নৈনা লোভী রে বহুরি সকে নহিঁ আয়।
রোম রোম নখশিখ সব নিরখত, ললচ রহে ললচায়॥
মৈঁ ঠাঢ়ী গৃহ আপণে রে, মোহন নিকসে আয়।
সারংগ ওট তজে কুল অংকুস, বদন দিয়ে মুসকায়॥
লোক কুটুম্বী বরজ বরজহী, বতিয়াঁ কহত বনায়।
চংচল চপল অটক নহিঁ মানত, পর হাথ গয়ে বিকায়॥
ভলী কহো কোই বুরী কহে মৈঁ, সব লই সীস চঢ়ায়।
মীরা কহে প্রভু গিরধরকে বিন, বল ভর রহ্যো ন জায়॥

'নয়ন দু'টি লোভী, আর ফিরিয়া আসিতে পারিল না। সর্বদেহ, নখ হইতে শিখ পর্যন্ত সব, নিরখিয়া লালসা আরও লুব্ধ হইয়া রহে। আমি দাঁড়াইয়া থাকি আপনার ঘরে, মোহন আসে বাহির হইয়া; চোখের আবরণ দূর করিয়া ত্যাগ করে (উপেক্ষা করে) কুলের অঙ্কুশ, বদন নিল মৃদু হাসিয়া। লোক-কুটুম্ব সবাই করে বারণই বারণ— বানাইয়া বলে কত কথা; চঞ্চল চপল (মন) মানে না কোনো

বাধা— পরের হাতেই গেল বিকাইয়া। কেহ কহে ভালো, কেহ কহে মন্দ, সব লই আমি মাথায় তুলিয়া; মীরা কহে, প্রভু গিরিধর বিনা এক মুহূর্তের জন্যও থাকা যায় না।'

ইহার ভিতরে মীরার প্রেম ও তাহার অভিব্যক্তি স্বতঃই আমাদিগকে অন্য বৈষ্ণব-কবিগণ বর্ণিত রাধা-প্রেমের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দিবে। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই, মীরা নিজেই এখানে রাধার স্থান অধিকার করিয়া আছে, রাধার অনুরূপভাবেই হইল মীরার প্রেমসাধনা। এই জিনিসটি আমরা বাঙলাদেশের বৈষ্ণব-কবিতায় কোথায়ও পাইব না। বাঙলার বৈষ্ণব-কবিগণ সকলেই প্রথমে ধামতত্ত্বের সাধনা করিয়া, অর্থাৎ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে ভগবানের পরিকরত্ব লাভ করিয়া, একটু দূর হইতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা আস্বাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, রাধার ভাব কেহই অবলম্বন করিতে চাহেন নাই। জীবে কখনও রাধাভাব সম্ভবে না; রাধিকার সখী বা মঞ্জরীগণের অনুগাভাবে সাধন করিয়া নিত্যযুগললীলা আস্বাদন করাই ছিল বাঙলা বৈষ্ণব-কবিগণের সাধ্যসার: 'রাগাত্মিক' প্রেম নিত্যপরিকরদের পক্ষেই সম্ভব — জীবের সাধ্যসীমা হইল 'রাগানুগ' প্রেম। বাঙলার সকল বৈষ্ণবকবিগণ বিধিপূর্বক দীক্ষিত বৈষ্ণব না হইলেও এই বৈষ্ণব ধর্মাদর্শের দ্বারা বাঙলাদেশের বৈষ্ণব-কাব্যাদর্শ সাধারণভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। এই জন্যই উপরে মীরাবাঈএর যে-জাতীয় কবিতা দেখিতে পাইলাম, এই জাতীয় কবিতা আমরা বাঙলায় দেখিতে পাই না। মীরাবাঈএর ক্ষেত্রে কিন্তু এই জাতীয় কবিতাতেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

মীরার একটি পদে দেখি—

সখী মোরী নীঁদ নসানী হো।
পিয়া কো পংথ নিহারতে, সব রৈণ বিহানী হো ॥
সখিয়ন মিলকে সীখ দই, মন এক ন মানী হো।
বিন দেখে কল ন পড়ে, জিয় ঐসী ঠানী হো ॥
অংগন ছীন ব্যাকুল ভঈ, মুখ পিয় পিয় বাণী হো।
অন্তর বেদন বিরহকী বহ পীর ন জানী হো ॥
জ্যোঁ চাতক ঘন কো রটৈ, মছরী জিমি পানী হো।
মীরা ব্যাকুল বিরহিণী, সুধবুধ বিসরাণী হো ॥

'সখী, আমার ঘুম গেল নষ্ট হইয়া; প্রিয়ের পথ চাহিতে চাহিতে সব রাত্রি গেল প্রভাত হইয়া। সখীরা সকলে মিলিয়া (কত) দিল শিখাইয়া, মন তো তাহার একটিও মানিতেছে না; তাহাকে দেখা বিনা সোয়াস্তি নাই, মন (জীবন) আছে এইভাবেই স্থির হইয়া। অঙ্গ-সকল হইল ক্ষীণ এবং ব্যাকুল, মুখে শুধু 'পিয় পিয়' বাণী; অন্তরে বেদনা বিরহের, উহা তো জানে না কোনো দরদী। চাতক যেমন চায় মেঘকে, মাছ যেমন চায় জল, মীরাও হইয়াছে ব্যাকুল বিরহিণী, সে হারাইয়া ফেলিয়াছে সব বিচারবুদ্ধি।'

মীরাবাঈএর রচিত এই জাতীয় বৈষ্ণব-কবিতার ধরনের সহিত দক্ষিণদেশীয় আলওয়ার সম্প্রদায়ের কবিতার ধরনের বেশ মিল পাওয়া যায়। এই আলওয়ার সম্প্রদায়ের ভক্তগণ নিজেদের নায়িকাভাবে ভাবিত করিয়া বিষ্ণুকে নায়কভাবে গ্রহণ করিয়া মধুররসাশ্রিত কবিতা রচনা করিয়াছেন। সেখানেও বিরহের আর্তি এবং মিলনের জন্য ব্যাকুল বাসনা বিচিত্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই আলওয়ারগণের ভিতরে নম্ম-আলওয়ালের কন্যা অণ্ডালের সহিত মীরাবাঈএর জীবন ও প্রেমসাধনার আশ্চর্য মিল দেখিতে

পাওয়া যায়। অণ্ডালও রঙ্গনাথকেই জীবনসর্বস্বরূপে গ্রহণ করিয়া রঙ্গনাথের মন্দিরেই বাস করিতেন; রঙ্গনাথকে প্রিয় লাভ করিয়া তিনিও আর বিবাহের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই অণ্ডাল গোপীভাবে রঙ্গনাথ সম্বন্ধে অনেক কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে হিন্দী কবিতা রচনাকারী কবিগণের মধ্যে অষ্টছাপের আটজন কবিই হইলেন প্রসিদ্ধ। এই অষ্টছাপের আটজন কবি ছিলেন— সুরদাস, কুম্ভনদাস, পরমানন্দ দাস, কৃষ্ণদাস, গোবিন্দস্বামী, নন্দদাস, ছীতস্বামী ও চতুর্ভুজ দাস। এইসকল কবি বল্লভাচার্যের 'পুষ্টিমার্গ' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পুষ্টিমার্গের প্রবর্তক শ্রীবল্লভাচার্য গোপালকৃষ্ণের উপাসনাকে তাঁহার ধর্মসাধনায় গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বালরূপের উপরেই জোর দিয়াছেন; এই জন্য তাঁহার আলোচনায় কোথাও রাধাবাদের সম্বন্ধে কোনো আলোচনা নাই। এই সম্প্রদায়ের ভিতরে এই রাধাবাদকে বল্লভাচার্যের পুত্র আচার্য বিট্ঠলনাথই প্রবর্তিত করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়। 'স্বামিন্যষ্টক' এবং 'স্বামিনী-স্তোত্র' নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ বিট্ঠলনাথ কর্তৃক লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; এই দুই গ্রন্থে রাধা-সম্বন্ধীয় স্তোত্র পাওয়া যায়। বিট্ঠলনাথ কোনো বিশেষ ভক্তি-সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়া রাধাবাদকে নিজেদের ধর্মমতে গ্রহণ করিয়াছেন কি না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে; তবে তাঁহার সময়ই যে রাধা-কৃষ্ণের লীলার প্রচলন পুষ্টিমার্গের ভিতরে ঘটিয়াছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বল্লভী-সম্প্রদায়ের ধর্মমতে, তথা সাহিত্যে, রাধা-কৃষ্ণলীলা প্রচলনের ভিতরে চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁহার ভক্ত বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীগণের যথেষ্ট প্রভাব থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে। স্বয়ং বল্লভাচার্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক; বৃন্দাবনে এতদুভয়ের সাক্ষাৎ হওয়া এবং ভাবের আদানপ্রদান হওয়ার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি 'নিজবার্তা' 'বল্লভ-দিগ্বিজয়' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানা যায়। এইসকল গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে বল্লভাচার্যের চৈতন্যদেবের প্রতি এবং তাঁহার অনুগামী বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ছিল। একই ভক্ত চৈতন্য-সম্প্রদায় এবং বল্লভ-সম্প্রদায় এই উভয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে।

এইসকল তথ্য আলোচনা করিলে মনে হয়, বল্লভাচার্য নিজে বালকৃষ্ণের উপাসনার কথাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং এই কারণেই আমরা অষ্টছাপ হিন্দী-সাহিত্যে বাৎসল্য-রসের এমন সমৃদ্ধি দেখিতে পাই। কিন্তু খানিকটা পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ কবি জয়দেব-বিদ্যাপতির কাব্য-প্রভাবে এবং কিছুটা চৈতন্য-সম্প্রদায়ের প্রভাবে হিন্দী অষ্টছাপ সাহিত্যেও যুগল-লীলা ও তৎসহ শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এ-স্থলেও একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। অষ্টছাপের পূর্ববর্তী কবি জয়দেব-বিদ্যাপতির রাধা পরকীয়া, এবং তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে আমরা সর্বদাই পরকীয়া প্রেমলীলার বর্ণনা দেখিতে পাই। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মত ঠিক স্বকীয়াবাদ কি পরকীয়াবাদ ছিল ইহা লইয়া বিতর্কের অবসর থাকিলেও চৈতন্যযুগের বাঙলা বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই অন্ততঃ প্রকটলীলায় পরকীয়া লীলারই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু বল্লভী-সম্প্রদায়ের ভিতরে, তথা অষ্টছাপ কবিসম্প্রদায়ের কাব্য-কবিতায়, কোথাও পরকীয়াবাদের প্রতিষ্ঠা দেখি না, রাধা এখানে সর্বত্রই স্বকীয়া বলিয়া স্বীকৃতা।

বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতা ও হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতা পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলে উভয়ের ভিতরে কতগুলি পার্থক্য অতি সহজেই চোখে পড়ে। প্রথমতঃ আদি যুগ হইতেই মধুর রসকেই শ্রেষ্ঠ রস

বলিয়া বাঙলা দেশে গ্রহণ করা হইয়াছে; ফলে শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্যের পদ বাঙলায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম। হিন্দী কবিতায় শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াও শান্ত ও দাস্য রসাশ্রিত সাধারণ ভক্তি ও প্রপত্তিমূলক কবিতা প্রচুর পাওয়া যায়; কিন্তু বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতায় এ-জাতীয় পদ খুব কম। বাঙলায় সাধারণ ভক্তিমূলক, আত্মসমর্পণমূলক যত কবিতা রচিত হইয়াছে তাহা কৃষ্ণকে লইয়া খুব কম, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে লইয়াই বেশী। গৌরাঙ্গ বিষয়ক এই পদের সংখ্যা অবশ্য একেবারে কম নয়। মধুর রসের ভিতরে আমাদের বাঙলা সাহিত্যে যুগল-লীলার প্রাধান্য হেতু কান্তাপ্রেমের পদই হইল সর্বাপেক্ষা অধিক। এই কান্তাপ্রেমের পদ আবার গোপীগণকে লইয়া নয়, কৃষ্ণ যেরূপ 'কান্তশিরোমণি', রাধিকা আবার সেইরূপ 'কান্তাশিরোমণি' হওয়াতে এই কান্তাপ্রেমের পদ প্রায় সবই হইল রাধিকাকে লইয়া। বাঙলায় বাৎসল্য-রসের ভালো ভালো পদ কিছু কিছু থাকিলেও হিন্দী বাৎসল্য-রসের পদের তুলনায় অনেক কম। বাৎসল্য-রসের পদেই হিন্দীর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি সুরদাসের বৈশিষ্ট্য। হিন্দীতে আবার কান্তাপ্রেমের পদও রাধাকে লইয়া বেশী নয়, বেশীই হইল গোপীগণকে লইয়া। সুরদাসের এই জাতীয় পদগুলির ভিতরে প্রসিদ্ধতম পদ হইল 'উদ্ধব-সংবাদে'র পদ। 'উদ্ধব-সংবাদে'র পদগুলিতে কিন্তু রাধাই একমাত্র কৃষ্ণপ্রেয়সীরূপে দেখা দেয় নাই, বিরহিণী গোপীগণেরই হৃদয়বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে— রাধা সেই গোপীগণের ভিতরে স্থানে স্থানে প্রধানারূপে দেখা দিয়াছেন। বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতায় বৃন্দাবনের গোপীগণ অনেক স্থানেই রাধার পরিমণ্ডলে প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, অষ্টসখী রাধারই কায়ব্যূহ রূপ, ষোল সহস্র গোপিনী প্রেমময়ী রাধিকারই বিচিত্র প্রসার; হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতায় গোপীগণেরও যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে।

বাঙলা ও হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতার এই পার্থক্যের মূল কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি; ইহা হইল, বাঙলা দেশে জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সাহিত্যে ও ধর্মে রাধা-কৃষ্ণের যুগল-লীলার প্রাধান্য। বল্লভাচার্য বালকৃষ্ণের উপাসনার উপরে জোর দিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় সুরদাস প্রভৃতি কবিগণের রচিত কৃষ্ণবাল্যলীলা বিষয়ক পদগুলি এমন চমৎকারিত্ব লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনায় হিন্দী কবিগণের শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণকে অনুসরণ। রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া বাঙলাদেশের কবিগণ লীলা-রচনায় তাঁহাদের নিত্য-নবনবোন্মেষশালিনী কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দী বৈষ্ণব-কবিগণের বর্ণনায় লীলাবৈচিত্র্য অনেক কম। ভাগবতপুরাণকে কেন্দ্রে রাখিয়াই কবিপ্রতিভা আবর্তিত হইয়াছে। এই জন্য সুরদাসের কবিতা অনেক সময়ে ভাগবতেরই ভাষায় রূপান্তরণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। অন্যান্য কবিগণও এই সুরদাসের অনুসৃত পথকেই অনুসরণ করিয়াছেন। দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রাপ্ত পালাবাঁধা কতগুলি কবিতা ব্যতীত ভাগবতের ঠিক এই জাতীয় অনুসরণ আমরা বাঙলায় খুব বেশী দেখিতে পাই না।

কোনো বিশেষ দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম-সিদ্ধান্তরূপে যুগল-লীলার উপাসনাকে অষ্টছাপের কবিগণ গ্রহণ না করিলেও ভক্তিধর্মের স্বতঃপ্রবাহে এবং কবিধর্মের স্বতঃপ্রবাহে এই যুগল-লীলা স্মরণ কীর্তন ও আস্বাদন অষ্টছাপের কবিগণের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনতত্ত্ব, গোপীতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা বাঙলাদেশের কবিগণের ভিতরে মোটামুটিভাবে যে ধারণা বা বিশ্বাস দেখিতে পাই হিন্দী অষ্টছাপ কবিগণের ভিতরেও তাহাই দেখিতে পাই। আমরা পূর্বে মীরাবাঈএর যে ধরনের কবিতা

দেখিয়া আসিয়াছি সমজাতীয় কবিতা অষ্টছাপের কবিগণের রচনার ভিতরেও পাওয়া যায়; তাঁহারাও নিজেদের গোপীভাবে ভাবিত করিয়া 'প্রেমরসৈকসীম' কৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুলতা এবং তাঁহার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া পদ রচনা করিয়াছেন। এই জাতীয় পদের পাশাপাশিই আবার দেখিতে পাই, গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের মতন তাঁহারাও যুগল-লীলার জয়গান করিয়া সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে দূর হইতে সখী বা অন্যান্য পরিকরের ন্যায় নিত্য যুগল-লীলার আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুরদাস নিত্য নব নব এই ব্রজবিহারে মুগ্ধ হইয়াছেন।—

রাধা মাধব ভেঁট ভঈ।
রাধা মাধব, মাধব রাধা, কীট-ভৃঙ্গগতি হোই জো গঈ॥
মাধব রাধাকে রঁগ রাচে, রাধা মাধব-রংগ-রঈ।
মাধব রাধা প্রীতি নিরংতর, রসনা কহি ন গঈ॥
বিহঁসি কহ্যো হম-তুম নহিঁ অন্তর, যহ কহি ব্রজ পঠঈ।
সূরদাস প্রভু রাধা-মাধব, ব্রজ বিহার নিত নঈ নঈ॥

'রাধা-মাধবের মিলন হইল। (সেই মিলনের ফলে) রাধা হইয়া গেল মাধব, মাধব হইয়া গেল রাধা, কীট-ভৃঙ্গ-গতির মত হইল তাহাদের অবস্থা (অর্থাৎ ভৃঙ্গী যেমন পোকাকে ছুঁইয়া দিয়া তাহাকেও ভৃঙ্গী করিয়া লইয়া উভয়ে একরূপতা প্রাপ্ত হয়, রাধা-মাধবও সেইরূপ দুই মিলিয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া গেল)। মাধব রাধার অনুরাগে রঞ্জিত হইল (প্রেমে মগ্ন হইল), রাধা রহিল মাধবের অনুরাগে (মগ্ন), মাধব ও রাধার এই প্রীতি হইল নিরন্তর, রসনায় ইহাকে কহা যায় না। হাসিয়া কহিল, আমি তুমি নই একটুও অন্তর (পৃথক্)— এই বলিয়া পাঠাইল ব্রজে। সুরদাস কহে প্রভু রাধা-মাধব, (তাঁহাদের) ব্রজ-বিহার হইল নিত্য নব নব।'

সুরদাস ব্যতীত অষ্টছাপের অন্যান্য কবিগণেরও এই যুগল-লীলা আস্বাদনের কিছু কিছু পদ রহিয়াছে। অষ্টছাপের কবিগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়[১] প্রায় সকল কবিই অন্তিমে এই যুগলমূর্তির ধ্যান করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরমানন্দ দাসের একটি চমৎকার যুগল-লীলার পদে দেখি—

নন্দ-কুঁবর খেলত রাধা সংগ যমুনা পুলিন সরস রংগ হোরী।
নব ঘনশ্যাম মনোহর রাজত শ্যামা সুভগ তন দামিনী গোরী॥··
থকে দেব কিন্নর মুনিগণ সঁব মন্মথ নিজ মন গয়ো লজ্যোরী।
পরমানন্দ দাস যা সুখ কোঁ যাচত যাচত বিমল মুক্তিপদ ছোরী॥

'নন্দকুমার খেলে রাধার সঙ্গে যমুনা-পুলিনে— সরস রঙ্গ হোরী; নব ঘনশ্যাম মনোহর শোভা পাইতেছে, রাধিকার সুভগ তনু যেন নবীন মেঘে গৌরবর্ণা দামিনী।··(এই লীলা দেখিবার জন্য— আস্বাদ করিবার জন্য) দেব, কিন্নর, মুনিগণ সব থকিয়া গেল, আর মন্মথ নিজের মনে গেল লজ্জা পাইয়া; পরমানন্দ দাস এই সুখকেই যাচে— বিমল মুক্তিপদ ছাড়িয়া।'

আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে যেরূপ সখীভাবের যুগল-উপাসনার কথা দেখিতে পাই, অষ্টছাপের

---

১ দীন দয়াল গুপ্তের 'অষ্টছাপ ঔর বল্লভী-সম্প্রদায়' গ্রন্থখানি (দুই খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

কবিগণের ভিতরে সেই সখীভাবেরই চমৎকার পদ দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও তাহা সংখ্যায় অতি অল্প। সুরদাস তো এই লীলাধাম বৃন্দাবনে তৃণলতা পশুপাখী, এমন কি ব্রজরেণু, যে-কোনো রূপ ধারণ করিয়া এই লীলা-আস্বাদনের অধিকার প্রার্থনা করিয়াছেন।—

করহু মোহি ব্রজরেণু দেহু বৃন্দাবন বাসা।
মাঁগৌ যহৈ প্রসাদ ঔর নহিঁ মেরে আসা॥
জোঈ ভাবৈ সো করহু লতা সলিল দ্রুম গেহ।
গ্বাল গাই কো ভৃতু করৈ মনৌ সত্যব্রত এহু॥

'কর আমাকে ব্রজের রেণু, দেহ বৃন্দাবনে বাস— এই চাহি তোমার প্রসাদ, আর নাই আমার কোনো আশা। যাহা তোমার ভালো লাগে তাহাই কর— লতা-দ্রুম— গৃহ, গাভীর ভৃত্য গোয়াল কর, ইহাকেই মানি সত্য ব্রত।'

যুগল-মিলনের পাশে থাকিয়া সুরদাস বলিয়াছেন—

সঁগ রাজতি বৃষভানু কুমারী।
কুংজ সদন কুসুমনি সেজ্যা পর দম্পতি শোভা ভারী॥
আলস ভরে মগন রস দোউ অংগ অংগ প্রতি জোহত।
মনহুঁ গৌর শ্যামকৈ রব শশি উত্তম বৈঠে সম্মুখ সোহত॥
কুংজভবন রাধা মনমোহন চহুঁ পাস ব্রজনারী।
সুর রহি লোচন ইকটক করি ডারতি তন মন বারী॥

'সঙ্গে শোভা পাইতেছে বৃষভানুর কুমারী। কুঞ্জগৃহে কুসুমের সজ্জা, তাহার উপরে দম্পতির ভারী শোভা। আলসভরে রসে মগ্ন দুই জনই, প্রতি অঙ্গ খুঁজিতেছে প্রতি অঙ্গ; মনে হয়, গৌর শ্যাম— অথবা রবি শশী উত্তমরূপে বসিয়া সম্মুখে শোভা পাইতেছে। কুঞ্জভবনে রাধা মনোমোহন— চারিপাশে হইল ব্রজনারী; সুর রহে লোচন এক করিয়া, তনুমন ডারিয়া দেয় অর্ঘ্যরূপে।'

বাঙালী কবিগণ শ্রীরাধিকার অসীম সৌভাগ্যের জয়গান করিয়াছেন; কারণ ত্রিভুবনের আরাধ্য যে হরি, তিনিও এই রাধার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহার অধীন হইয়া আছেন। পরমানন্দ দাসও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন—

রাধে তূ বড় ভাগিনী কৌন তপস্যা কীন।
তীন লোককে নাথ হরি সো তেরে অধীন॥

পূর্বরাগের রাধার বর্ণনা করিতে গিয়া বাঙালী কবিরা যেমন বলিয়াছেন, যমুনার জল আনিতে গিয়া রাধা মুহূর্তের জন্য কৃষ্ণরূপ দেখিয়াই ঘরের কথা ভুলিয়া গেল, সুরদাসের পদেও তেমনই দেখি—

আবত হী যমুনা ভরে পানী।
শ্যাম বরণ কা হূ কো ঢোঁটা নিরখি বদন ঘর গঈ ভুলানী।
উন মো তন মৈঁ উন তন চিতয়ো তব হী তে উন হাথ বিকানী।
উর ধকধকী টকটকী লাগী তনু ব্যাকুল মুখ ফুরত ন বাণী॥

'যমুনার জলে আসিলাম জল ভরিতে। শ্যামলবর্ণ কাহার ছেলে, মুখখানি দেখিয়া ঘর গেলাম ভুলিয়া।

সে আমার সর্বতনুতে, সমস্ত তনু ভাবাইয়া তুলিল, সেই হইতেই তাহার হাতে গেলাম বিকাইয়া; আমার বুক ধক্‌ধকী, আঁখি স্থির, তনু ব্যাকুল, মুখে ফুরে না বাণী!'

আবার—

স্থন্দর বোলত আবত বৈন।
না জানোঁ তেহি সময় সখীরী সব তন শ্রবণ কি নৈঁন॥
রোম রোম মেঁ শব্দ স্থরতি কী নখ শিখ জ্যোঁ চখঐন।
যেতে মান বনীঁ চংচলতা স্থনী ন সমুঝী সৈন॥
তবতকি জকি হ্বৈ রহী চিত্র সী পল ন লগত চিত চৈন।
স্থনহু স্থর যহ সাঁচ্ কী সংভ্রম সপন কিধোঁ দিন রৈন॥

'সুন্দর বচন বলিয়া সে আসে, না জানি সেই সময়, সখি, সব তনু শ্রবণ হইয়া যায় কি নয়ন হইয়া যায়! আমার প্রতি রোমে রোমে শব্দের স্মরণ, আমার নখ হইতে শিখা পর্যন্ত সর্ব তনু করে তাহার আস্বাদন। যত হয় মান, যত চঞ্চলতা, সকলই শুনি— বুঝি না তাহার কোনো সংকেতই। তখন হইতে চিত্রের মতন রহিলাম স্তম্ভিত হইয়া, এক পলেও চিত্তে আসে না সান্ত্বনা। সূর কহে, শোন, ইহা সত্য না ভ্রম, না স্বপ্ন? সে কি দিন কিংবা রজনী?'

কৃষ্ণদাসের একটি চমৎকার পদে দেখি—

গ্বালিন কৃষ্ণ দরস সোঁ অটকী।
বার বার পনঘট পর আবত সির যমুনা জলে মটকী॥
মনমোহন কো রূপ স্থধানিধি পীবত প্রেমরস গটকী।
কৃষ্ণদাস ধন্য ধন্য রাধিকা লোকলাজ সব পটকী॥

'গোয়ালিনী আটকা পড়িয়াছে কৃষ্ণের দর্শনে। বার বার মাথায় জলের ঘট লইয়া হেলিতে দুলিতে আসে যমুনার জলে। মনোমোহনের রূপসুধানিধি পান করে, পান করে প্রেমরস; কৃষ্ণদাস (করে) ধন্য ধন্য, রাধিকা লোকলাজ সব ছুড়িয়া ফেলিয়াছে।'

কৃষ্ণের নাম শুনিয়াই পাগল হইয়াছিল রাধা। এই নাম শ্রবণে পূর্বরাগ সঞ্জাত হইবার ভাব অবলম্বনে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ হইল চণ্ডীদাসের 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম'। এই পদের সহিত আমরা নন্দদাসের একটি পদ এক সঙ্গে বেশ মিলাইয়া পড়িতে পারি—

কৃষ্ণ নাম জব তৈ স্থন্যো রী আলী,
ভূলী রী ভবন হোঁ তৈ বাবরী ভঈরী।
ভরি ভরি আবৈঁ নৈঁন চিতহুঁ ন পরৈ চৈন,
তন কী দসা কছু ঔরে ভঈ রী॥
জেতিক নেম ধর্ম ব্রত কীনে রী, মৈঁ বহুবিধি,
অংগ অংগ ভই মৈঁ তো শ্রবণমঈ রী।
নংদদাস জাকে শ্রবণ স্থনে ঐসী গতি,
মাধুরী মূরতি কৈধোঁ কৈসী দই রী॥

'যখন হইতে শুনিয়াছি, রে সখি, সেই কৃষ্ণনাম, ঘর ভুলিয়া আমি তখন হইতে হইয়াছি পাগল। নয়ন ভরিয়া ভরিয়া আসে, চিত্তে আসে না চেতনা, দেহের দশা কেমন যেন অন্যরকম হইয়া গেল। যত না করিয়াছিলাম আমি বহুবিধ নিয়ম ধর্ম ব্রত— (কিন্তু আজ তো সব গিয়া) অঙ্গে অঙ্গে হইলাম আমি শ্রবণময়ী! নন্দদাস বলে, যাহাকে শ্রবণে শুনিয়া হইল এমনই গতি, তাহার মাধুরী মূরতি না জানি সে কেমন অদৃষ্ট!'

অবশ্য এই জাতীয় কবিতার ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে, বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণ এইসকল ক্ষেত্রেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামের রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগাখ্য প্রেমকেই দূর হইতে পরিকর রূপে আস্বাদ করিয়াছেন; কিন্তু হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণ এসকল ক্ষেত্রে শুধু রাধা-কৃষ্ণের বা গোপী-কৃষ্ণের পূর্বরাগ অনুরাগ মিলন-বিরহকেই আস্বাদ করেন নাই, নিজেরাই রাধাভাবে বা গোপীভাবে পরিভাবিত হইয়া এই জাতীয় কৃষ্ণপ্রেম আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। পরমানন্দ দাসের এই জাতীয় একটি বিরহের পদে দেখি—

যা হরি কো সংদেস ন আয়ো।
বরস মাস দিন বীতন লাগে বিনু দরসনু দুখ পায়ো॥
ঘন গরজ্যো পাবস ঋতু প্রগটী চাতক পীউ সুনায়ো।
মত্ত মোর বন বোলন লাগে বিরহিন বিরহ জনায়ো॥
রাগ মল্হার সহয়ো নহি জাঈ কাহূ পথিক হি গায়ো।
পরমানন্দ দাস কহা কীজে কৃষ্ণ মধুপুরী ছায়ো॥

'হরির তো আসিল না কোনো সংবাদ। (এই ভাবেই) বরষ মাস দিন ব্যতীত হইতে লাগিল, দরশন বিনা পাইলাম দুঃখ। বর্ষা কাল প্রকটিত হইল, মেঘ করিতেছে গর্জন, চাতক শুনাইতেছে পিউ পিউ রব, মত্ত ময়ূরের রবে বন আরম্ভ করিল কথা বলিতে— বিরহিণীর বিরহ দিল সব জানাইয়া। রাগমল্লার তো পারি না সহ্য করিতে, কেন পথিক গায় সেই গান; পরমানন্দ দাস কহিতেছে, কৃষ্ণ (কৃষ্ণ এবং বিষাদের কালো ছায়া) মধুপুরী ছাইয়া ফেলিল।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন রূপ

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

স্বাধীনতার একটা আশুলাভ নতুন করে ভাববার, প্ল্যান তৈরী করবার অধিকার। জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রের চেয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই গঠনমূলক চিন্তার সম্ভাবনা ও সার্থকতা বেশী। অন্য সকল ক্ষেত্রেই জনসাধারণের বোধশক্তি ও কর্মক্ষমতা আদর্শের উচ্চতাকে নামিয়ে আনতে চায় নিম্নস্তরে; কোনো চিন্তাধারা বা বিশেষ নেতৃত্ব স্বীকৃত হবার পথে থাকে অনেক বাধা। কিন্তু এই জ্ঞানের যুগযুগ-সঞ্চিত ঐশ্বর্যকে ও তার ব্যক্তিগত ভোগ-অধিকারকে আক্রমণ করে না কোনো প্রোলিটারিয়েট। কোনো জন-অভ্যুত্থানের অপেক্ষা না রেখে একমাত্র এই সম্পদেরই উদার সার্বজনীন বণ্টন সম্ভব।

শিক্ষাপ্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনায় অন্য সব রকমের সংস্কারপ্রচেষ্টা কত সংকীর্ণ, কত বিচ্ছিন্ন, কত অস্থায়ী ও অসহায়। জনশিক্ষার সময়পর্বগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, চমকপ্রদ দ্রুত উৎপাদন তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কিন্তু সমস্ত স্থায়ী উৎপাদনের একমাত্র উপায় এই শিক্ষা।

সুখের বিষয়, ভারত গভর্নমেণ্ট শিক্ষার সংশোধন ও সম্প্রসারণের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। এ বিষয়ে তাঁদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী যে-কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষেই শ্লাঘার বিষয়। সমস্যার সমস্ত দিক বিচার ক'রে শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ রূপটি আবিষ্কার করার ইচ্ছা যে এঁদের আন্তরিক, তার একটা প্রমাণ তাঁদের নিযুক্ত ইউনিভার্সিটিজ্ কমিশন। এই কমিশন গভর্নমেণ্টের স্বার্থসিদ্ধির কোনো দেশব্যাপী প্রচারযন্ত্র গঠন করতে চেষ্টা করেন নি। তাঁদের বিবৃতি পাঠ করলে সন্দেহ থাকে না যে তাঁরা শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো অবান্তর আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নি, এবং মূলতঃ 'শিক্ষার জন্য শিক্ষার'ই যথাসম্ভব সম্পূর্ণ একটি পরিকল্পনা রচনার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। আমাদের দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন একাধিক পরিকল্পনার স্মৃতি সঞ্চিত আছে; যে কোনো কারণেই হোক তাদের পরিণতি কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত হয় নি। কিন্তু এখন স্বাধীন ভারতে যে মস্তিষ্ক ভাবে, ও যে বিশাল বাহু সেই চিন্তা রূপায়িত করে তোলে, সেই দুয়ের মধ্যে কোনো আত্যন্তিক বিরোধের আশঙ্কা নেই। অতএব আশা করা যায় আমাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা যুগান্তরের সূচনা অবিলম্বে দেখবার সৌভাগ্য হবে।

কিন্তু এত বড়, এত সুদূরপ্রসারী একটা চেষ্টা জাতীয়-জীবনের রঙ্গমঞ্চে যেন অনেকটা অনাড়ম্বরভাবেই প্রবেশ করল। শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এ নিয়ে কোনো উত্তেজনা, কোনো তর্কের অবতারণা—কিছুরই কোনো প্রকাশ্য প্রমাণ পাওয়া গেল না। হয়তো দেশের নানা অস্বস্তি অসুবিধাই এর কারণ, কিন্তু তবু বলতে হবে শিক্ষাব্যাপারে দেশবাসীর আরো সজাগ সক্রিয় মনোভাব এই পরিকল্পনাকে আরো দ্রুত পরিণতির পথে এগিয়ে দিতে পারত। কারণ শিক্ষার সম্যক্ প্রসারের জন্যে একটা সুচিন্তিত প্ল্যানও যেমন দরকার, দেশব্যাপী একটা ঔৎসুক্য, একটা ভালোমন্দ বুঝে নেওয়ার প্রয়াসও তেমনই দরকার।

বিশেষত, প্রশ্নের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। মানুষের জীবন নিয়ে শিক্ষার কাজ। তাই জীবনের সমস্যা যেমন শেষহীন শিক্ষারও তাই। পাশ্চাত্য দেশগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গঠনে আমাদের দেশের চেয়ে

অনেক অগ্রসর; এমন বহু ইউনিভার্সিটি তারা বহুদিনের চেষ্টায় গড়ে তুলেছে যাদের যশ ও প্রভাব পৃথিবীবিস্তৃত। তবু সেইসব দেশেও, সেইসব ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধেও প্রশ্ন থামে নি। ইংলণ্ডের এক আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির চেয়ারম্যান মোবারলি সাহেবের অধুনা-প্রকাশিত ইউনিভার্সিটি শিক্ষা সম্পর্কীয় গ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায় সেই দেশে প্রচলিত উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট সংশয় ও উদ্বেগ আছে। শুধু ইংলণ্ডে নয়, ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ, এমন কি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকেও শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিৎদের কণ্ঠে অনুরূপ উদ্বেগের স্বর শোনা গিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি তাদের উদ্দেশ্য থেকে স্খলিত হয় নি? তাদের কৃতিত্ব ও তাদের মূল আদর্শের মধ্যে কি কোনো বিচ্ছেদ ক্রমশ স্ফীততর হয়ে উঠছে না?

আসল কথা এই, বহু দীর্ঘপ্রয়াস, বহু আপাতসাফল্যের পরেও পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আজ আবার সেই চিরপুরাতন সমস্যাগুলিই আন্দোলিত হয়ে উঠেছে। দুটি প্রধান সর্বপুরাতন ও চিরন্তন সমস্যা— বিশ্ববিদ্যালয় কাদের জন্যে, জাতির কোন্ এবং কতখানি অংশের জন্যে; এবং কিসের জন্যে— ব্যক্তিজীবন, সমাজ-জীবন ও স্টেটের কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে।

আমাদের কমিশনের রিপোর্টে এইসব আলোচনা ও মন্তব্য থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে। বিশেষজ্ঞতার লোভ কেমন করে সুসমঞ্জস ও উদার শিক্ষালাভের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, জীবিকার প্রতি অত্যধিক মনোযোগ শিক্ষার রূপকে কেমন করে শীর্ণ সংকীর্ণ ক'রে আনে— এসব বিষয়ে পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার যেসব সাক্ষ্য সম্প্রতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান কমিশন তা উপেক্ষা করেন নি। কিন্তু তার ফলে তাঁরা কি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোনো নূতন আদর্শ, নূতন গঠন, নূতন কর্মরূপের পরিকল্পনা করেছেন, কিম্বা তাদের কেবলমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠ ইউনিভার্সিটিগুলির পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড় করিয়ে দেবার প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত হয়েছেন?

রিপোর্টটি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল সমস্যারই উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রতিটি সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। তাই এঁদের সুপারিশসমূহের মধ্যে সংকলিত হয়েছে বহুবিচিত্র উপদেশ, নির্দেশ, নিষেধ। ইউনিভার্সিটির আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে যতরকম বিভিন্ন মত ও দাবী হতে পারে সবই তাঁরা নথি-ভুক্ত করেছেন। শিক্ষকদের উপদেশ দিয়েছেন এই জটিল শিক্ষাযন্ত্রের কোন্ অংশ কেমনভাবে সচল রাখতে হবে। পাঠ্য-তালিকায়ও এই সর্বার্থসংগ্রহের কৌশল দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বিভিন্ন আদর্শ ও দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব কি না, যদি-ই বা তা সম্ভব হয় নির্দিষ্ট কাল-পরিধির মধ্যে তার কতটুকুর সার্থক ব্যবহার সম্ভব। এই প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে উপযুক্ত সতর্কতা ও নিরাপদ ব্যবস্থা নিহিত আছে কি না যার ফলে পরিচিত ভ্রান্তি, অপচয় ও উন্মার্গগমন এড়িয়ে গড়পড়তা ছাত্র প্রত্যাশিত পরিমাণ সৎশিক্ষা লাভ করবে— বুদ্ধির ও আগ্রহের তারতম্য অনুযায়ী সকল শ্রেণীর ছাত্রই যথেষ্ট আত্মনিয়োগের সুযোগ পাবে, কিন্তু রেহাই পাবে মাত্রাতিরিক্ত দাবীর অত্যাচার থেকে অত্যল্প কর্তব্যের আলস্য থেকে? এমন কোনো মূল নীতি বা দৃষ্টি আছে কি না যার দ্বারা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দু-একটি শিক্ষকমাত্র নয়, গড়পড়তা সম্ভাব্যচারিত্র ও গুণসম্পন্ন শিক্ষককে বেছে নেওয়া যেতে পারে, যে নীতি বা দৃষ্টির দ্বারা শিক্ষক নিজেই নিজের ভ্রান্তি বা বিক্ষেপের সংশোধন করে শিক্ষাকর্মের কেন্দ্রস্থ

প্রেরণার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন ? এক কথায় প্রশ্ন করা যায় কমিশনের বিভিন্ন উপদেশ কি শুধুই বিভিন্ন উপদেশ, যুক্তিবাদী মনের বিচিত্র আহরণের সমাবেশ, শুধুই বিস্তারিত বিধিনিষেধের পঞ্জিকা, কিম্বা তাঁরা কোনো নূতনতর দৃষ্টি, বিশুদ্ধতর প্রেরণা এনেছেন বহন করে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে ?

দেশের রাজনৈতিক আর্থিক ব্যাপারে যেমন, তেমনি যদি শিক্ষার ব্যাপারেও আমরা যতদূর সম্ভব বুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে জাগ্রত রেখে পাশ্চাত্য প্রথা পদ্ধতি ও পথ অবলম্বন করি, এবং শুধু আমাদের রিপোর্টে নয়, জীবনের ক্ষেত্রেও যদি এই নবপ্রেরিত পথে লোকযাত্রাকে সহজ ও সার্থক ক'রে তুলতে পারি, তবে সেও নিশ্চয় বর্তমান নির্বোধ অনুকরণের আড়ষ্টতা ও নিঃস্বতা থেকে যথেষ্টগুণে হিতকর হবে। তবু যে ইতিহাসকার ভারতের এই স্বাধীনতা-আন্দোলনের মহতী সিদ্ধির ধ্যানচিত্র আঁকবেন, তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাসের একটি কারণ একটি শূন্যতার বুদ্বুদের মত রয়ে গেল এই ঘটনাস্রোতের মধ্যে। এত বড় এক ইতিহাসদুর্লভ মুহূর্তে আমরা সাড়া দিতে পারলুম না কোনো নূতন সৃষ্টি-প্রেরণার দ্বারা, আমাদের দায়িত্ব শেষ হল শুধু বিদেশী নজির অনুধাবন ক'রে, আমাদের আত্মসম্মান ক্ষান্ত হল দু-একবার আমাদের অতীতগৌরবের উল্লেখে।

যখন বহুশতাব্দীর বহু খ্যাতি ও ধাবমান কালের বহু সংঘাত উত্তীর্ণ হয়ে আসার পর বিদেশী ইউনিভার্সিটিগুলি আবার ভাবতে শুরু করেছে সম্ভাব্য অনেক রকম উদ্দেশ্যের মধ্যে কতটুকু বেছে নেওয়া যায়, কোন্ আদর্শকে মুখ্য ক'রে তারই বিশেষ অনুশীলনে ইউনিভার্সিটিকে বাঁচানো যায় চরিত্রভ্রষ্টতার গ্লানি থেকে, যদিই থাকে একাধিক উদ্দেশ্য নৌকোয় একাধিক দাঁড়ের মত, তবে সেইসমস্ত দাঁড়ের বেগ নিয়ন্ত্রিত করা যায় কোন্ একমাত্র হালের দ্বারা, তখন আমরা ঘোষণা করলুম আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলি একাধারে সমস্ত রকম উদ্দেশ্যই সাধন করবে। তারা হবে আমাদের সভ্যতার প্রধান বাহন; বুদ্ধির চিরনূতন অভিযানের— জ্ঞানের রাজ্যে নব নব আবিষ্কারের ক্ষেত্র; শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের মাধ্যম; বৈজ্ঞানিক, মনীষী, সাহিত্যিক, শিল্পীর জনয়িতা; নূতন সুমিতি ও সমন্বয়ে সার্থক জীবনরীতির প্রবর্তয়িতা; শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান নয়, যে বিজ্ঞান শুধু উন্মেষিত আত্মার লভ্য, তারও বিতরণদায়িত্ব ইউনিভার্সিটির। এ ছাড়া কতকগুলি উচ্চশিক্ষাসুলভ জীবিকার পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া চাই দেশের কৃতী যুবকদের জন্যে। গভর্নমেন্টের বিভিন্ন কাজের জন্য যেসব বিশেষজ্ঞ ও টেক্‌নিশিয়নের প্রয়োজন তাদেরও তৈরী করে দেওয়া চাই। এ ছাড়া ভারতের নূতন constitutionএ স্বাধীনতা, সুবিচার, সাম্য ও মৈত্রীর যে আদর্শ গৃহীত হয়েছে তাকে জাতির জীবনে সার্থক করে তোলবার ভার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের। যাতে দেশপ্রীতি ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর প্রেরণা পায় শিক্ষার্থী, এমন ব্যবস্থাও থাকা চাই।

এক কথায় বলা যায়— ছাত্র, তার অভিভাবক, সমাজ ও জাতি এবং স্টেটের পক্ষে যত রকম দাবী করা সম্ভব, তার সবগুলিই পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাদের ইউনিভার্সিটি কমিশন। কিন্তু কেমনভাবে এই দুরূহ কর্তব্য সম্পাদিত হবে তা পরবর্তী অধ্যায়গুলির মধ্যে অনুসন্ধান করে হতাশ হতে হয়। সেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষারীতি, পাঠ্যক্রম ও শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদির মিশ্রিত অনুকরণ ও অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই নেই— যা কোনো বৃহত্তর সার্থকতা, কোনো সুষ্ঠুতর সামঞ্জস্যের আশ্বাস দেয়।

জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রেই খুঁটিনাটি খুচরো ভাবনার কিছুটা সার্থকতা আছে। সাহিত্যের টেকনিক নিয়ে ভাবনায় প্রতিভার অভাব পূরণ করা না যেতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা অনেক রচনাকে সম্পূর্ণব্যর্থতা থেকে রক্ষা করা যেতে পারে; তাকে সাহিত্যপদবীতে উন্নীত করা না যাক, অন্তত বহুলোকের চিত্তাকর্ষক করে তোলা অসম্ভব নয়। শিক্ষার ব্যাপারেও ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়ানিয়ন্ত্রণের দ্বারা আদর্শকে প্রাণবান্ করে তোলা না গেলেও শিক্ষার কতকগুলি দৈনন্দিন কর্তব্য আরো নিপুণ ও নিশ্চিন্তভাবে করা যায় নিশ্চয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ও পটুতার উপর সমস্ত মনোযোগ দিলে তার ফলে ক্রমশ আদর্শ হয় ছায়াবৃত, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে। এর কারণ এই যে, কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যকে আয়ত্ত করা যায় শ্রেষ্ঠ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনে, কিন্তু আদর্শকে সংক্রমিত করা যায় শুধু প্রেরণার দ্বারা। প্রেরণা প্রক্রিয়াকে করে জীবন্ত, সফলতর; কিন্তু কোনো প্রক্রিয়াই প্রেরণাকে জীইয়ে রাখতে পারে না বা তার অভাব মোচন করতে পারে না।

তাই আমাদের খুঁটিনাটি ভাবনা, আংশিক কুশলতার চেয়ে সামগ্রিক আদর্শের দিকেই আজ নজর দেওয়া দরকার বেশী। কিন্তু সে কি সহজ কাজ? প্রতিটি কথা খুঁটিয়ে ভাবলেই কি সমস্ত সমস্যাটির রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এ ভাবনার কি কোনো সীমা আছে, নির্দিষ্ট আয়তন আছে। শিক্ষা মানে কি, জীবনের মধ্যে তার স্থান ঠিক কোনখানে, এই দুয়ের কোন্‌টি অপরটিকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করবে; জীবনের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করব, না, শিক্ষার অনুযায়ী জীবন গড়ে উঠুক এই হবে আমাদের চেষ্টা? বর্তমান মুহূর্তে মনুষ্যজীবন কোন্ পথে চলেছে, কি তার দাবী, কি তার সমস্যা? শিক্ষা সেই দাবী কতটা মানবে, কেমন ক'রে? সেই সমস্যা মেটাবে কি উপায়ে? তা ছাড়া যতটা শিক্ষা দেওয়া উচিত, তার কতটুকুর দায়িত্ব নেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি, কতটুকুই বা ছেড়ে দেওয়া হবে ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর? উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি তো আছেই। অতএব দেখা যায়, ভাবতে শুরু করলে অনেক বিষয়ে উন্নতির প্রয়োজন ও উপায় দেখতে পাওয়া যায়, আসল কথাটিরই কোনো নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর পাওয়া যায় না। সে কথা হল এই, শিক্ষার মূল আদর্শ ও কর্তব্য কি। সে কি জীবনকে শুধু গ্রহণ করবে, না, প্রভাবিত করবার চেষ্টা করবে? যদি দ্বিতীয়টাই কাম্য হয়, তবে কোন্ দিকে, কোন্ পরিণতিকে লক্ষ্য করে সে জীবনকে চালিত করতে চাইবে? বহুদিনকার এই প্রশ্ন, একে এতদিন এড়িয়ে এসেছে মানুষ। কিন্তু আজ এর উত্তর দিতে হবে। আজও যদি আমরা এই প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখি তবে যে চরিত্রভ্রষ্টতা আজ সর্বদেশের শিক্ষার আয়োজনকে আক্রমণ করেছে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাতেও লাগবে তার স্পর্শ।

২

আজকের দিনে শিক্ষার সম্বন্ধে ভাবতে গেলে একবার ফিরে চাইতেই হবে পশ্চিমদেশের শিক্ষার ইতিহাসের দিকে। শিক্ষার বহিরঙ্গের দিকে ততটা নয়, চাইতে হবে তার প্রাণধারার দিকে। বুঝতে হবে তার বহুদিনকার কীর্তি ও কৃতিত্বের আসল উৎস ছিল কোথায়, এবং এখনই বা তাদের শিক্ষাসঙ্কটের মূল কারণটি কি।

ইতিহাসের দীর্ঘপদক্ষেপগুলি দেখতে পাবার মত মানসিক দূরত্ব যদি আমরা অর্জন করি, তবে দেখতে পাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ও বিকাশকে চালিত করেছে কোনো কল্পিত আদর্শ নয়, মানুষের মনের একটি জীবন্ত আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা, মানুষের হৃদয়ের একটি অদম্য আবেগ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিযানের দ্বারা একদিন খুলে ফেলা যাবে বিশ্বরহস্যের দুর্গদ্বার— এই বিশ্বাস যে যুগে মানুষের চেতনাকে চেপে ধরেছিল দৃঢ়মুষ্টিতে, সেই যুগেই জন্ম হল প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের। সেই যুগের নাম দেওয়া যায় ফাউস্টের যুগ। আবিষ্কার, উদ্ভাবন, অনর্থক আগাছা উন্মূলিত করে জ্ঞানের চলাচল-পথগুলির উদ্‌ঘাটন, তথ্যের পর তথ্যকে সিঁড়ির মত গেঁথে তুলে দুর্গম অজ্ঞতার প্রাচীর বার বার ডিঙিয়ে যাওয়া, এই ছিল সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ। যাদের সঙ্গে এই জ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্ক মাত্র ছিল না সেই অসংখ্য জনগণ কিছু না বুঝুক এইটুকু জানত যে অসাধ্যসাধনের এই অভিযান— এ তাদেরি স্বপক্ষে, সমস্ত মানুষের হয়ে। কি শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখত তারা তখনকার আচার্য ও অধ্যাপকদের। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মাত্রেই পেত অসাধারণ সামাজিক মর্যাদা। তখন গবেষণা ও জ্ঞানান্বেষণের এই মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিশিয়ে যায় নি কোনো অবান্তর অভিপ্রায়। প্রশ্ন ওঠে নি এই জ্ঞান অর্থকরী কি না, তখনকার দেশকর্তা বা সমাজকে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে কোনো সেবা বা লাভ দিচ্ছে কি না, এই জ্ঞান সমাজের মধ্যে নূতন শ্রেণী সৃষ্টি করছে কি না, এর বিতরণে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে কি না। যতদিন এইসব প্রশ্ন ওঠে নি ততদিন ওই জ্ঞানান্বেষণের উদ্যম অনাহত রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে জার্মানি ফ্রান্স ইটালি ইংলণ্ডে। কিন্তু একদিন উৎপীড়িত ক্ষুব্ধ জনসমাজ আবিষ্কার করল এই জ্ঞানের অভিযানের সঙ্গে জনকল্যাণের কোনো সম্বন্ধ না থাকতেও পারে। এর সম্মুখযাত্রার উৎসব-আড়ম্বরের তারা কেবল উপেক্ষিত দর্শক ; কিম্বা হয়তো বা তারা কতকগুলি ব্যক্তিগত উজ্জ্বল উচ্চাশার ইন্ধন। তাদের এই অভিযোগের যথেষ্ট কারণও ছিল নিশ্চয়। এমন একটা সময় এসেছিল কল্পনা করা যায়, এবং ইতিহাসেও তার সাক্ষ্য মেলে, যখন জ্ঞানের অগ্রগামী সৈনিকরা সমাজের সুবিধা ও সৌন্দর্যের দিকে লুব্ধ দাম্ভিক হাত বাড়িয়েছিল, যেমন করে থাকে আজকের দিনের কোনো অকুপেশন আর্মি। জ্ঞানের শক্তিকে তারা নিযুক্ত করে নি সমাজের সেবায়, বরং তারই বলে করেছিল হৃদয়হীনতার সাধনা ; তাদের চেষ্টা, তাদের চরিত্রে গ্রহণ করেছিল শয়তানের প্রভাব। গ্যেটের মেফিস্টোফিলিস শুধু কল্পনা মাত্র নয়, যে অসংযম অহংকার শিক্ষিত মানুষের চরিত্রকে সেদিন অপ্রতিরোধ্য বেগে চালিত করছিল উচ্ছৃঙ্খলতার পথে, মেফিস্টোফিলিস তারই নাট্যরূপ। এইভাবে জ্ঞানের মুক্তরূপটি যেই আবৃত হল শক্তি ও সম্ভোগলিপ্সায়, ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হারাল জনচিত্তে তাদের আদরের আসন, আন্দোলন শুরু হল তাদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে।

এর পরে এল নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়। এরা এদের প্রাণের উৎস পেল, জ্ঞানের আগ্রহে নয়, সমন্বয় ও সাজঞ্জস্যের প্রবৃত্তিতে। চরিত্রের সঙ্গে অসম্পর্কিত জ্ঞানকে তারা আর শ্রেষ্ঠ কাম্য বলে নিতে পারল না, তারা পেতে চাইল সুবিহিত সুমিত মনের আনন্দ ও গঠনক্ষমতাকে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে যাযাবরদের সন্ধান ও আক্রমণের অস্থিরতা এক সময়ে যেমন সংকলিত হয়েছিল স্থিরজীবনের কৃষি ও শিল্পে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি অনুসন্ধান ও শিকারের যুগ গিয়ে এল মনের ফসল

ফলানোর যুগ। এডুকেশন হল লিবারেল এডুকেশন। গবেষণা সসম্ভ্রমে স্থান দিল সংস্কৃতিকে। তখনকার ইয়োরোপে এই সামঞ্জস্য বিধানের আগ্রহ ও চেষ্টা সমস্ত মানুষের মনে আপনি এসেছিল একটা আবেগের মত, সেই আবেগকে আয়ত্ত করে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাত্রা শুরু করেছিল তাদের কৃতিত্বে ইয়োরোপের ইতিহাসের কয়েক শতাব্দী উজ্জ্বল। এরই মধ্যে গৌরবের আসন দাবী করে অকস্‌ফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হার্ভার্ড। এদের এই লিবারেল এডুকেশন শুধু একটা পরিকল্পনা নয়, একটা অনুভূত আবেগের পরিস্ফুট রূপ। এই শিক্ষার যে চিত্র দিয়েছিলেন কার্ডিন্যাল নিউম্যান তা এখনো পৃথিবীর শিক্ষিত-সমাজকে আকৃষ্ট করে। দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি যখন অবিচলিত, তখনকার পক্ষে এমন শিক্ষা যে সকলের শ্রদ্ধা ও আদরের বিষয় হবে সে সম্বন্ধে নিউম্যানের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পড়লে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। ব্যবসায় ও সামরিক শক্তির দ্বারা ধনবৃদ্ধি যখন প্রায় স্বতঃসিদ্ধতায় পৌঁছেছে, তখন সেই সহজ ঐশ্বর্য ও তারই প্রভাবে গড়া সমাজসংস্থার উপর একটি স্থায়ী উদার কর্তৃত্বস্থাপনার পক্ষে এর চেয়ে ভালো প্রস্তুতি আর কি হতে পারে ?

নিউম্যান বলছেন, ইউনিভার্সিটি-শিক্ষা একটি বিরাট সার্বজনীন উদ্দেশ্যসাধনের একটি মহৎ অথচ সাধারণ উপায় ; এই উদ্দেশ্য হল সমাজের বোধ-গ্রামকে উন্নীত করা, জনসাধারণের চিত্তভূমিকে কর্ষিত করা, জাতীয় রুচির সংশোধন সাধন, জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনার এবং তাদের উচ্চাশার সুনিশ্চিত পথ তাদের সামনে খুলে ধরা, সেই যুগের বিশিষ্ট ধারণা ও ভাবগুলিকে আতিশয্য বা বিকার থেকে রক্ষা করা এবং তার পরিণতি সাধন করা, রাজনৈতিক ক্ষমতার উচিত ক্রিয়াকে সহজসাধ্য করা এবং ব্যক্তিজীবনের ব্যবহারে শোভনতা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন করা। এই শিক্ষাই মানুষকে তার নিজের মতামত ও বিচার সিদ্ধান্তকে স্পষ্ট চোখে সজাগ দৃষ্টিতে দেখতে শেখায়, সেই মতামত ইত্যাদিকে ক্রমশ ব্যাপকতর করে গড়ে তোলায় তাকে দেয় সত্যসুমিতিবোধ, তার প্রকাশে দেয় পটুতা এবং তার ব্যাখ্যানে ওজস্বিতা। এই শিক্ষাই তাকে শেখায় প্রতিটি জিনিস যেমন ঠিক তেমনটি করেই তাকে দেখতে, বিষয়ের মর্মদেশে সোজা পৌঁছতে, চিন্তার জট ছাড়াতে, কোন্ বিদ্যা বিদ্যা নয় শুধু বিদ্যার অভিমান তা বুঝতে, অসম্বদ্ধকে পরিহার করতে। এইখানেই সে পায় যে কোনো কর্মস্থান অধিকারের যোগ্যতা। তার মনের মধ্যে সে পায় সমতা ও শান্তি যা নিজের আশ্রয়ে নিজেই জীবন্ত। এবং সেই মন পারিপার্শ্বিক জগতের থেকেও বিচ্ছিন্ন নয়, সেখানেও সে জীবন্ত। বাইরে যাওয়ার যখন অসুবিধা তখন এই মনের অজস্র উপায় আছে আত্মবিনোদনের।

এই লিবারেল এডুকেশনকে নানা ভাষায় নিউম্যান বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, এ শুধু তথ্যসংগ্রহ নয়, শুধু viewiness বা চটপট সবজান্তাধরনের মতামত দিতে পারার ক্ষমতা নয়— যে ক্ষমতা আই. সি. এস.-দের আকাঙ্ক্ষিত। এ শুধু মনের মধ্যে মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডার রচনাও নয়, যদিও সে কাজের মহা সার্থকতা নিউম্যান অস্বীকার করেন না। তাঁর মতে এই শিক্ষা হল মনের ভারবর্ধন নয়, প্রসার, ব্যাপ্তি, নূতন শক্তিলাভ। এ আনে মনের নবতর উজ্জ্বলতা, এ দেয় জীবনবোধ, আত্মপরিণতির সহায়ক ফিলজফি। বিভিন্ন বিষয় এই শিক্ষায় সন্নিবেশিত হয়, কিন্তু এই শিক্ষা সেইসমস্ত বিষয়ের অতিরিক্ত একটা মানসিক লাভ। এই শিক্ষা চপল কৌতূহল নিবৃত্তিও নয় এবং কোনো বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বেও শেষ নয়। এ হল যেমনভাবে স্টিলের ধাত তৈরী করতে হয় তেমনি সতর্ক চেষ্টার দ্বারা

মনের সবচেয়ে সংস্কৃত, সবচেয়ে কার্যক্ষম, সচেতন সুসমঞ্জস, সংবেদনশীল ধাতটি তৈরী করে দেওয়া। কি বোঝাতে চান এর চেয়ে আর স্পষ্টতর করতে না পেরে নিউম্যান বলে উঠলেন, Education is a high word! বুদ্ধিজগতের এক ধরনের শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ কল্পনা করা যেতে পারে, তারই সাধনা ছিল নিউম্যানের কাম্য। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গঠনে বিশেষ অধ্যাপকের গুণ ও কৃতিত্বের চেয়ে বেশী মূল্য দিয়েছেন জীবন্ত পরিবেশকে— যে পরিবেশের উপাদান শান্তি, নিউম্যানের ভাষায় intellectual peace। এই শান্তি রচিত হয় বিভিন্ন বিষয়ের বিচ্ছেদ ও বিরোধিতাকে সামঞ্জস্য-বন্ধনে সমীকৃত ক'রে, আবিষ্কৃত জ্ঞানকে এখনও অনায়ত্ত জ্ঞানের বিশাল আকাশের নীচে তার যাথার্থ্যের মধ্যে স্থাপিত ক'রে, জ্ঞান-পরম্পরার মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও সুমিতির সূত্র অন্তর্লীন তার বিশ্বব্যাপী প্ল্যানটিকে উন্মোচিত ক'রে।

নিউম্যান-ব্যাখ্যাত এই মূল আদর্শের দুটি স্বাভাবিক আনুষঙ্গিক নীতি আছে। নিউম্যান সে দুটিকেই বিশেষ জোরের সঙ্গে সমর্থন করেছেন। একটি হচ্ছে এই যে, এই উদার শিক্ষার সঙ্গে কোনো সাংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্য জুতে দেওয়া চলবে না। জীবিকার জন্যে বিশিষ্ট কোনো জ্ঞান বা নৈপুণ্যদানের চেষ্টামাত্রও ইউনিভার্সিটির পক্ষে আদর্শহানি। এই প্রসঙ্গে liberal শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে নিউম্যান সালিস মানলেন অ্যারিস্টট্‌লকে। অ্যারিস্টট্‌ল্ সেইসব কাজকেই বলেন liberal যার একমাত্র পরিণাম উপভোগ, তার বেশী আর কোনো সার্থকতা নয়—'those liberal, which tend to enjoyment. I mean by enjoyable, where nothing accrues of consequence beyond the use'।

দ্বিতীয় নীতিটি হচ্ছে এই যে, ইউনিভার্সিটির মূলকাজ শিক্ষার পরিবর্ধন নয়, গবেষণা নয়, বর্ণিত উদারশিক্ষার রক্ষণ ও দেশে তার বহুল বিস্তার।

কিন্তু বতমান দিনে যে এই দুটি নীতির কোনোটিই পালিত হচ্ছে না তা সকলেই জানেন। অন্যান্য অনেক উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই নিউম্যান-সমর্থিত উদার শিক্ষাবিস্তারও একটি উদ্দেশ্য হিসাবে স্বীকার করেছে এমন বিশ্ববিদ্যালয় অনেক আছে। কিন্তু নিউম্যান যে বিশুদ্ধতার, অবিক্ষিপ্ত নিষ্ঠার দাবী করেছেন সে দাবী আজ বোধ হয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই আর স্বীকার করেন না। বিশুদ্ধতার, একমুখীনতার বদলে এখন এসেছে বহু উদ্দেশ্য সমন্বয়ের যুগ। কিন্তু সেই বিচিত্র উদ্দেশ্য ও অধ্যবসায় একত্রিত করা সম্ভব কি না এবং সেগুলি একে অন্যের বিরোধী কি না সে বিষয়ে আমাদের দেশে এখনো বিশেষ উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ইংলণ্ডে, এমন কি আমেরিকাতেও, এই চিন্তার সূত্রপাত হয়েছে।

৩

কোনো একটি শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাব্যবস্থা সফল কিম্বা ব্যর্থ, সে বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো শক্ত। এর একটা কারণ এই যে, বিদ্যাবত্তার কোনো নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড এখনো আবিষ্কৃত হয় নি, সংস্কৃতি ও চরিত্রের তো নয়ই। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে বুদ্ধিমান ছাত্র ছাপানো বইয়ের মধ্য থেকে তার যা দরকার সমস্তই পেতে পারে, এমন কি অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ছাত্র তাদের মোট শিক্ষার

খুব বৃহৎ একটা অংশের জন্যে ঐ 'মুক্তি শব্দে'র কাছেই ঋণী। শিক্ষাব্যবস্থার অনেক দোষত্রুটি সত্ত্বেও তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পারে অনেক কৃতী ছাত্র, এবং তাদের কৃতিত্বের নজির দেখিয়ে সেই শিক্ষার সমস্ত দোষক্ষালন করবার চেষ্টাও করা যেতে পারে। বিশেষত যতদিন কোনো শিক্ষার বাজার-দর ঠিক থাকে, যতদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন পদ ও বৃত্তির পথ প্রশস্ত থাকে, ততদিন সেই শিক্ষার কোনো সমালোচনা করা দুঃসাহসের কাজ। তার একটা মর্যাদা শুধু ছাত্র, অভিভাবক ও সাধারণ দেশবাসীর কাছেই নয়, এমন কি অনেক শিক্ষকের কাছেও স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয়। যখন এই ডিগ্রি ও চাকরির যোগাযোগটি ছিন্ন হয়ে যায় তখনি ক্রমে সেই শিক্ষার বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হতে আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য, সেই মতামতও শিক্ষার কোনো মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়, প্রধানত সে হল আশাভঙ্গের আক্রোশ।

ইউনিভার্সিটির শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের সাক্ষ্য মূল্যবান, কিন্তু তাও সন্দেহাতীত নয়। কারণ প্রশ্ন উঠতে পারে কারা শ্রেষ্ঠ ছাত্র? যারা সাংসারিক অর্থে কৃতী, না, যারা চরিত্র ও আদর্শবত্তার দ্বারা প্রতিবেশী মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে? প্রথম ধরনের কৃতিত্ব অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য, এবং তার সংখ্যা ও মূল্যনিরূপণও অনেক সহজ কাজ। দ্বিতীয় ধরনের কৃতিত্ব বহুক্ষেত্রে এবং বহুদিনই অপ্রমাণিত থাকে। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারীই একটি স্বাধীন স্বতঃপ্রমাণিত শক্তি হিসাবে সাধারণের স্বীকৃতি অর্জন করতে পারে।

পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও অনেকে শিক্ষা সম্বন্ধে এমন অনিশ্চিত অপরিণত ধারণা পোষণ করেন যে, যে-কোনোরকম চমকপ্রদ ফলশ্রুতি শুনিয়ে তাঁদের শিক্ষার মূলভূমি ও আদর্শ থেকে স্খলিত করা যায়। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করছে। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌ম্‌, ন্যাশনাল সোস্যালিজ্‌ম্‌, কম্যুনিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি মতবাদ শিক্ষাকে আয়ত্তাধীন করেছে নিজ নিজ উদ্দেশ্য পূরণের বৃহৎ যন্ত্র হিসাবে।

এখন শিক্ষার এই বিকারপ্রবণতা, ঘটনা ও চাহিদা অনুযায়ী এর পরিণতিশীলতা— তা ভালো বা মন্দ যে দিকেই হোক— এর সম্বন্ধে বিবেচক ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধানত দু রকমের মনোভাব দেখা যায়। এক: বিশুদ্ধিবাদ বা purism; এই মতের সমর্থকরা চান সমস্ত দাবীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে শিক্ষার বিশুদ্ধ আদর্শ ও রূপটিকে বাঁচিয়ে রাখতে, এবং যা কিছু তার অন্তরায় হতে পারে এমন সকল উদ্দেশ্য ও অধ্যবসায়কে একান্তভাবে বর্জন করতে। আর-এক: উপযোগবাদ বা ইউটিলিটেরিয়ানিজ্‌ম্‌; এর স্বপক্ষীয়রা শিক্ষাকে কোনো অসাধারণ আদর্শের উচ্চলোক বিহারের আভিজাত্য থেকে নামিয়ে আনতে চান দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে। কিম্বা হয়তো উদারভাবে তাকে কাজে লাগাতে চান জীবনের সমস্ত দাবী পূরণে। এঁরা জীবনের কোনো মূল সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শকে স্বীকারই করেন না, মানুষের অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত কোনো সর্বাঙ্গীণ পরিণতির কোনো ধারণা এঁরা প্রাথমিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করেন নি। কোনো বিশেষ সময় ও পরিস্থিতিতে ব্যক্তি ও সমাজের যে সমস্যাগুলি প্রবল হয়ে আমাদের চেতনাকে সদুত্তরের জন্যে বারবার আঘাত করতে থাকে, এঁরা শিক্ষাকে নিযুক্ত করতে চান যথাসম্ভব সেই সমস্যাগুলির সমাধানে। প্রথম দল আদর্শের বিক্ষেপকে ভয় করেন; দ্বিতীয় দল বহু আদর্শের বহুমুখীন বিকাশে বিশ্বাসী। প্রথম দল মূল্যবান মনে করেন

উদ্দেশ্য ও ফলের মধ্যে অবিকারী একটি ঐক্যকে; তাঁদের দৃষ্টিতে সেই ঐক্যমন্ত্রটি পেলে জগৎ ও জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্যের উপর পাওয়া যায় স্বাভাবিক অধিকার। দ্বিতীয় দল চান বৈচিত্র্য। এঁরা বিশ্বাস করেন না সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে কোনো ঐক্যবন্ধন থাকা সম্ভব। জীবনকে একেবারে তার উৎস থেকে প্রভাবিত করা যায়, এ কথা তাঁদের কাছে অবিশ্বাস্য। একে তাঁরা একরকমের বাস্তব জ্ঞান-রহিত শূন্যবিহারী আদর্শবাদ বলেই মনে করেন। এঁরা জানেন তার চেয়ে ঢের বেশী সহজে ও নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রকৃত ঘটনা ও অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই চেষ্টার ফল অবশ্য সাময়িক; তা ছাড়া তা কিছু পরিমাণে অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত হতে বাধ্য। তবু কিছু সাময়িক উপকার তো হয়ই। বিরাট ঐতিহাসিক শক্তিপ্রবাহগুলির সঙ্গে এইভাবে করা যায় সাময়িক আপস। এর বেশী দীর্ঘদর্শিতা ও কর্তৃত্ব এঁরা মনে করেন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের স্পষ্ট অনুভূত প্রয়োজনগুলিকে যথাসাধ্য মেটাবার চেষ্টা করা, সেই প্রয়োজনগুলি পরস্পরকে না আহত করে তার সম্বন্ধে যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করা এবং এর অতিরিক্ত কোনো দুর্লভ সমন্বয়ের আশাকে ঐতিহাসিক স্রোতগুলির মধ্যে দীপের মত ভাসিয়ে দেওয়া ভবিষ্যৎ কোনো সুসময়ের দিকে— এঁদের মতে এর বেশী কিছু করবার নেই। অতএব আজ যদি শিক্ষা বহু-মুণ্ড একটা অসুরের মত হয়ে উঠতে চায়, তাই হোক। তাতেই সে জনগণের ব্যাপকতর সেবা করতে পারবে। এ হল multi-purpose schemeএর যুগ, দশমুণ্ড নয় সহস্রমুণ্ড রাবণের যুগ। এখন একাগ্র হওয়া, single-thoughted হওয়া, শুধু আত্মহত্যা বরণ করা। এই হল দ্বিতীয়দলের যুক্তি।

এই দু রকম মনোভাবও যেমন চিরন্তন, এদের মধ্যে স্বভাব-বিরোধিতাও তেমনি। শিক্ষা জীবনকে তুলে নিতে চেষ্টা করবে নিজের উচ্চতায়, কিম্বা জীবন শিক্ষাকে ব্যবহার করবে নিজের বহুমুখীন শাস্ত্রনিরপেক্ষ অপ্রতিরোধ্য অভিব্যক্তির কাজে। সাহিত্য ও জীবন নিয়েও ঠিক এই ধরনের বিসম্বাদ আজ তীব্র হয়ে উঠেছে। চিন্তালোকের এ এক প্রদোষ-অঞ্চল। এখানে শেষহীন তর্ককে স্ফীত করে তোলা এত সোজা এবং এমন কি শ্রেষ্ঠ যুক্তিকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করা এত শক্ত যে এই ভাবনাই অনেকটা নিষ্প্রয়োজন খেলা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই অস্পষ্ট দেশ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা না থাকলে সমস্ত আলোচনা বারবার পিছলে গিয়ে পড়তে চায় ঐখানেই, একই তর্ক বারবার তুলতে থাকে তার স্পর্ধিত মুণ্ড। কাজেই সেইসব অনুত্তরণীয় তর্ককে ঐ অন্ধলোকে সমাহিত করে এবারে আমরা শিক্ষাদর্শের ভূমি রচনা করব একটি সু-আয়তন সুস্পষ্ট-বিন্যস্ত বিশ্বাসের দ্বারা।

শিক্ষা শব্দটির মধ্যেই একটি বিশ্বাস নিবিষ্ট আছে। সে হল এই যে, মানুষের মন বুদ্ধি স্বভাব চরিত্র সমেত মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশ সম্ভব। শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই নয়, মানবজাতির সম্বন্ধেই এই বিশ্বাস ও আশা শিক্ষার মূল ভিত্তি ও প্রেরণা। যেমন করেই হোক, অবস্থা ঘটনা ও সমস্যাগুলিকে আয়ত্তে আনো— শিক্ষার অভিপ্রায় এ নয়, কখনো ছিল না। তা হলে আদিম অসভ্যরা চিরকালই শুধু শত্রু-পরাভবের কৌশল আয়ত্ত করাকেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলে মনে করত; এবং জৈব প্রবৃত্তির রণক্ষেত্র থেকে মানুষ কোনোদিনই আর বুদ্ধির উন্নততর ক্ষেত্রে উন্নীত হত না। শিক্ষার প্রধান গৌরব এই কথাটা মনে রাখায়। কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে একটা জাতি আত্মরক্ষা ও আত্মসমৃদ্ধির জন্যে অনেক রকম উদ্যোগে লিপ্ত হতে পারে, বিশেষ ব্যক্তি জীবিকা বা প্রতিষ্ঠার জন্যে অনেক কিছুই

করতে পারে। কিন্তু সেইসব সাফল্যের রহস্য অনুধাবন ও প্রচারের দায়িত্ব শিক্ষার নয়। পৃথিবীর ধনকুবেরদের ধনোপার্জন-ক্ষমতা যে-কোনো ইউনিভার্সিটির শিক্ষার ফল নয়। বাণিজ্য-ব্যবসায়ে কোনো কোনো জাতির স্বাভাবিক দক্ষতা আছে; সেও formal শিক্ষার ফল নয়। অসাধুতা ও শঠতার সঙ্গে তাদেরই অস্ত্রে যুদ্ধ ক'রে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব। কিন্তু সেই নিপুণতা শিক্ষা দেবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কোনো ফ্যাকাল্টির প্রবতন করেন না। পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যাবহারিক দক্ষতা ও কৃতিত্বই স্বোপার্জিত।

মোট কথা, শিক্ষা আর শিক্ষণ (trai ing) দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রক্রিয়া আছে। ব্যাবহারিক প্রয়োজন সাধনের জন্যে শিক্ষণের প্রয়োজন আছেই— তা সে ব্যাবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, ইত্যাদি পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই। এই রকম শিক্ষণব্যবস্থার বহুল বিস্তার, যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষসাধন নিশ্চয় একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ। কিন্তু এই রকমের বিশেষ শিক্ষণকে যদি শিক্ষায়তনের অবশ্য কর্মের মধ্যে স্থান দেওয়া যায় তবে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার উত্তেজনা সমস্ত শিক্ষার বায়ুকে দূষিত করতে বাধ্য।

ভেবে দেখলে দেখা যাবে শতাব্দীকাল ধরে মানুষের মন-বুদ্ধি-কল্পনায়, মানুষের সমস্ত উদ্যোগ-অধ্যবসায়ে একটা অনিশ্চয়, একটা অদ্ভুত আত্মদ্বন্দ্বের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। দৃষ্টি গিয়েছে সমগ্র থেকে বিবিধে, প্রসার থেকে সূক্ষ্মতায়, প্রধান থেকে গৌণে। কোনো ক্ষেত্রেই আর মূল একটা প্রেরণার তাগিদ নেই, আছে বহুধাবিভক্ত কৌতূহলের অবিশ্রান্ত অস্থিরতা। অসংখ্য খুচরো নিয়ম, নীতি ও প্রয়োজন আবিষ্কার ক'রে, সেগুলিকেই অসাধারণ দক্ষতায় ঘূর্ণিত ক'রে তুলে সেই সুদর্শন চক্র দ্বারা আমরা জীবনের সূর্যকে আচ্ছন্ন করেছি। এই শঠতা শুধু আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি নয়; আক্রমণ করেছে পৃথিবীর সাহিত্যকে, শিক্ষাকে। সহস্র অবান্তর দাবীর উৎপাতে তাই আজ সাহিত্য ও শিক্ষা দুইই কুয়াশাচ্ছন্ন। আজ প্রধান কর্তব্য এই যুগের যথেচ্ছমিশ্রণ-প্রথার রোধ করা। শিক্ষার স্বরূপকে অনাবশ্যক জটিলতা থেকে মুক্ত করা।

বর্তমান যুগকে আশুফলের দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় এ শুধু একটা সংশয়, বিফলতা, সংঘাতের যুগ। কিন্তু এর অন্তর্লীন একটি মহৎ সংকল্প হয়তো চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট। সেই সংকল্প হচ্ছে স্থানীয়, গোষ্ঠীয় জীবনকে অতিক্রম ক'রে একটি জগৎব্যাপী বৃহৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলিত হওয়া। সেই প্রসারের বেগ শিক্ষা, সাহিত্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, মানসিক ব্যবহারনীতি (ethics) সকল ক্ষেত্রেই সম্ভব অসম্ভব সকল রকম পথেই আঘাত দিয়ে ফিরছে। তাই আজ বিশোধন-প্রস্তাব শ্রেষ্ঠ মনীষীরাও গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করেন, এ যুগের পক্ষে সে হবে এক প্রতিক্রিয়াশীল উদ্যম এই আশঙ্কায়। ইউনিভার্সিটি কমিশনের রিপোর্টই তার প্রমাণ। কিন্তু এই বিস্তৃতির নীতির মূল প্রকৃতি ও অভিমুখ বুঝে নিয়েও কেমনভাবে শিক্ষা ও সাহিত্যের স্বরূপকে রক্ষা করা যায় সেই হল এই যুগের সমস্যা।

বিশোধন আর ব্যাপ্তি এই দুই আদর্শের তফাত একটি উপমার দ্বারা স্পষ্ট করে তোলা যায়। মেলাকে যে জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এ কথা অনেকেই মনে করেন। সেখানে সহজ প্রবেশাধিকার পাবার জন্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি তার আভিজাত্যের উচ্চপীঠ ছেড়ে নেমে আসবে সহজ সৌজন্যে, আবার অপর দিকে জনগণের অসংস্কৃত

প্রবৃত্তি ও মননবৃত্তি মেলার সেই বিপুল জীবনোচ্ছ্বাসের মধ্যে অনুভব করবে এমন একটি অলক্ষিত অভিভাবকতা যা তাদের বিশোধন ও বিকাশের সহায়ক— এই হল সত্যিকার শিক্ষামূলক মেলার আদর্শ। এ আদর্শের মহত্ত্ব স্বীকার করা যায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষের বিভিন্ন স্তরকে একত্রিত করলে কি হয় এ নিয়ে মতভেদ আছে। এককালে অনেকের ধারণা ছিল যে, কোনো তরলপদার্থের মত শিক্ষাও স্বভাবতই আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তি-মন থেকে সমাজ-মনে, উন্নত চিত্ততল থেকে সাধারণ চিত্তভূমিতে এর প্রবাহ স্বতঃসিদ্ধ। আধুনিক মত অন্যরকম। শিক্ষাবিৎরা আজ আর ঐ সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে বসে থাকতে প্রস্তুত নন। ফলে আজ ঐ সংক্রমণ-থিয়োরি তার মান হারিয়েছে। তবু এ কথা ঠিক, তার ভেতর কিছুটা সত্যতা আছেই। যদি তা এতদিন ফল না দিয়ে থাকে তার কারণ এই যে, মানুষদের পাশাপাশি রাখলেই তাদের মিলিত করা হয় না। শহরের সহস্রলোক সহস্র বিভিন্ন উদ্দেশ্যের দিকে ধাবমান। তাদের যোগে বাড়ে শুধু ভিড়। কিন্তু মেলার উৎসবের ডাকে তবু কাছাকাছি আসতে পারে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকৃতির হৃদয় ও মন। এখানেই তবু কিছুটা চিত্তসঞ্চিত রসের প্রবহণ সম্ভব।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার কতটুকু হয়ে থাকে? মেলার মধ্যে একটা স্বতন্ত্র অঞ্চলকে শিক্ষাপ্রদর্শনীতে পরিণত করলে তার দ্বারা শিক্ষিত দর্শকরাই হয়তো বা কিছুটা শেখে। তা ছাড়া সেই তথ্যবিতরণ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই নয়। সমস্ত মেলাটিকে তার অসংখ্য বিভিন্ন চরিত্র ও উদ্যম সমেত যদি একটি গড়পড়-তার নিম্নতম লোক থেকে ঈষদুচ্চলোকের আকর্ষণীয় আবহাওয়ার অন্তর্ভুক্ত করা যেত, যদি সেখানে বইয়ে দেওয়া যেত একটা সুরুচি, সুস্থ শুদ্ধ চেতনার হাওয়া, তবে তারই মধ্যে বুদ্ধি-মন-আকাঙ্ক্ষার হাজার দুর্বল সত্তা এগোতে পারত সুস্থ পরিণতির দিকে। সে কি সহজ কাজ? অর্থব্যয়ে উজ্জ্বল মনোরম পরিবেশ রচনা করা যায়, কিন্তু মনের পক্ষে শুভদায়ক পরিবেশ রচনা কি সহজ কাজ? আজ আমরা যদি শিক্ষাকে তার সগোত্র এবং সম্পূর্ণ বিভিন্নগোত্র অসংখ্য চেষ্টার সঙ্গে একত্রিত ক'রে বর্ধিত করবার চেষ্টা করি, তখন সেও হবে এক মহৎ কিন্তু দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু আমরা যে তা পেরে উঠছি না, পৃথিবীর কোথাও কোনো দেশই যে এই উদ্যমে আশানুরূপ ফল পায় নি তা আমরা ভেবে দেখছি না। ভেবে দেখছি না যে সর্বমানুষের বহুবিস্তৃত পরিবর্তন হবার পরে হয়তো বহুযুগ পরে শিক্ষার এই সর্বাধিপত্য সহজসাধ্য হবে। তার আগে পর্যন্ত যদি আমরা শিক্ষাকে পৃথিবী-জীবনের বিরাট মেলার থেকে স্বতন্ত্র আশ্রমভুক্ত না করি, তবে আমাদের শিক্ষার অধঃপতন ঘটবেই। সে তখন বিচরণ করবে চাতুর্যলোকে, নিউম্যান-কথিত মননের শান্তিলোকে নয়, জাগ্রত আত্মার শান্তিনিকেতনে তো নয়ই।

অর্থনীতির রাজ্যে কুটীরশিল্পের যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌মের দ্বারা। শিক্ষানীতির রাজ্যে, যেখানে উৎপাদক ও উৎপন্নবস্তুর মধ্যে অব্যবহিত ব্যক্তিগত যোগের আবশ্যক, সেখানে এখনও অনেককাল কুটীরশিল্পের রীতিই চলবে এবং চলা উচিত। সেখানেও হঠাৎ বৃহৎ কর্মশালার পত্তন করে দ্রুত পাইকারি উৎপাদনের চেষ্টা হবে মানুষের সংস্কৃতির পক্ষে মর্মান্তিক। আমাদের ধৈর্যের সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে শিক্ষার অপেক্ষাকৃত মন্থর রীতি, এবং তার ফলে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে আশা করব সার্থকতার সৃষ্টি; শুধু সংখ্যা নয়, ব্যক্তিগত উৎকর্ষ; যান্ত্রিক সাদৃশ্য নয়, শেষহীন বৈচিত্র্য; ফরমায়েশি জীব নয়, জীবন্ত মানুষ।

আজ আমাদের শিক্ষাকে সমস্ত অলংকার, অবান্তর উপযোগিতা, অনর্থক আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত করার দিন এসেছে। তার অমিশ্র পরিস্রুত রূপটি আজ দেখতে হবে; শিক্ষার্থী, শিক্ষাব্যবসায়ী, দেশবাসী— সকলের সামনে সেই রূপটিকে একটি স্থিরজ্যোতিষ্কের মত জাগিয়ে রাখতে হবে। অতীতের দীর্ঘ ইতিহাস আজ শিক্ষার সর্বজীবনব্যাপী বিচিত্র সম্ভাবনা যেমন ফুটিয়ে তুলেছে, তেমনি বিভ্রমবিক্ষেপহীন শিক্ষার নিজস্ব ক্ষেত্রটি চিনে নেবারও যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে। যে-কোনো দেশ নিজের চরিত্রে সম্পূর্ণস্থিত হয়ে তবেই আন্তর্দেশিকতায় পৌছতে পারে; শিক্ষাকেও তেমনি সম্পূর্ণভাবে আত্ম-চরিত্রের প্রতিষ্ঠা ক'রে তবে হাত দিতে হবে শিক্ষাতিরিক্ত কর্মে। আজ আমাদের চিনে নিতে হবে সেই শিক্ষাকে যা গভর্নমেণ্টের কোনো উচ্চ পদ বা কর্তৃত্বের দিকে প্রার্থীদের অগ্রসর ক'রে দেবার দায়িত্ব স্বীকার করে না, জীবিকার্জন-প্রতিযোগিতায়ও কারও পৃষ্ঠপোষকতা করবার চেষ্টা করে না। জীবনসংগ্রাম— পশ্চিমীরা যাকে বলেন struggle for existence— সে হল অন্ধ জৈব নিয়ম, সে হল প্রাণীর অশিক্ষিতপ্রবণতা। হিংসা ও স্বার্থের অশিক্ষিতপটুত্ব সেই আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত জীবিকার সংগ্রামে সাফল্যলাভ করেছে। শিক্ষা চিরকাল দাঁড়িয়েছে এর বিরুদ্ধে। অন্যায় হিংসাকে সে বাঁধতে চেয়েছে বীরত্বের মহৎ আদর্শে। সংগ্রামকে সে আয়ত্ত করতে চেয়েছে সঙ্ঘবদ্ধ সৃষ্টিকর্মে। সে যে চরিত্র, যে ক্ষমতা গ'ড়ে তুলবে, জীবিকা তার ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু সেই ন্যায্য প্রাপ্য কোনো বিশেষ উপায়ে বিশেষ ফন্দী-ফিকিরে তাকে পাইয়ে দেবার দায়িত্ব শিক্ষার নয়। সে দায়িত্ব সমাজের, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের, স্টেটের।

সেই সঙ্গে আরো একটি প্রলোভন থেকে শিক্ষাকে মুক্ত রাখতে হবে। গবেষণা ও বিশেষজ্ঞতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা স্থান পাবেই। কিন্তু সে স্থান হবে পরিমিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত অঙ্গনে তাকে সম্মানের বেদীতে স্থাপন করলে চলবে না। তাকে পাঠাতে হবে কোনো পাশ-কামরাতে। অর্থোপার্জন মূল্যবান কাজ, তাই বলে বাড়ী ও অফিস, কেউ সম্পূর্ণ এক ক'রে ফেলে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন অনেক কর্মধারা থাকবেই, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রেরণা ও কীর্তির ওপর নির্ভরশীল, অনেক পরিমাণে তারই থেকে স্বাভাবিক নিয়মে নিঃসৃত, এমন কি অংশত তার মূল উদ্দেশ্যের সহায়ক, তবু সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ লীন নয়। আণবিক শক্তি নিয়ে গবেষণা করলে তার ফল বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করবে। পুরানো কোনো রাজত্ব বা যুদ্ধের তারিখ সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তকে বিশ্ববিদ্যালয় উপেক্ষা করতে পারে না। পুঁথির কীটদষ্ট পাতা থেকে অনেক ধৈর্যে যে তথ্য সঞ্চিত হয় তার স্বাভাবিক গ্রহীতা ও আশ্রয় বিশ্ববিদ্যালয়। অনেক সময়েই অবশ্য গবেষণার নামে যে কাজ চলে তা জ্ঞানবর্ধন করে না, করে শুধু তথ্যবর্ধন। নিছক সংবাদেরও মূল্য নেই তা বলি না; কিন্তু সংবাদ যখন সার্থক বাণীরূপ গ্রহণ ক'রে আসে তখন তাকে বলি জ্ঞান। তখন তাকেই শুধু পৃথক্ তথ্য হিসাবে পাই না, পাই সত্যের একটি নতুন কক্ষদ্বার খোলবার চাবি। এই জ্ঞানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন যেখানে সাধিত হবে সেই প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয় যুক্ত থাকা উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে, দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা অনুযায়ী হোক সেই প্রতিষ্ঠান দ্রুত সমৃদ্ধিমান্; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে দেশবাসীকে নিমন্ত্রণ করবে সেই স্থানের আবহাওয়া হওয়া চাই অনেক উদার বিস্তৃত। সেখানে কোনো একটি চিন্তার অভিযান নয়, সেখানে সমস্ত জীবন্ত

চিন্তাগুলিকে পাশাপাশি স্থান দেওয়া, তাদের পরিবারবন্ধনে বাঁধা। গবেষণা যতদিন পুঁথির পাতায় বা অবেক্ষিত dataর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তখনও হয়তো তা প্রশংসার যোগ্যতা পায়; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সদর আঙিনায় তার মহৎ প্রবেশ তখনই সম্ভব যখন তার অনুসন্ধান তথ্যের ব্যূহ অতিক্রম ক'রে জীবনকে স্পর্শ করেছে। এমন গবেষক হয়তো থাকেন লক্ষের মধ্যে এক জন, যাঁর আবিষ্কার বা সত্য-উন্মোচন সমস্ত জীবনকে করে প্রভাবিত। কিন্তু তাঁদেরও চেষ্টা চলে নিভৃতে। সেই চেষ্টার, আদর্শের একটা রশ্মি পড়ুক এসে শিক্ষার ক্ষেত্রে। তার সাফল্যের পাকাফলটি উঠুক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে। তার বেশী আর কিছু নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কৃত্যের মধ্যেও খুব বড় রকমের একটা সন্ধান কর্ম, একটা একনিষ্ঠ সাধনা আছে। প্রচলিত গবেষণা সেই সাধনার গভীরতা, দাবীর বিভ্রমজনক বৈচিত্র্যকে সভয়ে পাশ কাটিয়ে চলে। কোনোক্রমে কিছু তথ্যকে একটা চলনসই প্যাটার্নের মধ্যে গেঁথে ফেলার ক্ষেত্র সে নয়। নিছক বুদ্ধির রচনাকৌশল সেখানে অবাঞ্ছিত। সেখানকার মুক্ত প্রাঙ্গণ এতদিন যেসব বুদ্ধির কারিগরিতে কণ্টকাকীর্ণ ছিল, আজ তাদের উন্মূলিত করে আবার স্বাস্থ্য ও জীবনময় আলোহাওয়া বইয়ে দেবার সময় এসেছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মূল উদ্দেশ্যটি হচ্ছে জীবনরচনা। এই সৃষ্টিকর্মে অনেক উপাদান আবশ্যক— ইতিহাস, দর্শন, সমাজ-অর্থ-রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান, সাহিত্য সংগীত চারুকলার অনুভূতি ও রসবোধ, সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনযাপনে বিভিন্ন বাঞ্ছনীয় মনোভঙ্গী ও কৃতিত্ব, সমস্ত পৃথিবী ও বিশ্বজগতের দিকে অবাক্ উন্মুখ চিত্তের মধ্যসঞ্চিত অনামিত অচিহ্নিত কত চিন্তার ইঙ্গিত, কত ভাবের আকুতি, কত অস্পষ্ট বোধের উপক্রম। প্রতিটি শিক্ষার্থী এই বিভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রে পাবে সহজ সঞ্চরণের অধিকার। সে শুধু কয়েকটি বিষয়ই শিখবে না। প্রতিটি বিষয়ের মূল অভিপ্রায়ের সঙ্গে নিজের চিত্তকে মিলিত করতে শিখবে, এবং সকল বিষয়ের বিভিন্ন অভিপ্রায়ের সামঞ্জস্য কত বিচিত্র রকমে সম্ভব তার সন্ধান করবে। এই হল নিউম্যানের ইনটেলেক্চুয়্যাল পীস্। বুদ্ধিগত সাম্যের সাধনা। তার পরে নিজ মনের আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, অভীপ্সার সঙ্গে, নিজ জীবনের পর্যবেক্ষণ, অনুভূতি, বেদনার সঙ্গে এই বুদ্ধিদত্ত প্যাটার্নকে কতদূর ও কেমন ক'রে মিলিয়ে নেওয়া যায় তাই দেখতে হবে। এই দ্বিতীয় সমন্বয়ের ফলে উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে চরিত্রের কোরক। তখন সেই চরিত্রকে দাঁড়াতে হবে দেশকাল গোষ্ঠীর সাময়িক পরিস্থিতির মাঝখানে। সক্রিয়তার দ্বারা দেখে নিতে হবে যা হওয়া উচিত, ঘটা উচিত আর তখনকার বাস্তবক্ষেত্রে যা হওয়া ও ঘটা সম্ভব তার ব্যবধান। এই হল চরিত্রের চরম পরীক্ষা। তাকে শেষবিবেচনায় স্থির করতে হবে সে থাকবে ঐ উচিতেরই দিকে, কিম্বা নিজেকে ক্ষুণ্ণ ক'রে, নিজের আদর্শের অপ্রতিভতা স্বীকার ক'রে সাফল্য শিকার করবে যা হয়ে থাকে ঘটে থাকে তারই আওতায়। বিভিন্ন আদর্শের মিলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব সন্তান জীবনের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হবে তারা হবে এক-একটি নতুন সম্ভাবনার মত। স্বাধীনতাই হবে তাদের লক্ষণ, তাদের গৌরব। চিরাগত প্রথা, নীতি, সংস্কারের সঙ্গে ইচ্ছামত তারা করবে সন্ধি বা সংগ্রাম। এই নতুন বংশবিস্তারই বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল কাজ। তাকে তৈরী করে দিতে হবে জীবনের শিল্পী, জীবনের সৈনিক। পৃথিবীতে মানুষজাতির সবচেয়ে বিশাল, চিরন্তন যে কর্মকাণ্ড— সার্থক ভাবে, নূতনতর উন্নততর ভাবে, বৃহত্তর সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের মধ্যে বাঁচার সাধনা— অতীত ও বর্তমানের, নিকট

ও দূরের, প্রধান সূত্রগুলি গুছিয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এই বিরাট জীবনযাত্রার রথকে আকর্ষণ করা— সেই হল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্ষেত্র।

আজও কি আমরা মুখে ঘোষণা করব যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সর্বার্থসিদ্ধির কল্পতরু, চরিত্রের জন্মদাত্রী, কিন্তু কাজের বেলায় রাখব শুধু বুদ্ধির ব্যায়ামকৌশল, কিম্বা তাও নয়, বুদ্ধির দিনমজুরি। আশা করব আমাদের শিক্ষার্থীরা কয়েকটা ফরমূলার রজ্জুতে বেঁধে নিয়ে যাক তথ্যের গন্ধমাদন। আজও কি আমরা প্রচার করব শান্তি সাম্য সুবিচারের আদর্শ, এবং শিক্ষাকে স্থাপিত করব ক্ষুরধার প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে? শিক্ষার বাইরে কোনো সাফল্যই যে শিক্ষার সাফল্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নয় এ কি আজও আমাদের বুঝতে হবে না? লোকজীবনের মধ্যে যে অপ্রমাণিত নিপুণতা, নেতৃত্ব, মহত্ত্ব কোনো পুরস্কার বা স্বীকৃতির অপেক্ষা না রেখে আপনাকে প্রকাশ করে, জীবনের ও সভ্যতার সমস্ত সম্পদ্ ও সম্ভাবনাকে রক্ষা করে, অগ্রসর করে— আজ যদি আমরা তার মধ্যেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পরিণতি দেখতে না পাই, যদি সেই পরিণতি কোনো চমকপ্রদ কীর্তির জ্যোতিস্ফুরণেই মাত্র দেখবার প্রত্যাশা করি— তবে শিক্ষা চিরকালই থাকবে অন্য কোনো অভিপ্রায়ের বা স্বার্থের, ভিন্ন কোনো দেবতা বা অসুরের সেবাদাসী হয়ে।

৪

সমস্ত গোলযোগের মূল কারণ এই যে, আমরা এই যুগের পৃথিবীব্যাপী একটি ব্যাধির গ্রাস থেকে কিছুতেই নিজেদের মুক্ত করতে পারছি না। আমাদের সকল ধারণায়, সিদ্ধান্তে, চেষ্টায় সেই ব্যাধির উপসর্গগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ছে। সে ব্যাধি হল অসমঞ্জস স্ফোটকের মত, টিউমারের মত বুদ্ধিবৃদ্ধি। জীবনের অন্য সকল প্রয়োগ ও প্রয়োজনকে পিছনে ফেলে রেখে এই যে মাস্তিষ্ক অন্যায়রকম স্পর্ধিত হয়ে উঠেছে, আমরা মুখে যাই বলি, তার ওপর এখনও সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করে বসে আছি। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুধু বারংবার মস্তিষ্কটাকে অঙ্কুশবিদ্ধ করেই মনে করি কাজ চলছে। যে বার্তা, যে প্রেরণা দেবার আছে, বুদ্ধিকে তার কাছে নত করলেই বুঝি তার প্রতিগ্রহ সম্পন্ন হল। আমরা বিশ্বাস করি মানুষের মাথাটা যা নেবে মানুষটাও নিশ্চয় তাই নেবে। এই বিশ্বাস যে কি নিদারুণ ভ্রম তা আজকের সংঘাতময় পৃথিবীর দিকে চাইলেই বুঝতে দেরী হয় না। ভালো ভালো কথা, নীতি, অভিজ্ঞতার সারমর্ম আজ যত সুলভ— গ্রন্থে, সংবাদপত্রে, বেতারে সমস্ত জগৎ জুড়ে যত দ্রুত সঞ্চরমান— এমন আর কখনো হয় নি। কিন্তু যারা সত্যিই বুদ্ধিমান, যারা শুধু স্মৃতির ক্লিষ্টপিঠে এই দীর্ঘসঞ্চিত চিন্তা ও আদর্শের ভার বহন করে না, তারা আজও বিদ্যাকে এক সম্পূর্ণ লাভজনক ব্যবসায়ের মূলধন হিসাবে ব্যবহার করছে। তাই আজ বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ দানই হিংসার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হয়ে উঠেছে। আজ কে কাকে বোঝাবে যে ফরমূলাগুলো শুধু মস্তিষ্কগত করলেই হবে না, হৃদয়ঙ্গমও করতে হবে, কে বোঝাবে যে ফরমূলাগুলো আর কিছু নয়, শুধু ব্যাবহারিক সুবিধার জন্যে অতিসরলীকরণ? শুধু সেইগুলোকেই বুঝলে সেইগুলোকে যথার্থ বোঝা যায় না?

পৃথিবীতে এক সময়ে গেছে শারীর উৎকর্ষের অধ্যায়। তখন ধনুর্ধর হয়ে ওঠাটাই ছিল শ্লাঘনীয়। তার পর এল প্রবৃত্তি-সংস্কারের যুগ— ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও কামনাদমনের দ্বারা আত্মপ্রভুত্ব লাভের চেষ্টা।

তখন একেবারে নির্বারিতপ্রশ্ন বিগলিতবুদ্ধি উদ্ভিদ্‌-জীবনও প্রশংসা লাভ করেছে। আমাদের দেশে একসময়ে প্রবল হয়েছিল ঐ উদ্ভিজ্জতারই পরিপোষক এক ধরনের প্রবৃত্তি ও হৃদয়ভাবের চর্চা। তখন মাতৃত্ব ভ্রাতৃত্ব সতীত্ব ইত্যাদি অস্বাভাবিক পুষ্টি ও রসাধিক্য অর্জন ক'রেছিল। যখন শুরু হল বুদ্ধির রাজত্ব, তখন তার কল্যাণ অবিলম্বেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু এখন বুদ্ধি নিজের ক্ষমতাকে অতিক্রম করেছে। বুদ্ধির কাজ সংশোধন, শৃঙ্খলাময় শাসন। কিন্তু যে ভাব, অনুভূতি, আবেগ, চরিত্রকে নিয়ে তার কাজ তাদেরই সে সমূলে বিনাশ করেছে। একচ্ছত্র বুদ্ধিকে স্থানচ্যুত করে তাই পৃথিবীময় বেধেছে বহু বিচিত্র বুদ্ধির সংঘাত।

ইতিহাসের এইসমস্ত অভিজ্ঞতাকে আমাদের সতর্কতার মধ্যে মিলিত ক'রে এবারে সিংহাসন ছেড়ে দেওয়া হোক বুদ্ধিরও অতীত জীবনবোধকে। তারই মধ্যে মিলুক ইন্দ্রিয়, হৃদয়, বুদ্ধির সমস্ত প্রাচীন সার্থক প্রাপ্তি। পাশ্চাত্য humanismও বুদ্ধিগঠিত প্যাটার্ন মাত্র। এই জীবনবোধ তার চেয়ে অতিরিক্ত, তাকে অন্তর্লীন করেও আলাদা আর একটা কিছু। মানুষের চিত্তের সে একটা বিশেষ, মহত্তম শক্তির প্রকাশ। দেশে-বিদেশে বহু মহাত্মার জীবনে তার উদয় দেখা গিয়েছে এবং সকল মানুষের জীবনেই সেই নূতন বোধ, নূতন চেতনার উদ্ভব সম্ভব। এমন কি একথাও বলা যায় সর্বদেশেই শিক্ষিত এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎসংস্পর্শের দ্বারা ক্রমশ বেড়ে উঠেছেন সেই চেতনার দিকে। তাকে আধ্যাত্মিক বলতে যদি বাধে নাহয় নাই বললাম। রবীন্দ্রনাথের religion of man ঐ একই বস্তু, কিন্তু religion শব্দটা আজকালকার রসনায় হয়তো বিস্বাদ ঠেকবে। কিন্তু নাম যাই দেওয়া যাক, এই সর্বাঙ্গীণ বোধের সাধনাই সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের একান্ত সাধনা— এবং সেই সাধনার কেন্দ্রভূমি একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ই হতে পারে, এই স্বীকৃতি আজ না হোক কিছুদিন পরে দিতেই হবে। তবে আজই কেন শুরু হবে না সেই নূতন সূচনা।

শুধু যদি এই জীবনবোধকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসাবে মেনে নিই, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ব্যবস্থা নীতি প্রক্রিয়া কত স্পষ্ট, কত স্থিরলক্ষ্য হয়ে আসে। ইউনিভার্সিটি কাদের জন্যে— এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে আসে সোজা। সকল দেশেই এমন অনেকে আছে যারা ধনমান শক্তিকে অস্বীকার করে না, কিন্তু কেবল ঐসবের জন্যেই বাঁচতে প্রস্তুত নয়। তারা জন্মগ্রহণ করে হৃদয়ে একটি আলোর কণিকা নিয়ে, তাকেই দীপ্ত বিস্তৃত ক'রে জীবনের রহস্যের উপর ফেলে তারা জানতে চায় জীবনকে। তারা জীবিকা অর্জনও করে, হয়তো বা উদয়াস্ত ঘোরে দাসবৃত্তি ক'রে— তবু তাদের মুখ ফেরানো থাকে ধর্ম সাহিত্য সংগীত চিত্রকলার দানের দিকে। প্রকৃতির অপর্যাপ্ত দানবর্ষণের নীচে এরা পাতে অঞ্জলি। মানুষের সমাজজীবন, পারিবারিক জীবনের স্নিগ্ধতা ও সৌরভগুলি এরা উপভোগ করে, রক্ষা করে, সাধ্যমত তাদের পরিবর্ধনের চেষ্টাও করে। এরা পিতৃত্ব বন্ধুত্ব পতিত্বের মধ্যে পায় উচ্চাশার তৃপ্তি। এরা দেশ জুড়ে মেলে ধরে থাকে সৌজন্য শালীনতা, সংস্কৃতির একটি মৃদুস্নিগ্ধ আবহাওয়া। দলগত প্রচারের অন্তরালে দেশের যে জনমত, যে ঘটনা ও পরিস্থিতি বোধ, যে জাতিচরিত্র বহুযুগ ধ'রে গ'ড়ে ওঠে— যার ওপর নির্ভর করে স্টেটের সমস্ত প্ল্যান ও প্রচেষ্টার সাফল্য, সমস্ত নির্মাণ ও সংস্কারচেষ্টার ভবিষ্যৎ—সেই বৃহৎ বোধের এরাই বাহক এবং পোষক।

আমাদের নেতা ও কর্তারা ভুলে থাকেন এই দেশবিস্তৃত বোধ ও ধারণাশক্তিই দেশের প্রধানতম শক্তি। সমাজের উপরের স্তরে যে সব মহৎ কীর্তির চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হতে থাকে, যা দেখে আমরা জাতির সৌভাগ্য সম্বন্ধে আশান্বিত হই, যা নিয়ে আমরা গর্ব করি— তার মূল্য অতি সামান্যই যতক্ষণ না তা প্রবেশ করে সেই বৃহৎ বোধমণ্ডলে। এই মণ্ডলের উচ্চতা, উৎকর্ষই যে-কোনো দেশের মোট লাভের অঙ্ক। যারা বিশেষ ক'রে এই জীবনের প্রজা, তা ছাড়া অতিভৌম আনুগত্য যাদের নেই, যারা স্নান আহার গৃহসজ্জা উদ্যান-রচনা প্রভৃতি আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ কাজেও নিজের সমস্ত আনন্দ ও উদ্ভাবনশক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগকে অপব্যয় বলে মনে করে না, যারা সামাজিক মিলন, উৎসব-আলোচনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে, যারা নিছক ভালোবাসার দায়ে দেখে ফেরে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন জীবনপ্রণালী, অযাচিত উপকারে যায় এগিয়ে, পল্লীগ্রামের ফুটোচাল কুঁড়েয় বসে ভাবে কি বিচিত্র এই মানুষ আর এই পৃথিবী, ছোটখাট উদ্যমে আবিষ্কারে সংগঠনে চির আকর্ষণীয় ক'রে রাখে জীবনের আঙিনা দালান পথঘাট প্রান্তর ট্রেন ট্রাম বাস— তারাই খোঁজে শিক্ষার জন্যে শিক্ষা। আজকের দিনের অতিদ্রুত অতিসাফল্যের মোহে অন্ধ হয়ে যেন আমরা অস্বীকার না করি এদের অস্তিত্ব। মানুষজাতির মধ্যে একটা বেশ বড় অংশ শিক্ষাসচেতন, স্ফুটনোন্মুখ মন নিয়েই তারা জন্মায়। অন্য কোনো কামধেনু তারা খোঁজে না, তারা খোঁজে জীবনধেনুর দুগ্ধ। এদেরই সহজাত প্রবণতাকে সুযোগ দেওয়াই ইউনিভার্সিটির প্রথম দায়িত্ব। এরা আত্মতৃপ্ত, তাই এদেরই পক্ষে সম্ভব জীবনকে নিয়ে পরীক্ষা করার দুঃসাহস, জীবনের জন্যেই জীবন-উৎসর্গ। এদের জন্মগত অধিকার জীবনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এবং জীবনকে প্রভাবিত করা। এদেরই জন্যে ইউনিভার্সিটি। কোনো দেশে কোনো বিশেষ যুগে নির্দিষ্ট বা নির্ধার্য যে সংখ্যা উচ্চশিক্ষার সহজ দাবী নিয়ে জন্মায়, কোনো বিপরীত ঘটনার পেষণে যেন তারা পথভ্রষ্ট না হয়, যেন তারা সম্পূর্ণ আনুকূল্যের দ্বারা আশ্বাসিত হয়ে তাদের তীর্থে এসে পৌঁছোয়—এই হওয়া উচিত ইউনিভার্সিটির প্রয়াস। সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো একদিন সমগ্র মানবজাতিই চিত্তসম্পদের এক উন্নততর গ্রামে উঠবে, তখন হয়তো ইউনিভার্সিটি হবে প্রাইমারি শিক্ষার মতই সাধারণ। কিন্তু সব সময়ে মনে রাখতে হবে এই সংখ্যাটি কারো মন-গড়া নয়, কোনো নীতি বা দাক্ষিণ্যপ্রসূত নয়, এ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। গণনার দ্বারা দেশের প্রকৃত লোক-সংখ্যাই নির্ণয় করতে হয়, তেমনি অনুসন্ধানের দ্বারাই ইউনিভার্সিটির যোগ্য প্রবেশকদের সংখ্যাও নির্ণয় করতে হবে।

ইউনিভার্সিটি কিসের জন্যে, কি-ই বা তার কর্মরূপ— এ প্রশ্নেরও স্পষ্ট দ্বিধাহীন উত্তর দেওয়া সম্ভব। ইউনিভার্সিটি বুদ্ধিচর্যার জন্যে নয়, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক বা ব্যবসায়িক নির্দেশ অনুসারে বিশেষ কৌশল ও মনোভঙ্গী সম্পন্ন মানুষ তৈরীর জন্য নয়, এমন কি বিদ্যার স্বতন্ত্র সুদূর সূত্রানুসরণের জন্যেও মুখ্যত নয়। কোনো বিশেষ একটি আদর্শের প্রচারযন্ত্রও ইউনিভার্সিটি নয়। ইউনিভার্সিটি যথাসম্ভব উন্নত উপযুক্ত এবং সার্থক ভাবে বাঁচতে শেখার বিচিত্র বহুবিকল্প এক্স্‌পেরিমেণ্ট। সেখানে এসে দিনে দিনে প্রতিটি ছাত্র খুঁজে নেবে তার নিজ প্রয়োজনমত জ্ঞান সংবাদ নীতি আদর্শ, গ'ড়ে তুলবে তার চরিত্র; সেই চরিত্রকে ক্রিয়াশীল করে আবিষ্কার করবে তার নিজের বিশিষ্ট জীবন। কোনো মতামত তাকে নিতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু কেমন ভাবে সুসঙ্গত মতামত গঠন

করতে হয় তা তাকে শিখতে হবে। আদর্শ নির্বাচনে সে স্বাধীন, কিন্তু কতটা যুক্তিসহ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাত সহনক্ষম হলে তবে আদর্শকে ঐ আদর্শপদবাচ্য ব'লে স্বীকার করা যায় তা তাকে জানতে হবে।

এই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তবে তার কর্মরূপ হবে তারই অনুযায়ী। বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির যান্ত্রিক ব্যবহারকে পরিহার ক'রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে অঙ্গন রচনা হবে সকল অভিজ্ঞতার। লোকে গান গেয়েই গান শেখে এবং তার ফলে গানই গায়। জীবনের সকল কাজেই আরম্ভ অভ্যাস এবং ফলের এই সামঞ্জস্য আছে। শিক্ষাতেও তাই বাঁচার চেষ্টার দ্বারাই বাঁচতে শিখতে হবে। সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তি বিশিষ্ট স্বাধীনভাবে ভাববে, উপভোগ উৎসব আলোচনা আন্দোলন সংগঠন সেবায় ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করবে বলে আশা করা যায়। সেইসমস্ত শিক্ষিতজনোচিত ব্যবহার ও কর্মের সূচনা হবে ইউনিভার্সিটিতে।

সেখানে নিষ্ক্রিয়ভাবে বক্তৃতাগলাধঃকরণের পাট আর থাকবে না। যে অনুরাগ, প্রশ্ন, interestগুলি নিয়ে ছাত্ররা ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করেছে (আগেই ধরে নেওয়া হয়েছে যাদের এমন কোনো মানসিক ও চারিত্রিক প্রয়োজন নেই তারা অন্য কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে প্রবেশাধিকার পাবে না) সেইগুলিকে শিক্ষকের সহযোগিতায় দেওয়া হবে স্বাধীন বিচরণের অধিকার সুপরিকল্পিত লাইব্রেরিতে। আলোচনা-সভা হবে এই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। বুদ্ধিহীন অতিশয়োক্তি, অসংলগ্নতা, ভাবালুতা, অস্পষ্টতা প্রভৃতি ত্যাগ ক'রে কেমন করে ফলপ্রসূ আলোচনা করতে হয় তাই শিখবে ছাত্ররা। শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রকে ব্যক্তিগত কথোপকথনে তার মতামত, ব্যবহার ও আদর্শের অযৌক্তিকতা বা অপূর্ণতা দেখিয়ে দেবেন। বক্তৃতার অবশ্যকর্তব্যতা নিবারিত হলেই এই ব্যক্তিগত মনোযোগ দুঃসাধ্য হওয়ার কোনো কারণ নেই। তা ছাড়া থাকবে সাহিত্যসভা। তার মধ্য দিয়েই ছাত্ররা প্রকাশ করবে তাদের সঞ্চয়, তাদের আবিষ্কার, তাদের রসানুভূতি। এর মধ্য দিয়েই শিক্ষক পাবেন ছাত্রদের জ্ঞানোন্নতির মাপ। এই তাদের আনন্দময় পরীক্ষা। একত্রজীবনের নানা আয়োজন, মিলিতপ্রচেষ্টা কর্তব্যপালনের মধ্য দিয়ে শিক্ষক যাচাই করে নেবেন এদের প্রত্যেকের মতামত ও আচারব্যবহারের সামঞ্জস্য বা তার অভাব, এদের চরিত্রের সবলতা দুর্বলতা।

শিক্ষা সমাজের জন্যে না ব্যক্তির আত্মোন্নতি ও চরিতার্থতার জন্যে এই প্রশ্ন পাশ্চাত্য শিক্ষাচিন্তাকে বেশ কিছুকাল বিতর্ক ও বিভেদে লিপ্ত রেখেছে। এ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া শক্ত যতদিন আমাদের বোধরীতির পরিবর্তন না হয়। আমরা ভাবতে অভ্যস্ত যে সমাজ ব্যক্তির থেকে স্বতন্ত্র একটা বৃহৎ শক্তি, তার দাবীর কাছে ব্যক্তিকে অধীনতা স্বীকার করতে হয়, নইলে বাধে ঘোর অশান্তি। এ কথা সাধারণ জীবনে অসত্য নয়। কিন্তু শিক্ষা যে জ্ঞানের সাধনা করে তার চক্ষুতে সমাজ ও ব্যক্তি পরস্পরনির্ভরশীল। তাদের একটি আর-একটিকে আকর্ষণ করে, আলিঙ্গন করে; মিলিত হবার অদম্য প্রয়াসে প্রশ্রয় দিয়ে, আঘাত দিয়ে নিজের মত করে বদলে নিতে চায়, আবার প্রশ্রয় পেয়ে প্রত্যাঘাত পেয়ে নিজেকেও বদলে ফেলে। আলাদা এর প্রত্যেকটিই অপূর্ণ, অর্ধেকমাত্র। কাজেই কে কার জন্যে সে তর্ক শিক্ষার নয়, সে মল্লযুদ্ধ রাজনীতির। শিক্ষা স্বীকার করে দুয়েরই স্বাধীনতা, বুঝে নিতে চায় ব্যক্তি ও বৃহতের মিলনলীলা। তাই শিক্ষার একটি প্রধান বিষয় মানুষ, ব্যক্তি ও সমাজের আকর্ষণ বিকর্ষণ স্বীকরণ ও

বহিষ্করণের মধ্যে তার মুক্তির রূপ। তাই পাশ্চাত্যদেশে দেখা যায় পুরোনো মানবিকতার (humanism) আদর্শ ভেঙে পড়ছে। তার কারণ এই আদর্শ আজ ব্যক্তির স্বাধীনতার পোষক না হয়ে তার জীবনের প্রভু হয়ে উঠতে চেয়েছে। তাই এক দিকে রহস্যবাদ, নির্জ্ঞানবাদ, স্বভাববাদের দ্বারা অন্তরের মুক্তি, আর অন্যদিকে সহজীবনবাদ (unanimism), সমাজবাদ (লক্ষ্যণীয় এই যে এই সমাজ অজাত সমাজ, বর্তমান ব্যক্তিনিপীড়ক সমাজ নয়) প্রভৃতির দ্বারা বাহিরের মুক্তি ব্যক্তির প্রয়াসকে উদ্দীপিত ক'রেছে। এই বৃহৎ জীবনের ক্ষেত্রেই তো শিক্ষাকে বসাতে হবে বিচারদণ্ড হাতে দিয়ে। The proper study of mankind is man। অসংখ্য চক্ষু কর্ণ স্পর্শ রসনা ঘ্রাণের দ্বারা যে বৃহৎ মানব জগৎকে জানছে, মনের দ্বারা উপভোগ করছে, অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে, তার বৃহৎজীবনে নিজের জীবনকে মিলিত না করলে যা জানবার তা কিছুই সম্পূর্ণ ক'রে জানা হয় না, যা অন্তরের মধ্যে চরিত্রের মধ্যে পাবার তাকে সক্রিয়ভাবে কিছুতেই পাওয়া যায় না। এই সংযোগের দ্বারা ব্যক্তির নিজের নিজত্বটুকুই ফুটে ওঠে। সেই পূর্ণপ্রকাশিত, পূর্ণক্রিয়াশীল আত্মাই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য। বুদ্ধির সমস্ত প্রাপ্তি ও কৃতিত্বের পরেও যারা এই আত্মাকে পায় না, সেই অকৃতাত্মারা যত্ন সত্ত্বেও কিছুই দেখতে পায় না, বুঝতে কিছুই পারে না। যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ। তাই শিক্ষায়তনে আজ প্রধান কাজ এই জীবনের ভূমিকা রচনা করা।

কয়েকটি মানুষকে একত্রিত করলেই হয় জীবনের সূচনা। অন্তত তাই হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, বহু স্থুল সূক্ষ্ম বাধা জীবনের প্রবাহকে করে খণ্ডিত। সান্নিধ্যটুকু থেকে যায় কেবল ভৌগোলিক। কেমন ক'রে সংস্কার সংকোচ সংকীর্ণতার পাশ ছিঁড়ে ব্যক্তিজীবনকে মুক্তি দিতে হয় মিলিত-জীবনের মধ্যে, কেমন ক'রে সেই মিলিতজীবনের বিভিন্ন প্রবণতার প্রত্যেকটিকে যোগ্য স্থান দিয়ে মোট সম্ভাবনার ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়— সেই তত্ত্ব যিনি সন্ধান করেন, জানেন, তিনি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকুন বা তার বাইরে থাকুন, তিনিই তো হলেন শিক্ষক, গুরু, জীবন ও জ্ঞানের নেতা। তিনিই নিরভিমান কৌতূহলে লক্ষ্য করেন প্রতিটি মানুষ কেমন করে চরিত্রের জট ছাড়িয়ে খুঁজে পায় নিজের আভ্যন্তরিক সমাধান ; তিনি জানেন একের চিন্তা ভাব আদর্শ কেমন করে ব্যাপ্ত হয়ে সমৃদ্ধতর হয়ে স্থান পায় সমাজচিত্তে। সংস্কার সেবা সংগঠনের দ্বারা ব্যক্তিচিত্ত থেকে সমাজচিত্তের সংক্রমণপথ প্রশস্ত করে তোলাই শিক্ষার সত্যকর্ম। সেই কর্মের নায়ক হতে হবে শিক্ষককে।

তাই শিক্ষকনির্বাচনে প্রধান বিচার্য হওয়া উচিত কার এই বৃহৎজীবনে কতটা প্রবেশ আছে। তিনি শুধু গ্রন্থকীট নন, শুধু পণ্ডিত নন। Lambএর New School Masterএর মত সবজান্তা হওয়ার সাধনাও তাঁর নয়। দ্রুত মতামত দানের ক্ষমতা, যাকে Newman বলেছেন viewiness, সেও তাঁর নয়। দেখতে হবে তিনি শুধু স্মৃতি বা বুদ্ধিতে নয়, তাঁর সহৃদয়তা কল্পনা সত্যবোধ ও সত্যকর্মের মধ্যেও জীবিত কি না। অন্তত এটুকু জানতেই হবে— তাঁর অপর গুণাগুণ যাই হোক, তাঁর চিত্তের মুখ কোন্ দিকে ? অর্থ, সম্মান, প্রতিষ্ঠার দিকে ? না জীবনের দিকে ? বুঝে নিতে হবে শিক্ষার তীর্থবাসে তাঁর রুচি কতটা।

শিক্ষার কর্মরূপ স্পষ্ট হলে পাঠ্যতালিকাকেও তার উপযোগী করে তোলা যায়। দেখতে হবে যেন এই তালিকা সেই সিন্ধবাদের কাঁধেচাপা বুড়োর মত শিক্ষাজীবনের স্কন্ধে না ভর করে। যেন বিভিন্ন মন

তার স্বাধীন বুদ্ধির অনুকূল যথোপযুক্ত আহার্যই পায়, সেই আহার্যের পরিমাণ যেন প্রত্যেকের পক্ষে সুসঙ্গত হয়। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে কারুর পক্ষে যা অমৃত অপরের পক্ষে হয় তো তাইই বিষের মত। কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের অবশ্যপাঠ্যতা সম্বন্ধে যেন আমরা আমাদের সংস্কার শিক্ষার্থীদের স্কন্ধে না চাপাই। কিন্তু আসল মূল্যবোধ বিষয়বিদ্যা থেকে জীবনবিদ্যায় স্থানান্তরিত হলে আপনি এইসব ভ্রম দূর হয়ে যাবে।

সবশেষে স্থির করতে হবে এই শিক্ষার পরিবেশ কেমন হবে। যেখানে কাজ হয়, সেখানে প্রচুর আসবাব সরঞ্জাম জঞ্জালমাত্র। কাজের জন্যে চাই মুক্ত অঙ্গন। চিত্রের জন্যে যেমন চাই নির্মল পট, জীবনের প্রকাশের জন্যেও তাই। শিক্ষায়তনে মেলে ধরা চাই বিহার আবিষ্কার আনন্দের সুপরিসর ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথ তাই চেয়েছেন যথাসাধ্য তৈরী জিনিসের নির্বাসন। জীবন যাতে এই পৃথিবীতে নিজ অস্তিত্বের সমস্ত আবশ্যিক সমস্যাগুলি উপলব্ধি করে, অথচ তার কোনোটার দ্বারাই অসহায়ভাবে আক্রান্ত না হয়—এই হবে শিক্ষাপরিবেশ রচনার আদর্শ। যা-কিছু শিক্ষাজীবনের পক্ষে অবান্তর, যে-কোনো শক্তি প্রভাব পরিস্থিতি শিক্ষার্থীর চিত্তসাম্যকে অস্থির করতে পারে, অথচ যার ওপর শিক্ষাকর্তাদের কোনো হাত নেই—সেসব থেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে পত্তন করতে হবে শিক্ষাতীর্থ। সে হবে গ্রামও নয়, সহরও নয়—এ দু'য়ের মিলিতরূপ। আবাসিক ব্যবস্থাও হওয়া উচিত এই শিক্ষার ভিত্তি, কিন্তু যদি তা একান্ত সম্ভব নাও হয় ব্যবস্থা করতে হবে প্রতি শিক্ষার্থী যেন এই তীর্থজীবনে যথেষ্ট অংশ গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু যে-কোনো মহৎ আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করবার আগে কোনো সীমিতক্ষেত্রে তার পরীক্ষা হওয়ার প্রয়োজন। এবং সেই পরীক্ষার ফল কিছুকাল ধরে লক্ষ্য করবার সুযোগও পাওয়া উচিত। আজকের দিনে প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে হঠাৎ কোনো অপরীক্ষিত ক্ষেত্রে স্থাপিত করার চেষ্টায় যে অনিশ্চয়তা ও সংকটের আশঙ্কা থাকবেই, তা স্বীকার করে নেওয়া যে-কোনো গভর্নমেণ্টের পক্ষেই অসম্ভব। কিন্তু এই নূতন আদর্শের ক্ষেত্র অপরীক্ষিত নয়। আজ পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠিক এমনই একটি আদর্শের ভূমিকা রচনা করেছিলেন। সেই আদর্শের অসাধারণত্ব দেশে-বিদেশে স্বীকৃত হয় নি তা নয়। কিন্তু সেই আদর্শই যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত বহন করছে, এ কথা আমরা বুঝি নি, কারণ বুঝতে চাই নি। বারবার বালির বাঁধ উঁচু ক'রে তুলে আমরা নূতন যুগের দ্বন্দ্ব ও বিরোধের প্লাবন ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে এসেছি। এবং আজ, স্বাধীনতার পরে, শুধু সেই পুরানো আয়োজনকেই আরো পাকা ক'রে তোলবার চেষ্টা করছি। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাস্বপ্ন কতদূর সফল হ'য়ে উঠবে তার উত্তর আছে ভবিষ্যতে নিহিত। কিন্তু সন্দেহ নেই যে, শান্তিনিকেতনের একটি ডাক আছে। সে ডাক শুধু তার ছাত্র ও কর্মীদেরই নয়, দেশে-বিদেশে আরো অনেক মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে। তবু কি আমরা চাইব না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হয়ে উঠুক দেশের প্রাণকেন্দ্র? তাদের আনন্দ-আহ্বান বাজতে থাকুক শিক্ষার্থীদের চিত্তে? সেই আহ্বানে গড়ে উঠুক একপ্রাণ সমাজ, সমতান জনমত, আত্মচেতন জাতি?

সেযুগের পত্র-পত্রিকা ও আমাদের জাতীয়তা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আমি এখানে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার কথা বলিতেছি, আর সীমারেখা টানিতেছি ১৮৫৭-৫৮ সনের সিপাহীযুদ্ধের সময় পর্যন্ত। এ সময়ে সরকারীভাবে দেশ-শাসনে ভারতবাসীর কথা গ্রাহ্য হইবার কোনো উপায় নির্ধারিত হয় নাই। সংবাদপত্রই তখন রাষ্ট্র সম্পর্কে দেশবাসীর মনোভাব প্রকাশের একমাত্র উপায় বলিয়া গণ্য হইত। ব্রিটেন গণতন্ত্রের দেশ। সেখানেও সংবাদপত্র 'Fourth State' বা 'চতুর্থ রাষ্ট্র' বলিয়া আখ্যাত। স্বৈর-শাসনাধীন দেশের পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা যে অত্যধিক তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

আধুনিক যুগে, অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে, প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৭৮০ খৃস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী দিবসে। এখানি ছিল ইংরেজী সাপ্তাহিক, নাম 'বেঙ্গল গেজেট'; সম্পাদক জেম্‌স্ অগস্টাস হিকি। সেযুগে বেসরকারী ইউরোপীয়দের বিলাত হইতে অনুমতিপত্র (licence) লইয়া এদেশে আসিতে হইত। এই নিয়ম বাহাল হয় ১৭৮৩ খৃস্টাব্দ হইতে। তৎকালীন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হইলে ইহাদিগকে স্বদেশে সরকারী ব্যয়ে পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। একারণ সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজের মধ্যে স্বভাবতঃই একটা রেষারেষির ভাব বিদ্যমান ছিল। তখন ইংরেজের শাসন-নীতি সম্পর্কে ভারতবাসীদের আলোচনা বা সমালোচনা করার ক্ষমতা ও উপায় ছিল না। রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষও তখন হয় নাই। একারণ বেসরকারী ইউরোপীয় তথা ইংরেজগণই এ ভার স্বেচ্ছায় লইয়াছিলেন।

হিকি 'গেজেট' মারফত সরকারী রীতিনীতির সমালোচনা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সবেমাত্র ভারতবর্ষে আড্ডা গাড়িতেছিলেন। তাঁহারা তাই নিজ কার্যের সমালোচনা আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। একারণ হিকির কাগজখানির উপর তাঁহারা বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন। পত্রিকা প্রকাশের কিছুকাল পরে হিকি ওয়ারেন হেস্টিংসের পত্নী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে প্রমুখ পদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অযশস্কর কথা প্রচার করিতেছেন— এই অজুহাতে তাঁহারা কাগজখানি বন্ধ করিয়া দেন। হিকি এদেশেই বহুবার কারাবরণ করিয়া লালবাজারের জেলে দেহত্যাগ করেন।

বেঙ্গল গেজেটের পরে বাহির হইল 'ইণ্ডিয়া গেজেট' (নবেম্বর ১৭৮০)। কলিকাতা গেজেট, বেঙ্গল হরকরা, এশিয়াটিক মিরর, ক্যালকাটা মান্থলি জর্ন্যাল নামে আরও কয়েকখানি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা পর পর বাহির হয়। শেষোক্তখানিতে বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি সংকলিত হইত। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যে প্রকাশিত সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' নামক সাময়িকপত্র আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। তবে ইহা দ্বারা পরোক্ষে ভারত তথা প্রাচ্যের সাহিত্য সংস্কৃতি বিজ্ঞান রাষ্ট্র-পরিচালন-পদ্ধতি সম্পর্কে বহু কীর্তিকাহিনী জগদ্‌বাসীর গোচরে আসিতে থাকে, এবং পরবর্তীকালে এইসকল গবেষণার ফলে ইহা হতচেতন ভারতবাসীর মনেও আত্মচেতনার উন্মেষে সহায়তা করে।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রাজ্যবিস্তার-পদ্ধতি বেসরকারী ইংরেজদের মনে বিশেষ ধোকা লাগায়। মরাঠা শক্তি, টিপু স্থলতান প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে কোম্পানীর অপকৌশল ও দুর্নীতির কঠোর সমালোচনা করিতে আরম্ভ করে এইসকল সংবাদপত্র। তখন লর্ড ওয়েলেসলি ভারতের বড়লাট। তিনি এই বিরোধিতা বিদূরণের জন্য ১৭৯৯ সনে একটি রেগুলেশন জারি করেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ আমলে যত মুদ্রাযন্ত্র-আইন চালু হইয়াছে এইটি তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। বড়লাট ওয়েলেস্‌লি এই আইন বা রেগুলেশন বলে নির্দেশ দিলেন যে, গবর্নমেণ্টের 'সেন্সরে'র নিকট সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিটি বিষয়, মায় বিজ্ঞাপন, পেশ করিতে হইবে। তাঁহার অনুমোদন পাওয়া গেলে এসকল, হয় পুরাপুরি নয় আংশিক ভাবে, ছাপা চলিবে। আইন পাস হইয়া গেল। এই সময়কার সংবাদপত্রে প্রায়ই '* * *' এই রকম তারকা-চিহ্ন যুক্ত হইয়া মন্তব্যাদি মুদ্রিত হইত। ইহার কারণ, সেন্সর যাহা বাদ দিতেন, অনেক ক্ষেত্রে তাহা পূরণের সময় থাকিত না। যাঁহারা সেন্সরের আদেশ অমান্য করিতেন তাঁহাদের শাস্তি ছিল— অবাঞ্ছিত বলিয়া বিলাতে নির্বাসন।

এই ভাবে প্রায় উনিশ বৎসর কাটে। ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকাও অধিক সংখ্যায় বাহির হইতে থাকে। সংবাদপত্রের মালিকেরা কেহ কেহ ওয়েলেস্‌লী-আইন এড়াইবার জন্য এদেশীয় ফিরিঙ্গীদের নাম সম্পাদকরূপে ঘোষণা করিলেন। 'মর্নিং পোস্টে'র সম্পাদক ছিলেন এইরূপ একজন ফিরিঙ্গী, নাম হিট্‌লি। ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে সেন্সর তাঁহাকে সম্পাদকীয় মন্তব্যের কতকাংশ বর্জন করিতে বলিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হন, এবং সেন্সরের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াই পরদিন তাহা ছাপাইয়া দেন। হিট্‌লি ফিরিঙ্গী, ভারতবর্ষই তাঁহার জন্মভূমি। আইন তাঁহার ক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইল। কর্তৃপক্ষ কিছুকাল আলাপ-আলোচনার পর স্থির করিলেন, ওয়েলেস্‌লী-রেগুলেশন তুলিয়া দিয়া নূতন আইন করাই যুক্তিসংগত। তাঁহারা ১৮১৮ সনের ১৯শে আগস্ট সাময়িকভাবে সম্পাদকগণের নির্দেশার্থ কতকগুলি সাধারণ নিয়ম রচনা করিয়া বিধিটি তুলিয়া দিলেন। যাঁহারা মনে করেন বড়লাট লর্ড হেস্টিংস দয়াপরবশ হইয়া উক্ত রেগুলেশন তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।

এই ১৮১৮ সনটি বঙ্গভারতীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এ বৎসরের মাঝামাঝি অল্প সময়ের ব্যবধানে দুইখানি বাংলা সাপ্তাহিক সর্বপ্রথম বাহির হইল। একখানি শ্রীরামপুর হইতে তখনকার ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের পক্ষে জেম্‌স ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'সমাচার দর্পণ', দ্বিতীয়খানি কলিকাতা হইতে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'বাংলা গেজেট,' বা ঐ সময়কার কথায় 'বাঙ্গালা গেজেটি'। প্রথম পত্রিকাখানি প্রকাশের পূর্বেই সরকারকে এই আশ্বাস দেওয়া হয় যে, তাঁহাদের অমর্যাদাকর বা হানিকারক কোনো কথা ইহাতে লেখা হইবে না। 'বাংলা গেজেট' এরূপ কোনো আশ্বাস দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। ইহার ফাইল পাওয়া না গেলেও, ইহা হইতে যৎসামান্য উদ্ধৃতি যাহা স্থানে স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠে জানা যায়, ইহা মুখ্যতঃ রাজনীতিবিষয়ক পত্রিকা ছিল। রাজা রামমোহন রায় ইহার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ইহাতে মাঝে মাঝে লিখিতেন। জাতীয় সমস্যার আলোচনা সম্পর্কে বাংলা গেজেটকেই আমরা প্রথম জাতীয় বাংলা সংবাদপত্রের মর্যাদা অর্পণ করিতে পারি।

এ বৎসর, ১৮১৮ সনের ২রা অক্টোবর 'ক্যালকাটা জর্নাল' নামে একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রও নূতন বাহির হইল। এখানির সম্পাদক ছিলেন জেম্‌স সিল্ক বাকিংহাম। তিনি প্রাচ্যবিদ্যায়, বিশেষতঃ

আরবি ভাষাতে, সুপণ্ডিত ছিলেন। রামমোহন রায়েরও তিনি ছিলেন বিশেষ গুণগ্রাহী বন্ধু। ইংরেজ হইয়াও তিনি পত্রিকাখানিকে ভারতবাসীদের মুখপত্র হিসাবেই সম্পাদনা করিতেন। তিনি সরকারী কার্যাকার্যের তীব্র সমালোচনাও করিতে থাকেন এই কাগজখানিতে। ১৮২২ সনের ১০ই অক্টোবর শাসন-পরিষদের অস্থায়ী সদস্য উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেলি বড়লাটকে সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে সুবৃহৎ মিনিট পেশ করেন, বাকিংহাম ছিলেন তাহার মূল লক্ষ্য। ১৮১৮-১৮২২, এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে দেশীয় ভাষায় কয়েকখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে 'সম্বাদ কৌমুদী' (৪ ডিসেম্বর ১৮২১), 'সমাচার চন্দ্রিকা' (৫ মার্চ ১৮২২), এবং উর্দু 'জাম-ই-জাহান-নুমা' (২৮ মার্চ ১৮২২) ও ফার্সি 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার' (১২ এপ্রিল ১৮২২) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্তখানির প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং শেষোক্তখানির পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এই দুইখানি পত্রিকায় প্রকাশিত জ্ঞাতব্য বিষয়াদির ইংরেজী অনুবাদ বাকিংহাম নিজ 'ক্যালকাটা জর্ন্যালে' প্রায়ই প্রকাশ করিতেন।

২

বাংলাদেশের তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া, স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ না করিলেও, পাশ্চাত্য ভাবধারায় কতকটা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। আবার হিন্দু কলেজের (প্রতিষ্ঠাকাল ২০শে জানুয়ারী ১৮১৭) শিক্ষায় ধীরে ধীরে তরুণদের মনেও নব ভাবের উদয় হইবার সুযোগ পাইল। ধর্মবিষয়ে মতান্তর ঘটিলেও, রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নিতান্তই ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। আবার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিদেশীয়দের আক্রমণে মতান্তর ভুলিয়া ইহার প্রতিবাদে সকলেই অগ্রসর হইতেন। এ বিষয়ে বাঙালীদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন একেশ্বরবাদী রাজা রামমোহন রায়। এই বাদপ্রতিবাদকে ভিত্তি করিয়া বাঙালীর মনে জাতীয়ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। সেযুগের পত্র-পত্রিকা ইহার বাহন হইল। ১৮২১ সনের ১৪ই জুলাই 'সমাচার দর্পণে' হিন্দুধর্মের নিন্দাসূচক প্রস্তাব প্রকাশিত হইলে রামমোহন রায় তাহার জবাব দেন। এই জবাব 'দর্পণে' স্থান পায় নাই। রামমোহন অগত্যা এই আলোচনা প্রকাশের জন্য 'ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন' (বা 'ব্রাহ্মণ সেবধি') নামে ইংরেজী-বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশিত করেন। মিশনরীদের হিন্দুধর্মবিরোধী আন্দোলন বাঙালীদের মধ্যে শুধু জাতীয়তা নহে, আত্মজিজ্ঞাসারও উদ্রেক করে। রামমোহন লেখেন :

"যদ্যাপিও য়িশুখ্রিষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্যের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেইরূপ মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে সিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোকে ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে

সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোনমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবর্ধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসাত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্ব প্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়।"[১]

রাজনীতি তথা ইংরেজের শাসনপ্রণালী লইয়া সংবাদপত্রে তখন যেসব আলোচনা বা সমালোচনা শুরু হয় তাহা সরকারের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে। রামমোহনের খৃস্টান ধর্মবিষয়ক তর্কবিতর্কও তাঁহাদের মনঃপুত হইল না। পূর্বোক্ত বেলির মিনিটে এইসকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, একটি স্বাধীন দেশের পক্ষে স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের আবশ্যকতা অনুভূত হইলেও স্বৈর ('despotic') শাসনাধীন ভারতবর্ষে ইহা কোনোমতেই প্রযোজ্য নহে। বিশেষতঃ যখন—

"The stablity of the British dominion in India mainly depends upon the cheerful obedience and subordination of the officers of the Army, on the fidelity of the Native troops, on the supposed character and power of the Government, and upon the opinion which may be entertained by a superstitious and unenlightened Native population of the motives and tendency of our actions as affecting their interests."[২]

অর্থাৎ, ভারত-শাসন দুইটি প্রধান জিনিসের উপর নির্ভর করে: ১. ভারতীয় বাহিনীর আনুগত্য এবং ২. গবর্নমেণ্টের শক্তির উপর অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের অটুট আস্থা। ইহার পর বেলি লেখেন:

"The liberty of the Press, however essenial to the nature of a free state, is not in my judgment, consistent with the character of our institutions in this country, or with the extraodinary nature of our dominion in India."[৩]

বেলির মতে ভারতবর্ষের ন্যায় পরাধীন দেশের শাসন-ব্যবস্থার রীতি-প্রকৃতিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা ভাবাই চলে না। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের উদ্দেশ্যে বড়লাট লর্ড হেস্টিংস ১৮২২ সনের ১৭ই অক্টোবর এক আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার পর ৮২৩, ৯ই জানুয়ারী তিনি ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যান। বিলাতের কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়া গেলে, অস্থায়ী বড়লাট জন অ্যাডাম পর বৎসর ১৪ই মার্চ তারিখে কুড়ি দিনের মেয়াদে সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষ এই আইন জারি করিলেন। তখন কোনো আইন কার্যকরী করিতে গেলে সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন লইতে হইত। বিচারপতি স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকৃনটেন ৩১শে মার্চ তারিখে আইন প্রয়োগে সম্মতি দিলেন। পরবর্তী ৪ঠা এপ্রিল এই আইন যথারীতি বিধিবদ্ধ হইল। আইনের একটি ধারায় অবাঞ্ছিত ইউরোপীয় সম্পাদকদের স্বদেশে প্রেরণের পূর্ববর্তী ব্যবস্থাও

---

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, ৫ম খণ্ড। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, পৃ. ৩, ৪।

২, ৩ বাংলা সাময়িক-পত্র, ২য় সংস্করণ, ১০৫-১৬ পৃষ্ঠায় 'মিনিট'টি পুরাপুরি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ছিল। অন্য একটি ধারায় নূতন-পুরাতন সকল পত্র-পত্রিকার প্রকাশককেই সরকারের নিকট হইতে 'লাইসেন্স' বা প্রকাশের অনুমতি লাভ করিতে হইত।

রাজনৈতিক আলোচনায় অগ্রণী রামমোহন নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ পাঁচ জন বন্ধুর সহযোগে সুপ্রিম কোর্টে ইহার বিরুদ্ধে ১৮২৩ খৃস্টাব্দের ১৭ই মার্চ একখানি আবেদনপত্র দাখিল করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোনোই ফল হইল না। ইহার পর রামমোহনের নেতৃত্বে বিলাতে সকৌন্সিল রাজার নিকটেও একখানি স্মারকলিপি প্রেরিত হয়। বেলির 'মিনিট' ও এই আবেদনপত্র দুইখানি একসঙ্গে পাঠ করিলে এ কথা স্বতঃই মনে উদিত হইবে যে, সোয়া শ বৎসর পূর্বেই শাসক এবং শাসিতের রাজনীতি তথা শাসনপদ্ধতি সম্পর্কিত মনোভাব ও চিন্তাধারা পরস্পরবিরোধী পথে চলিতে শুরু হয়। শাসকশ্রেণী স্বৈরশাসন অক্ষুণ্ণ রাখায় বদ্ধপরিকর, পক্ষান্তরে শাসিত ভারতবাসীদের নেতৃস্থানীয়েরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ স্বরূপ সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতা রক্ষায় উন্মুখ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময় হইতেই এদেশে 'জাতীয়' আন্দোলনের সূচনা হইল। রামমোহন রায় এইরূপ 'বেআইনী' আইনের প্রতিবাদে স্বকীয় 'মিরাৎ-উল-আখ্‌বার'এর শেষ সংখ্যা ৪ঠা এপ্রিল ১৮২৩ তারিখে প্রকাশান্তর বন্ধ করিয়া দিলেন। একারণ ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম অসহযোগীর সম্মান রামমোহনেরই প্রাপ্য।[৪] উক্ত শেষ সংখ্যায় তিনি দুইটি ফার্সি বয়েৎ উদ্ধৃত করিয়া সংবাদপত্রখানি তুলিয়া দেওয়ার কারণ নির্দেশ করেন। তাঁহার মনে সেযুগেই স্বাধীনতা-বহ্নি কিরূপ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল ইহা হইতে তাহা সম্যক্ বুঝা যায়। একটি বয়েৎ-এর বঙ্গানুবাদ এইরূপ :

"যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দরোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।"[৫]

সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীন মতামত প্রকাশের পক্ষপাতী ছিলেন না, বলাই বাহুল্য। তবে তিনখানি সংবাদপত্রের সমালোচিত বিষয় সম্বন্ধেই তাঁহাদের দৃষ্টি বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হয়। প্রথমখানি ইংরেজী 'ক্যালকাটা জর্ন্যাল', দ্বিতীয় উর্দু 'জাম-ই-জাহান-নুমা', আর তৃতীয় ফার্সি 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার'। তৃতীয়খানি সম্পাদক রামমোহন রায় বন্ধ করিয়া দেন, বলিয়াছি। 'ক্যালকাটা জর্ন্যালে'র সম্পাদক জেম্‌স সিল্ক বাকিংহামের উপরই সরকারের বিষম আক্রোশ ছিল। প্রেস-আইন প্রচারিত হইবার পূর্বেই, ১৮২৩ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী সরকার হইতে তাঁহার উপর আদেশ আসে যে, দুই মাসের মধ্যে তাঁহার এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার সহকারী স্যাণ্ডফোর্ড আর্নটের উপর কাগজখানি সম্পাদনার ভার পড়ে। কিন্তু তাঁহাকেও কিছুকাল পরে ১৮২৩ সনের নবেম্বর মাসে এদেশ হইতে নির্বাসিত করা হইল। এই সময়ে তিনি রামমোহনের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্যেও নিযুক্ত ছিলেন। আর্নটের ভারত-ত্যাগের সঙ্গেসঙ্গে 'ক্যালকাটা জর্ন্যাল'ও উঠিয়া গেল। সরকারের কোপানল এইরূপে কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল।

---

৪ এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা বর্তমান লেখকের "মুক্তির সন্ধানে ভারত"এর অন্তর্গত 'মুক্তিকামী রামমোহন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য

৫ ঐ, পৃ ৩৭, এবং "বাংলা সাময়িক-পত্র", ২য় সং, পৃ ৩৭।

৩

উইলিয়ম ক্যাভেণ্ডিশ বেণ্টিঙ্ক বড়লাট হইয়া আসিলে শাসনে কতকটা উদার নীতি প্রবর্তিত হয়। তাঁহার আমলে (জুলাই ১৮২৮ - মার্চ ১৮৩৫) মুদ্রাযন্ত্র-আইন বলবৎ থাকিলেও কার্যতঃ খুব কমই প্রযুক্ত হইয়াছে। ১৮২৯ সন হইতে রাজনৈতিক অগ্রগামী দল পুনরায় সংবাদপত্র প্রকাশে উত্থোগী হইলেন। 'বেঙ্গল হেরাল্ড' (৫ মে ১৮২৯) ও ইহার বঙ্গানুবাদ 'বঙ্গদূতে'র স্বত্বাধিকারী রূপে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতিকে দেখিতে পাই। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক রূপে ১৮৩১, ২৮শে জানুয়ারী আত্মপ্রকাশ করে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পাদনায় ইংরেজী সাপ্তাহিক 'রিফর্মার' বাহির হয় পরবর্তী ৫ই ফেব্রুয়ারী। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্রগণও একে একে সংবাদপত্র প্রকাশে মন দিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭ই মে ১৮৩১ তারিখে 'এন্‌কোয়েরার' নামক ইংরেজী এবং প্রথমে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও পরে রসিককৃষ্ণ মল্লিক 'জ্ঞানান্বেষণ' (প্রকাশকাল ১৮ই জুন ১৮৩১) নামক একখানি ইংরেজী-বাংলা সাপ্তাহিক বাহির করিতে থাকেন। কোনো কোনো বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে মতদ্বৈধ থাকিলেও স্বদেশের উন্নতি-চিন্তাই এইসকল পত্র-পত্রিকার প্রধান উপজীব্য ছিল। 'রিফর্মারে'র প্রথম সংখ্যায় "Address to our Countrymen" প্রস্তাবে[৬] সম্পাদক ইহার উদ্দেশ্য বিশদভাবে বিবৃত করেন। প্রস্তাবটির এক অংশ এই :

"It is not a mere theoretical presumption that we raise this great and noble fabric of what must be estimated the only means of happiness to mankind. The influence of liberty and truth was spread and is spreading far and wide, and nothing can check its course. There was a time when the natives of this country were looked upon as a race of unprincipled and ignorant people, void of all qualities that separate human from the brute creation. But look at the contrast now. Is it possible that at the present day an impeachment of such a dark character will be allowed to bear the slightest colour of truth ?"

এই উদ্ধৃতি হইতে তৎকালীন শিক্ষিত ভারতবাসীর মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষের আভাস পাওয়া যাইতেছে। বাঙালীরা তখনই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুকলেজের নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে উগ্রপন্থী হইলেও তাঁহারাও ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার উন্নতিই চাহিতেন এবং শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। রাজনীতির আলোচনায় তাঁহারা সমান আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এই সময়কার সাধারণ সভা-সমিতিতে, বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক সভায়, 'জ্ঞানান্বেষণ'সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিক নব্যদলের মুখপাত্ররূপে সারগর্ভ বক্তৃতা করিতেন। তিনি ১৮৩৫ সনের ৫ই জানুয়ারীর সভায় নূতন চার্টার বা সনন্দ সম্বন্ধে ভারতবাসীর পক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-দান সম্পর্কীয় সভায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক বাংলা পত্র-পত্রিকার সম্বন্ধেও জোর বক্তৃতা

---

৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় লেখক কর্তৃক সম্পূর্ণ উদ্ধৃত

দেন। উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের উদারনীতির প্রশংসা করিলেও তাঁহারা সংবাদপত্র সম্পর্কে তাঁহার ঔদাসীন্যকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। দেশীয়দের পরিচালিত ইংরেজী-বাংলা সংবাদপত্রেও এ সময়কার নূতন চিন্তাধারা প্রকাশিত হইতে থাকে।

ইহার পর আসিল ১৮৩৫ সন। ভারতের জাতীয়তা তথা স্বাধীনতা প্রচেষ্টার ইতিহাসে এই সময়টিও একটি বিশেষ কারণে স্মরণীয়। এ বৎসর মার্চ মাসে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারত ত্যাগ করেন, এবং তাঁহার স্থলে স্যার চার্লস থিয়োফিলাস মেটকাফ অস্থায়ী বড়লাট হন। তিনি এক বৎসর মাত্র এই পদে সমাসীন ছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যেই উদার শাসন-নীতির ফলে ভারতবাসীর চিত্ত জয় করিতে সক্ষম হন। এ সময়কার তাঁহার সর্বপ্রধান কার্য মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান। তাঁহার এই কার্যের মূলে আর-এক জনের কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি কটূক্তি করার দরুন বড়লাটের প্রথম আইন-সচিব টমাস বেবিংটন মেকলে ভারতবাসীর নিকট নিন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু শাসন-ব্যবস্থার দিক দিয়া তিনি আমাদের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বেন্থাম-শিষ্য উদার রাজনীতিক। পার্লামেণ্টের সদস্য রূপে ভারতবর্ষ সম্পর্কে যেসকল উক্তি ইতিপূর্বে তিনি করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার উদারচিত্ততার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। মানুষের স্বাভাবিক অধিকার রক্ষায় তিনি সর্বদা ব্যাগ্র ছিলেন। ইউরোপীয় ও ভারতবাসীদের ভিতরকার বিচারবৈষম্য কথঞ্চিৎ দূর করিয়া ১৮৩৬ সনে একটি আইনও তিনি বিধিবদ্ধ করান। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের মূলে তাঁহার বিশেষ হাত ছিল। আইন-সচিব রূপে মেকলে ১৮৩৫, ১৬ই এপ্রিল এতৎসংক্রান্ত আইনের সপক্ষে একটি সুচিন্তিত মন্তব্য[৭] লিপিবদ্ধ করেন। তাহার এক স্থলে আছে:

"Possessing as we do the unquestionable power to interfere, whenever the safety of the State may require it, with overwhelming rapidity and energy, we surely ought not in quiet times to be constantly keeping the *offensive form and ceremonial of despotism* before the eyes of those whom we nevertheless permit to enjoy the substance of freedom. It is acknowledged that in reality liberty is and ought to be the general rule, and restraint the rare and temporary exception. Why then should not the form correspond with the reality? Why should our laws be so formed as to make it appear that the ordinary practice is in the highest degree oppressive and that freedom can be enjoyed only by occasional connivance?"

সরকার মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অর্পণে মনস্থ করিয়াছেন জানিয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পরবর্তী জুন মাসে একটি সভায় সম্মিলিত হন এবং বড়লাট স্যার চার্লস মেটকাফকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। বারো বৎসর পূর্বেকার শাসনকর্তৃপক্ষ ভারতবাসী অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন, এ সময়কার কর্তৃপক্ষ ইহা বিদূরণের জন্যই স্বাধীনতা পুনঃসংস্থাপনে উদ্‌গ্রীব হন। মেটকাফ অভিনন্দনের উত্তরে এই মর্মে বলিয়াছিলেন:

---

৭ Lord Macaulay's *Legislative Minutes*, The Oxford Universitiy Press, 1946, pp. 166-7.

"কিন্তু আমি বোধ করি যে প্রজারদের মন অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন থাকাই আমাদের রাজ্যের অধিক বিঘ্ন এবং আমি এই বিবেচনা করি যে এতদ্দেশে যদনুসারে বিদ্যার প্রাচুর্য্য হয় তদনুসারে রাজশাসনের দৃঢ়তা হইবে। বিদ্যার বৃদ্ধি হইলে লোকেরদের অযুক্ত বিবেচনা বিলুপ্ত হইবে ও কাঠিন্য স্বভাব, কোমল হইবে এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে উপকার আছে ইহা লোকের যুক্তিসহ অনুভব হইবে এবং ঐক্যের দ্বারা রাজা ও প্রজারদের সম্বন্ধ সমৃদ্ধ হইবে এবং তাঁহারদের মধ্যে পরস্পর যে বিচ্ছেদ আছে তাহা ক্রমেই হ্রাস হইয়া পরিশেষে লুপ্ত ইহবে।"[৮]

সপরিষদ বড়লাট ১৮৩৫, ৩রা আগস্ট সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃস্থাপন আইন বিধিবদ্ধ করেন। পরবর্তী ১৫ই সেপ্টেম্বর আইন অনুযায়ী কার্য আরম্ভ হইল। এই সন হইতে ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রও বেশী করিয়া বাহির হইতে লাগিল। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রকাশিত হয় ১৮৩৫, ১০ই জুন তারিখে। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণ 'হিন্দু পাইয়োনিয়র' নামে একখানা ইংরেজী পাক্ষিক পরবর্তী ২৭শে আগস্ট বাহির করিলেন। ইহার সম্পাদক হইলেন রসময় দত্তের মধ্যম পুত্র কৈলাসচন্দ্র দত্ত। 'সংবাদ প্রভাকর' কিছুকাল বন্ধ ছিল। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় ইহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া ১৮৩৬, ১০ই আগস্ট হইতে বারত্রায়িক রূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহা দৈনিকে পরিণত হয় ১৮৩৯ সনের ১৮ই জুন। শেষোক্ত বৎসরের মার্চ মাস হইতে 'সম্বাদ ভাস্কর' নামক সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। প্রথম হইতেই ইহার পরিচালনা ও সম্পাদনাকার্যে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য যুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি ছিলেন একাধারে সংস্কৃতবিদ্ এবং প্রগতিপন্থী। রামমোহন রায়ের সংস্কারমূলক প্রচেষ্টায় গৌরীশঙ্কর ছিলেন একজন সহকারী। প্রগতিবাদী 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা সম্পাদনায়ও তাঁহার বিশেষ হাত ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সময়ে 'ইংলিশম্যান' 'বেঙ্গল হরকরা' প্রভৃতি সেযুগের বিখ্যাত সংবাদপত্রের মালেকানা স্বত্ব একে একে ক্রয় করেন। একারণ এসকল পত্র-পত্রিকাও ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষায় কতটা নিয়োজিত হইয়াছিল।

৪

কিন্তু পরবর্তী দশকে বেসরকারী ইংরেজগণ এবং তাহাদের মুখপত্র সংবাদপত্রসমূহের অন্য রূপ দেখি। ইহার কারণও আছে। ১৮৩৩ সনের পূর্বে তাহাদিগকে একপ্রকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দয়ার উপর নির্ভর করিয়াই এদেশে বসবাস করিতে হইত। তাহারা তখন ভারতবাসীদের দলে টানিয়া কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুঝিতে লাগিয়া যাইত। ১৮৩৩ সনের পরে এ অবস্থা আর রহিল না। ঐ বৎসরের সনন্দে বেসরকারী ইউরোপীয়েরা এদেশে শুধু বসবাস নয়, ব্যাবসা-বাণিজ্য-কৃষি-শিল্পে লিপ্ত হওয়া নয়, তাহারা এদেশে ভূম্যাদি ক্রয় করিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইবারও অধিকার পাইল। খৃস্টান পাদ্রীরা ইতিপূর্বেই স্বাধীন ভাবে ধর্মপ্রচারের অধিকার লাভ করিয়াছিল। এইরূপে বেসরকারী ইউরোপীয়েরা সর্বপ্রকারে ক্ষমতাবান্ হইয়া সহরে ও মফস্বলে ব্যাবসা-শিল্প ব্যাপদেশে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাদের বিচার-আচার পূর্ববৎ কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টেরই এক্তিয়ার থাকায়, তাহারা সর্বত্র, বিশেষতঃ মফস্বলে, ভারতবাসীদের উৎপীড়নের কারণ হইয়া উঠিতে থাকে। মেকলে ইউরোপীয় ও ভারতবাসীদের মধ্যে বিচারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ

---

৮ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃ. ৩৮৭। 'সমাচার দর্পণ' ২৭ জুন ১৮৩৫ হইতে উদ্ধৃত

স্বরূপ মফস্বলের দেওয়ানী আদালতকে ইউরোপীয়দের মোকদ্দমাদির বিচারের ক্ষমতা দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা লইয়া ইউরোপীয় মহলে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহারা তখনই ইহাকে 'Black Act' বা কালো আইন আখ্যা দিয়াছিল। দেশী-বিদেশীদের মধ্যে জাতিবৈরিতার ইহাই প্রকাশ্য সূচনা।

চতুর্থ দশকে নব্যশিক্ষাগুণে এবং কথঞ্চিৎ পূর্ববর্তী দশ বৎসরের উদার শাসন-নীতির দরুন ভারতবাসীরা আত্মসচেতন হইয়া উঠিল। তাহাদের মুখপাত্র স্বরূপ নব্যবঙ্গের অন্যতম নেতা রামগোপাল ঘোষের পরিচালনায় এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সম্পাদকতায় ১৮৪২ সনের এপ্রিল মাস হইতে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামে একখানি ইংরেজী-বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশিত হইল। ইহা এই বৎসর নবেম্বর মাসে পাক্ষিক এবং ১৮৪৩, মার্চ মাসে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ইহার উদ্দেশ্য শুধু সংবাদ সরবরাহ করা বা কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রকাশ করা নয়, প্রচলিত শাসনপদ্ধতি তথা রাজনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাও ছিল ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। দ্বারকানাথ ঠাকুর তখন বিলাতে। ভারতবর্ষের উন্নতি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও ছিল তাঁহার তীক্ষ্ণ। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির অন্যতম সভ্য, ক্রীতদাসপ্রথার উচ্ছেদকারী, মানবহিতৈষী জর্জ টমসনকে ১৮৪২ সনের শেষ দিকে নিজ ব্যয়ে কলিকাতায় লইয়া আসেন এবং নব্যবঙ্গের নেতাদের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেন। টমসনের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহারা এখানে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন (২০শে এপ্রিল ১৮৪৩)। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ইহার মুখপত্র হইল। নব্যবঙ্গের এতাদৃশ রাজনীতি-চর্চা স্থানীয় বেসরকারী ইংরেজদের মোটেই প্রীতিপ্রদ হয় নাই। তাহাদের মুখপত্রগুলি নেতৃবৃন্দের নিন্দাবাদে মুখর হইয়া উঠিল। নব্যবঙ্গের মুখ্য নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নামে এই দলকে 'চক্রবর্তী ফ্যাক্‌শন' বলিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ হইল না।

চতুর্থ দশকে আর একটি ব্যাপারে বাঙালী ধর্ম বা দলগত বিভেদ ভুলিয়া জাতীয় মঙ্গলকার্যে উদ্বুদ্ধ হয়, আর ইহাতে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তৎপরিচালিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৪৩, ১৬ই আগস্ট) নামক মাসিক। মূলতঃ বেদান্ত প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ ও তাহার সমর্থক বিষয়াদির জন্য প্রকাশিত হইলেও জাতীয় শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সমস্যার আলোচনায় এই পত্রিকাখানি বিশেষভাবে লিপ্ত হয়। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'এর পক্ষে এককভাবে তখন যাহা করা সম্ভব হয় নাই, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছিল বলিতে পারা যায়। এই সময় হিন্দুদের খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করা লইয়া ইংরেজ ও বাঙালী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং খৃস্টানীর কেন্দ্রস্বরূপ অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে হিন্দুপ্রধানেরা অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী হন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পূর্ব হইতে জাতীয় শিক্ষার বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কাজেই এবারে স্বতঃই ইহার প্রচারেও অগ্রণী হইল। পত্রিকাখানি হইতে একটি উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া গেল :

"অত্যাচারি মিশনরিগণ প্রতীক্ষা করিতেছে, ইহাতে কৃতকার্য্য না হইলে কি নিস্তার আছে? শত্রু যদি বিপক্ষের দুর্ব্বলতা জানিতে পারে তবে আর কি রক্ষা থাকে? তাহারা এতকাল আমারদিগের পরাক্রমকে পরীক্ষা করিতে পারে নাই—অদ্যাবধি আমারদিগের প্রতি তাহারদিগের শঙ্কা দূর হয় নাই, কিন্তু এইবারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়ি না হইলে তাহারা ভবিষ্যতে আমারদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে

কোন সংশয় করিবেক না। সর্প শিরে আঘাত করিয়া তাহাকে সজীব পরিত্যাগ করিলে প্রতিহিংসা করিতে কি সে বিলম্ব করে? কালস্বরূপ মিশনরিদিগকে দমন না করিলে তাহারা ভবিষ্যতে বল বা ছল পূর্ব্বক আমারদিগের সন্তানদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষ পান করাইতে নিমেষমাত্র কি গৌণ করিবেক? অতএব বিপক্ষের ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া নিরস্ত হওয়া অপেক্ষা এ কর্ম্মের উদ্যোগ না করাও মঙ্গল ছিল। ফলতঃ এ সকল আশঙ্কারই প্রয়োজন কি? আমারদিগের যুক্তি সমুদয় স্থির হইয়াছে—উপায় সকল ধার্য্য হইয়াছে, ঐইক্ষণে দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিলেই অভিপ্রায় সম্পূর্ণ হইবেক।

"··তোমারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐক্যকে বন্ধন কর, কর্ম্মের সোপান নিবদ্ধ কর, এবং নিন্দা ও প্রশংসাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য সাধনে অনুরক্ত থাক। এইরূপে যখন কৃতকার্য্য হইবে, তখন সকল পরিহাস নিরস্ত হইবে, বিপক্ষের বল জীর্ণ হইবে, জয়ধ্বনি বিস্তৃত হইবে, বান্ধবমণ্ডলী বৃদ্ধি হইবে, এবং এইক্ষণে যাঁহারা দূর হইতে কটাক্ষ করিতেছেন তখন তাঁহারা মিশ্রিত হইতে ব্যাগ্র হইবেন।"[৯]

রাজা রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মণ সেবধি' মারফত খৃস্টানীর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত 'তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা' তাহার মূলোচ্ছেদনে অগ্রসর হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' এবং 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর সম্পাদকদ্বয়ও জাতির কল্যাণমূলক, বিশেষতঃ এই সময়কার খৃস্টানী আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রচলিত হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই একেশ্বরবাদী দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও যখন তীব্রভাবে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করে তখন হিন্দু মাত্রেরই দৃষ্টি এই দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল,· এমনকি প্রগতিপন্থীরাও ইহার সমর্থন না করিয়া পারিলেন না। বস্তুতঃ এই সময় প্রাচীনপন্থী নব্যপন্থী সকলেই একযোগে খৃস্টানীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ঐক্যশক্তি দ্বারা ইহা অনেকটা প্রশমিত করিতে সমর্থ হন। 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'র মত শক্তিশালী পত্রিকাও ভারতবাসীর বিপক্ষতা করিয়া বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন প্রখ্যাত ছাত্র সুসাহিত্যিক ও সুকবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৮৪৬ সনে 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করিয়া খৃস্টানী-বিরুদ্ধ আন্দোলনের সহায়তা করিতে থাকেন। পত্রিকাখানির আর-এক দিকেও কৃতিত্ব ছিল। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ অব্যবহিত পরবর্তী কালের বিখ্যাত সাংবাদিকগণ ইহাতে রাজনীতিবিষয়ক নিজ নিজ রচনা প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহকালে নূতন প্রেস-আইন বিধিবদ্ধ হইলে পত্রিকাখানি উঠিয়া যায়।

৫

ইহার পর, এই দশকেরই শেষ বৎসর ১৮৪৯ সনে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে ব্যবহার-সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য তৎকালীন আইন-সচিব বেথুন কতকগুলি আইনের খসড়া কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করেন। মেকলের আইনের পরিপূরক হিসাবেই এগুলি রচিত হয়। কিন্তু তখন বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। সরকার তাহাদের বিরোধিতার জন্য এবিষয়ে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে রাজী হন নাই। এই সময় নব্যবঙ্গের নেতা রামগোপাল ঘোষ *Black Acts* নামে একখানি পুস্তিকা

৯ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৭৬৭ শক।

লিখিয়া ইউরোপীয়দের যুক্তির অসারত্ব প্রতিপাদন করেন। উক্ত খসড়াগুলি সত্বর আইনে পরিণত করার সপক্ষে তিনি অকাট্য প্রমাণও উত্থাপন করিয়াছিলেন। জাতীয়তার ইতিহাসে এই পুস্তিকাখানির গুরুত্ব সমধিক।

ইউরোপীয় সমাজের এই ঐক্যশক্তি বাঙালী নেতাদের চোখ খুলিয়া দিল। ভারত-শাসনের অনাচার যদি কিছু সংশোধন করিতে হয় তবে তাহাও করিবার উপায় বিশ বৎসর অন্তর কোম্পানীর সনন্দ পুনঃপ্রাপ্তির কালে। আর পার্লামেণ্ট দ্বারাই ইহা সম্ভব। ১৮৫৩ সনে সনন্দ পুনঃপ্রাপ্তির বিষয় আলোচিত হওয়ার কথা। এই সময় পার্লামেণ্টে ভারতবাসীর মতামত জানাইতে হইলে দুইটি উপায় দ্বারা তাহা সম্ভব হইতে পারে— একটি, প্রতিনিধিমূলক সভা প্রতিষ্ঠা; অন্যটি, প্রথমশ্রেণীর একটি সংবাদপত্র প্রকাশ। দুইটি উপায়ই তখন অবলম্বিত হয়। ১৮৫১, ২৯শে অক্টোবর কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হইল। প্রাচীন ও নব্যপন্থী সকলেই ইহাতে যোগদান করেন। সভাপতি হইলেন রাজা রাধাকান্ত দেব ও সম্পাদক হন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশ, এই সভা দ্বারা ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কারের পক্ষে পার্লামেণ্টে যে স্মারকলিপি প্রেরিত হয় তাহার মুশাবিদা করেন সুবিখ্যাত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় উপায়— সংবাদপত্র প্রকাশ প্রথমে ব্যক্তিগত ভাবেই আরব্ধ হয় ইহার বৎসরেক কাল পরে। চোরবাগানের ঘোষ-ভ্রাতৃগণ— শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (পরবর্তী কালের বিখ্যাত 'বেঙ্গলী' সম্পাদক) এবং ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ ১৮৫৩, ৬ই জানুয়ারী 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বিশিষ্ট সদস্য হরিশ্চন্দ্র প্রথম হইতেই ইহাতে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বলিত অনুষ্ঠান-পত্রের মূল অংশ এখানে দেওয়া হইল :

"A few disinterested—in as far as their pockets are concerned, individuals were some time past thinking of establishing a weekly newspaper in English, having for its object a fair and manly advocacy of the interests of their country and an impartial exposition of the social and political evils with which she is now afflicted. The task which they proposed to themselves, is, by no means, an easy one, but as the projectors of the *Hindoo Patriot* consider that the very important end they had in view, is worthy of at least a fair and an earnest attempt, they have presumed, however diffidently, to make their bow to the public, in the hope that their countrymen will rally round them and place them in possession of the means so absolutely necessary to a full and satisfactory working out of their design.· ·

"The discussions connected with the East India Company's Charter, which have already commenced, must command an all absorbing interest in the hearts of all true friends of India. An organ of the people, conducted by natives, on catholic and enlightened principles, must then be greatly needed, and without presuming to set up as the *only* organ of the hundred millions

whose destinies are bound up with the welfare of this land, the *Hindoo Patriot* may be allowed to take its stand as a champion, however insignificant, of the neglected rights of the country and a zealous and unflinching advocate for constitutional reform."[১০]

'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রকাশের তিন-চার মাস পরে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ইহার সম্পাদনা ও পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিলেন। হরিশ্চন্দ্র কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। সমাজসংস্কার ও রাজনীতি সম্বন্ধে প্রগতিশীল মতানুবর্তী হইয়া তিনি এইসকল বিষয়ে কর্মতৎপর হইয়াছিলেন। তিনিও পেট্রিয়টের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে শুধু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মুখপত্রই করিলেন না। এসোসিয়েশন যেসব বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে পারিতেন না এরূপ বহু বিষয়ের আলোচনায়ও 'পেট্রিয়ট' নিয়োজিত হইল। বড়লাট ডালহৌসীর দেশীয় রাজ্য গ্রাস করার নীতিকে 'পেট্রিয়টে' তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেন এবং তখনই ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন যে, এই নীতির অনুসরণের ফলে ভারতবর্ষে বিদ্রোহ-বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিবে। দিল্লীর মুসলমানগণ এই সময় ইংরেজ সরকারের উপর কিরূপ বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, পাদ্রী লঙ্‌ সেখানে দেশীয় ভাষার পুথি ও পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে গিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নূতন সনন্দ অনুসারে বড়লাটের আইন সভায় কোনো ভারতবাসীকে লওয়া হয় নাই, আইন-প্রণয়নে সাহায্য করিবার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে মাত্র 'ক্লার্ক অ্যাসিস্ট্যাণ্ট' পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র পরিষদে ভারতীয় সদস্য গ্রহণের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছিলেন। এ সময়কার সরকারী কর্মচারী, পরবর্তী কালের স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ বলিয়াছিলেন যে, আইন-সভায় ভারতীয় সদস্য থাকিলে সিপাহী বিদ্রোহ এড়ানো সম্ভব হইত।

ভারত-শাসন ব্যাপারে সিবিলিয়ান গোষ্ঠীর একাধিপত্য এবং ইহাতে ভারতীয় গ্রহণে কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যেরও তীব্র প্রতিবাদ করে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'। হরিশ্চন্দ্র ভারতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি এবং ভাবধারা-বিরোধী এই সিবিলিয়ান মণ্ডলী তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। তিনি লেখেন :

"The close Civil Service, the instrument of a temporary policy, and an institution un-rooted in the deeper parts of the social frame, must make way for an agency less pretentious and better suited to the altered requirements of the time." Feb. 12, 1857.

মফস্বলে নীলকরদের অত্যাচার-অনাচার চরমে উঠিয়াছিল। ১৮৪৯ সনের খসড়া আইনগুলির ভিত্তিতে ১৮৫৭ সনে একটি আইনের খসড়া প্রচারিত হয়, যাহাতে মফস্বলের ইউরোপীয়দের বিচার এদেশীয়দের মত স্থানীয় ফৌজদারি আদালতসমূহেও হইতে পারে। মেকলের আইনটির বাইশ বৎসর পরেও কিন্তু ইউরোপীয়দের ফৌজদারি অপরাধের বিচার কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টেই হইত। এবারেও খসড়া প্রচারিত হইলে, ইহার বিরুদ্ধে ইউরোপীয়েরা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করে। কলিকাতা টাউন হলে সাধারণ সভা করিয়া তাহারা ইহার প্রতিবাদ জানায়। এই প্রতিবাদের

১০ *The Hindu Intelligencer*, January 17,1853.

বিরুদ্ধে এবং উল্লিখিত খসড়া আইনের সমর্থনে ভারতবাসীরাও ঐস্থলে এক বিরাট সভার অধিবেশন করে। এই সময় জর্জ টমসন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং সভায় প্রস্তাবিত আইনটির সমর্থনে জোরালো বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' মফস্বলের নীলকরদের তথা ইউরোপীয় সমাজের উৎপীড়ন-নিপীড়নের ফিরিস্তি ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া উক্ত আইন আশু বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পেট্রিয়ট বলেন, এই খসড়া আইন লইয়া 'স্বাধীন' ব্রিটন এবং বাঙালীদের মধ্যে যে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইল, সিপাহী-বিদ্রোহ কালে তাহার সুযোগ লইয়া প্রথম দল শেষোক্ত দলকে নানাভাবে নির্যাতন করিতে চেষ্টা করে। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ন্যায় বাংলা 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সম্বাদ ভাস্কর' ইংরেজদের এই শ্রেণী-প্রাধান্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে কসুর করেন নাই। তবে পেট্রিয়টের তীব্রতা তাঁহাদের লেখনীতে আশা করা সম্ভব নয়।

সিপাহী-যুদ্ধ কালেও পেট্রিয়টে হরিশ্চন্দ্র যে ভাবে লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহাতে আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি অধিকতর দৃঢ় হইয়াছিল। বাঙালী সিপাহী-যুদ্ধে যোগ না দিলেও ইউরোপীয়গণ তাহাদিগকে ইহার সঙ্গে জড়াইয়া বিদ্রোহী প্রতিপন্ন করিতে বিশেষভাবে প্রয়াস পাইয়াছিল। কারণ তাহারা জানিত, আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়ে তাহারা বিদ্রোহ হয়তো দমন করিতে সক্ষম হইবে, কিন্তু বিদ্রোহে জয়লাভ করিলেও বাঙালীদের রুখিতে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। কেননা বাঙালীর মত সুশিক্ষিত, মার্জিত-বুদ্ধি, পশ্চিমের স্বাধীনতা ও বিপ্লবের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ, সমগ্র ভারতের ঐক্যকামী জাতি ভারতবর্ষে তখন বিরল ছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়টে' হরিশ্চন্দ্র ইউরোপীয়দের বিদ্বেষের মূল কারণ ফাঁস করিয়া দিতে লাগিলেন। 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'র বিষোদ্গারও তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। বিদ্রোহকালে সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রণে 'পেট্রিয়ট' অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল। এরূপ প্রকাশ, বড়লাট ক্যানিং প্রতি সপ্তাহে এই কাগজখানির জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতেন। তবে এই সময় লর্ড ক্যানিং ইংরেজী ও দেশীয়দের সম্পাদিত পত্রিকাগুলিকে সংযত করিয়া রাখিবার জন্য সাময়িকভাবে একটি প্রেস আইনও করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ অবসানের পরে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নীল-আন্দোলন পরিচালনে প্রজাদের সপক্ষতা করিয়া জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়তা করে। কিন্তু সে কথা আজিকার বক্তব্য নয়।

গ্রন্থপরিচয়

পাগলা দাশু। সুকুমার রায়। সিগনেট প্রেস। আড়াই টাকা।

গল্প আর গল্প। শ্রীসুখলতা রাও। মিত্র ও ঘোষ। চার টাকা।

কথাসরিৎসাগর। ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি। রবিন হুড। কুলদারঞ্জন রায়। এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানী। প্রতিটি দেড় টাকা।

খাই খাই। সুকুমার রায়। সিগনেট প্রেস। দুই টাকা বারো আনা।

ড্র্যাগনের নিশ্বাস। 'কুমির! কুমির!'। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। সিগনেট প্রেস। যথাক্রমে দুই টাকা চার আনা ও দুই টাকা।

রাঙা ধানের খৈ। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড। দুই টাকা।

ছড়ার বই। শ্রীঅজিত দত্ত। দিগন্ত পাবলিশার্স। দেড় টাকা।

কালোর বই। শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার। দিগন্ত পাবলিশার্স। দেড় টাকা।

দিনে দুপুরে। শ্রীলীলা মজুমদার। সিগনেট প্রেস। আড়াই টাকা।

নতুন ছড়া। শ্রীসুখলতা রাও। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড। পাঁচ সিকা।

হিতোপদেশের গল্প। শ্রীরাজশেখর বসু। বিশ্বভারতী। সাত সিকা।

বেড়াল ঠাকুরঝি। শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত। বিশ্বভারতী। পাঁচ সিকা, বোর্ড বাঁধাই সাত সিকা।

ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব। শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস। দুই টাকা।

হাতে খড়ি। শিল্পী শ্রীসত্যজিৎ রায়। ছড়া শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ। দীপঙ্কর ভবন। এক টাকা চার আনা।

আগডোম বাগডোম। শিল্পী শ্রীগোপাল ঘোষ। দীপঙ্কর ভবন। পনেরো আনা।

হাট্টিমা টিম্ টিম্। শিল্পী শ্রীগোপাল ঘোষ। দীপঙ্কর ভবন। পনেরো আনা।

✓**ছেলেভুলানো ছড়া।** শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী সংকলিত। পাঠভবন-পুস্তকপ্রকাশ-সমিতি, শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতী। এক টাকা।

কঙ্কাবতী। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। চার টাকা।

ছোটদের কঙ্কাবতী। শ্রীঅনাথনাথ বসু সংকলিত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং। এক টাকা।

মিঠেকড়া। সুকান্ত ভট্টাচার্য। সারস্বত লাইব্রেরি। দুই টাকা।

আমরা ছোটো ছিলুম বাংলা শিশুসাহিত্যের সোনালি যুগে। দুই অর্থেই সোনালি সেই যুগ। প্রথমত, সেই আরম্ভ, সূত্রপাত— বলতে গেলে শিশুসাহিত্যই শিশু তখনো; আমরা এখন যারা সসম্মানে কিংবা যে-কোনো প্রকারে মধ্যবয়সে অবস্থান করছি, বাংলা ভাষার লক্ষণযুক্ত শিশুসাহিত্য আমাদেরই ঠিক সমসাময়িক। দ্বিতীয়ত, গুণের বিচারেও সোনালি; শুদ্ধ, সরল, সুন্দর, স্ফুটনোন্মুখ কিংবা সদ্যস্ফুটিত—

এই অর্থেও সোনালি। বেশি বই ছিলো না তখন; কিন্তু যে-ক'টি ছিলো তার অধিকাংশেরই আজ পর্যন্ত জুড়ি মেলেনি, তার অধিকাংশই আজকের দিনে ক্লাসিক ব'লে গণ্য হয়েছে। তখনকার বাল্যবঙ্গের নিরন্তরভোগ্য মধুচক্র যাঁরা বানিয়েছিলেন, সংখ্যায় তাঁরা মাত্রই কয়েকজন: প্রাতঃকালীন, প্রাতঃস্মরণীয় যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নানা-রঙিন রূপকথার দক্ষিণারঞ্জন, এবং সর্বোপরি সেই বিস্ময়কর রায়চৌধুরী পরিবার, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-একটিমাত্র পরিবারের আসন— মাত্রাভেদ যত বড়োই হোক না— জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ির পরেই। কোনো-একটা সময়ে এ-রকমও মনে হয়েছিলো যে বাংলা শিশুসাহিত্য এই রায়চৌধুরীদেরই পারিবারিক এবং মৌরশি কারবার ভিন্ন কিছুই নয়। রামায়ণ মহাভারত প্রথম আমাদের শোনালেন উপেন্দ্রকিশোর; যাকে বলা যায় বাংলা দেশের অমর ছড়ার গদ্য রূপ, সেই টুনটুনির গল্প শোনালেন। কুলদারঞ্জনেব পুরাণের গল্পে প্রাচীন ভারতের হৃদয়ের পথ খুঁজে পেলুম আমরা; তাঁর রবিন হুডের কাহিনীতে— যাতে ভোরবেলার শিশির-ছোঁয়া গন্ধটুকুও যেন লেগে ছিলো— মধ্যযুগীয় 'সবুজ সুভগ' ইংলণ্ডের কত স্বপ্নেই মধুর হ'লো ছেলেবেলা। আর সুখলতা রাওয়ের 'গল্পের বই', 'আরো গল্প'? সেই দুটি— হায় রে, দুটিমাত্র!— বইয়ের কথা কি বলবার! না কি তারা কখনোই ভোলবার! এটুকু হ'লেই যথেষ্ট ছিলো, সাহিত্যের সেই প্রাথমিক অবস্থায় খুব বেশি কেউ চাইতে শেখেনি; কিন্তু ছোটোদের আশার হরিণকে দিগন্তের দিকে ছুটিয়ে দিয়ে মাসে-মাসে আসতো 'সন্দেশ' পত্রিকা, আসতো তার আশ্চর্য মলাট আর ভিতরকার মনোহরণ রঙিন ছবি নিয়ে, আনতো দুটি মলাটের মধ্যে সাহিত্যের বিচিত্র ভোজে উজ্জ্বল পাইকা অক্ষরের পরিবেশন। কবিতা, গল্প, উপকথা, পুরাণ, প্রবন্ধ, ছবি, ধাঁধাঁ— 'সন্দেশে'র ভোজ্যতালিকায় এমন কিছু ছিলো না, যা সুস্বাদু নয়, সুপাচ্য নয়, যাতে উপভোগ্যতা এবং স্বাস্থ্যকরতার সহজ সমন্বয় ঘটেনি;— শুধু তা-ই নয়, সমস্ত বিভিন্ন রচনার মধ্যে এমন একটি সংগতি ছিলো সুরে, এমন একটি অখণ্ডতা ছিলো এই পত্রিকাটির চরিত্রে, যে অনেক সময় পুরো সংখ্যাটা একজনেরই রচনা ব'লে মনে হ'তো। এই ধারণার সমর্থন করতো অস্বাক্ষরিত রচনার প্রাচুর্য— স্পষ্টত একই হাতের কর্ম সে-সব। অনেক লেখাই অনামীতে বেরোতো 'সন্দেশে': সেই সব খেয়ালি কবিতা, ছন্দে-মিলে মন্ত্র-পড়ানো এবং অর্থহীনতায় অর্থময় সব কবিতা, পাতা খুলে প্রথমেই যার প্রিয় কণ্ঠের অভ্যর্থনা শুনতাম, আর কখনো-কখনো একই সংখ্যায় যার দুটি-তিনটি ক'রেও পাওয়া যেতো;— আর সেই সব স্কুল-ছেলেদের হাস্যস্ফুরিত সমানুভাবী গল্প, বালকের প্রচ্ছন্ন জগতে নিত্যনতুন আবিষ্কারের কাহিনী— যেখানে অধ্যবসায়ী নন্দলাল নিয়তিনির্বন্ধে কিছুতেই প্রাইজ পায় না, পাগলা দাশুর রহস্যময় বাক্স শুধু কৌতূহলের অসারতা প্রমাণ করে, এবং মাতুলবিলাসী কল্পনাপ্রবণ যজ্ঞিদাস কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের বিরোধ সইতে না-পেরে মর্মপীড়িত অশ্রুপাত করে— এই সব অস্বাক্ষরিত গল্প-কবিতা যে কার লেখা, সে-বিষয়ে 'সন্দেশে'র তৎকালীন পাঠকরা ঠিক অবহিত না-থাকলেও সারা বাংলায় তার প্রচার হ'তে বিলম্ব হ'লো না— যখন 'হ-য-ব-র-ল' এবং 'আবোলতাবোল' বই দুটি প্রকাশিত হ'লো। শুধু তো বই দুটি নয়, প্রকাশিত হ'লো প্রতিভা— অকালমৃত্যুর বেদনাজড়িত সেই বিস্ময় বাংলার সাহিত্যজগতে তরঙ্গ তুললো সেদিন। সোনার খাতায় নতুন একটি নাম উঠলো, নতুন একটি তারা ফুটলো আকাশে: সুকুমার রায়।

২

আজ আমার সেই ছেলেবেলার পড়া— বাঙালি ছেলের চিরকালের পড়া—রচনাবলীর কিছু অংশ নতুন আকারে দেখতে পেয়ে আনন্দিত হচ্ছি। ইতিমধ্যে অনেক বছর কেটেছে; আমরা যারা এ-সব লেখার প্রথম ছোটো-ছোটো ভোক্তা ছিলুম, আজ আমাদেরই উপর ভার পড়েছে নবীন তরুণের মনের খাদ্য সংগ্রহ করার। এই চেষ্টায় সম্প্রতি আমরা নানা ভাবেই হতকাম হয়েছি। যে-সব বই বিশেষভাবে অপত্যপাঠ্য মনে করি, তা সংগ্রহ করা অনেক সময়ই সহজ হয়নি। এমনকি, বাংলাদেশে এত বড়ো লজ্জাকর দুর্ঘটনাও ঘটেছিলো যে 'আবোলতাবোল' অনেক বছর ছাপা ছিলো না। মাঝে কুলদারঞ্জন অবলুপ্তির প্রান্তে এসে ঠেকেছিলেন, সুখলতা রাওয়ের বই জোগাড় করতে প্রায় গোয়েন্দা লাগাবার প্রয়োজন হ'তো। এ-সব বইয়ের পুনঃপ্রকাশ, তাই, সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব'লে মনে করি। একই সঙ্গে দেখছি 'পাগলা দাশু', কুলদারঞ্জনের তিনখানা আর সুখলতার দুটি বই যুক্ত হ'য়ে 'গল্প আর গল্প' নামে বেরিয়েছে। রায়চৌধুরীদের এই রচনাগুচ্ছে একটি পারিবারিক সাদৃশ্য ধরা পড়ে: সেটি তাঁদের সহজ ভঙ্গিতে, গল্প বলার নির্ভার প্রবাহে, কণ্ঠস্বরের সেই লাবণ্যে, যে-কোনো পাতায় বই খুললেই যা অনুভব করতে হয়। এই লাবণ্য গুণটি বুঝিয়ে বলা শক্ত— কিংবা খুবই সহজ, অর্থাৎ সাহিত্যরান্নায় এটি সেই লবণ, যার অভাবে অন্য কিছুরই অর্থ থাকে না। এ-ক্ষেত্রে বলা যায় যে এঁরা ঠিক ছোটোদের মতো ক'রেই বলতে পারেন— মানে, ছোটোরা নিজেরা যে-রকম ক'রে বলবে সে-রকম অবশ্য নয়, কিন্তু যেমন ক'রে বললে তাদের মনে হবে তাদের মতোই বলা হচ্ছে, ঠিক তেমনি ক'রেই বলতে পারেন এঁরা। অর্থাৎ, এঁদের লেখায় কৃত্রিমতা নেই; এক ফোঁটা পিঠ-চাপড়ানো নেই ছোটোদের উদ্দেশ্যে, কোনোরকম ইস্কুলমাস্টারি দয়া অথবা কর্তব্যবোধ নেই; ছোটোদের সম্মান সম্পূর্ণ বজায় রাখেন এঁরা, কিন্তু তাই ব'লে স্বকীয় সত্তা ভোলেন না, নিজেরাই ছেলেমানুষির ভুল করেন না কখনো, বন্ধুতাস্থাপনের চেষ্টায় অশোভন মুখভঙ্গি ক'রে শ্রদ্ধা হারান না। সুকুমার রায়ের প্রত্যেক গল্পেই উপদেশ আছে, কিন্তু তা বাইরে থেকে নিক্ষিপ্ত নয়, ভিতর থেকেই প্রকাশ-পাওয়া; অর্থাৎ, সে-উপদেশ সেই জাতের যা বালকেরা নিজেরাই মাঝে-মাঝে কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ ক'রে থাকে জীবন থেকে। তাই তাদের উপভোগে ব্যাঘাত ঘটে না কখনো; তাদের বয়সোচিত নানা রকম ছলচাতুরী বোকামি এবং দুষ্টুমির শেষে জব্দ হওয়ার দৃশ্যটিতে নিজেরাই তারা প্রাণ খুলে হাসে; ঐ জব্দ হওয়ার— যদিও তারাই এক-এক জন এক-এক গল্পের নায়ক— সম্পূর্ণ সমর্থন করে তারা; সেটুকু না-থাকলেই ভালো লাগতো না, সত্যি বলতে। এতে প্রমাণ হয়, বয়স্ক লেখকের সঙ্গে তাঁর ছোটো-ছোটো পাঠকদের একাত্মবোধ কত নিবিড়; এবং এই একাত্মবোধেরই ফলে রচনায় স্বাচ্ছন্দ্য আসে, লাবণ্যের গুণ বর্তায়।

এই যাকে লাবণ্য বলছি, সহজ ভঙ্গি বলছি, তা সবচেয়ে প্রশংসা জাগায় সুখলতা রাওয়ের গল্পগুলিতে, কেননা 'পাগলা দাশু' কিংবা কুলদারঞ্জনের বইগুলির তুলনায় এ-সব গল্প আরো অনেকটা শিশুদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। 'গল্পের বই', 'আরো গল্প'— কিংবা 'গল্প আর গল্প'—হাতে নিলে মনে হয় এ যেন আগাগোড়া শৈশবের রসে সবুজ, একেবারে কিশলয়ের মতো কাঁচা; ছোটো-ছোটো কথা, মৃদু-মৃদু বাক্য, অথচ কোথাও একটু জোলো নয়, আর তার সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে লেখিকার নিজের আঁকা বাঁকা ভুরিঙের ছবিগুলি— সুখের বিষয় প্রকাশক সেগুলোই রেখেছেন, 'শিক্ষিত' কোনো শিল্পীকে

দিয়ে— মলাটে ছাড়া— রূপভঙ্গ ঘটাননি। (প্রসঙ্গত বলা দরকার যে দুটি বইকে একসঙ্গে জুড়ে প্রকাশক সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি; 'গল্পের বই', 'আরো গল্প' স্বতন্ত্রভাবে, পূর্বের আকারে, লেখিকার আঁকা মূল প্রচ্ছদপট নিয়ে বেরোলেই সব দিক থেকে ভালো হ'তো; তাতে ঐ স্মৃতিজড়িত মলাটের ছবি দুটিও হারাতে হ'তো না, আর একবারে একটি ক'রে কেনবার পক্ষেও সুবিধে হ'তো অনেকের।) সুখলতার গল্প অবশ্য মৌলিক নয়, বিদেশী রূপকথার— প্রধানত গ্রিম-ভ্রাতাদের জর্মনদেশীয় রূপকথার অনুসরণে লেখা;— কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। সাহিত্যের কোনো-কোনো অবস্থায় অনুবাদ কিংবা অনুসারী রচনা মৌলিকতারই মর্যাদা পেয়ে থাকে; এবং অন্য দিক থেকে রূপকথার কোনো মূল খুঁজে পাওয়াই শক্ত, কেননা একই কাহিনীর বিভিন্ন প্রকরণ বিভিন্ন এবং বহুবিচ্ছিন্ন দেশে অনেক ক্ষেত্রেই বিস্ময়কররূপে পাওয়া যায়। এ-গ্রন্থে যে-ভাবে গ্রিমের গল্প স্বদেশীয় হাওয়ায় প্রস্ফুটিত হয়েছে, সেজন্যই বাঙালি শিশুর বংশাবলীর কাছে সুখলতা রাও কৃতজ্ঞতভাজন। সবেমাত্র যারা পড়তে শিখেছে, তাদের তখনই ধরিয়ে দেয়া যায় এমন কোনো সুখপাঠ্য গল্পের বই এটি ছাড়া বাংলা ভাষায় বেশি নেই এখনো। আর অবশ্য 'টুনটুনির বই' আছে।

সুকুমার রায়কে আমি বরাবর শ্রদ্ধা করেছি শুধু হাস্যরসিক ব'লে নয়, শুধু শিশুসাহিত্যের প্রধান ব'লে নয়, কবি ব'লেও, বয়স্কদের কবি ব'লেও। 'আবোলতাবোল' আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ একটি কাব্যগ্রন্থ, যাতে হাসির ছুতো ক'রে, ছবি এবং কৌতুকের সাহায্যে ভুলিয়ে এনে, শিশুদের— এবং আশা করা যায় প্রবীণদেরও— কয়েক ফোঁটা বিশুদ্ধ কাব্যরস অন্তঃস্থ ক'রে দেয়া হ'লো। 'মেঘ-মুলুকে ঝাপসা রাতে রামধনুকের আবছায়াতে' ব'সে 'আলোয় ঢাকা অন্ধকারে'র গন্ধে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাবেন কি কবি ছাড়া অন্য কেউ? যিনি লিখেছেন—

বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা,
জটবাঁধা ঝুল কালো বটগাছ তলে,
ধক ধক জোনাকির চকমকি জ্বলে,
চুপচাপ চারদিক ঝোপঝাড়গুলো,
আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হুলো।· ·
পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা,
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা—

তাঁকে কবি ব'লে না-মানতে হ'লে 'কবি' কথাটায় অন্যায়ভাবে সীমানা টানতে হয়। সত্য, সুকুমার রায়ের পদ্যজাতীয় রচনা অধিকাংশই সর্বতোভাবে পদ্য, সাধারণত যাকে কবিত্ব বলি সেদিকে তাদের উন্মুখতাই নেই; কিন্তু নিছক পদ্যরচনায়, শুধুমাত্র ছন্দ-মিলের পরিচালনায় এমন অসামান্য সাবালক দক্ষতা তাতে প্রকাশ পেয়েছে যে তারই জোরে কোনো-কোনোটি কবিতার জাতে উৎরে গেছে সন্দেহ নেই। উদ্ধৃত অংশের নিখুঁত চিত্ররূপ, তার হসন্ত শব্দে অন্তর্মিলবহুল নৌকোর দাঁড় পড়ার মতো ছপছপ আওয়াজ— এরই জোরে এর কৌতুকাবহ প্রসঙ্গ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে এই পদ্য— কিংবা কৌতুকের সঙ্গে কল্পনা মিশে অন্য কিছু হ'য়ে উঠেছে— এতে আমরা অন্য যে-আস্বাদ পাই তাকে কবিতা ব'লে চিনতে

আমাদের দেরি হয় না। অর্থাৎ, 'আবোলতাবোলে'র আবেদন একাধিক স্তরে ; ছোটোরা কুমড়োপটাশ আর বোম্বাগড়ের রাজাকে নিয়ে হাসে, দুলে-দুলে ছন্দ পড়ে, আবৃত্তি করে চেঁচিয়ে ; আর বড়োরা— হয়তো কোনো-কোনো বালকবালিকাও উপভোগ করে 'দখিন হাওয়ার সুড়সুড়ি', লক্ষ্য করে বাতিক-গ্রস্তদের অবিশ্বাস্য ব্যবহারে সমাজবিধানের সমালোচনা।

'আবোলতাবোলে'র সঙ্গী বই এবার প্রকাশিত হ'লো 'খাই খাই' নামে। বইটি চোখে দেখে, এমনকি শুধু নাম শুনে, আমার মনে প'ড়ে গেলো 'খাই খাই' কবিতা প্রথম যখন বেরিয়েছিলো সেই কত দূরের কিন্তু এখনো খুব স্পষ্ট অতীতে। সেই গ্রন্থবিরল যুগে বিধাতার আশীর্বাদের মতো এসেছিলো নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পার্বণী', তারই পাতায় এই অপ্রতিরোধ্য কবিতা প্রথম এবং অবিস্মরণীয়রূপে পড়েছিলাম। মনে পড়ে একটি বালককে অসংখ্য বার আবৃত্তি করতে হয়েছিলো এটি, আর তা শুনে বয়স্কজনেরা কতই না হেসেছিলেন। হ্যাঁ—নিঃসন্দেহে হাসির কবিতা, কিন্তু শুধু তা-ই নয়, শুধু ঔদরিকতার পরাকাষ্ঠাই প্রকাশিত হয়নি এখানে, মাতৃভাষার স্বরূপেও আমরা শিক্ষা পেয়েছি। এক-একটি ক্রিয়াপদ বাংলায় কত রকম বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয় তা সব সময় অভিধানে পাওয়া যায় না— আমরা সাধারণত ভেবেও দেখি না সে-কথা— কিন্তু এ-বিষয়ে মনোরমরূপে আমাদের সচেতন ক'রে দিলেন সুকুমার রায়। তাঁর এ-ধরনের রচনার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ 'শব্দকল্পদ্রুম', সবচেয়ে বিস্তারিত এবং সন্নিবদ্ধ 'খাই খাই'— পদ্যে লেখা প্রবন্ধ, সত্যি বলতে, অথচ কোনোখানেই সরসতা থেকে চ্যুত নয়। (প্রসঙ্গত ব'লে নিই যে ভোজ্যবস্তুর বহির্ভূত কোনো-কোনো খাওয়া—যেমন, খাপ খাওয়া, মিশ খাওয়া— এগুলি উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে বসিয়ে মুদ্রাকর রসজ্ঞানের পরিচয় দেননি, ওতে কৌতুকের চাপ লঘু হ'য়ে গেছে, পাঠককে আগে থেকেই তৈরি ক'রে দিয়ে বিস্ময়টাকে জখম করা হয়েছে রীতিমতো।) ভাষাতত্ত্ব-ঘটিত আরো তিনটি রচনা আছে এ-গ্রন্থে—'দাঁড়ের কবিতা', 'পাকাপাকি' আর 'পড়ার মতো পড়া' ; তাছাড়া আছে সুকুমার রায়ের অন্যান্য কবিতা, 'সন্দেশে'র যুগ-পেরোনো পাঠকরা হয়তো যার অস্তিত্বও জানতেন না এতদিন। যদিও প্রকাশক এ-বিষয়ে কিছু জানাননি, তবু আশা করি গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়েছে, অর্থাৎ অপ্রকাশিত কোথাও কিছু প'ড়ে নেই। সেদিক থেকে 'খাই খাই' মূল্যবান, তাছাড়া আমাদের কিশোর-সাহিত্যের সম্পদহিশেবে কতখানি, সে-কথা কিছু না-বললেও চলে।

৩

সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পরে 'সন্দেশ' যতদিনে বন্ধ হ'লো, তার আগেই শিশুসাহিত্যে নতুন যুগ এনেছে 'মৌচাক' পত্রিকা। পরে অবশ্য 'সন্দেশ' আবার বেরিয়ে কিছুদিন চলেছিলো, কিন্তু 'প্রত্যাগত' শার্লক হোমস-এর মতোই সে আর তার পূর্ব সত্তা ফিরে পায়নি। এর পর থেকে শিশুসাহিত্যে আসর জমালেন 'মৌচাকে'র লেখকরাই ; শিশুসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের এই পত্রিকাটিকেই প্রতিভূ বলা যায়।

এ-কথার অর্থ এই যে আধুনিক কালে— অর্থাৎ গত তিরিশ বছরের মধ্যে—যাঁরা ছোটোদের জন্য উল্লেখ্যরূপে লিখেছেন, তাঁরা সকলেই ঐ পত্রিকার লেখক, এবং কেউ-কেউ হয়তো ওরই প্ররোচনায় এদিকে প্রথম মন দেন। প্রথম যুগের সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের কিছু লক্ষণগত প্রভেদ দৃষ্টিপাতমাত্র ধরা পড়ে। আগে সাহিত্যক্ষেত্রে নাবালক সাবালকের সীমান্তরেখা খুব স্পষ্ট ছিলো ; কেউ-কেউ ছিলেন একান্তরূপেই

শিশু-সাহিত্যসেবী, এবং বয়স্কপাঠ্য লেখকরা শিশুরঞ্জনে উচ্চাভিলাষী হতেন না। (পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে বলছি, এবং 'শিশু' কাব্যটি যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে ছোটোদের জন্য লেখেননি—এবং শিশুপাঠ্য হ'লেও ওটি যে শিশুসাহিত্য নয়—সে-কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য।) আধুনিক কালে এ-ব্যবস্থার বদল হয়েছে। 'মৌচাকে'র প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতার লেখক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত; 'ভারতী'-গোষ্ঠীর, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর সকলেই প্রায় লিখেছেন সেখানে;—মোটের উপর ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে যে সম্প্রতি যাঁরা ছোটোদের জন্য লিখেছেন এবং লিখছেন, দু-একজনকে বাদ দিলে সকলেই তাঁরা বয়স্ক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাবান। ফলত—কিংবা হয়তো অনিবার্য যুগপ্রভাবে—আমাদের শিশুসাহিত্যও অপেক্ষাকৃত বয়স্ক হয়েছে এখন; হয়তো শৈশবেরও চরিত্র বদলেছে এতদিনে; আমরা আমাদের ছেলেবেলায় যে রকমের ছোটো ছিলুম, এই রেডিওমুখর সিনেমাচ্ছন্ন যুগে সে-রকম সম্ভব ব'লেই মনে হয় না। এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে শিশুসাহিত্যে: রচনার বিষয় বেড়েছে তার, বিষয় বদলেছে; ভিন্ন সুরে বলা হয় আজকাল, ছোটোদের আর ততটা ছোটো ব'লে গণ্য করা হয় না, এবং অনেক ক্ষেত্রেই বোঝা যায় যে লেখক যদিও মুখ্যত ছোটোদের জন্য লিখছেন, তবু সাবালক পাঠকও তাঁর লক্ষ্যের একেবারে বহির্ভূত নয়।

এর ফল—বলতে পেরে সুখী হচ্ছি—ভালোই হয়েছে। প্রাচুর্য বেড়েছে, বৈচিত্র্য বেড়েছে—সেই সঙ্গে উৎকর্ষেরও অভাব নেই এইটি হচ্ছে সুখের কথা। বিস্তর বই বেরোচ্ছে আজকাল, বিস্তর বাজে বই বেরোচ্ছে; কিন্তু ফাঁকে-ফাঁকে ভালো যা পাওয়া যাচ্ছে তারও পরিমাণ বড়ো কম নয়। আমার হাতের সামনেই উল্লেখযোগ্য আছে কয়েকটি। লেখকদের মধ্যে দেখছি আধুনিক সাহিত্যে অগ্রগণ্য কিছু নাম। প্রেমেন্দ্র মিত্র—'বৈজ্ঞানিক' অ্যাডভেঞ্চারের গল্পে যাঁর জুড়ি নেই বাংলাদেশে, যাঁর দানবিক দ্বীপের অথবা চান্দ্র ভ্রমণের রহস্যঘন কাহিনী বয়স্করাও রুদ্ধশ্বাসে প'ড়ে থাকেন, তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার প্রমাণ নতুন ক'রে পাওয়া গেলো 'ড্র্যাগনের নিশ্বাস'-এ। 'কুমির কুমির!' তাঁরই হাতের পদ্য—একটি রাশিয়ান ছড়া অবলম্বনে রচিত—এবং যদিও বোঝা যায় এখানে লেখক নিজের প্রতি ঠিক সুবিচার করতে পারেননি, তবু অন্য দিক থেকে প্রমাণ মিললো যে ছড়া জিনিশটা নতুন ক'রে জেগে উঠেছে দেশে। একই সঙ্গে হাতে পেলুম অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'রাঙা ধানের খই' আর অজিত দত্তর 'ছড়ার বই'। ছড়া ব্যাপারটার বিপদ এই যে অনেক সময়ই তাতে সারাংশ কিছু থাকে না, শুধুমাত্র শব্দের টুংটাং-এই পর্যবসিত হয়, কিন্তু এ-দুটি বইয়ে রূপের সঙ্গে বস্তুও আছে রীতিমতো, তার উপর সেই কৌতুকের খোঁচাটুকুও আছে, যেটুকু না-থাকলে কোনো ছড়াই ঠিক সম্পূর্ণ মনে হয় না। অন্নদাশঙ্করের 'উড়কি ধানের মুড়কি' কয়েক বছর আগে সাবালক পাঠকের সবিস্ময় প্রশংসা জাগিয়েছিলো; সেই ঝাল-মিষ্টি-মেশানো মুড়মুড়ে ঠাট্টার ছড়াছড়ি দেখছি 'রাঙা ধানের খৈ'তেও— যদিও এ-খই তিনি ছোটোদের উদ্দেশ্যে বিলিয়েছেন। 'যদিও' বললুম, কেননা বয়স্করাও বাদ পড়তে রাজি হবেন না—বাদ পড়লে ঠকবেন— এবং সম্ভবত এ-সব ঠাট্টা সম্পূর্ণ উপভোগ করবেন তাঁরাই। 'কেশনগরে'র মশার কাঁদুনি শুনে ছেলে-বুড়ো অবশ্য সমান হাসবে, কিন্তু যুদ্ধের সময়কার পলিটিক্যাল ব্যঙ্গ—

আমরা গেছি জিতে
আমরা মানে আমাদের সেই
সিঙ্গি ভালুক মিতে।··

আমরা মানে আমাদের সেই
ঈগলপাখী মিতে।

কিংবা ভারতভঙ্গের বেদনা—

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো !
তার বেলা ?

কিংবা 'দুই বেড়াল ও এক বাঁদর' নামক আশ্চর্য সুলিখিত নাটিকাটিতে পিষ্টকগ্রাসী বিচারক বানরের পুরোনো নীতিকথায় ভারত-পাকিস্তান-ব্রিটিশ সম্বন্ধের হাস্যমুখর সমীকরণ—এ-সব রচনা যথোচিতমাত্রায় ভালো লাগবে পরিণতবুদ্ধি পাঠকেরই। ভালো লাগবে, আবার রাজনৈতিক শিবিরভেদে রেগেও যাবেন কেউ-কেউ; কিন্তু অজিত দত্তর 'নইলে' নামক উৎকৃষ্ট কবিতাটিতে মতভেদের কোনো অবকাশই নেই, এখনকার বরাদ্দ-বাঁধা বিঘ্নবহুল জীবনযাত্রার এই সকৌতুক ছন্দোনিপুণ বর্ণনা সকলকেই যথার্থ ব'লে মানতে হবে। নমুনাস্বরূপ দুটি স্তবক উদ্ধৃত করছি:

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির ?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির ?
নইলে
রইলে
ট্রাম না চ'ড়ে—
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।
দাঁত আছে মজবুত সব বেশ ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস ?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে,
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

'ছড়ার বই'য়ের সব রচনাই কৌতুকাবহ নয়, লেখকের স্বপ্নিল কবিস্বভাব জানান দিয়েছে বারবার, কোথাও-কোথাও ছড়ার পরিধি ছাড়িয়ে গেছে। যাকে বলতে পারি খাঁটি ছড়া, অর্থাৎ যা পরিশীলনের মুখাপেক্ষী নয়, পদ্যছন্দের বাঁধাবাঁধির বদলে মুখের কথার চওড়া তালে চলাই যার অভ্যেস— এই রকম ছড়ায় কিছু প্রশংসনীয় পরীক্ষা করেছেন সুনীলচন্দ্র সরকার তাঁর 'কালোর বই'তে। এ-বইটি একটু নতুন রকমের রচনা; লেখকও নতুন— অন্তত, এই তাঁর প্রথম বই। পৃথিবীটা যে শুধু মানুষের নয়, পশুপাখিও যে তার সমান শরিক, এ-কথা আমরা ব্যস্তবাগিশ বয়স্কজনেরা অনেক সময়ই ভুলে থাকি;—কিন্তু শিশুরা কখনো ভোলে না। পশুপ্রীতি তাদের পক্ষে স্বাভাবিক; প্রত্যেক শিশুই প্রাণীর প্রতি— প্রাণের প্রতি—একটি

আদিম সহানুভূতির বশবর্তী। কালো-ধলো দুই ভাই, আর তাদের মাথায়-ছিটওলা ছড়াকাটুনি মামাকে অবলম্বন ক'রে এই সহজ সম্বন্ধসূত্রটির অনুসরণ করেছেন লেখক; জীবজন্তুর মানসরাজ্যে আবিষ্কারের কাহিনী তাঁর 'কালোর বই'। রচনাভঙ্গিতে তিনি অনুসরণ করেছেন অবনীন্দ্রনাথের— যিনি এ-ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান লেখক— কিন্তু ফল তার খারাপ হয়নি, একটু বাঁকাচোরা গদ্যের সঙ্গে দুলকি চালের বেপরোয়া পদ্য মিশিয়ে প্রসঙ্গ বুঝে ঠিক সুরটি লাগাতে পেরেছেন। প'ড়ে বোঝা যায় এই মর্ত্যলোকে আমাদের ভাষাহীন কিন্তু সরব সঙ্গীদের বিষয়ে তাঁর শৈশবদৃষ্টি ঝাপসা হয়নি।

৪

শিশুসাহিত্যের দুই যুগের প্রভেদ বিষয়ে পূর্বে যা বলেছি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ লীলা মজুমদার। সুকুমার রায়ের পিতৃব্যপুত্রী ইনি, রায়চৌধুরীদের বংশগত দীপ্তি পেয়েছেন, এঁর বাচনভঙ্গিও সুকুমার রায়কে মনে করিয়ে দেয়—কিন্তু 'পাগলা দাশু'র পরে 'দিনে দুপুরে' পড়লে দ্বিতীয়টির বৈশিষ্ট্য বুঝতে একটুও দেরি হয় না। সেই একই রকম চাপা হাসি, কৌতুকচ্ছুরিত ছদ্ম-গাম্ভীর্য, এমনকি বালিকার বদলে বালকেরই জীবনবিষয়ে সহজবোধ (স্কুলের ছেলেদের অসাধু কিন্তু বলশালী স্ল্যাং বুলিতে এই লেখিকার দখল দেখে আমি অবাক হয়েছি)— তবু লীলা মজুমদারকে মনে হয় পূর্বপুরুষের তুলনায় বেশি অভিজ্ঞ, বেশি সচেতন, কিংবা ইংরেজিতে যাকে বলে sophisticated— আশা করি কথাটায় কেউ অপরাধ নেবেন না। এর সমস্তটাই আধুনিক কালের লক্ষণ ভাবলেও ভুল হবে, তাতে লেখকের স্বকীয়তাকে যথেষ্ট মূল্য দেয়া হয় না। একদিক থেকে বরং বলা যায় যে লীলা মজুমদারের গল্পের স্বাদ একান্তই তাঁর স্বকীয়— এবং এ-যুগে বিরল— তাঁর সমসাময়িক কারো সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য নেই। হাসির গল্প সাধারণত জ'মে ওঠে ব্যঙ্গ কিংবা অতিরঞ্জনের আশ্রয়ে, কিন্তু এঁর রচনায় সে-দুটোই অনুপস্থিত; এঁর গল্পে কখনোই আমরা চেঁচিয়ে হাসি না, কিন্তু আগাগোড়াই মনে-মনে হাসি; আর কখনো-কখনো শেষ করার পর ভাবতে আরো বেশি ভালো লাগে। এই অবিরল অনতিস্ফুট কৌতুকে, আজগুবির সঙ্গে বাস্তবের সুসংগত মিশ্রণে, কল্পনার মাত্রা-না-ভোলা খেয়ালিপনায়, এবং লয়দার নিচু গলার গল্পে, এক-একটি গল্প এমন সুন্দর এবং সুসম্পূর্ণ যে আমি অন্তত উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ না-দিয়ে পারি না। আক্ষেপ শুধু এই যে লীলা মজুমদার এত অল্প লেখেন— তাঁর আগের বই 'বদ্যিনাথের বড়ি'র সব ক-টি গল্পই 'দিনে দুপুরে'ও স্থান পেয়েছে— আসলে তাঁর দ্বিতীয় বই প্রথমটিরই পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ— এবং এর পর তাঁর নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখে থাকলেও কোনো বই এখনো বেরিয়েছে ব'লে জানি না। আরো একটি দুঃখের কথা নিবেদন করি এখানে: 'দিনে দুপুরে'র মুদ্রাকর নতুন অনুচ্ছেদও সমান মার্জিনে সাজিয়েছেন— এই মার্কিনি অভিনবত্ব শুধু-যে আমাদের চক্ষুপীড়া ঘটায় তা নয়, তাতে রচনার সুবোধ্যতাও ক্ষুণ্ণ হয় মাঝে-মাঝে।

সাম্প্রতিক যে-ক'টি বইয়ের আলোচনা করলাম তার প্রায় প্রত্যেকটিই সাবালকভোগ্য। কিন্তু তাই ব'লে এমন নয় যে বিশুদ্ধরূপে শিশুপাঠ্য ভালো বইও বেরোচ্ছে না। 'নতুন ছড়া', 'হিতোপদেশের গল্প' আর 'বেড়াল ঠাকুরঝি'— এ-তিনটি বই খুব ছোটোদের উপযোগী, নতুন যারা পড়তে শিখেছে তাদেরও বোধহয় অসুবিধে হবে না। প্রথমটিতে ইংরেজি ছেলে-ভুলানো ছড়ার অনুবাদ করেছেন সুখলতা রাও; বহুকাল পর তাঁর নতুন কোনো লেখা বেরোলো। দ্বিতীয়টি পঞ্চতন্ত্রের গল্প, রাজশেখর বসুর পরিচ্ছন্ন,

স্থমিত গদ্যে অনুবাদ। তৃতীয়টিতে পাওয়া গেলো বাংলার কিছু মেয়েলি রূপকথা; রবীন্দ্রনাথের মুখবন্ধ-সংবলিত বিভূতিভূষণ গুপ্তর এই বইটি প্রথম বেরিয়েছিলো ১৩৩০ সালে— আজকালকার পাঠকদের কাছে নতুনই লাগবে। আরো একটু বড়োদের জন্য 'ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব' লিখেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এতে বীজাণুলোকের রহস্যকথা গল্পের মতো ক'রে বলা হয়েছে।

নেহাৎ বাচ্চারাও বাদ পড়েনি। তাদের জন্য বেরিয়েছে বর্ণপরিচয়ের নতুন বই, অনেক রঙের অনেক ছবিওলা 'হাতে খড়ি'; আর 'আগডোম বাগডোম' আর 'হাট্টিমাটিমটিমে' পাতা-জোড়া-জোড়া ছবির সঙ্গে কয়েকটি পুরোনো ছড়া। এ-তিনটিকে ছবির বই বললেই ভালো, কিন্তু 'ছেলেভুলানো ছড়া' বাংলা ছড়ার নতুন একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। ছোট্ট বই, রংচঙে ছবি নেই, কিন্তু নন্দলাল বস্থর পরিকল্পিত শাদা-কালো মলাটটি উজ্জ্বল, সংকলনেও রুচির পরিচয় আছে।

৫

ছোটোরা কী পড়ে, কী পড়তে ভালোবাসে, বাংলাদেশে তার সংখ্যাগণনা যদি নেয়া হয়, তাহ'লে হয়তো দেখা যাবে যে ডট-ড্যাশ-নরহত্যাবহুল বীভৎস গোয়েন্দা-গল্পই তাদের প্রিয়তম পাঠ্য আজকাল। যুদ্ধের পর থেকে সারা দেশে রুচির যে অধঃপতন ঘটছে, তাতে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হবার কারণ আছে, মনে করি। 'কালস্রোত ঠেকানো যায় না', ব'লে নিশ্চিন্ত থেকে লাভ নেই। এ-কথা ব'লেও লাভ নেই, 'শেষ পর্যন্ত ভালোরই জয় হবে।' সত্য, শেষ পর্যন্ত ভালোই জিতে যায়; কিন্তু সেই 'শেষ পর্যন্ত' বহুদূরের কথা; সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে— এই গণতান্ত্রিক যুগে— মন্দই প্রবল হ'য়ে উঠে ভালোকে চেপে রাখে— একেবারে তাড়িয়ে দিতে না পারুক, তার যথোচিত প্রচার হ'তে দেয় না। মন্দের আপাতরমণীয়তা বেশি, তাই চাহিদাও বেশি; এবং চাহিদা যার বেশি সেটাই বিপুল পরিমাণে গজিয়ে উঠতে থাকে। এই অবস্থার একমাত্র প্রতিষেধক শিক্ষিত সমাজের দায়িত্ববোধ। তাঁরাই পারেন ভালোকে তুলে ধরতে, এগিয়ে আনতে, নানা ভাবে তাকে দেশের হাওয়ায় ছড়িয়ে দিতে, যার ফলে মনের স্বাদ বদলে যাবে, মন্দটা নীরস ব'লেই ভালো লাগবে না। কিশোরসাহিত্যের ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরো শঙ্কিল, কেননা আমাদের ভবিষ্যৎ সেখানে জড়িত। প্রকাশকদেরও দায়িত্ব আছে এ-বিষয়ে— কিংবা মুখ্য দায়িত্ব তাঁদেরই; আমাদের পুরোনো এবং নতুন কালের সৎসাহিত্য প্রচারের কাজটি মুখ্যত তাঁদেরই উপর নির্ভর করে। ও-তরফে দায়িত্ববোধ যে ঘুমিয়ে নেই, একসঙ্গে এতগুলি ভালো বইয়ে তার উৎসাহজনক প্রমাণ মিললো।

উপরন্তু উৎসাহ পেলাম একটি লুপ্তপ্রায় রত্নোদ্ধারে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'র এতদিনে পুনঃপ্রকাশ হ'লো— একেবারে একই সঙ্গে দুটি সংস্করণের। পুরো বইটি সম্পাদনা করেছেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য; তাঁর দীর্ঘ ভূমিকাটি ত্রৈলোক্যনাথের জীবন এবং সাহিত্যের আলোচনায় মূল্যবান, রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'কঙ্কাবতী'র সমালোচনাও উদ্ধৃত আছে। মূল বইটি ছোটোদের পড়বার বাধা নেই, কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারে 'ছোটোদের কঙ্কাবতী' সংকলন ক'রে অনাথনাথ বস্থ আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। এই উনিশ শতকী উপন্যাসটি নানাদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, এটি বঙ্কিমের বামপন্থী, গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রবহুল, ঘরোয়া ভাষায় লেখা, এবং সমাজপ্রথার অন্যায় বিষয়ে স্বতপ্রবৃত্তরূপে বিদ্রোহোন্মুখ।

দ্বিতীয়ত, কৌতুকের এবং কল্পনার— অসম্ভব, অতিবাস্তব কল্পনার— এমন বিস্তারিত অবতারণা বাংলা ভাষায় এই বোধহয় প্রথম। সত্য— রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন— বাস্তবের সঙ্গে আজগুবির অংশ মিশতে পারেনি এখানে, বইয়ের মধ্যে দুটো একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে, প্রায় দুটো আলাদা গল্পই বলা যায়,— কিন্তু দুটো গল্পেই হৃদয়গ্রাহিতার গুণ আছে ব'লে এই বিশ শতকের মধ্যভাগেও এ-গ্রন্থ আদরণীয়। কঙ্কাবতীর স্বপ্নের অংশে অসংগতি যতটাই থাক না, তাতে ব্যাংসাহেবের ইংরেজি বলা থেকে ভূতিনীমাসি-কর্তৃক আকাশ চুনকাম করা পর্যন্ত অনেক কিছুই আছে যা মূল কাহিনীর সম্বন্ধসূত্র বাদ দিয়েও নিজের গুণেই উপভোগ্য। ছোটোদের তো বিশেষ ক'রে ভালো লাগবে।

৬

প্রবন্ধটি প্রেসে যাবার পর আর-একটি বই হাতে এলো: সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'মিঠে কড়া'। এই অকালমৃত তরুণ কবির নামের সঙ্গে আমাদের অনেকের মনেই বেদনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তাঁর লেখা ছোটোদের কবিতার সংগ্রহ দেখে তাই আনন্দ পেলাম। কবিতাগুলি কাঁচা সন্দেহ নেই— লেখকের বয়সও তো কাঁচা— কোথাও-কোথাও 'আবোলতাবোলে'র প্রতিধ্বনির মতো শোনায়, কিন্তু ওরই মধ্যে নূতনত্বের চিহ্ন আছে বিষয়বস্তুর নির্বাচনে। বোমা, র‍্যাশন-কার্ড, ব্ল্যাক মার্কেট— এই সব এতদিনে-মামুলি-হ'য়ে-যাওয়া বিষয় নিয়ে টাটকা ব্যঙ্গের ফুর্তি ছড়ানো আছে বইটিতে। ইংরেজির অনুসরণে লেখা 'পৃথিবীর দিকে তাকাও' নামক রচনায়— প্রেমেন্দ্রের 'কুমির! কুমির!'-এর মতোই— লেখকের স্বাচ্ছন্দ্য যদিও ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তবু অন্যান্য অনেক স্থলে সুকান্তর নিজের গলা চেনা যায়। সেই সঙ্গে ভালো লাগে নতুন ধরনে আঁকা শাদা-কালো ছবিগুলি।

ছবির কথা যখন উঠলোই তখন এ-প্রসঙ্গে আরো কিছু বলতে হয়। বহিরবয়ব, অঙ্গসজ্জার দিক থেকে বাংলা বই খুব এগিয়ে গেছে আজকাল। দেখামাত্র চোখ বুজে ফেলতে হয় এ-রকমের 'ত্রিবর্ণ' মলাট, এবং দশ বছরের ধড়ের উপর চল্লিশ বছরের মুখ-বসানো বাচ্চার ছবি— আমাদের মর্মমূলে শূল বিঁধিয়ে এ-সব যদিও টিঁকে আছে এখনো, তবু এ-ক্ষেত্রে বৈদগ্ধ্যেরও পরিচয় বেশি ক'রেই পাওয়া যাচ্ছে দিনে-দিনে। এখানে যে-ক'টি বইয়ের কথা বলা হ'লো, তার প্রায় প্রত্যেকটিই সুদৃশ্য— কোনো-কোনোটি অতিশয়রূপে সুদৃশ্য বললেও ভুল হয় না। এটা খুব সুখের কথা, কিন্তু এর ফলে দামও যখন বেশি হ'য়ে পড়ে, তখনই একটু থমকাতে হয় আমাদের। 'বেশি' মানে— মুদ্রণব্যয়ের তুলনায় নয়, আমাদের দশজনের পকেটের মাপে বেশি আরকি। ছোটোদের বই— ভালো বই— সে তো এই রকমই হওয়া উচিত যা তারা নিজেরাই হাত-খরচ থেকে জমিয়ে কিনতে পারবে, আর আমরা— অনতিবিত্তবান বয়স্কজনেরা— আমরাও যখন-তখন কিনতে পারবো বন্ধুর ছেলে বা কন্যার বন্ধুকে উপহার দিতে, একই বই বারে-বারে কিনতে পারবো তেমন খুব ভালো যদি লেগে যায়। মনে আছে কোনো-এক কালে যে-কোনো উপলক্ষ্যেই 'আবোলতাবোল' কিনতাম— সেই চোদ্দ আনা দামের বইয়ের আজকের দিনে দেড় টাকারও কোনো সংস্করণ কি সম্ভব নয়? আর 'হিতোপদেশের গল্পে'র মতো ছোটো বইয়ের সাত সিকে দাম দেখে কেমন লাগে—দেখতে যত ভালোই হোক না? না-হয় বর্ণবিলাস একটু কম হ'লো, কি একটু ছোটো হ'লো আকারে, কিংবা উৎকৃষ্টের বদলে মাঝারি গোছেরই কাগজ পেলাম— তবু ভালো বইয়ের দামও

যদি কমানো যায় সেটাই কি সবচেয়ে ভালো হয় না, একেবারে সোনায় সোহাগা? আর তাতে যে সুদৃশ্যতায় ক্ষতি হবে তাও কিন্তু বলা যায় না ;— কেননা দেখতে ভালো মানে তো আর জমকালো নয়, পরিচ্ছন্ন শোভনতাই আসল— আর রুচি থাকলে, নৈপুণ্য থাকলে, তার জন্য বিস্তর ব্যয়েরও প্রয়োজন হয় না। সেই রুচির, নৈপুণ্যের আনন্দজনক প্রমাণ যখন পাচ্ছি আজকাল, তখন আমরা নিশ্চয়ই আশা করবো যে শিশুসাহিত্যের অসংখ্য সম্ভাব্য ক্রেতার ইচ্ছার সঙ্গে শক্তির ব্যবধানও প্রকাশকরা সচেষ্ট হ'য়ে কমিয়ে আনবেন।

একটি আবেদন জানিয়ে এই আলোচনা শেষ করি— এটিও প্রকাশকদেরই উদ্দেশে। বাংলা শিশুসাহিত্যের একটি অমর গ্রন্থ— উপেন্দ্রকিশোরের পদ্যে লেখা 'ছোট্ট রামায়ণ'— যার সঙ্গে তুলনীয় কোনো গ্রন্থ অদ্যাবধি দেখা যায়নি— বহুকাল ধ'রে ছাপা না থেকে-থেকে এখন প্রায় বিস্মৃতিপ্রান্তে ঠেকেছে। জগদানন্দ রায়ের বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থমালারও তেমন প্রচলন আর নেই ; এ-যুগের ছেলেমেয়ের কাছে— যদিও বিজ্ঞান এখন স্কুলে অবশ্যপাঠ্য— জগদানন্দর নামও ঠিক পরিচিত নয়। এ-সব বইয়ের পুনরুজ্জীবনের জন্য আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে?

বুদ্ধদেব বসু

স্বরলিপি

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে টুকরো করে কাছি
ডুবতে রাজি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি।
সকাল আমার গেল মিছে, বিকেল যে যায় তারি পিছে
রেখো না আর, বেঁধো না আর কূলের কাছাকাছি॥

মাঝির লাগি আছি জাগি সকল রাত্রিবেলা,
ঢেউগুলো যে আমায় নিয়ে করে কেবল খেলা।
ঝড়কে আমি করব মিতে, ডরব না তার ভ্রূকুটিতে—
দাও ছেড়ে দাও ওগো, আমি তুফান পেলে বাঁচি॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

পা -া মা -গা II {রা -া রা -পা । পা -মা পমা -গা I -া -া -া -া । -া -া -া -া I
তো ॰ মা র্‌ খো ॰ লা ॰ হা ও য়া॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I (সা গা গা -মা । মা -পা পা -ধা I -মপা -া -া -া । পা -া মগা -া)} I
লা গি য়ে ॰ পা ॰ লে ॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ তো ॰ মা॰ র্‌

I র্সা -া -া র্গা । র্রা -া র্গর্রা -া I র্সা -া র্সা -া । র্সা -া র্রর্সা -না I
ট্ ০ ক্ রো ক ০ রে০ ০ কা ০ ছি ০ আ ০ মি০ ০

I না -া -া র্রা । র্সা -া র্রর্সা -না I না -র্সা র্সা -া । র্রর্সা -না না -র্সনা I
ডু ০ ব্ তে রা ০ জি০ ০ আ ০ ছি ০ আ০ ০ মি ০০

I ধা -া -া না । র্সা -া না -র্সনা I ধনা -া ধপা -া । মা -া গা -মগা II
ডু ০ ব্ তে রা ০ জি ০০ আ ০ ছি০ ০ "তো ০ মা ০ র্"

II {সা -া সা -গা । গা -া গা -মা I মা -া পা -া । ধপা -ধপা পা -া I
স ০ কা ল্ আ ০ মা র্ গে ০ ল ০ মি০ ০ ছে ০

I মা -া মা -ধা । পা -া ধপা -মা I মা -া পা -ধা । ধপা -া ধপা -মা I
বি ০ কে ল্ যে ০ যা০ য়্ তা ০ রি ০ পি ০ ছে০ ০

I পা -পমা -গা -া । (-গা -মগা -রা -গা)} I -া -া না না I
গো ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ রে খো

I ধনা -া -ধনা -র্সা । র্সা -া -া -া I র্সা -না না -নর্সা । ধনা -া -ধনা -র্সা I
না ০ ০ ০ আ ০ ০ র্ বেঁ ০ ধো ০০ না ০ ০ ০

I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I র্সা -া না -র্রা । র্সা -া র্রর্সা -না I
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্ কূ ০ লে র্ কা ০ ছা০ ০

I না -র্সা র্সা -া । র্রর্সা -না না -র্সনা I ধা -া -া না । না -র্সা র্সা -না I
কা ০ ছি ০ আ০ ০ মি ০০ ডু ০ ব্ তে রা ০ জি ০

I ধনা -া ধপা -া । পা -া ধপা -মা I মা -া -া ধা । পা -া ধপা -মা I
আ ০ ছি০ ০ আ ০ মি০ ০ ডু ০ ব্ তে রা ০ জি০ ০

I মপা -া পগা -া । গা -া মগা -া II
আ ০ ছি ০ "তো ০ মা০ র্"

II {সা -া সা -গা । গা -া গা -মা I মা -া পা -ধা । পা -ধপা মা -পমা I
মা ০ ঝি র্ লা ০ গি ০ আ ০ ছি ০ জা ০০ গি ০০

I গা -া গা -া । গা -া গা -মা I মা -পা পা -া । -া -া -া -া I
স ০ ক ল্ রা ০ ত্রি ০ বে ০ লা ০ ০ ০ ০ ০

I পা -া -ধা ধা । ধা -া না -ধপা I পা -না না -র্সনা । ধা -নধা ^ধ^পা -া I
ঢে ০ উ গু লো ০ যে ০০ আ ০ মা ০য়্ নি ০০ য়ে

I পা -না না -র্সনা । ধা -নধা পা -ধপা I মা -পমা গা -া । (-গা -মগা -রা -গা)} I
ক ০ রে ০০ কে ০০ ব ০ল্ খে ০০ লা ০ ০ ০০ ০ ০

। -া -া -া -া I র্সা -া -া র্গা । র্রা -া র্গর্রা -র্সা I র্সা -া -া র্রা । র্সা -া র্রর্সা -না I
০ ০ ০ ০ ঝ ০ ড়্ কে আ ০ মি০ ০ ক ০ র্ ব মি ০ তে০ ০

I না -া -া র্রা । র্সা -া র্রর্সা -না I না -র্সনা ধপা -া । ধা -া না -র্সা I
ড ০ র্ ব না ০ তা০ র্ ভ্র ০০ কু০ ০ টি ০ তে ০

I -^ধ^না -া -া -া । -া -া -া -া I ^ধ^র্সা -া -া র্সা । র্সা -া র্সা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ দা ০ও ছে ড়ে ০ দা ও

I র্সা -া র্সা -া । র্সা -র্রা ^র^র্সনা -া I না -র্রা র্রা -া । র্সা -া র্রর্সা -না I
ও ০ গো ০ আ ০ মি০ ০ তু ০ ফা ন্ পে ০ লে০ ০

I না -র্সা র্সা -া । র্সা -না না -র্সনা I ধা -া -া না । না -র্সা র্সা -না I
বাঁ ০ চি ০ আ ০ মি ০০ ডু ০ ব্ তে রা ০ জি ০

I ^ধ^না -া ^ধ^পা -া । পা -া ^ধ^পা -মা I মা -া -া ধা । পা -া ^ধ^পা -মা I
আ ০ ছি ০ আ ০ মি ০ ডু ০ ব্ তে রা ০ জি ০

I মা -পা মগা -া । গা -া মগা -া II II
আ ০ ছি০ ০ "তো ০ মা০ র্"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতী পত্রিকা
মাঘ-চৈত্র ১৩৫৮

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ওঁ

৫২।২ পার্ক ষ্ট্রীট
৩ ভাদ্র বুধবার
[১৩০৫]

শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু

রবি

কর্ত্তামহাশয় আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা যে তুমি পাণ্ডুয়ায় গিয়া পুণ্যাহের অনুষ্ঠান কর— তাহা হইলেই সে কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

ও বইটে[১] বড়ই গোলমেলে— একদিকে পৌত্তলিকতা আর এক দিকে শুষ্ক অদ্বৈত-জ্ঞান। Annie Besant এবং Theosophy একাধারে। পৌত্তলিকতার পক্ষে special pleading— তাহার ভাব এই যে, মনের একটা অবলম্বন দরকার। তাহার পরে একেবারে অবলম্বনরহিত শূন্য abstraction-এ ঝম্প-প্রদান। দুই কথার মধ্যে মিল নাই।

সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই মধ্য পথ— তাহাই প্রকৃত সত্যের পথ। পৌত্তলিকতা তাহার একরূপ বিকৃতি এবং শূন্য অদ্বৈতবাদ তাহার আর-একরূপ বিকৃতি। ভক্তেরা Personal Godকে means to an end করিতে পারেন না— কিন্তু তাহাই লেখক বলেন। তিনি বলেন Personal God impersonal-এ উঠিবার সোপান। বৈষ্ণবেরা তাঁহার এ কথায় সায় দিবেন না। আমার বক্তব্য আমি বলিলাম। তুমি বইখানা প'ড়ে দেখে এই সকল কথা— বা যাহা তোমার মনে ভাল বোধ হয় তাহা লিখিবে।[২] আমি এখন প্রতাপবাবুর সভার জন্য একটা লেখা লইয়া ব্যস্ত আছি। তুমি বইখানার সমালোচনা করিলে খুব ভাল হয়— আমি লিখিয়া লিখিয়া হয়রান হইয়া পড়িয়াছি। সুধীর একটি কন্যা হইয়াছে— আমি তাহা পূর্ব্বেই prophecy করিয়াছিলাম। পুত্র হইবার হইলে আমি সাপের স্বপ্ন দেখি— এবার ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম— তাহাই আমার prophecyর ভিত্তিমূল। আমার অঙ্কের ব্যাপারটা[৩] দেখিয়া Engineering College-এর professor McDonald সাহেব খুব খুসী হইয়াছেন— এবং তিনি তাহা আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিতেছেন। আমরা এখানে ভাল আছি— দ্বিপু বোলপুরে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

২

ওঁ

রবিবার

রবি

সমালোচনা[৪] কতদূর এগো'লো। তোমার ওখানে বেস্ Leisure— অতএব Treat it in your usual masterly manner। সমালোচক আমাকে ভাবে বলিয়াছে যে, আমি পুরাতন আচার্য্যদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছি। but nothing of the kind। পুরাতন আচার্য্যদিগের উপসর্গ বিচার লইয়া একবারও মাথাব্যথা হয় নাই। আমি কেবল তুই এক স্থানে Scholastic methodএর উপর কটাক্ষ করিয়াছি। যাহারা পুরাতন আচার্য্যদিগের দোহাই দিয়া টীকাভাষ্যে তাহাদিগের শ্রাদ্ধ করে তাদের উপরে আমার চোট— not পুরাতন আচার্য্যের প্রতি। অতএব তোমার বেস্ একটা ভারতীয় article হ'তে পার্‌বে। হাল্ ছেড়ে দেও নি তো? I am afraid তুমি ব'ল্‌বে— কাজে ব্যস্ত অতএব এখনো লিখ্‌তে পাচ্চি নে। But that won't do।

তোমার বড়দাদা

৩

ওঁ

সোমবার

রবি

আমার হাতের ব্যথার জন্য এতদিন তোমাকে পত্র লিখতে পারি নাই। এখন অনেকটা ভাল আছি। দিশী mesmerism অর্থাৎ ঝাড়ানো with জল-পড়া আমাকে আশ্চর্য্য আরাম করিয়া তুলিয়াছে— রোগের চারি-আনা মাত্র অবশিষ্ট আছে। শ্যাম বাবার পাল্লায় পড়িয়া দাক্তারি অষুধ সেবন করিলে এতদিনে হয় তো রোগের বোঝার উপর অষুধের বোঝা চাপিয়া আমাকে এ লোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইত। এখন আমি নির্লাঠি চলা-ফেরা করি। তোমার উপর সাহেবি উপদ্রব কিরূপ চলিতেছে— গরম কেমন— এ গরমের সময় তোমার ওখানে যাওয়া আমার তো মনে হয় একপ্রকার শব-সাধন— (á la Bomwetch) অসম্ভব। আজকাল্ আমি প্রতিবাদীদের জ্বালায় অস্থির— পত্রিকা ও ভারতীতে খুব লাঠি চালাইতেছি— আমার motto হ'চ্চে "Beware of quarrel &c. &c."

তুমি এখন কিসে আছ— গদ্য না পদ্য?

৪

ওঁ

রবি

বৃষ্টি থেমেচে না চল্‌চে ? চারিটি কোটি উপস্থিত— (১) বৃষ্টি চল্‌চে হেঁয়ালি চল্‌চে— (২) বৃষ্টি থেমেচে হেঁয়ালি চল্‌চে— (৩) বৃষ্টি চল্‌চে হেঁয়ালি থেমেচে— (৪) হেঁয়ালি থেমেচে বৃষ্টি থেমেচে। ইহার কোন্‌টা ঠিক্‌ ? যদি (৪) হয়, তবে আমার সাধের হেঁয়ালি-টা মাটে মারা যাইবে, (৩) হইলেও তথৈবচ, (২) হইলে তাহা জম্‌বে না, (১) হইলেই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল। Never mind

দিই একটা হেঁয়ালি— যা থাকে অদৃষ্টে !
এ পৃষ্ঠে আর না— নিরখ' ও পৃষ্ঠে ॥

[অপর পৃষ্ঠায়]

শূণ্ড ও যেমন শোভে বিন্দুও তেমনি
কে হেন ধরণী-মাঝে সমুজ্জ্বল মণি
বিন্দু যদি ধরে তবে ইন্দু হয় ম্লান
শূণ্ড যদি বাড়ায় জুড়ায় মন-প্রাণ ॥
বিন্দুই ধরুক্‌ আর শূণ্ডই বাড়া'ক্‌
মহিমা নিরখি বিশ্ব বিস্ময়ে অবাক্‌ ॥
বিন্দু যদি সরি' বসে শূণ্ড থাকে স্থির,
ফুলিয়া উঠিয়া হয় বিপুল-শরীর ॥

বড় দাদা

গোলোক ধাঁধা

৫

তোমার বড়দাদা-সূত্রে এক সময়ে আমার মুখ দিয়ে এইরূপ বুলি বে'র হয়েছিল :—

কাজে নাহি কাজ—আমি ভাবে মাতোয়ারা।
বোধের না মানে রোধ ভাবের ফোয়ারা ॥

এখন কিন্তু কঠোর পরীক্ষার চোটে আমার বুলি ফিরে গিয়েছে ; আমার এখনকার বুলি এইরূপ :—

ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে মন যদি কাজ ভোলে,
বোধ না সহায় হ'লে কে তাহারে ধরি' তোলে ?

ওরে ভোলা মন
বলি তোরে শোন্
ভাবের তরী পাল তুলে' চলে যাবে প্রাণ খুলে,
রসের ঢেউ'এ দোলো-দোলো করি।
নৌকাটিরে সে সময় উড়্তে দেওয়া ভাল নয়,
Ballast চাই ষোলো-ষোলো ভরি।
ভারী হলে টলিবে না তরী ॥

[শান্তিনিকেতন, এপ্রিল ১৯১৩]

৬

ওঁ

শান্তিনিকেতন
১৬ই জুলাই ১৯২০

রবি,

Graphicএ ভারতবর্ষের রাজ্যে তোমার শুভ অভিষেকের অপূর্ব্ব কাহিনী পাঠ করিয়া আমি যে কিরূপ আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।[৫] সেইদিন সেই তোমাকে যখন আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর ক্রোড়ে "ছোড় ব্রজ কী বাঁশরী" কপচাইতে দেখিয়াছিলাম, তখন এরূপ পরমাদ্‌ভূত অভাবনীয় ব্যাপার আমি যে আমার মর্ত্ত্যজীবনে দেখিব তাহা স্বপ্নেও মনে করি নাই। জম্বুদ্বীপের রাজসিংহাসনে তুমি অধিরূঢ় হও বা নাই হও— সাতসমুদ্রপারের শ্বেতদ্বীপের (Albionএর) মনীষী এবং হৃদয়বান মহৎ লোকদিগের হৃদয়দ্বীপে তুমি যে তোমার পুণ্য সারস্বত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছ সে বিষয় আর আমার সন্দেহমাত্র নাই।

আমাদের এই অধঃপাতিত বিষাদাচ্ছন্ন রোগশোকে জর্জ্জরিত হতভাগ্য দেশের এক কোণে তুমি যে গোকুলে বাড়িতেছিলে— ইহা বিশ বৎসর পূর্ব্বে কাহারও সাধ্য ছিল না ধ্যানেও উদ্‌ভাবিত করা। Graphic দৃষ্টে— কী আর বলিব, আমি আশ্চর্য্যে থ বনিয়া গিয়াছি। এই ঘটনাটি শুধু কেবল কালের একটি চল্‌তি গোছের তরঙ্গ নহে, ইহা একটি আবহমান পরবর্ত্তীকালের সর্ব্বথা স্মরণার্হ ঐতিহাসিক জয়স্তম্ভ — অমঙ্গলের ভয়াবহ অন্ধতমিস্র ভেদ করিয়া একাকী দণ্ডায়মান মঙ্গলের অভয়জ্যোতিঃ। এই ঘটনাটি সামান্য ঘটনা নহে— এই মর্ত্ত্যঘটনাটিতে জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার স্বর্গীয় মহিমা বরণীয় ভর্গ দেদীপ্যমান। তোমার সহিত সমস্বরে "পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু, মা মা হিংসীঃ," পাঠ করিয়া এইখানে আজ ক্ষান্ত হইলাম। সিদ্ধিদাতা বিশ্ববিধাতার অমোঘ প্রসাদবারিবর্ষণে তোমার অপরাজিত আত্মপ্রভাব হইতে রাশি রাশি অমৃত ফল উদ্বেলিত হইয়া ত্রিতাপতপ্ত তৃষিত পৃথিবীর দেশবিদেশে পরিকীর্ণ হউক ইহাই সেই করুণার সাগরের নিকটে অন্তরের সহিত সকাতরে প্রার্থনা করিতেছে

তোমারই
স্নেহেবাঁধা
বড়দাদা

৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন

১লা ডিসেম্বর ১৯২০

রবি

জগদানন্দবাবুকে দিব্য যে-একখানি মিঠেকড়া গোচের পত্র তুমি ভেটিয়াছ, তাহার ভিতরে অনেকগুলি ভাবিয়া দেখিবার বস্তু আছে সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তুমি প্রাতিভজ্ঞা উচ্চ ডাঙা হইতে ন্যায়শাস্ত্রীয় বাদবিতণ্ডার বনজঙ্গলের পাকচক্রময় পথে নাবিয়াছ দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে— পাছে তুমি পথ হারাইয়া ধন্দে পড়'।

তুমি ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মহলের বিসদৃশ ব্যাপার সকল— রাক্ষুসে কাণ্ডসকল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আণ্ড্রুজ্ সাহেবকে মনের খেদে চোটের সহিত এই যে গোটা দুই কথা লিখিয়াছিলে— যে, "I am fully convinced that the Engilsh people cannot give us anything truly great, and to accept anything from their hand is *hārām*. We should ignore all connections with those people" ইহা বড্ড আমার ভাল লাগিয়াছিল; কিন্তু জগদানন্দবাবুকে৬ ঠিক তাহার উল্টা কথা এই যে লিখিয়াছ—যে, "Non-co-operation অকাজ, উহা ঋণাত্মক" ইহা দেখিয়া আমি হাসিব কি কাঁদিব ভাবিয়া পাইলাম না। যে জায়গাটিতে দেশশুদ্ধ আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত লোকের প্রাণ লইয়া টানাটানি— সে জায়গার মর্ম্মান্তিক গুরুতর বিষয় সকল লইয়া তক্রাতক্রি এবং কচ্লাকচ্লি করিতে আমার মন সরে না আদবেই, কেননা সেরূপ হৃদয় এবং কর্ম্মের সহিত সম্পর্কবর্জ্জিত শুষ্ক জ্ঞানের আন্দোলন অনর্থের মূল— এবিষয়ে আমার জ্ঞান টন্‌টোনে যেহেতু আমি একবারকার রোগী— আরবারকার রোঝা; অতএব, বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং।

তোমাকে বেশী কথা বলা বাহুল্য— তাই দুই একটি কথার আঁচড় দিয়া মাত্র লেখনী সম্বরণ করিতেছি। ✓

প্রথম আঁচড়।

কণ্টকাকীর্ণ বনের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে যে-পথিক বেচারীর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, সে যদি বন হইতে কষ্টে শ্রষ্টে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গাত্র হইতে কণ্টকগুলা উন্মোচন করিয়া ফেলিতে তৎপর হয়, তবে তাহার সে কার্য্যটি কি ঋণাত্মক বলিয়া নিন্দনীয়? আর যদি কণ্টকারণ্যের সংস্পর্শে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও জটিল হইতে জটিলতর বনগর্ভে প্রবেশ করিয়া নাস্তা নাবুদ্ হইতে থাকে, তবে তাহার সে কার্য্যটি কি ধনাত্মক বলিয়া অভিনন্দনীয়?

দ্বিতীয় আঁচড়।

আমরা ক্রমাগতই রাজপুরুষদিগের বিষমিশ্রিত দান গ্রহণ করিয়া ঋণের উপর ঋণ জড়ো করিতেছি। এমতাবস্থায় যে-ব্যক্তি আর ঋণ না করিয়া পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিবার মানসে আপনার অধিকার-ভুক্ত পুরাতন পতিত রত্নখনি-সকলের উদ্ধার কার্য্যে প্রাণপণ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার সেই মনুষ্যোচিত কার্য্য

হইতে তাহাকে এই বলিয়া নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিব—যে "তোমার এ কার্য্যটা ঋণাত্মক— আরো দান গ্রহণ করা তোমার উচিত, যে হেতু এইরূপ কার্য্যই ধনাত্মক— ঘৃত-ভোজন করা ধনাত্মক— ঘৃত-ভোজন না করা ঋণাত্মক— অতএব ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

তৃতীয় আঁচড়।

তক্‌রাতক্‌রি ছাড়িয়া দিয়া আসল কাজের কথা যদি বলিতে হয়— তবে সে কথা এই যে, ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত একত্রে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করা আমাদের পক্ষে ঠিক সেইরূপ— সারসের পক্ষে যেমন শৃগালের সহিত একত্রে মিলিয়া অ্যাক্‌ই থাল-পাত্রস্থিত মাংসের জুষ ভক্ষণ করা।

চতুর্থ আঁচড়।

এ কথা দেশসুদ্ধ লোকে সবাই জানে যে, মহাত্মা গান্ধী কামক্রোধ ভয়লোভ মদমাৎসর্য্যের কর্দম হইতে অনেক উচ্চভূমিতে অবস্থান করেন। বিশেষতঃ গান্ধী রণোন্মত্ততার প্রতি নিতান্তই বীতরাগ এবং non-violenceএর একান্তই সেবক; তিনি নেশার ঝোঁকে কোনো কাজে প্রবৃত্ত হ'ন না— সর্ব্বানুমোদিত কাজেও না। তাই আমার মনে হয় যে, গান্ধীর ন্যায় অমন একজন মহাত্মার মোহমুক্ত বিশুদ্ধবুদ্ধির অনুমোদিত শুভানুষ্ঠানের পদে পদে ছল ধরা অপেক্ষা তাহার সাধুজনোচিত সৎকার্যে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত যোগ দেওয়াই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। আমার এটা ধ্রুব বিশ্বাস যে, গান্ধীর ন্যায় সাঁচা সোণা (Sterling Gold) এ ঘোর কলিতে মেলা ভার।

তোমার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করা আমার পক্ষে যে কীরূপ অপ্রীতিকর— তোমাকে তাহা বলা বাহুল্য। অতএব উপরিউক্ত গোটা দুই স্মর্ত্তব্য কথা তোমার সুবিবেচনায় সমর্পণ করিয়াই এ যাত্রা ক্ষান্ত হইলাম। তোমার উপরে আমাদের দেশের মঙ্গলামঙ্গল পুরামাত্রা নির্ভর করিতেছে। এইজন্য বলি যে, তোমার উচিত আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার আগাগোড়া ভালমতে বিবেচনা করিয়া দেখিয়া দেশের জনসাধারণকে প্রকৃত হিতপরামর্শ প্রদান করা, আর, সে কার্য্যে তুমি যেমন পারদর্শী এমন আর কেহই না। আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদের দেশের গাত্র হইতে মোহনিদ্রা ঝাড়িয়া ফেলিবার এই মুখ্য সময়টিতে ঈশ্বর তোমাকে এবং আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

তোমার স্নেহেবাঁধা

বড়দাদা

৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

২৫ ফেব্। ২১

শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু।

আমার স্মরণ হইতেছে— অন্যূন বিশ বৎসর পূর্ব্বে বায়ুভক্ষক নাগরাজের তড়িদ্‌ভক্ষক দুমুখো সন্তানের অর্থাৎ cable-নামক আট্‌লান্টিক প্রতানের সাহায্যে ভর করিয়া একজন সতরঞ্চবাজ ইংলণ্ড হইতে

আমেরিকায় এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ সতরঞ্চবাজ আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে— এক এক সপ্তাহ ধরিয়া মনের মধ্যে তরো বেতরো কৌশল ফাঁদিয়া এক এক চাল্ চালিতেছিলেন কী যে গূঢ় মৎলব হাসিল করিবার জন্য তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। তোমার আমার মধ্যে যদি ঐ রকমের চাল্ চালাচালি আরম্ভ হয়, তবে তাহা কোথায় গড়াইবে তাহা জানি না। দুই তিন মাস পূর্ব্বে তোমাকে প্রবোধিত করিবার জন্য পত্রযোগে যে-এক চাল্ আমি চালিয়াছিলাম— তোমার নিকট হইতে তাহার প্রতিচাল্ আসিয়াছে এতদিনের পর। আমি ভারতসমুদ্রের এপারে বসিয়া বলিলাম "কীস্তি!" এক মাস লাগিল তাহা তোমার শ্রবণে পৌছিতে— আর এক মাস, তোমার, লাগিল তাহার ধাক্কা সাম্লাইতে, আবার, তেস্‌রা আর এক মাস পরে তুমি যখন বলিলে "কীস্তি!" আমারও তথৈবচ একমাস লাগিল তাহা শ্রবণে পৌছিতে— আর এক মাস লাগিল তাহার ধাক্কা সাম্লাইতে। অতএব আর না! জানোই তো "Art is long— Time is short"। তুমি ঘরে ফিরে এ'লে বিতর্কিত বিষয়টির সম্বন্ধে তোমার সহিত আমার বোঝাপড়া হবে বিধিমতপ্রকারে! আপাতত তোমার পত্রের প্রত্যুত্তর সংক্ষেপে সারিলাম এইরূপ করিয়া :—

তোমাদের পত্রখানিতে তুমি যা লিখেছ— সে কথাটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে :— সয়তান মহাপুরুষ সময় বুঝিয়া সময়ে সময়ে ওস্তাদি চাল্ চালেন এম্নি তুখোড় রকমের— যে, তাহার গুপ্ত অভিসন্ধির ভিতরে সেঁধো'য় সাধ্য কা'র? উঁহার ফুস্‌মন্ত্রের চোটে বেচারা অসহযোগিতা শ্রবণ-কটু নৈর্যুজ্য বনিয়া যায়— নৈর্যুজ্য প্রাতিযুজ্য বনিয়া যায়— প্রাতিযুজ্য প্রতিহিংসা বনিয়া যায়— চকিতের মধ্যে! তা ছাড়া :— সয়তানের শনির দৃষ্টিতে পড়িলে তোমার আদরের বাছা সাযুজ্যটির কোনো ক্ষতি হইবে না যদি মনে কর তবে তোমার সে আশা নিতান্তই দুরাশা। সকলেরই এটা জানা কথা যে, অবিবেচনার গর্ভজাত কাঁচা সাযুজ্যকে দুর্জ্জনসাযুজ্য করিয়া, দুর্জ্জন-সাযুজ্যকে দলবদ্ধ দুরাচার-প্রবর্ত্তনা করিয়া, দলবদ্ধ দুরাচার-প্রবর্ত্তনাকে নির্লজ্জ এবং নিরঙ্কুশ দিনে ডাকাতি করিয়া পাকাইয়া তুলিতে সয়তান মহাপ্রভু যেমন সিদ্ধহস্ত এমন-আর কেহই না। সয়তানকে আর বেশী না ঘাঁটাইয়া সার কথাটা বলি তবে শোনো :—

যোগশাস্ত্রে আছে

"সুখিত জনের প্রতি মৈত্রী ভাব ধারণ করিলে চিত্তের ঈর্ষাকালুষ্য ঘুচিয়া যায়।"

"দুঃখিত জনের প্রতি কারুণ্য ভাব ধারণ করিলে চিত্তের পরাপকার-কালুষ্য ঘুচিয়া যায়।"

"পুণ্যশীলের প্রতি অনুমোদনের ভাব ধারণ করিলে চিত্তের অসূয়াকালুষ্য ঘুচিয়া যায়।"

তাহার পরে আছে

"অপুণ্যবৎসু চ ঔদাসীন্যমেব ভাবয়েৎ—নানুমোদনং— ন বা দ্বেষং।"

অর্থাৎ "অধর্ম্মপরায়ণদিগের প্রতি [আর সেই জন্য— ব্রিটিষ্ রাজপুরুষদিগের ন্যায় দিনে-ডাকাতি-পরায়ণ কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত দুরাত্মাদিগের প্রতি] ঔদাসীন্যের ভাব [অর্থাৎ non-co-operationএর ভাব] ধারণ করাই বিধেয়— অনুমোদনের ভাবও না— বিদ্বেষের ভাবও না।"

যোগশাস্ত্রে এ যাহা বলা হইয়াছে শাস্ত্রীয় ভাষায়— ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা সেই কথাটাই এক্ষণে বলিতেছে আটপহুরিয়া প্রাকৃত ভাষায়— তা বই নূতন কোনো কথা বলিতেছে না :— বলিতেছে

"তফাৎ থাকা-ই সার কথা!"

তোমার শুভানুধ্যায়ী

বড়দাদা

৯

রবি

Translationটা কিরূপ হয়েছে ?

বেশ ভাল কিন্তু harm-এর বদলে আর একটা কথা ভাল হত। W.W.P.[১]

বাউলের গান

গোলে মালে মিশা'য়ে আছে
ও তার গোল ছেড়ে মাল লও রে বেছে।
শুনেছি বৈষ্ণবের করণ
বালির সঙ্গে চিনির মিলন,
ও তা জানে দুইএক জন ;
ও তা মত্তহস্তী টের পে'লে না
চেঁউটি মরম জেনেছে ॥

Translation

Harm & money dwell together in harmony.
Leave the harm and get the money.
I have heard of the method pursued
by the worthy people of God :—
Sugar is mixed with the sand ; only
one or two men know it.
The big Elephant knows nothing
of it ; but little ant knows the secret.

১০

শ্রীমৎ রবীন্দ্রনাথ কবীন্দ্র
চিরঞ্জীবেষু

জনম দিবস আজি তোমার।
ধর উপহার বড় দাদার ॥
বিশ্বভারতী ভারতপ্রাণা
নানা দেশে ধরি মূরতি নানা,
প্রকাশিল লীলা অতি অপূর্ব্ব

কবি যবে দিলা গীত অনজলি
বলিলা জননী স্নেহরসে গলি
"কত আমি বিদেশে ঘুরব!
"এসেছিস্ তুই শুভ মুহূরতে
নিয়ে চল্ মোরে পুণ্য ভারতে,
শান্তি-সদন সেই আমার।"

নেপথ্যে ॥ বহুকালের প্রাচীন বৃদ্ধ ॥
সেই বালকটি সেদিনকার
পঞ্চষষ্টি হইল পার,
কাণ্ড একি চমৎকার!

পঠদ্দশায় নাবালক বৃদ্ধ ॥ চমৎকার না চমৎকার!!

শুভকামী দ্বিজ ॥ নবারুণ-রথীকে নিয়ে রবি দীপতিমান্
বর্ষে বর্ষে এম্নি দিনে করিবে যবে ধেয়ান
তৎসবিতৃ দেবতার বরণীয় ভর্গ
শান্তিনিকেতন হবে পৃথিবীতে স্বর্গ ॥
সত্যজ্যোতি বিনা হায় আঁধার পৃথিবী।
আঁধারের আলো রবি হো'ক চিরজীবী ॥

[২৫ বৈশাখ ১৩৩২] শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১ 'সাকার ও নিরাকারতত্ত্ব', যতীন্দ্রমোহন সিংহ

২ রবীন্দ্রনাথ সাকার ও নিরাকারতত্ত্ব গ্রন্থের যে সমালোচনা করেন তাহা ১৩০৫ সালের আশ্বিন মাসের ভারতী পত্রে প্রকাশিত হয়। "সাকার ও নিরাকার", আধুনিক সাহিত্য

৩ গণিতচর্চা আজীবন দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যসন ছিল। *Geometry in which the 12th axiom has been replaced by new ones* নামে তাহার একখানি পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর' পৃ ৩৩-৩৪; "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ", বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২, পৃ ২৮১-৮২, পাদটীকা।

৪ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৪র্থ ও ৫ম বর্ষ) "উপসর্গের অর্থ-বিচার" নামে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী তাহার সমালোচনা করেন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম বর্ষ); রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রে (বৈশাখ ১৩০৬) "উপসর্গ সমালোচনা" প্রবন্ধে তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, শব্দতত্ত্ব, পরিশিষ্ট।

২ সংখ্যক পত্রের তারিখ "[১৩০৫]" হইবে।

৬ সংখ্যক পত্র, ১৯২০ সালে বিদেশভ্রমণকালে কবির সংবর্ধনার বিবরণ পড়িয়া লিখিত। এই পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন শান্তিনিকেতন পত্র, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩৩ সংখ্যা হইতে তাহা মুদ্রিত হইল—

ওঁ

বড়দাদা, এণ্ড্রুজের কাছে আমার সব খবর জানতে পারবেন। য়ুরোপে আমাকে যে এরা এত বেশী সমাদর করে তা আমি আগে ঠিক বুঝতে পারিনি। এদের এই সম্মান সমাদরের মধ্যে কোথাও কিছু কাঁটা নেই, বাধা নেই। জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর এখানে বড় অসময়—কেউ শহরে থাকে না— সেইজন্য এবারকার পালা যথোপযুক্ত পরিমাণে জমল না। এরা আমাকে সবাই বলচে আগামী এপ্রেল মে জুন মাসে এখানে আসতে। কাজেই আমেরিকা থেকে এই পথ দিয়েই ফিরব, আর সেই সময়ে একবার

যতদূর পারি য়ুরোপে ঘুরে যাব। সমস্ত য়ুরোপের সঙ্গে যদি আমি শান্তিনিকেতনের যোগ স্থাপন করতে পারি তাহলে আমার জীবনের একটা বড় উদ্দেশ্য সার্থক হবে। পৃথিবীর বাইরে আমরা যদি একলা পড়ে থাকি তাহলে আমরা বর্তমান যুগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হব। শান্তিনিকেতনে আগে থেকেই আয়োজন প্রস্তুত হয়ে আছে এবার অবিলম্বে সেখানে আসর জম্‌বে। চারিদিক থেকেই উৎসাহ পাচ্চি। আমার এবারকার প্রবাস-যাত্রা পূর্ণভাবে সার্থক হবে এই আশা করচি। দেশে যে সব কলহ কোলাহল চলবে, বড় দেশ এবং বড় কালের মধ্যে তাকে বিস্তৃত করে দেখ্‌লে বুঝতে পারি তার মধ্যে কত প্রচুর ব্যর্থতা। আমার প্রণাম জান্‌বেন। বড়দিদি চলে গেলেন— যাবার আগে তাঁকে দেখতে পেলুম না, তাই মনে বড় বেদনা বোধ হচ্চে। ইতি

সেবক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ সংখ্যক পত্রে জগদানন্দ রায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যে পত্রের উল্লেখ আছে ("অ-সহযোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরাতন চিঠি", প্রবাসী, ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ) তাহা অংশতঃ উদ্ধৃত হইল—

'. . সত্য হচ্চে পরমা গতি, অর্থাৎ এমন গতি যার প্রত্যেক পদক্ষেপেই সার্থকতা। আর মোহ হচ্চে সেই গতি যার চলায় সার্থকতা আনে না, কেবল নেশা আনে। একটা হচ্চে ধনাত্মক গতি, আর-একটা হচ্চে ঋণাত্মক গতি। দেশ জুড়ে যখন তোলাপাড়া ঘটছে তখন ভালো করেই ভাবতে হবে, এই গতির প্রকৃতি কি। যে জলে স্রোত প্রবল কিন্তু তট অবর্তমান সে-ই হচ্চে বন্যা। বন্যায় ভাঙে, ভাসিয়ে দেয়, ফসল নষ্ট করে। আমাদের দেশে যে আবেগ এসেছে সে যদি একমাত্র ভাঙনেরই বার্তা নিয়ে আসে তা হলে অনাবৃষ্টিতে শুক্‌নো ভাঙার ক্ষেতে অতিবৃষ্টির অগাধ ক্ষতির মধ্যে ডুবে মরতে হবে। আমার অনুরোধ এই যে, মন যখন কোনোমতে জেগেছে, তখন সেই শুভ অবকাশে মনটাকে কষে কাজে লাগিয়ে দাও, অকাজে লাগিয়ে শক্তির অপব্যয় কোরো না। Non-co-operation অকাজ— তার আবির্ভাব অন্তিমে। শাস্ত্রে বলে কর্মের দ্বারাই কর্ম থেকে মুক্তি, নৈষ্কর্ম্যের দ্বারা নয়; পাস করার দ্বারাই স্কুল থেকে মুক্তি, আমার মত ইস্কুল ত্যাগ করার দ্বারা নয়। আজ সময় এসেছে নিজেদের সব কাজ নিজেরা মিলে করতে হবে। সে কাজ কতখানি বাহ্যফল দেবে তা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কাজের উপলক্ষ্যে আমাদের যে মিল সেই মিলই সত্য মিল, সেই সত্য মিলই হচ্চে চরম লাভ। অ-কাজ করবার উপলক্ষ্যে যে মিল সে কখনই সত্য এবং স্থায়ী হতে পারে না। আহারে শরীরে যে শক্তি আনে সেইটাই শ্রেয়, মদের নেশায় যে শক্তি তার বেগ আপাতত বেশি হলেও পরিণামে প্রতিক্রিয়ার দিনে তার হিসাব নিকাশ হতে থাকে। গীতা বলেছেন— স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ— সত্যের মিলও অল্প যেটুকু দেয় সেও মস্ত বড়, আর ক্রোধের মিল, খিলাফতের মিল, এমন বর দিতে পারে যাকে নিয়ে কোথায় ফেলব ভেবে অস্থির হতে হবে। মিথ্যা জোড় যখন ভাঙে তখন ভালোয় ভালোয় সরে যায় না, নিজের মধ্যে দমাদ্দম মাথা ঠোকাঠুকি করতে থাকে। এই জন্যে আবার একবার দেশকে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে সমিধ যদি সংগ্রহ হয়ে থাকে তবে সে যজ্ঞ করবার জন্যই, দাবানল জ্বালাবার জন্যে নয়। একদিন আমি স্বদেশী সমাজে যা বলেছিলাম আবার সেই কথাই বলতে চাই। আমরা যে রাগারাগি করছি তার গতি বাইরের দিকে অর্থাৎ অন্য পক্ষের দিকে অর্থাৎ পরে তার কর্তব্য করেছে, কি, না করেছে, সেইটেই তার মুখ্য লক্ষ্য। ভিক্ষা করবার বেলাতেও সেই লক্ষ্যই প্রবল। আমি বলি আপাতত বাইরের পক্ষকে ভোলো। পরের সঙ্গে অসহকারিতার দিকেই সমস্ত ঝোঁক দিয়ো না। নিজের লোকের সঙ্গে সহকারিতার দিকেই সমস্ত ঝোঁক দাও। আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্তকার্য, বিচার প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে নেব এই পণ করো। সেজন্য সমস্ত দেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দরকার। গান্ধিজী সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে আমাদের প্রত্যেককে কাজে আহ্বান করুন, অকাজে না। আমাদের কাছ থেকে টাকার এবং কাজের খাজনা তলব করুন। আমাদের অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, পথকষ্ট, রোগকষ্ট, সমস্ত নিজেরা দূর করব বলে আমাদের সত্যাগ্রহ করান। তার বাহ্যফল আপাতত কী হবে তার হিসাব করবার কোনো দরকার নেই, কিন্তু এই সত্য গ্রহণ ও পালনের ফল গভীর স্থায়ী। . .'

দ্বিজেন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর একান্ত অনুরাগী ছিলেন। সাময়িক পত্রে একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াও মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন—"মহাত্মা গান্ধীর মনোগত অভিপ্রায়", প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৭; "Non-co-operation পদার্থটা কী?", প্রবাসী আষাঢ়, ১৩২৮। মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠি *Young India* পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান প্রসঙ্গে 'শ্রীমৎ সত্যজ্যোতিশ্চিরঞ্জীবয়ঃ''র উদ্দেশে (শান্তিনিকেতন পত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২) দ্বিজেন্দ্রনাথের এই পত্রাংশও উল্লেখযোগ্য—

'ভাই জ্যোতি· ·রবি দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন Andrews সাহেবকে তাহার keynote হচ্ছে worldwide co-operation। এবার এ যে দুটি পত্র লিখিয়াছেন রবি—ইহার উপরে কাহারো দ্বিরুক্তি হইতে পারে না; তা শুধু না—আমি তাহার প্রতি কথায় সর্বান্তঃকরণের সহিত সায় দিতেছি। তাহা দেখ্‌লে তুমি খুব খুসি হবে যে, রবির কথা আমার গভীর অন্তরাত্মার কথা—. .

তোমার স্নেহে বাঁধা বড়দাদা'

কর্তামহাশয়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ॥ সুধী—দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ॥ দ্বিপু—দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ॥ প্রতাপবাবু—নববিধান সমাজের আচার্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার॥ সত্যজ্যোতি—সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ॥ W.W.P.—উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়ার্সন॥ রথী—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর॥ বড়দিদি—সৌদামিনী দেবী

শ্রীরাধার প্রাচীন পটভূমি

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শ্রীরাধার একটি দার্শনিক পরিচয় আছে। প্রাচীন সাহিত্যে এবং কিছু কিছু পুরাণাদিতে শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা অনেক পূর্বেই ঘটিয়াছিল; কিন্তু শ্রীরাধার দার্শনিক প্রতিষ্ঠা গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণের ধ্যান-মননে। বাঙলা বৈষ্ণব-সাহিত্যের ন্যায় হিন্দী বৈষ্ণব-সাহিত্যও সমৃদ্ধিশালী; কিন্তু হিন্দী-সাহিত্যের রাধার পশ্চাতে কোনও স্পষ্ট দার্শনিক পটভূমিকা নাই; যেটুকু আছে তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রভাবজনিত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। গৌড়ীয় গোস্বামিগণ শ্রীরাধা সম্বন্ধে যে দার্শনিক কাঠামো সৃষ্টি করিলেন তাহার ভিতরে পুরাতন উপাখ্যান ও কিংবদন্তী, কবিগণের সূক্ষ্মসুকুমার কবিকল্পনার অজস্র দান ও ভক্তহৃদয়ের পরম শ্রেয়োবোধ ও বিচিত্র রম্যবোধ একত্রে সমাবিষ্ট হইয়া শ্রীরাধার সৌন্দর্যময়ী ও প্রেমময়ী মূর্তিকে বহু বিচিত্রতা এবং বিস্তৃতি দান করিয়াছে। রাধার এই বহুবিচিত্র রহস্যময়ী মূর্তির পরিচয় দেওয়া বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নহে, শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে রাধা যে দার্শনিক রূপ পাইয়াছে তাহার প্রাচীন পটভূমিটি কি তাহাই এখানে আমরা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিব। এইদিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব, গৌড়ীয় রাধাবাদ প্রাচীন ভারতীয় সাধারণ শক্তিবাদেরই একটি বিশেষ পরিণতি ও প্রকাশ মাত্র।

গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে রাধার যে দার্শনিক পরিচয় পাওয়া যায় তাহার ভিতরে আমরা নিম্নলিখিত জিনিসগুলি লক্ষ্য করিতে পারি।

প্রথমতঃ, ভগবানের স্বাভাবিক অচিন্ত্য অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি হইল প্রধানা। একটি হইল তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, দ্বিতীয়টি তটস্থা জীবশক্তি এবং তৃতীয়টি বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। ইহার ভিতরে প্রথমটি হইল বিরজানদীর পরপারে, প্রাকৃত মলের দ্বারা একান্তভাবে অস্পৃষ্ট, অপ্রাকৃত; অপর দুইটি প্রাকৃত। ইহার ভিতরেও আবার জীবশক্তি হইল পরাপ্রকৃতি, আর বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইল অপরাপ্রকৃতি।

দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে পাই, ভগবানের স্বরূপশক্তির ভিতরে আবার তিনটি প্রকার রহিয়াছে। ভগবানের বিশুদ্ধসত্তা বিধৃত হইয়া আছে যে শক্তিদ্বারা এবং যে শক্তিদ্বারা এই বিশুদ্ধসত্তার স্বরূপ বৈভব এবং পরিকরাদি রূপে বিস্তার ঘটে তাহাকেই বলা হয় সদাখ্যা সন্ধিনী শক্তি। ভগবানের চৈতন্যময়ত্বের প্রতি হেতু হইল তাঁহার সংবিৎশক্তি, তাঁহার আনন্দময়ত্বের হেতু তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি। এই তিন শক্তিকে তিনটি পৃথক শক্তি না বলিয়া একই শক্তিরই তরতম অবস্থা বলা যাইতে পারে। সংবিৎ হইল সত্তারই সারাংশভূত, আবার এই সংবিতের সারাংশভূত হইল হ্লাদিনী; হ্লাদিনীতে তাই ভগবানের সত্তা ও চৈতন্যের পরাকাষ্ঠা। এই হ্লাদিনীরই সারভূত বিগ্রহ হইল শ্রীরাধা।

তৃতীয়তঃ, হ্লাদিনী-শক্তি-বিগ্রহা শ্রীরাধার সহিতই হইল নিত্যবৃন্দাবনে শ্রীভগবানের নিত্যলীলা। স্বরূপ-শক্তির সহিতই ভগবানের সাক্ষাৎ মিলন এবং লীলা, প্রাকৃতশক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ কোনও সম্বন্ধ নাই।

চতুর্থতঃ, শ্রীরাধিকার ভগবৎকোটি এবং জীবকোটি এই উভয় কোটিতেই বিচরণ। বিশুদ্ধ রসময়ী রূপে তাহার ভগবৎকোটিতে বিহার, আবার প্রেমভক্তিরূপে রাধিকারই জীবকোটিতে বিস্তার। ভগবানের আনন্দবিধায়িনী যেমন রাধা, তেমনই প্রেমভক্তিদানে জীবের প্রতি কৃপা বিতরণেরও রাধিকাই হইল মুখ্য করণ এবং কারণ। শ্রীরাধা একদিকে যেমন শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে প্রেমকল্পলতা, তেমনই আবার জীবের সম্পর্কে বাঞ্ছাকল্পতরু।

পঞ্চমতঃ, প্রেমরূপিণী রাধার দ্বারেই কৃষ্ণের স্বরূপানুভব; পরম-'বিষয়'-রূপ কৃষ্ণের স্বরূপোপলব্ধি স্থলে রাধিকাই হইল অনাদিসিদ্ধ মূল 'আশ্রয়'।

গৌড়ীয় গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া মোটামুটি ভাবে এই যে আমরা শ্রীরাধাবাদের বৈশিষ্ট্য-সকলের উল্লেখ করিলাম ইহা সম্পূর্ণভাবে কোনও নূতন সিদ্ধান্ত নহে, ভগবৎ-শক্তির এইসকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন মতবাদের ভিতরে ছড়াইয়া আছে। আমরা অতিসংক্ষেপে পূর্বমতগুলির উল্লেখ করিয়া ভারতীয় প্রাচীন ধারার সহিত নবীন ধারার মিলটি লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শাস্ত্রেই আমরা শক্তির প্রধানভাবে দ্বিধাভেদ লক্ষ্য করিতে পারি। পঞ্চরাত্রে শক্তিকে পরাশক্তি এবং প্রাকৃতশক্তিরূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। এই পরাশক্তি হইল স্তৈমিত্যরূপা— ভগবানের সমবায়িনী শক্তি, ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের স্বরূপশক্তি। পঞ্চরাত্র মতেও এই সমবায়িনী পরাশক্তির সহিত সৃষ্টিকার্যের কোনও সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই, সৃষ্ট্যাদি কার্য সাধিত হইতেছে ভগবানের প্রাকৃতশক্তি দ্বারা, এই প্রাকৃতশক্তিই হইল মায়া। কাশ্মীর শৈবদর্শনেও ঠিক অনুকূল সিদ্ধান্তের কথাই দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানেও পরমশিবের সহিত প্রায় অভিন্না পরমশিবেরই 'পূর্ণাহন্তা' রূপ যে শক্তি তাহাকে বলা হইয়াছে শিবের সমবায়িনী শক্তি; সৃষ্টিকার্যে ব্যাপৃতা গুণময়ী শক্তি হইল পরিগ্রহা শক্তি; এই পরিগ্রহা শক্তিই হইল প্রাকৃত মায়াশক্তি। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে আবার এই পরা স্বরূপশক্তি এবং জড় মায়াশক্তির মাঝখানে জীবভূতা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তির উল্লেখ পাইতেছি; এই ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীবভূতা শক্তিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে তটস্থা জীবশক্তি-রূপে পরিণত হইয়াছে।

পূর্বোল্লিখিত দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের সর্ববিধ শক্তিতত্ত্বের ভিতরেই বলা হইয়াছে যে শক্তি আনন্দরূপিণী। এই আনন্দই যে সর্বশক্তির সারভূত এ কথা খুব স্পষ্টভাবে বর্ণিত বা ব্যাখ্যাত না হইলেও দেখিতে পাই, শক্তির আর যাহা যাহা ব্যাপার বা বৃত্তি থাকুক না কেন, তাঁহার মূলরূপে তিনি পরমানন্দরূপিণী। বৈষ্ণব শৈব ও শাক্ত মতবাদে সর্বত্রই ইহার আভাস মিলিবে। কাশ্মীর শৈব-সিদ্ধান্তে আবার আনন্দশক্তি পরমশিবের পঞ্চশক্তির ভিতরে একটি পৃথক্ শক্তি; পুরাণাদিতেও এই মতের প্রতিধ্বনি মিলে। কিন্তু পরমশিবের এই আনন্দশক্তিরূপে একটি পৃথক্ শক্তি স্বীকার করা অপেক্ষা শক্তির মূল বৃত্তিতে তাঁহার আনন্দময়িত্বের প্রাধান্য প্রায় সর্বত্রই স্বীকৃত। এই শক্তিবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া কৃষ্ণের চরমোৎকর্ষ প্রাপ্তা শক্তি রাধা হ্লাদিনী-রূপত্ব লাভ করিয়াছে। অবশ্য ইহার উপরে আবার প্রেমভক্তির আদর্শ প্রাধান্য লাভ করাতে এবং প্রেমস্বরূপতা ও হ্লাদস্বরূপতা একই হওয়াতে রাধিকার এই হ্লাদিনী-রূপ উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা শৈবশক্তিতন্ত্র এবং যোগ-শাস্ত্রাদিতে ব্যাখ্যাত আর-একটি তত্ত্বের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা এইসকল শাস্ত্রে বহু স্থানে দেখি, শক্তি হইলেন ষোড়শাত্মিকা। কৃষ্ণের এই ষোড়শকলাত্মিকা শক্তি হইতেই ষোড়শ গোপীর উদ্ভব

হইবার সম্ভাবনা। এখানে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির ষোড়শ বিকারের কথাও স্মরণীয়। তন্ত্র এবং যোগ গ্রন্থে আমরা আরও দেখিতে পাই, চন্দ্রের ষোলো কলা হইল বিকারাত্মিকা, অতএব পরিবর্তনশীলা; কিন্তু এই বিকারাত্মিকা ষোলো কলার অতিরিক্ত চন্দ্রের আর-একটি নিজস্ব কলা আছে, তাহাকে বলা হয় চন্দ্রের সপ্তদশী কলা। এই সপ্তদশী কলাই হইল চন্দ্রের অমৃত-কলা, ইহাই পরমানন্দময়ী। তন্ত্রের বা যোগশাস্ত্রের ভাষায় বিকারাত্মিকা ষোড়শ কলা হইল 'প্রবৃত্তিরাজ্যে'র বস্তু, আর আনন্দরূপিণী অমৃতরূপিণী সপ্তদশী কলা হইল 'নিবৃত্তিরাজ্যে'র বস্তু; ইহাকেই বৈষ্ণবগণের ভাষায় প্রাকৃত ধাম ও অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধাম বলা যাইতে পারে। যোগ-তন্ত্রাদির দৃষ্টিতে বলা যায়, অমৃতরূপিণী চন্দ্রের নিজস্ব সপ্তদশী কলাই হইল রাধিকা, ইহা বিকারহীন ভাবে স্বরূপে অবস্থান করিয়া অমৃতাত্মক 'আশ্রয়' রূপে ইহার বিষয়কে নিত্যানন্দে নিমগ্ন রাখিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা আরও লক্ষ্য করিতে পারি, আত্মমায়া বা যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সকল প্রেমলীলা সাধন করেন। এই যোগমায়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'পৌর্ণমাসী'র রূপ ধারণ করিয়াছে। এই পৌর্ণমাসী প্রেম-সংঘটনে পরমাভিজ্ঞা বর্ষিয়সী রমণী রূপে অঙ্কিত হইয়াছেন। রূপ-গোস্বামীর 'বিদগ্ধ-মাধব' 'ললিত-মাধব' নাটকে এই ভগবতী পৌর্ণমাসী সাবিত্রী সদৃশ রুচিশালিনী, সান্দীপনি মুনির জননী, দেবর্ষি নারদের শিষ্য, বক্ষঃস্থলে কাষায়বস্ত্রধারিণী এবং মস্তকে কাশপুষ্পের ন্যায় শুভ্র কেশধারিণী রূপে বর্ণিতা হইয়াছেন। নানা কৌশলে বহু অঘটন ঘটাইয়া রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করানোই তাঁহার কাজ; কিন্তু মিলন-লীলাতে তাঁহার আর কোনও স্থান বা অধিকার নাই। যোগমায়ার এই 'পৌর্ণমাসী' নাম হইবার সার্থকতা কি? ষোলোকলা পূর্ণিমার উদয় হইলে তাহার পরে সপ্তদশী কলার সহিত স্বরূপ-লীলা; ইহাই কি 'পৌর্ণমাসী'র তাৎপর্য? শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার ভিতরে বৈশাখীপূর্ণিমা ঝুলন-পূর্ণিমা রাসপূর্ণিমা দোলপূর্ণিমার আবির্ভাবও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পৌর্ণমাসী বা পূর্ণিমাই ষোলোকলার পূর্তির দ্বারা যেন সপ্তদশী কলার অমৃতময়ী লীলার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেয়।

পূর্বালোচিত গৌড়ীয়গণের তৃতীয় সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে আমরা প্রথমেই লক্ষ্য করিতে পারি যে, রাধা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি রূপে শক্তিমান্ কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন; কিন্তু অভেদে কখনও লীলা সম্ভব নয়; সেইজন্যই বৈষ্ণবগণ নানাভাবে অভেদের মধ্যেই একটা ভেদ স্বীকার করিয়া লইয়া লীলা স্থাপন করিয়া লইয়াছেন। আমরা যদি আদিযুগ হইতে ভারতীয় শক্তিবাদের আলোচনা লক্ষ্য করিয়া আসি তবে দেখিতে পাইব, এই অভেদে একটা ভেদের বিশ্বাস লইয়াই ভারতীয় সমগ্র শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই অভেদে ভেদবাদ যে কোনও স্থানে কোনও দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এমন কথা বলা যায় না; ইহা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনের একটি বিশেষ প্রবণতা রূপেই বারবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

স্বরূপ-লীলাবাদের উপরেই বৈষ্ণবেরা, বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা, প্রাধান্য দিয়াছেন। পঞ্চরাত্রে কি কাশ্মীর-শৈব-সিদ্ধান্তে অথবা পুরাণগুলির ভিতরে আমরা লীলার সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা পাই তাহাতে দেখি, স্বরূপ-লীলার কথা কম, প্রাকৃত মায়াশক্তির দ্বারায় সৃষ্ট্যাদি-লীলাই সেখানে মুখ্যভাবে লীলা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' সূত্রটির ভাষ্যে প্রাচীন বৈষ্ণবগণ জগৎ-প্রপঞ্চ-লীলার কথাই বলিয়াছেন। এই স্বরূপ-লীলার উপরে কোনও জোর দেওয়া হয় নাই বলিয়াই প্রাচীন বৈষ্ণবগণ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদকে স্পষ্টতঃ সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই; কোথাও এই

ভেদকে ঔপচারিক সত্য, কোথাও ভেদের অবভাস মাত্র, কোথাও বা ভেদের ভান বলা হইয়াছে। দ্বাদশ শতকের লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থে এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের ভিতরে আমরা স্বরূপ-লীলার প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই; আর এই স্বরূপ-লীলার প্রতিষ্ঠার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সকল সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব। এই জন্য দেখিতে পাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রাধা-কৃষ্ণের ভেদকে শুধুমাত্র ঔপচারিক, ভেদের অবভাস বা ভান বলেন নাই; তাঁহারা এই অভেদে ভেদকেও সত্য বলিয়াছেন, লীলাকেও তাই তাঁহারা সত্য এবং নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকররূপে এই লীলা-স্মরণ ও লীলা-আস্বাদন, ইহাই হইল গৌড়ীয় ভক্তগণের পরম সাধন ও সাধ্য। শ্রীকৃষ্ণের গোপলীলার প্রসার ও প্রতিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়াই এই স্বরূপ-লীলাবাদের ক্রমপ্রসার ও ক্রমপ্রতিষ্ঠা।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা লক্ষ্য করিতে পারি। লীলাবাদের ক্রমপ্রসার এবং প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে শক্তির প্রেমরূপিণীত্ব। তন্ত্রাদিতে এই স্বরূপ-লীলাবাদের বিশেষ কোনও বিকাশ না হইবার কারণ, শক্তি সেখানে 'শক্তি' বা বলই রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু আমরা বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিষ্ণুশক্তির ক্রমবিকাশ যদি লক্ষ্য করি তবে দেখিতে পাইব, শক্তি প্রথমে প্রেমোন্মুখিনী হইয়া শেষ পর্যন্ত প্রেম-মাত্রতায়ই আসিয়া পর্যবসিত হইল। শক্তি একটু একটু করিয়া যত প্রেম হইয়া উঠিতে লাগিল ততই স্বরূপ-লীলার স্ফূর্তি এবং লীলাবাদের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। তন্ত্রাদিতে বর্ণিত শক্তির ভিতরে এখানে সেখানে সৌন্দর্য-মাধুর্যের আভাস থাকিলেও তাঁহার অনন্তবলযুক্ত ক্রিয়াত্মকত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; কিন্তু বিষ্ণুশক্তি শ্রী-বা-লক্ষ্মীর ভিতরে সৌন্দর্য-মাধুর্যের দিকই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে; রাধার ভিতরে আসিয়া শক্তি বিশুদ্ধহ্লাদিনী রূপে পর্যবসিত হইল। আবার এই হ্লাদিনীর সার হইল প্রেম, প্রেমের সার ভাব, ভাবের সার মহাভাব—সেই মহাভাব-স্বরূপাই হইলেন শ্রীরাধা। প্রেমে সৌন্দর্যে এই মহাভাব স্বরূপিণী রাধা তন্ত্রাদির বর্ণিত শক্তি হইতে রূপে গুণে অনেক খানিই পৃথক্ হইয়া উঠিলেন। ফলে রাধাতত্ত্ব যে শক্তিতত্ত্বেরই একটি রূপভেদ এ কথাটা একটু একটু করিয়া যেন যবনিকান্তরালে বিলীন হইয়া গেল। প্রেমে রাধা এমনই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যে তত্ত্বালোচনা না করিলে বৈষ্ণব সাহিত্যাদিতে বর্ণিত রাধাকে আর শক্তি বলিয়া চিনিবার কোনও উপায় নাই। ভক্তকবি রাধা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> সে যে চেতনজলের ফুটন্ত ফুল,
> তাই লোকে বলে কমলিনী।

ইহাই তো রাধার আসল 'কমলিনী'-রূপ? শক্তিতত্ত্ব হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমবিবর্তনের ফলে রূপে-রসে বর্ণে-গন্ধে সৌন্দর্যপ্রেমের পূর্ণশতদলে প্রস্ফুরণ! পুরাণাদিতে গোপীগণকে লইয়া ব্রজধামে এই লীলার ক্রমপ্রসার— শ্রীরাধিকার সহিত এই লীলার পরিপূর্ণতা।

পূর্বোল্লিখিত চতুর্থ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও দেখিতে পাই, রাধিকার যে ভগবৎকোটি এবং জীবকোটি এই উভয়কোটিতে বিচরণ ইহাও ভারতীয় শক্তিবাদের একটি প্রাচীনধারারই নবপরিণতি। জীবকে কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা অনুগৃহীত করিতে হ্লাদিনীরূপিণী রাধিকাই হইল কারণ। পুরাণাদিতে বর্ণিত লক্ষ্মীতত্ত্বের ভিতরেও এই সত্যটি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ ভাবে শ্রী-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে গৃহীত লক্ষ্মীতত্ত্বের ভিতরে ইহার গভীর ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। শ্রী-সম্প্রদায়ের মতে শ্রী-বা-লক্ষ্মী ঈশ্বরকোটি এবং জীবকোটি এই উভয়ের ভিতরে যেন একটি স্নেহ-প্রীতিময় সেতু রচনা করিয়া রহিয়াছেন। লক্ষ্মী মঙ্গলময়ী এবং করুণাময়ী, তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'করুণাগ্রা-

নতমুখী'; অষ্টোত্তরসহস্র নামের ভিতরেও বলা হইয়াছে 'করুণাং বেদমাতরম্'; তাই ঈশ্বরকোটিতে অবস্থান করিয়াও এই করুণাময়ী দেবীর দৃষ্টি রহিয়াছে সর্বদাই দুঃখতাপক্লিষ্ট তাঁহার সন্তান বদ্ধজগজ্জীবের প্রতি। তিনি তাই তাঁহার করুণা-স্নেহ-প্রেমের দ্বারা জীবকে সর্বদা ভগবন্মুখী করিবার চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপতা দ্বারা জীবের সকল অজ্ঞানতম সকল মায়াচ্ছন্নতা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; আবার তিনি বিষ্ণু-স্বরূপ-ভূতা তাঁহার প্রিয়তমা প্রধানা মহিষী বলিয়া জীবের পক্ষ হইয়া পরমেশ্বরের উপরেও গভীর প্রভাব বিস্তার করিতেছেন, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি প্রপন্নার্ত জীবগণের প্রতি আকর্ষিত করিতেছেন। মুক্ত-জীবরূপে নিত্যকাল লক্ষ্মানন্দ আস্বাদন করাই হইল শ্রীবৈষ্ণবগণের সাধ্য, আর এই সাধ্যের জন্য প্রপত্তি বা অনন্যশরণতাই হইল প্রধান সাধন। এই প্রপত্তিই মুখ্য সাধন হওয়াতে লক্ষ্মীর স্থানও মুখ্য হইয়া উঠিল। প্রিয়তমা ভগবৎপত্নী এবং কল্যাণময়ী করুণাময়ী জীবমাতারূপে তিনি ভগবান্ এবং জীব এতদুভয়ের মধ্যবর্তিনী হইয়া জীবকে স্ববুদ্ধিদানে নিরন্তর ভগবন্মুখী করিয়া তুলিতেছেন, আবার ভগবান্‌কে জীবমুখী করিয়া অকৃপণভাবে কৃপাবিতরণে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। শ্রীবৈষ্ণবগণের মতে এই মাতৃরূপা লক্ষ্মীদেবী 'প্রণিপাত প্রসন্না,' 'ক্ষিপ্র-প্রসাদিনী দেবী,' 'সদানুগ্রহসম্পন্না'; তিনি 'ক্ষান্তিরূপিণী, অনুগ্রহপরা, অনঘা'। সর্বদাই ইনি অনিষ্টনিবর্তন এবং ইষ্টপ্রাপণ-গর্ভ করুণানিরীক্ষণের দ্বারা সবকিছু রক্ষা করিতেছেন। পুরুষোত্তমদেব যেমন শ্রীকান্ত, শ্রীও সেইরূপ 'অরবিন্দলোচনমনঃকান্তা'; এইরূপ পরস্পরানুকূলতা দ্বারা সর্বব্যাপারেই উভয়ের সামরস্য; এই জন্যেই শ্রীর প্রসাদ ব্যতীত কাহারও শ্রেয়োলাভ হয় না, শুধু ঐহিক শ্রেয় নয়, ইহার কৃপা ব্যতীত মোক্ষ লাভও সম্ভব হয় না।

শ্রীবৈষ্ণবগণের লক্ষ্মী সম্বন্ধে এই যে দৃষ্টি তাহার আভাস আবার আমরা পুরাণাদিতেই পাইয়া থাকি। পদ্মপুরাণে স্বর্গ খণ্ডে দেখিতে পাই, লক্ষ্মীই মধ্যবর্তিনী হইয়া সর্বদোষের আকর হিরণ্যকশিপুর উপরেও বিষ্ণুর কৃপাবর্ষণ সংঘটিত করাইয়াছিলেন। ব্রহ্মপুরাণেও দেখিতে পাই, জগন্নাথ সর্বলোকবিধাতা অব্যয় বাসুদেবকে প্রণতিপূর্বক পদ্মজা লক্ষ্মীদেবী সর্বলোকের হিতকামনায় সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই যে মর্ত্যলোকরূপ মহাশ্চর্য কর্মভূমি, এই যে লোভমোহগ্রস্ত কামক্রোধমহার্ণব, এই যে বিস্তীর্ণ সংসার-সাগর—ইহা হইতে জীবগণ কি করিয়া মুক্তিলাভ করিবে, ইহাই হইল প্রশ্নের বিষয়। এই প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, দেবীচরিত্রের এই যে বৈশিষ্ট্য ইহা বৈষ্ণবশাস্ত্রে বর্ণিত লক্ষ্মীদেবীরই বৈশিষ্ট্য নহে, ইহাও আমরা ভারতবর্ষের সর্বশাস্ত্রে বর্ণিত দেবী চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। শৈবশাক্ত আগমগুলি অধিকাংশই শিব-পার্বতীর প্রশ্নোত্তর-ছলে লিখিত; সর্বত্রই দেখিতে পাই, জীবের দুঃখে বিগলিত-হৃদয়া দেবী জীবের হিতকামনায়, জীবের মুক্তির উপায় নির্ধারণ করিবার জন্যই পরমেশ্বর শিবের নিকটে সকল তত্ত্ব এবং সাধন-পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন; দেবীর প্রতি গাঢ় প্রেমবশতই মহেশ্বর শিব দেবীর নিকট জীবমুক্তির সকল তত্ত্ব ও পন্থা উপদেশ করিয়াছেন। মধ্যযুগের কিছু কিছু বাঙলা গ্রন্থেও এই প্রাচীনধারার রেশ দেখিতে পাই। বহুসংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্রও এই একই ধরনে রচিত। সেখানেও করুণাবিগলিত ভগবতী-প্রজ্ঞাই জীব-হিত কামনায় সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, ভগবান্ বজ্রেশ্বর হেবজ্র বা হেরুকই সকল প্রশ্নের উত্তরে সব তত্ত্ব ও সাধন-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং জীবের মঙ্গলকামনায় করুণা-বিগলিত দেবীর এই সন্তানবৎসলা মাতৃমূর্তি, ইহাও ভারতবর্ষেরই সাধারণ মাতৃমূর্তি। বিশেষ সম্প্রদায়ের ভিতরে আসিয়াই ইহা একটি বিশেষ মূর্তি লাভ করিয়াছে।

ভারতীয় শক্তিতত্ত্বের এই বৈশিষ্ট্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের শ্রীরাধার ভিতরে একটি গভীর পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইঁহাদের মতে, যেখানে যত আনন্দানুভূতি তাহা ভগবৎকোটিতেই হোক আর জীবকোটিতেই হোক— সকলই একই হ্লাদিনী-শক্তির দ্বারা সাধিত হইতেছে। জীবের ভিতরে যে প্রেমভক্তির আস্বাদন সে স্থলে বুঝিতে হইবে, একই হ্লাদিনী-শক্তি করুণায় বিগলিত হইয়া জীবানুগ্রহের জন্য প্রেমভক্তিরূপে নিজেকে ভগবৎকোটি হইতে জীবকোটিতে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' বলিয়াছেন, 'ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ'। এই ভাবেই রাধিকার রসময়ী রূপে কৃষ্ণ-বাঞ্ছাপূর্তি—আর ভক্তিরূপে জীবানুগ্রহ। এই তত্ত্বটিই পরবর্তী কালের গোবিন্দ অধিকারীর শুক-সারীর দ্বন্দ্বে সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে—

শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
সারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু ॥

পূর্বালোচিত পঞ্চমসিদ্ধান্ত— রাধাদ্বারেই যে স্বরূপানন্দ অনুভবের চরম উৎকর্ষ, এই তত্ত্বটিও ভারতীয় শক্তিবাদেরই একটি বিশেষ পরিণতি। শক্তির সান্নিধ্য ব্যতীত শিব যে শব হইয়া যায় তন্ত্র-পুরাণাদিতে বহু প্রচলিত ভারতীয় শক্তিবাদের এই কথাটির ভিতরেই রাধাবাদের এই তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। শক্তিদ্বারে পরমশিবের আত্মোপলব্ধির তত্ত্বটি কাশ্মীর শৈবদর্শনে সুন্দর বিকাশ লাভ করিয়াছে। পঞ্চরাত্রের শক্তিবাদের আলোচনায়ও দেখিতে পাই, শক্তিদ্বারে যে বিশ্বসৃষ্টি তাহার মূল প্রয়োজন পরমপুরুষের আত্মোপলব্ধি; শক্তিকে স্বেচ্ছায় খানিকটা যেন পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহার ভিতর দিয়া পরমপুরুষ নিজেকেই অনন্তরূপে সৃষ্টি করেন, নিজেকে এই অনন্তরূপে সৃষ্টির ভিতর দিয়াই তাঁহার অনন্তভাবে আত্মোপলব্ধি। কাশ্মীর শৈবধর্মে সৃষ্টিস্থিতি-উপসংহাররূপা এই শক্তিকে বলা হইয়াছে 'তদ্ভরণে রতা'। 'তৎ-ভরণ' শব্দের এখানে তাৎপর্য হইল পরমশিবের মনোরঞ্জন বা তৃপ্তিবিধান। এই দেবী হইলেন পরমশিবের 'ইচ্ছানুবিধায়িনী,' এই জন্যই ইঁহার পতি ইঁহাকে কামনা করিয়া থাকেন। নিজের ভক্তৃত্বরূপকে অনুভব করিবার জন্যই পরমেশ্বর এই শক্তিরূপিণী মূল প্রকৃতিকে বারবার ক্ষোভিত করিয়া তাহাকে সৃষ্টির উন্মুখিনী করিয়া তোলেন। পরমপুরুষের এই ভোক্তৃত্ব কিরূপ? গাঢ়নিদ্রাভিভূত কোনো ব্যক্তি তাহার সুন্দরী প্রিয়তমা দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে, সেই গভীর নিদ্রার ভিতরেই তাহার স্তিমিত চৈতন্যের মধ্যে সে যেরূপ নিজের একটা 'ভোক্তৃত্ব' অনুভব করে, এই মহাশক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত পরম শিবের ভোক্তৃত্ববোধও তদনুরূপ। নিজেকেই নিজে এইরূপে বহুভাবে ভোজ্যরূপে ভাগ করিয়া, পৃথগ্‌বিধ পদার্থরূপে বহুধা সৃষ্টি করিয়া সর্বেশ্বর এবং সর্বময় পরমেশ্বর যে নিজেকে নিজে ভোগ করেন— এই ভোক্তৃত্ব যেন লীলাময়ের একটা স্বপ্ন ভোগ মাত্র। নিজেকেই তিনি জ্ঞেয়ী ও জ্ঞেয়রূপে পৃথক্ করিয়া লন; এই জ্ঞেয় সর্বদাই জ্ঞেয়ীর উন্মুখ, এই জন্য জ্ঞেয় কখনও জ্ঞেয়ীর স্বাতন্ত্র্য খণ্ডন করে না। প্রভু, ঈশ্বর প্রভৃতি সংকল্পের দ্বারাই তিনি নিজেকে নিজে নির্মাণ করেন, এ নির্মাণ শুধু মাত্র তাঁহার ব্যবহারের জন্য। বিজ্ঞানভৈরবে বলা হইয়াছে যে, আলোকের দ্বারা যেমন দীপকে জানা যায়, কিরণের দ্বারা যেমন সূর্যকে জানা যায়, তেমনই শক্তিদ্বারাই শিবের যাহা কিছু সমস্ত প্রকাশ।

অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই অবভাস বা প্রতিফলনের জন্য একখানি স্বচ্ছ মুকুর (আয়না) চাই; সেই স্বচ্ছ মুকুর হইল পরমেশ্বরের 'স্ব-সংবিৎ'। এই স্ব-সংবিৎই যখন স্বপ্নে যেন একটা প্রমাতৃত্ব

গ্রহণ করে তখন সেই প্রমাতৃরূপ স্ব-সংবিৎ-স্বচ্ছ-মুকুরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবভাস হয়। শক্তি-দ্বারে সৃষ্ট এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাই পরমেশ্বরের নিজের বিমল সংবিদের ভিতরে নিজেরই একটা প্রতিফলন মাত্র; অর্থাৎ নিজের চৈতন্যের ভিতরে নিজেকেই দৃশ্যরূপে দেখা। শক্তিদ্বারে নিজের ভিতরেই যে-পর্যন্ত নিজের প্রতিফলন না হয় সে পর্যন্ত নিজেকেই নিজে দেখা হয় না; তাই শক্তি-রূপে এক দ্রষ্টাই নিজেকে দৃশ্য করিয়া তোলেন। একস্থানে বলা হইয়াছে যে, এই বিশ্ব ভৈরবের (পরম শিবের) চিদ্রূপ স্বচ্ছ অম্বরে প্রতিফলিত মল-স্বরূপ; নিজের চিদম্বরে এই যে জ্ঞেয়রূপ প্রতিবিম্ব-মল তাহা ভৈরবের নিজের প্রসাদেই সম্ভবপর হয়, অন্য কাহারও প্রসাদে নহে। আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে, শক্তিদ্বারে পরমশিব নিজেকে নিজে দেখেন বলিয়া এই শক্তি হইল শিবের নির্মল আদর্শ। শিবের সাধকতমা বা করণরূপা হইল শক্তি; সুতরাং এই শক্তিই হইল শিবরূপের নির্মল-আদর্শ, এই আদর্শের ভিতর দিয়াই তিনি সর্বদা নিজে নিজের রূপ দেখেন। অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, পরমশিব হইলেন রবি-স্বরূপ, শক্তি হইলেন তাঁহার কর-নিকর-স্বরূপা, এই শক্তিরূপা বিশদ বিমর্শ-দর্পণে প্রতিফলিত হন পরমাক্ষর পরমাব্যক্ত মহাবিন্দু; অথবা এই মহাবিন্দু অধিষ্ঠান করেন প্রতিসৌন্দর্যের দ্বারা সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে শিবের এমন চিত্তময় শক্তিরূপ কুড্যে বা দেয়ালে। শিবের সকল ইচ্ছা বা কাম পূরণ করেন বলিয়াই শক্তিকে বলা হইয়াছে বিমর্শরূপিণী কামেশ্বরী, এই পরমশিব এবং তাঁহার শক্তি ব্রহ্মাণ্ডগর্ভিণী পরমেশ্বরী যেন হংস-হংসীরূপে নিত্য লীলারত।

রাধাতত্ত্বে আসিয়া দেখিলাম, শক্তি আর ব্রহ্মাণ্ডগর্ভিণী নন, তিনি শুধুমাত্র হ্লাদিনী; এই হ্লাদিনী সকল সত্তা ও চৈতন্যের সারভূতা বলিয়া প্রেমময়ী হ্লাদিনীর ভিতর দিয়াই ভগবানের স্বরূপোলব্ধির চরমোৎকর্ষ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের চমৎকারিত্ব স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে ইহা একান্তরূপে অভিনব নহে।

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মানুষের মানসজীবনকে বহুগ্রন্থিযুক্ত একটি সুতার সহিত উপমিত করিলে অন্যায় হইবে না। ঐ গ্রন্থিগুলি সংস্কার; কতকগুলি স্বোপার্জিত, কতকগুলি সহজাত। ঐসব গ্রন্থির ফলেই সুতাটি দৃঢ় হয়, আবার গ্রন্থির আতিশয্যে সুতায় জট পাকাইয়া যাইতে পারে, সুতাটি অকেজো হইয়া পড়ে। গ্রন্থি না থাকিলেও যেমন চলে না, তেমনি আবার সংখ্যায় বেশি থাকিলেও অচল। ঐ গ্রন্থিগুলি অনেকটা জীবদেহে গ্ল্যাণ্ডের অনুরূপ; জীবদেহ চালাইবার এঞ্জিন স্বরূপ। মানবজীবন গ্ল্যাণ্ডের কর্মতৎপরতার উপরে নির্ভরশীল। মানুষের মানসিক জীবনের উৎকর্ষ ঐসব সংস্কার বা গ্রন্থির উপরে নির্ভর করে।

সাহিত্য শিল্প দর্শন প্রভৃতি মানসজীবনের ফুল ও ফসল বিশেষভাবে ঐ গ্রন্থির ইতিহাসের সহিত যুক্ত। কিম্বা আরও একটু জোর দিয়া বলা যাইতে পারে, মানবদেহের উৎকর্ষ যেমন গ্ল্যাণ্ড-গুলির কর্মপটুতার উপরে নির্ভর করে, তাহার মানসজীবনের উৎকর্ষ তেমনি নির্ভর করে ঐ সংস্কার গুলির সার্থকতার উপরে।

মানবসমাজে এমন জাতি দেখা যাইবে না যাহার কোনো সাহিত্য বা শিল্প নাই। নিতান্ত অসভ্য বলিয়া পরিগণিত জাতিরও সংগীত ও শিল্পকলা আছে। আবার সভ্যতার উচ্চধাপে উন্নীত জাতিরও সাহিত্য ও শিল্পকলা আছে। উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক গ্রন্থি বা সংস্কার বর্তমান এবং সেগুলি অল্পাধিক সক্রিয়। কিন্তু এমন যদি কোনো ব্যক্তি থাকে (জাতি সম্ভব নয়) যাহার মানস-জীবন গ্রন্থিহীন বা সাধনার ফলে গ্রন্থিবিমুক্ত, তবে সে ব্যক্তি সাহিত্য বা শিল্প-সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করে না। সাধনমার্গের অন্তে উপনীত মহাপুরুষগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যীশু বুদ্ধ চৈতন্য রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সরাসরি সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করেন নাই। অথচ তাঁহাদের উপদেশাবলীর সরসতা ও বাগ্‌বিভূতি স্মরণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় সাহিত্যসৃষ্টি-ক্ষমতার প্রাচুর্য তাঁহাদের ছিল। ইঁহাদের প্রত্যেককে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইঁহারা নিজেরা তাহার অতীত। এমন যে হইয়াছে তাহার কারণ, সাধনার দ্বারা মানসিক গ্রন্থিগুলি তাঁহারা খুলিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে যন্ত্র সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করে, তাঁহারা সেই যন্ত্রের অতীত হইয়া গিয়াছেন।

নিতান্ত অসভ্য জাতি বা মানবসভ্যতার চূড়ায় অধিষ্ঠিত মহাপুরুষ আমাদের প্রসঙ্গ নয়। সভ্য সমাজের অন্তর্গত যে মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করে আমাদের আলোচ্য সেই লোক। এখানে একটা তর্ক উঠিতে পারে, সভ্য সমাজের সকল মানুষেরই মানসজীবনে যদি গ্রন্থি থাকে তবে সকলেই সাহিত্যিক বা শিল্পী হয় না কেন? হয় না কে বলিল? সক্রিয়ভাবে হয় না এই পর্যন্ত। একজন লোক কবিতা লেখে না বটে, কিন্তু কবিতার রস গ্রহণ করিতে পারে। ঐ রসগ্রহণ-ক্ষমতাই প্রমাণ করে যে তাহার

মানসজীবন গ্রন্থিমুক্ত নয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রন্থি সক্রিয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ। তা ছাড়া, সক্ষম সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি আরও কয়েকটি অবস্থার উপরে নির্ভর করে। শিক্ষা ও পরিবেশ তন্মধ্যে। মূল প্রেরণা জোগায় ঐ সংস্কার। শিক্ষা ও পরিবেশ আনুষঙ্গিক; স্রোতের টানের আনুষঙ্গিক যেমন গুণটানা ও পালের হাওয়া, অনেকটা তেমনি আর কি।

সাহিত্য বা শিল্প সম্যক বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থিগুলির ইতিহাস ও কার্যক্রম বোঝা অপরিহার্য। কোনো বিশেষ লেখকের রচনার তাৎপর্য বুঝিবার পক্ষে তাহার মানসজীবনের গ্রন্থিগুলির ইতিহাস বোঝা অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ববিদ্যা কতক সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্রয়েডীয় বিচারপদ্ধতির শরণ গ্রহণ ছাড়া উপায় থাকে না, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থিগুলির মূল অবচেতন মানসে নিহিত। সেখানে নামিতে না পারিলে পুরা হদিশ পাওয়া যাইবে কিরূপে? সাহিত্য ও শিল্পের সমালোচনা-পদ্ধতি ক্রমে সেই দিকেই আগাইয়া চলিতেছে মনে হয়।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে এইরূপ একটা গ্রন্থির দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই একাধিক সন্ন্যাসীর উল্লেখ আছে, অনেক ক্ষেত্রেই তাহারা আবার অতিলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সন্ন্যাসীর উপস্থিতি আকস্মিক নয়, ঘটনার তাগিদে আরোপিত নয়, লেখকের মনের কোনো গ্রন্থি বা সংস্কারের অনিবার্য ফল। আমরা ফলটি মাত্র দেখিতেছি, কিন্তু মূল কোথায়? লেখকের কোন্ অবচেতনার মধ্যে? এসব তত্ত্ব পুরা না জানা পর্যন্ত বঙ্কিমী উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতে বাধ্য। শিল্পক্ষেত্রে কেবল শিল্পগত বিচার নিতান্ত একদেশদর্শী। যে-রচনা যত রসোত্তীর্ণ, তাহার মূল তত নিম্নগামী। শ্রেষ্ঠ রচনার মূল চেতন মনকে অতিক্রম করিয়া অবচেতন মনে প্রবিষ্ট। অবচেতন মনের ভূগোল না জানিলে শ্রেষ্ঠ রচনার রহস্য জানা যাইবে কি প্রকারে? বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাস-কম্প্লেক্সের (এই গ্রন্থিগুলিই কি কম্প্লেক্স?) স্বরূপ না জানা পর্যন্ত বঙ্কিমী উপন্যাসের রূপটুকু মাত্র জানা যাইবে, তাহার বেশি নয়; কিন্তু তাহার বেশিতেই আসল রহস্য।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতেই আরও একটা গ্রন্থির দৃষ্টান্ত লওয়া যাক।

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের[১] জীবন এইরূপ আর-একটি উদাহরণ। তাঁহার জীবনের একটি কূট গ্রন্থি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিশ বৎসর বয়সে কবির প্রথমা স্ত্রী মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পরে কবির সমস্ত রচনায় একটি তিক্ততা, এক প্রকার জ্বালা, সমস্ত কথায়, বিশেষ নারী-সম্বন্ধীয় কথায়, অত্যন্ত জোর দিয়া উচ্চারণ করিবার অভ্যাস দেখা যায়। এমন আগে ছিল না, এই দুর্বিষহ ঘটনার পরে এটি নূতন আমদানি। বুঝিতে পারা যায় যে, স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁহার জীবনে যে গ্রন্থি পড়ে তাহার সঙ্গে এই অভ্যাসটি জড়িত। প্রিয়জনের মৃত্যু মাত্রেই দুঃসহ হইতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু বিশেষ ছিল। সেটি কি? জানা দরকার। তাঁহার চরিতকার বলিতেছেন: "গোবিন্দচন্দ্র পত্নীকে শেষ দেখা দেখিলেন

১ ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস নামে পরিচিত। যথার্থ কবিমাত্রেই স্বভাবকবি, বাকি সকলে অভাব-কবি: কেহ বা কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে কবি, কেহ বা অন্য কার্যের অভাবে কবি; কাজেই গোবিন্দ দাসকে বিশেষভাবে স্বভাবকবি বলিবার হেতু নাই, খুব সম্ভব বৈষ্ণব পদাবলীর কবি গোবিন্দদাস হইতে বিশেষ করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে স্বভাবকবি বলা হইয়া থাকে।

বটে, কিন্তু পরস্পর বাক্যবিনিময় আর হইল না। রাত্রি ৮টার সময়ে সারদা সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন (২৬শে নভেম্বর ১৮৮৫)। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গে নানারূপ জনশ্রুতি আছে। কাহারও মতে 'তাঁহার মৃত্যু একটা শোকাবহ বাস্তব ঘটনার উপরে প্রতিষ্ঠিত', আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা হইতেই নাকি কবির 'আত্মহত্যা' কবিতাটির সৃষ্টি।"[২] এই দুর্ঘটনার সঙ্গে যে রহস্যই জড়িত থাকুক না কেন, সেই ঘটনাটি কবির পরবর্তী সমস্ত কাব্যকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। একদিকে কবির স্বর্গতা প্রেয়সী যেমন দিব্যরূপ লাভ করিয়াছে, আর-একদিকে নারীর উপরে অবিচারকারীদের প্রতি সাধারণভাবে কবির ধিক্কার শতগুণ জ্বালাময় হইয়া উঠিয়াছে।

বারাঙ্গনা-কুলের মনোভাব সম্বন্ধে তাঁহার একটি কবিতা আছে, নাম প্রতিহিংসা। বারাঙ্গনার মুখ দিয়া কবি বলাইয়াছেন—

সেই প্রতিহিংসা বিষ
প্রাণে জলে অহর্নিশ ;
এ তো নহে ভালবাসা প্রেমী প্রেমিকায়।
এ অধরে রক্তহাসি
নহে এ অমৃতরাশি,
তব রক্ত অভিলাষী জানিও ইহায় !
এ মৃদু মৃণালভুজে
শুধু প্রতিহংসা বুঝে,
এ বন্ধন নাগপাশে বাঁধিতে তোমায়।[৩]

এই কবিতায় তিক্ততার ও জ্বালার যে আতিশয্য তাহা জীবনের কেবল সাধারণ অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় কোনো বিশেষ গ্রন্থির সহিত যুক্ত। সে গ্রন্থি কবির জীবনে কোথায় পড়িয়াছে? সেই গ্রন্থিপাতের বাস্তব রহস্য কি ? কিছু যে আছে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এবং সেটি স্ত্রীর মৃত্যুরূপ 'শোকাবহ ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত' হইলে বিস্মিত হইব না। সেটি জানা দরকার।

কবির জীবনের আর-একটি গ্রন্থি, ভাওয়ালের রাজার আদেশে স্বগ্রাম জয়দেবপুর হইতে কবির নির্বাসন। স্ত্রীর মৃত্যু এবং জয়দেবপুর হইতে নির্বাসন, এই দুটি তিক্ত স্মৃতি কবির পরবর্তী সমস্ত রচনাকে দুঃখে তিক্ততায় জ্বালায় এবং সৌন্দর্যে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। জন্মভূমি ও পত্নী, জন্মভূমির সৌন্দর্য এবং পত্নীর প্রেম— এই দুইটি হইতে অকালে আকস্মিকভাবে শোকাবহভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় কবির মনে যে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল সেই ক্ষতমুখে তাঁহার কবিতা উৎসারিত হইয়াছে, সেইজন্যই তাঁহার কবিতাবলীতে, তা সে যে-বিষয়েই হোক-না কেন, গলন্ত লাভার ন্যায় একপ্রকার অস্বাভাবিক উত্তাপ অনুভূত হয়।

---

২ গোবিন্দচন্দ্র দাস, পৃ ১৮। সাহিত্যসাধকচরিতমালা ৭৪। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩ গোবিন্দ-চয়নিকা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীকৈলাসচন্দ্র আচার্য, ওরিয়েন্টাল এজেন্সি, কলিকাতা

২

ভাওয়াল-জয়দেবপুরে ১৮৫৫ সালের ১৬ই জানুয়ারি গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কবির জীবন দুঃখের। দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য আশৈশব তাঁহার সহচর। শৈশব হইতেই ভাওয়াল-রাজপরিবারের অনুগ্রহ লাভ তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অনুগ্রহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। রাজপরিবারের কৃপায় ঢাকা নর্মাল স্কুলে এবং পরে ঢাকায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে তিনি কিছুকাল শিক্ষা করেন। কিন্তু কোনো বিদ্যালয়ের পাঠই তিনি চূড়ান্ত গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে রাজপরিবারে চাকুরি গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানেও শেষ পর্যন্ত তিনি টিকিতে পারিলেন না। কোনো ঘটনায় রাজার অবিচার দেখিয়া তিনি কর্ম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য রাজকর্মচারীদের মধ্যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। এতদিনে ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য সফল হইল। অতঃপর তাঁহাকে ময়মনসিংহ জেলার নানা স্থানে চাকুরি করিতে হয়। কোনো চাকুরি দীর্ঘকাল করা তাঁহার হইয়া উঠিত না।

"পনর বৎসর বয়সে গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ হয়। জয়দেবপুরেই তাঁহার পত্নী সারদাসুন্দরীর পিত্রালয়।" কবির ত্রিশ বৎসর বয়সে কবিপত্নীর মৃত্যু হইয়াছিল সে কথা আগেই বলিয়াছি। "পত্নীবিয়োগের অল্পদিন পরেই কবি একমাত্র সহোদর জগচ্চন্দ্রকে হারাইলেন (১৪ই আগস্ট, ১৮৮৬); একে একে আত্মীয় পরিজন সকলেই তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রমদার মৃত্যু পূর্বেই ঘটিয়াছিল, বাকি রহিল কনিষ্ঠা কন্যা— সপ্তম বর্ষীয়া মণিকুন্তলা।"

নানা কাজে কবিকে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতে হইত, এইভাবে কলিকাতার সাহিত্যিক-সমাজে তিনি পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। 'নবযুগ' নামে কোনো পত্রিকায় জয়দেবপুরের রাজপরিবারের সমালোচনাত্মক একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। রাজার ধারণা হয়, সেটি গোবিন্দচন্দ্রের রচনা। এই ধারণার বশে, কবির অস্বীকৃতি সত্ত্বেও, রাজার আদেশে কবি স্বগ্রাম হইতে নির্বাসিত হন। এইবারে তাঁহার দুঃখের পাত্র পূর্ণপ্রায় হইল। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা এই যে, দুঃখের পাত্র প্রায়শঃ আকারে বড় হইয়া থাকে। কবিজীবনের পরবর্তী ঘটনাসমূহ সেই পাত্রকে পূর্ণতর করিতে থাকিয়াছে।

প্রথম পত্নী সারদার মৃত্যুর সাত বৎসর পরে কবি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এবং পরে যাহার চক্রান্তে তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জয়দেবপুরে প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি পান। এ দুটিকে সৌভাগ্য বলা চলে। কিন্তু এই সৌভাগ্যোদয়েও কবির মন হইতে পূর্বস্মৃতির কালো ছায়া দূর হইল না। অর্থকষ্টও সমান চলিল।

কবির খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো ভূম্যধিকারী তাঁহাকে কিছু মাসিক বৃত্তি দিতে লাগিলেন। কিন্তু মোটের উপরে তাঁহার অবস্থার বড় তারতম্য ঘটিল না। প্রথমা পত্নীর বিয়োগে এবং জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হওয়ায় যে যুগল গ্রন্থি তাঁহার জীবনে পড়িয়াছিল তাহারাই কবিকে পীড়ন করিতে লাগিল। যে-পীড়নের কেন্দ্র মনে, বাহির হইতে তাহার সান্ত্বনা আসিবে কোন্ সূত্রে?

ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধি দেখা দিতে লাগিল। এই সময়ে কলিকাতায় কবিকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন মহাশয় ব্যক্তির চেষ্টায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে একটি সভার আয়োজন হয়। বাঙালির সভার সাধারণ পরিণাম যাহা হয়, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না, বক্তৃতা হইল, চাঁদা উঠিল না; প্রস্তাব গৃহীত হইল, টাকা আসিল না। "বাঙালি

মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?" তবু প্রেতের রাজ্যে এই শুভচেষ্টা আশার সংবাদ। অবশেষে দুর্ভাগ্যে অভাবে ও রোগে ভুগিতে ভুগিতে কবি ঢাকা সহরে ১৩২৫ সালের ১৩ই আশ্বিন ইহলোক ত্যাগ করেন।[৪]

৩

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রতিভার প্রধান লক্ষণ একটা দুর্দমনীয় আবেগ। এই আবেগের প্রচণ্ডতা এমনি যে, কোনো বাধা মানে নাই। সাহিত্যিকের সম্মুখে বাধা আসিতে পারে দুইটি: ভাষা ও ছন্দের স্বাভাবিক বাধা, আর সামাজিক পরিবেশের বাধা; অর্থাৎ ভাষা-পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ দুটাই বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, সব ক্ষেত্রেই করিয়া থাকে; কবির প্রতিভায় এবং এই দুই শ্রেণীর বাধায় একটা দ্বন্দ্বের মত চলে; এবং শেষ পর্যন্ত দুইয়ে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করিয়া কবির কাব্য জগৎকে বিধৃত করিয়া রাখে। এই ভারসাম্য কেবল মহাকবিগণের কাব্যেই সম্ভব হয়; নব্যবাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহার উদাহরণ মধুস্থদন ও রবীন্দ্রনাথ। অল্পশক্তিমান কবিদের বেলাতে এই বাধার ফলে দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে। কোনো কোনো কবি পরিবেশের দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া নতিস্বীকার করেন, আবার কোনো কোনো কবির ক্ষেত্রে পরিবেশ ও প্রতিভার দ্বন্দ্বে পরিবেশ দুটাই পরাজিত হয়, কবির দুর্দমনীয় প্রতিভা শেষ পর্যন্ত বাগ মানে না। প্রথম প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ভাষা ছন্দ ও প্রতিভার দ্বন্দ্বে এখানে ভাষা ও ছন্দই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কবি তাঁহার উত্তরজীবনের কাব্যগ্রন্থসমূহে ভাষা ও ছন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অন্যরূপ প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয় কাজী নজরুল ও গোবিন্দ দাসের কাব্যে। ইঁহাদের দুজনেরই প্রতিভার আবেগ এমন দুর্বার যে, ভাষা ও ছন্দের অর্থাৎ কাব্যের পরিবেশ কিছুতেই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই; পাথরের বাঁধকে যেমন পার্বতী নদী কিছুতেই স্বীকার করে না, অনেকটা তেমনি। এ দুটিই ত্রুটি, দুই শ্রেণীর ত্রুটি, প্রভেদের মধ্যে এই। এদিক হইতে, যেমন অন্যদিক হইতেও বটে, বিচার করিলে গোবিন্দ দাসের তুলনা কাজী নজরুল ইসলাম।

নব্যবাংলাসাহিত্যের জন্ম কলিকাতার পরিবেশে। প্রধানতঃ কলিকাতার ভাষা ও সামাজিক পরিবেশকে অবলম্বন করিয়াই নব্যবাংলাসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশের যে অঞ্চলের লোকই সাহিত্যসৃষ্টি করুন না কেন, কলিকাতার সামাজিক ও ভাষিক পরিবেশরূপ convention বা প্রথাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন। কালের গতি ইহার অনুকূলে ছিল। কলিকাতা শহর আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নব্যবাংলার জীবনকেন্দ্র, কাজেই কলিকাতার সঙ্গে যোগস্থাপন অধিকাংশ লেখকের পক্ষে কঠিন হয় নাই— অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক হইয়াছে। অনেক সময়েই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার আগেই লেখকগণ কলিকাতার পরিবেশে প্রবেশ করিয়াছেন, কাজেই কলিকাতার পরিবেশ গ্রহণের পক্ষে কোনো বাধাই তাঁহারা অনুভব করেন নাই। কিন্তু গোবিন্দ দাসের বেলাতে এমনটি ঘটে নাই। তাঁহার জীবনের গড়তি অংশটা কলিকাতা হইতে দূরে কাটিয়াছে, তখনই তাঁহার কাব্যের ভিত্তিপত্তন হইয়াছে। তার পরে পরিণত বয়সে যখন যখন কলিকাতার সমাজে উপস্থিত হইয়াছেন, নিতান্ত অতিথির মতন, অনেক ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত অতিথির মতন উপস্থিত হইয়াছেন; ফলে কলিকাতার

৪ কবির জীবনবৃত্তান্ত সাহিত্যসাধকচরিতমালার পূর্বোক্ত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

সমাজ, যাহা অধিকাংশ বাঙালির পক্ষে জল-হাওয়ার মত সহজ, তাহাকে তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই ; সন্দেহের সঙ্গে, সমালোচনার সঙ্গে, বিরূপ ভাবোদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন।[৫]

নব্যবাংলাসাহিত্যের স্বাভাবিক ক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার ভারসাম্য না ঘটায় ভালো মন্দ দুইরূপ ফলই ফলিয়াছে। মন্দর দিক এই যে, কবি যেখানে সমালোচকের কলম হাতে লইয়াছেন সেখানে সবই কেমন একদেশদর্শী হইয়াছে ; তাঁহার মতামত সে সব সময়ে ভুল এমন নয়, কিন্তু ঠিক যেখানে যতটুকু জোর দেওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি জোর দিয়াছেন, নৌকা কাৎ হইয়া পড়িয়াছে, কারণ, আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে লেখকের সমবেদনার অভাব, আর তার মূলে রহিয়াছে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব। এই জাতীয় বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা বাস্তবনিষ্ঠার অভাবজাত বলিয়া নিতান্ত লঘু। আর ভালোর দিকে সত্যই ভালো ; এমন এক প্রকার সরলতা ও আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে স্বর্ণের ওজনেই যাহার মূল্য। শহরের শিক্ষিত-সমাজে পল্লীগ্রামের নবাগন্তুক আসিয়া পড়িলে তাহার কথায় ও আচরণে যেমন কৌতূহল সৃষ্টি করে, তাহার গ্রাম্য সরলতা মনকে যেমন আপনি আকর্ষণ করে— গোবিন্দ দাসের অনেক কবিতা শিক্ষিত পাঠকের মনে তেমনি প্রতিক্রিয়া ঘটাইয়া থাকে।

'উলঙ্গ রমণী' কবিতাটি ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমন অকুণ্ঠিতভাবে সত্য কথা বলা বোধ করি শিক্ষিতসমাজে আবাল্যবর্ধিত কবির সম্ভব হইত না। বিষয়টি স্বভাবতই কুণ্ঠাজড়িত, একটু হাত কাঁপিলেই সমস্ত কবিতাটি অতলস্পর্শ খাদের মধ্যে গিয়া পড়িত, কিন্তু সে বিভ্রাট কোথাও ঘটে নাই, তার কারণ বিষয়টির মধ্যে কোথাও কিছু যে কুণ্ঠার কারণ আছে সে বিষয়ে কবি একেবারেই সচেতন নন। তিনি নিঃশঙ্ক অচেতনার সঙ্গে সংকীর্ণ গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, কোথাও পা টলে নাই। 'আমার ভালোবাসা' এবং 'নৃসিংহ'— এই জাতীয় আর দুটি কবিতা। এবং এই তিনটি গোবিন্দ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতানিচয়ের অন্তর্গত ; এ বিষয়ে সার্থক কবিতা লিখিতে এক মহাকবিগণ পারেন, আর পারেন সাহিত্যিক সংস্কারে অনভিজ্ঞ কবিগণ ; মধ্যপন্থা এক্ষেত্রে অচল। কিন্তু মহাকবিগণের শিল্পের ইন্দ্রজাল যেখানে আবরণের মত কাজ করিতে পারিত, ইঁহাদের হাতে তাহা সম্পূর্ণ অনাবৃত ; কিন্তু যে আবরণহীনতায় লজ্জাবোধ নাই, সেখানে লজ্জার কারণও ঘটিতে পারে নাই ; ইহা শিশুর নগ্নতা, বন্যের নগ্নতা, সংক্ষেপে এ নগ্নতা দেবতার।

গোবিন্দ দাসের কবিপ্রতিভার এই লক্ষণগুলির সঙ্গে তাঁহার হাস্যরস ও পূর্বোক্ত কূটগ্রন্থিদ্বয় যদি যুক্ত করি তবে তাঁহার প্রতিভার প্রায় সাকুল্যটা পাই, ইহাই তাঁহার প্রতিভার স্বরূপ।

৪

ময়মনসিংহ জেলার প্রান্তে জাত (কর্মজীবনে দীর্ঘকাল তিনি ময়মনসিংহ জেলাতে কাটাইয়াছেন) এই কবির কাব্য পড়িতে পড়িতে কেন জানি না বারংবার ময়মনসিংহের গাথাকাব্যগুলি মনে পড়িয়া গিয়াছে। সে কি ভাব ও ভাষার সাম্যে ? সে কি প্রকাশভঙ্গির অনাড়ম্বর সরলতায় ? সে কি প্রকাশ্য বিষয়ের নির্বিচার আগ্রহে ? কিম্বা কেবলই একটা ভৌগোলিক সান্নিধ্য-হেতু ? ময়মনসিংহ-গাথা কাব্যের কবিদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয়রূপে কিছুই জানি না, যেটুকু জানি তার মধ্যে সংশয় ও জ্ঞানের অভাব মিশ্রিত। কিন্তু আমার কেন জানি না এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, সেইসব অজ্ঞাতপরিচয় কবিদের জীবন-কাঠামোর মধ্যে

---

৫ দ্র° বাঙ্গালি, সৌরভ, আমারি যে দোষ, আমারি কি দোষ ?, সে কেমন ?, প্রভৃতি কবিতা। গোবিন্দ-চয়নিকা

এবং গোবিন্দ দাসের জীবনে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। সামাজিক আর্থিক এবং আঞ্চলিক একই স্তরের লোক ইঁহারা, কেবল কিছু সময়ের প্রভেদ। কিন্তু সে ভেদও দুস্তর নয় এই জন্য যে, গ্রামাঞ্চলের সময় নগরাঞ্চলের সময়ের চেয়ে মন্দগতি। বিশেষ, উনবিংশ শতকের শেষভাগের জয়দেবপুর ময়মনসিংহ-গাথার কবিদের যুগের গা-ঘেঁষিয়াই বিরাজমান ছিল। এক পরিবেশের ফল একরূপ হইবে ইহাই স্বাভাবিক। তাই বুঝি এই দুই সময়ের কবিদের মধ্যে এমন ঐক্য, বাহিরের পার্থক্য সত্ত্বেও এমন আন্তরিক ঐক্য। বাস্তবিক স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস ময়মনসিংহ-গাথার স্বভাবকবিদেরই উত্তরপুরুষ। তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশ, বিশিষ্ট অংশ, মহুয়া-মলুয়ার লতাবিতানের শেষ পুষ্পগুচ্ছ। নব্যবাংলাসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ অনেকটা আকস্মিক, তাঁহার আন্তরিক যোগ পদ্মাযমুনার পরপারবর্তী ঐসব গাথাকারগণের সঙ্গে।

এটি আরও স্পষ্ট হইয়া ওঠে যখন স্মরণ করি তাঁহার আঞ্চলিক (এখানে গ্রাম ও তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশ) সম্পর্কে প্রীতি ; স্বগ্রামের প্রতি তাঁহার অন্ধ দুর্নিবার আকর্ষণ, শিশুসন্তান যেমন দুর্নিবার অন্ধ আকর্ষণ অনুভব করে তাহার মাতার প্রতি। তাত্ত্বিকগণ পিতামাতার প্রতি আচরণ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন সে আর-এক বস্তু ; তাহা তত্ত্ব, তাহা নীতি, তাহা যেমন সামাজিক সত্য, তেমন আন্তরিক সত্য নয়। শিশুর অন্ধ আকর্ষণের সঙ্গে তুলনায় সেই জন্যই তাহার মূল্য কম। গোবিন্দ দাসের স্বগ্রামের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ শিশুর মাতৃব্যাকুলতার মতই আন্তরিক বস্তু, তাহা patrotism নয়, এমনকি local patriotismও নয়। প্যাট্রিয়টিজম্ সম্বন্ধে তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, সেসব সামাজিক সত্য হইতে উদ্ভূত, এমনতরো জীবনের বস্তু নয়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাছে তাঁহার দামুন্যা ও রত্নাহু যেমন সত্য ছিল এবং যে-স্তরের সত্য ছিল, গোবিন্দদাসের কাছে তাঁহার জয়দেবপুর ও চিলাই নদী তেমনি সত্য এবং তেমনি স্তরের সত্য ; যেমন সত্য এবং যেমন স্তরের সত্য কাঁশাই, ধনু, জালিয়াহাওর প্রভৃতি অঞ্চল ঐসব গাথা-কবিগণের নিকটে। যাহার বিশিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল নাই, সে-ই নির্বিশেষকে লইয়া প্যাট্রিয়টিজম্ করে। বিশেষকে মানুষ যখন পায় তখন তাহাকে ভালোবাসে, তাহাকে লইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রশ্ন তোলে না। মায়ের মুখের অ্যানাটমি পরীক্ষা করিয়াছে এমন বৈজ্ঞানিকের কথা জানিতে এখনো বাকি আছে।

নব্য বাঙালি কবিগণ এই বিশেষ অর্থে মাতৃভূমির স্পর্শ হইতে বঞ্চিত। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ঘটনাচক্রের রহস্যময় হস্ত রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলে কিছুদিনের জন্য নিক্ষেপ করিয়া ছিল। পাবনা রাজসাহী নদীয়া শিলাইদহ পতিসর সাজাদপুর পদ্মা আত্রাই যমুনা—ইহাই সেই বিশিষ্ট অঞ্চল। মূলতঃ ইহাই রবীন্দ্রনাথের কাছের বাংলা দেশের প্রত্যক্ষ রূপ। এই অঞ্চলে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার দিব্যস্ফূর্তি। সে কেবলই কি কাকতালীয় ? রবীন্দ্রনাথ জীবনের কমবেশি পনেরটি বছর প্রায় স্থায়ীভাবে এই অঞ্চলে কাটাইয়া ছিলেন। ইহার আগের ও পরের রবীন্দ্রকাব্যে একপ্রকার নির্বিশেষ ভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই সময়কার কাব্যগুলি বিশেষের রস হইতে সঞ্জাত বলিয়া তাহার মূল্য এমন সমধিক। উঠ্‌তি বয়সে এই আঞ্চলিক পরিবেশটি না পাইলে রবীন্দ্রকাব্য কি রূপ ধারণ করিত কে জানে।

যাই হোক, আমার বক্তব্য এই যে প্রাচীন সমস্ত কাব্যই ভৌগোলিক অঞ্চল বিশেষের ধন, এ সত্য কবিরাও জানিতেন, তাই তাঁহারা 'Leaving great verse to a little clan' কোনো দুঃখ অনুভব করিতেন না। গোবিন্দদাসের কাব্যে সেই প্রাচীন ধারাটির একটি আধুনিক মূর্তি পাই।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত উল্লেখ নানা কারণে উচিত হইবে না। প্রথম কারণ প্রতিভার

অসামান্যতা, দ্বিতীয় কারণ তাঁহার ঐ সময়ের কাব্যে আঞ্চলিক রস ছাড়াও অন্য অনেক রসের মিশাল আছে। তাঁহার ঐ সময়ের কাব্যের ভিত্তিটা আঞ্চলিক হইলেও বস্তুটা বিচিত্র উপাদানে গঠিত। কাজেই নব্যবাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে গোবিন্দ দাসই প্রধান এবং খুব সম্ভব উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক রসের কবি। এখানেই তাঁহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইবারে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কেন স্বগ্রাম হইতে নির্বাসনকে আমরা কবিজীবনের একটি কূটগ্রন্থি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। স্বক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত হইলে লোকের অসুবিধা হয়, স্বার্থহানি হয়, বড়জোর অভিমানে আঘাত লাগে। কিন্তু গোবিন্দ দাস যে আঘাত পাইয়াছিলেন তাহা এসবের চেয়ে অনেক গুরুতর— একেবারে জৈব অস্তিত্বের মর্মে আঘাত। সে আঘাতের স্মৃতি তিনি কখনো ভুলিতে পারেন নাই, পরবর্তীকালে গ্রামে ফিরিবার অনুমতি পাইলেও ভুলিতে পারেন নাই ; আর শুধু তাই নয়, ঐ বিষময় স্মৃতি তাঁহার জীবনের সাকুল্যটাকে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে— 'তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি'। এমন আঘাত একমাত্র সেই পাইতে পারে যাহার কবিচিত্ত আছে এবং সে কবিচিত্ত মাটিতে বদ্ধমূল। এই মূলে আঘাতের অভিজ্ঞতা গোবিন্দ দাসের কবিপ্রেরণার একটি মৌলিক বেদনা।

অপর মৌলিক বেদনা তাঁহার পত্নীর শোকাবহ মৃত্যু। এই শোকাবহ ঘটনার স্বরূপ নিশ্চয় জানি না, তবে ইহাতে কবির জীবনে যে কূটগ্রন্থি পড়িয়াছিল সারা জীবনেও আর তিনি তাহা খুলিতে পারেন নাই। বিশ্বের নারীসমাজের সৌন্দর্য ও মাধুর্য, প্রণয় ও প্রেম, সংসারের যাবতীয় সুখ-দুঃখ— এক কথায় মানুষের সমগ্র জীবন— ঐ শোকাবহ মৃত্যুর ছায়ায় সমাচ্ছন্ন, ঐ স্মৃতির দ্বারা সকরুণ। আর শুধু তাই কেন বা বলি, পত্নী জীবিত থাকিলে পতির মনের যে দুর্দাম আবেগ স্বাভাবিক ভাবেই শান্তি ও শমে ফিরিতে পারিত, নিষ্ফলতাজাত অতৃপ্তি তাহাতে একপ্রকার প্রচণ্ড তীব্রতা ও উত্তাপ দিয়াছে। সে উত্তাপ এমনি উগ্র যে কবির হৃদয় দগ্ধ করিয়া দিয়াছে, দগ্ধহৃদয়-নির্গত সেই লাভাস্রোত পাঠকের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াও সম্পূর্ণ শীতল হয় নাই, তাহার চোখে মুখে ভাপ লাগে—

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস-সহ।
আমি ও-নারীর রূপে
আমি ও-মাংসের স্তূপে
কামনার কমনীয় কেলি-কালীদহ,
ও-কর্দমে অই পঙ্কে
ওই ক্লেদে ও-কলঙ্কে
কালীয়নাগের মত সুখী অহরহ—
আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ।[৬]

কিংবা—

যাও নারি, যাও ফিরা,' নতুবা ও বক্ষ চিরা'
চুষে নিব হৃৎপিণ্ড শুষে নিব হাড়,

৬ গোবিন্দ-চয়নিকা

প্রেমের ভীষণ দৃশ্য নিরখিয়া কাঁপে বিশ্ব,
ভীষণ নৃসিংহ রূপ প্রেমে অবতার।
দিলে যদি সব দেও, যা আছে তোমার।[৭]

নিছক উত্তাপের বিচারে, তীব্রতার বিচারে, বাংলা সাহিত্যে ইহাদের তুলনা মেলা ভার। ইংরেজ কবি বার্নস-এর রচনায় ইহাদের দোসর আছে।

কিন্তু এরূপ উত্তাপ মানবহৃদয় দীর্ঘকাল পোষণ করিতে পারে না, দুঃখ যতই তীক্ষ্ণ হোক কালক্রমে তাহার ধার পড়িয়া আসে। কবির দুঃখস্মৃতির ধারও পড়িয়া আসিয়াছে, উত্তাপের পরিবর্তে মাধুর্য, দাহের পরিবর্তে সৌন্দর্য দেখা দিতে শুরু করিয়াছে; মাধ্যাহ্নিক প্রচণ্ড ভাস্বরতার স্থানে সন্ধ্যার করুণ লাবণ্য কবিহৃদয়কে মনোহর করিয়া তুলিয়াছে—

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে জ্বর আসিছে গায়।
ঐখানে সে দাঁড়াইয়া,
মুখ দেখিত আয়না দিয়া,
অমল জলে কমল যেন শরৎ-সুষমায়।
আজো আমি দিন দুপরে
আয়নাতে তার চাই না ডরে,
কি জানি কি পাছে তাহার মুখ বা দেখা যায়।
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়।[৮]

কিন্তু এই শুধু নয়, আরো আছে। কাল যেমন সান্ত্বনা দিতে পারে, তেমনি সান্ত্বনার আর-একটা কেন্দ্র হইতে পারে আপন হৃদয়ের হাস্যরস-বোধ। কবি সে সুখে বঞ্চিত নন। তাঁহার হাস্যরসজাত কাণ্ডজ্ঞানই বলিয়া দিয়াছে, বাড়াবাড়ি কিছু নয়, শোক সহ্য করিয়াও টিকিয়া থাকা যায়, জীবন একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় না—

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে
প্রভাতে সোনার সূর্য হবে না উদয়,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে
বুঝিবা আঁধারে রাত চিরকাল রয়।

কিন্তু

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে
চোখে দেখি, কানে শুনি, নাকে বাস পাই,
এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে
আমিও বাঁচিয়া আছি, আজো মরি নাই।[৯]

৭ ৮ ৯ গোবিন্দ-চয়নিকা

এই কবিতাটিতেই কবিজীবনের আর-একটি স্থায়ী সূত্রের আভাস পাওয়া যায়—

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
দীনের আশ্রয় শেষ আছে ভগবান্‌,
এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে
অনন্ত করুণা প্রেম সেই করে দান।[১০]

ভগবদ্‌বিশ্বাস কবিজীবনের একটি ঐশ্বর্য, অনেক দুঃখের অনেক সান্ত্বনা তিনি ঐ বিশ্বাস হইতে লাভ করিয়াছেন।

৫

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিকৃতি সম্বন্ধে একটি নিশ্চিত ধারণায় পৌছানো সম্ভব নয়, কেননা তাঁহার কাব্য অনেক পরিমাণে নব্যবাংলাসাহিত্যের মূল প্রবাহের বাহিরে অবস্থিত। দ্বিতীয়ত, যেসব কবির সম্বন্ধে লোকের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল তাহাতে আঘাত পড়িবার আশঙ্কা। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ অনেক উর্ধ্বে, তাঁহাদের প্রথমেই ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিভায় ও প্রতিভার ফলশ্রুতিতে গোবিন্দ দাসের আসন হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের চেয়ে উঁচুতে ধার্য হইবে বলিয়াই আমার ধারণা। তবে এ বিষয়ে মতভেদ অনিবার্য, বস্তুতঃ সাহিত্যসমালোচনা মানেই মতভেদের নূতন দৃষ্টান্ত। তবে আমার বিশ্বাস এই যে, কাব্যরসিক ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে গোবিন্দ দাস নব্যবাংলাসাহিত্যের একজন major কবি, যেমন major কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কাজী নজরুল ইসলাম। অনেক প্রখ্যাতনামা কবি বঙ্গবাণীর বীণাযন্ত্রের পুরাতন তন্ত্রীটি বাজাইয়াই যখন সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন পুরাতনে সন্তুষ্ট না থাকিয়া গোবিন্দ দাস পুরাতন বীণাযন্ত্রে নূতন তন্ত্রী আরোপ করিয়া নূতনতর সুর ধ্বনিত করিয়াছেন— তার কমে তাঁহার কবিপ্রকৃতি সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

---

১০ গোবিন্দ-চয়নিকা

রাশিয়ার এক প্রান্তে

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ মস্কৌ থেকে চিঠি লিখেছিলেন, "রাশিয়ায় এসেছি— না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্ব প্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস।"[১] একুশ বছর পরে মস্কৌতে বেড়াতে এসে যা দেখি তাতেই রবীন্দ্রনাথের সেই কথা মনে পড়ে, বারে বারে ভাবি এদের কী অসীম সাহস।

রাশিয়ায় বিপ্লব হল ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম পাঁচ বছর গেল বাইরের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে। তাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার পরে ১৯২২ সাল থেকে এরা ঘরের কাজে মন দিতে পারলে। কুড়ি বছর যেতে না যেতেই ১৯৪১ সালে জার্মানরা আবার এদের আক্রমণ করে। আরো চার-পাঁচ বছর গেল জীবনমৃত্যুর দোলায়মান সংগ্রামে। তার পরে সবে বছর পাঁচেক সময় পেয়েছে যুদ্ধের সমস্ত ক্ষতি মিটিয়ে ফেলে অগ্রসর হওয়ার জন্যে। বিপ্লবের পরে এরা যা-কিছু করেছে সবই আসলে বিশ-পঁচিশ বছরের কাজ।

এদের সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যোগের একটা বিরাট ও সমগ্র রূপ দেখতে পেলেম মস্কৌর চেয়েও স্পষ্টভাবে কাজাকস্থানের রাজধানী আল্‌মা-আতায়। গত সপ্তাহে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলুম। মস্কৌ থেকে অনেক দূর, আড়াই হাজার মাইল হবে। উড়ে যেতেও সময় লাগল একুশ ঘণ্টা। আল্‌মা-আতা ভারতবর্ষেরই কাছে; কাশ্মীরের গায়ে লাগা, আর চীনদেশের পশ্চিম সীমান্তে। দিল্লী-আগ্রার ঠিক সোজা উত্তর দিকে, হিমালয় আর আল্‌তাই পর্বতশ্রেণীর অপর পারে।

কাজাক দেশটা পাহাড়ে জায়গা। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে এই দেশের লোকেরা ছিল খুব একটা পিছিয়ে-পড়া জাত। এক শ জনের মধ্যে তখন মোটে দু জন লেখাপড়া জানত। আধুনিক কোনো ব্যবস্থা, যেমন হাসপাতাল থিয়েটার বিশ্ববিদ্যালয়, কোনো কিছুরই চিহ্ন ছিল না।

কাজাকরা হল একেবারে খাঁটি এশিয়াবাসী। এদের ভাষাও রুশ-ভাষার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিপ্লবের আগে রাশিয়ার সম্রাট জ়ারের গবর্মেণ্ট এদের সব দিক দিয়ে দাবিয়ে রেখেছিল। এদের জন্য কিছুই করে নি। শুধু শোষণ করেছে।

আল্‌মা-আতায় এসে দেখলুম, এখানকার লোকেরা অনেকটা আমাদের দেশের পাহাড়ীদেরই মতো দেখতে। গায়ের রং কারো ফরশা, কারো বাদামী, কারো রীতিমতো কালো। মনে হয় যেন খাসিয়া ভুটিয়া নেপালীরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ধরন-ধারণও অনেকটা সেই রকমের। অনেককে দেখতে ভারতবাসী, এমনকি কাউকে কাউকে একেবারে বাঙালি বলেই ভুল হয়। বিপ্লবের আগে এরা সত্যিই ছিল আমাদের দেশের পিছিয়ে-পড়া জাতের মতো— যাদের আমরা অনেক সময়ে বলি অর্ধ-সভ্য। আল্‌মা-আতা ছিল একটা ছোটো শহর; আমাদের দেশের চেয়েও গরিব, রাস্তাপথ আরো খারাপ, ছোটো ছোটো

১ রাশিয়ার চিঠি। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

মাটির কুঁড়ে ঘর। এখনো তার কিছু কিছু নমুনা আমরা পথে যেতে যেতে দেখেছি। বিপ্লবের আগে দশ-বিশ হাজার লোক এখানে বাস করত।

আজ গিয়ে দেখলুম চমৎকার একটা আধুনিক শহর, লোকসংখ্যা চার লক্ষ। সুন্দর চওড়া রাস্তা, দুই ধারে লম্বা এক-এক ফালি ফুলের বাগান, তার পাশে পায়ে-চলা পথ। তার পরে এক সারি উঁচু গাছ, সমস্ত রাস্তাটাকে ছায়ায় ঢেকে রেখেছে। তার পরে এক-একটা বাড়ি। প্রত্যেকটি বাড়ির সঙ্গেই অল্প একটু জমি আর ফলফুলের বাগান। একটা নয়, শহরের নতুন সব রাস্তাই এই রকম। ওরা বললে যে, নতুন শহর সমস্ত রাশিয়া জুড়ে এইভাবেই তৈরি হচ্ছে। ওদের ইচ্ছা সব জায়গায়ই সবুজ শহর গড়ে তোলা।

সব রাস্তাতেই বিজলি-বাতি। তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, কারণ শুধু শহরে নয়, রাশিয়ার প্রত্যেকটি গ্রামে— একটাও বাদ নেই— এরা বৈদ্যুতিক শক্তি পৌঁছিয়ে দিয়েছে। শহরে নতুন বাড়ি অনেক তৈরি হয়েছে, দোতলা বা তিনতলা। এদেশে ভূমিকম্প হয়ে থাকে, তাই বেশি উঁচু বাড়ি তোলা নিরাপদ নয়। মাঝে মাঝে সাবেক আমলের ছোটো ছোটো বাড়ি-ঘরও আছে। তার মধ্যে অনেক মাটির বাড়ি।

জমির মালিক হয় শহরের ম্যানিসিপালিটি অথবা কাজাকস্থানের গবর্নমেণ্ট। প্ল্যান করে কাজ করবার কোনো বাধা নেই। শহরের মাঝে মাঝে সুন্দর ফুলের বাগান, ফুলগুলি সব আমাদের দেশেরই মতো। ছোটো একটা নদীর ধারে প্রকাণ্ড একটা বাগান দেড় মাইল দুই মাইল লম্বা। তার মধ্যে নানারকম খেলাধুলার ব্যবস্থা, সিনেমা, অনেক রকম খাবারের দোকান— সবই অবশ্য সরকারী— আর একটা প্রকাণ্ড হ্রদ। গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলা তিন হাজার ফুট উঁচুতে খানিকটা কালিম্পঙ-কার্সিয়াঙের মত। বাগান জুড়ে হাজার হাজার বাচ্চা ছেলেমেয়ে অধিকাংশই খালি গায়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে। সকলেরই মুখে হাসি।

আল্‌মা-আতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যালয়। শহরে ৬ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত, আর গ্রামে ৬ থেকে ১৩ বছর পর্যন্ত সকলকেই বিদ্যালয়ে পড়তে হয়, তার জন্য কোনো মাহিনা দিতে হয় না। যে জাতটার মধ্যে বিপ্লবের সময়ে শতকরা মোটে দু জন লেখাপড়া জানত, ১৯৪১ সালে তাদের মধ্যে একজনও নিরক্ষর রইল না। কুড়ি বছরের মধ্যে শতকরা এক শ জনকে লেখাপড়া শিখিয়ে দিলে।

দেখতে গিয়েছিলুম আল্‌মা-আতা বিশ্ববিদ্যালয়। এদেশে ষোলো বছর বয়সের পরে অধিকাংশ ছেলেই যায় নানারকম টেক্‌নিক্যাল স্কুলে। সাধারণ শিক্ষার জন্য যাদের বিশেষ যোগ্যতা আছে, প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল অনুসারে বাছাই করে নিয়ে শুধু তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। আল্‌মা-আতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুনলুম ছাত্রসংখ্যা এখন তিন হাজার, আর শিক্ষকমণ্ডলী তিন শ, তার মধ্যে অর্ধেক কাজাকদেশের লোক। এখানে বলে দেওয়া ভালো যে, সমস্ত কাজাকস্থানের লোক-সংখ্যা হল ষাট লক্ষ, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগও আছে। এ ছাড়া কাজাকদেশে পঁচিশ-ছাব্বিশটি টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউশন আছে, তাতে ছাত্রসংখ্যা ষোলো হাজার। বিদ্যালয় আছে নয় হাজার, আর তাতে ছাত্রসংখ্যা দশ লক্ষ।

এসব বাদেও আছে সংগীত ও অন্যান্য ললিতকলা শেখবার জন্য প্রতিষ্ঠান। আল্‌মা-আতায় সংগীত-বিদ্যালয় দেখলুম— কন্‌সারভেটোয়ার, তার ছাত্রসংখ্যা তিন হাজার।

আমি ইচ্ছা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার (Physics আর Chemistryর) ল্যাবরেটরি দেখতে গিয়েছিলুম। যন্ত্রপাতি যা দেখলুম তা কোনো বিষয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের চেয়ে খারাপ নয়, বরং ভালো।

এই হল বিশ্ববিদ্যালয়। তার পরে দেখতে গেলুম Academy of Sciences। ভারতবর্ষে এরকম কোনো জিনিস নেই, এর নাম দেওয়া যেতে পারে বিদ্যা-আয়তন। রাশিয়াতে সায়ান্স বললে ইতিহাস অর্থশাস্ত্র দর্শন বা সাহিত্য সবই বোঝায়। সব রকম বিদ্যাচর্চা ও গবেষণার ব্যবস্থা এই অ্যাকাডেমিতে। অ্যাকাডেমির অনেকগুলি ইনস্টিটিউট আছে অর্থাৎ গবেষণার জায়গা। সব জড়িয়ে অ্যাকাডেমিতে হাজার লোক কাজ করে। তা ছাড়া পাঁচ শ জন ছাত্র এম্. এ. বা এম্. এসসি. পরীক্ষার জন্য থিসিস্ তৈরি করছে। অ্যাকাডেমির জন্য এই বছরের বাজেটে মঞ্জুর হয়েছে পাঁচ কোটি রুব্‌ল— প্রায় ছয় কোটি টাকা। এখন অ্যাকাডেমির সভ্য তিরিশ জন, তার মধ্যে ষোলো জন কাজাক-দেশীয়। আর সভাপতি একজন বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ, নাম সাৎপায়েভ্। তিনি নিজে কাজাকী, ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে কাজাকদেশের প্রথম গ্রাজুয়েট। বিদ্যা-আয়তনের মধ্যে একজন আছেন মহিলা-সভ্য।

এই হল শিক্ষার ব্যবস্থা। মনে পড়ল, রাশিয়ার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কথা: "রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল। শিক্ষার বিরাট পর্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখি নি, তার কারণ অন্য দেশে শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তারই— দুধু ভাতু খায় সেই। এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা। একজনের মধ্যে শিক্ষার যে অভাব হবে সে অভাব সকলকেই লাগবে। কেননা সম্মিলিত শিক্ষারই যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্বসাধারণের কাজে সফল করতে চায়। এরা 'বিশ্বকর্মা'; অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই। অতএব এদের জন্যেই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়।"[২]

তার পরে আল্‌মা-আতায় দেখলুম হাসপাতাল, স্যানেটোরিয়ম। এক আল্‌মা-আতাতেই আছে দু হাজার রুগীর জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা। তাতেও এরা সন্তুষ্ট নয়। এরা চার হাজার বেড্-এর ব্যবস্থা করবে শীঘ্রই। শহরে ছয় বছর শিখে পাশকরা ডাক্তারের সংখ্যা পাঁচ শ। সমস্ত রাশিয়াতে এখন প্রতি আট শ জন লোকের জন্য একজন ডাক্তার। ওদের পরিকল্পনা যে আরো বাড়াতে হবে; প্রতি ছয় শ জনের চাই একজন ডাক্তার। আর প্রতি এক শ জন লোকের জন্য চাই হাসপাতালে একটা বেড্। চিকিৎসার ব্যবস্থা অবশ্য সবই বিনা পয়সায়। ডাক্তাররা সকলেই মাহিনা পান। হাসপাতাল ডিস্‌পেন্সারিতে কাজ শেষ করার পরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করতে বাধা নেই, কিন্তু তা খুবই কম চলে। কারণ হাসপাতালে বিনা পয়সায় আরো অনেক ভালো চিকিৎসা লোকে করাতে পারে।

হাসপাতাল স্যানেটোরিয়ম কয়েকটা দেখলুম। খুব ভালো ব্যবস্থা। একটা পুরানো ছোটো হাসপাতাল, তাতে ১০৫টি বেড্। সেখানে কাজ করেন ৪৫ জন ডাক্তার, তার মধ্যে মোটে ৩ জন পুরুষ মানুষ। এদেশে অধিকাংশই মেয়ে-ডাক্তার। আর দেখলুম ৯৬ জন নার্স। এই ৪৫ জন ডাক্তার আউটডোর রুগীও অবশ্য দেখে থাকে, তার জন্য হাসপাতালের সঙ্গে সংলগ্ন ডিস্‌পেন্সারি বা পলিক্লিনিক আছে। ঘুরে দেখলুম ৩৯টা আলাদা আলাদা ঘর আছে এক-একজন বিশেষজ্ঞের জন্য। হাসপাতালের আসবাবপত্র, ব্যবস্থা সব কিছুই মস্কৌর হাসপাতালের মতো। কোনো তফাত নেই।

২ রাশিয়ার চিঠি। ৩ অক্টোবর ১৯৩০

স্যানেটোরিয়ম যেটা দেখতে গিয়েছিলুম আল্‌মা-আতায় তাতে ব্যবস্থা আছে ১৮০ জন রুগীর জন্য। ঠিক রুগী বলা যায় না, অসুখ সেরে ওঠার পরে কিংবা বিশ্রাম করার জন্যই বেশি লোকে আসে। এখানে ১০ জন ডাক্তার, সকলেই মহিলা। ব্যবস্থা আছে সব রকম। এক্‌স্‌ রে, খেলাধুলা, নানারকম স্নানের ব্যবস্থা— তাও চিকিৎসার অঙ্গ। প্রকাণ্ড খাবার-ঘর। দু শ জন একসঙ্গে খেতে বসতে পারে। নিজেদের সিনেমা-ঘর, লাইব্রেরি। আমাদের দেশে এরকম একটা স্যানেটোরিয়মও আছে বলে জানি না। এদেশে শুনলুম হাজার হাজার।

আল্‌মা-আতায় দেখলুম প্রকাণ্ড অপেরা-গৃহ, তাতে আঠারো শ লোক বসতে পারে। মস্কৌতে সব চেয়ে বড়ো বিখ্যাত বল্‌শয় (Bolshoi) থিয়েটারে লোক ধরে চব্বিশ শ। তফাত খুবই অল্প। আল্‌মা-আতায় মস্কৌর মতো একটা 'চিল্‌ড্রেন্স থিয়েটার' আছে, সেখানে বিশেষভাবে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের জন্য অভিনয় দেখানো হয়।

এখন জুলাই মাস। গ্রীষ্মকালে আল্‌মা-আতা থেকে এদের সব থিয়েটারের দলগুলি বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। এখানে গ্রীষ্মকালে দু-তিন মাস এক রিপাব্লিকের দল অন্য রিপাব্লিকে তাদের অভিনয় নাচ গান শোনাতে যায়। এই ভাবে ষোলোটা রিপাব্লিকের লোক পরস্পরের জিনিসগুলি দেখতে পায়। আমরা যেমন মস্কৌতে বসে য়ুক্রেন, উরাল, উজ়বেকিস্তান প্রভৃতি জায়গার অভিনয় দেখলুম।

কাজাকদেশের থিয়েটারগুলি গ্রীষ্মকালে বন্ধ। তবে একদিন একটা কন্‌সার্টে গিয়েছিলুম, সেখানে কয়েকজন ভালো গাইয়ে-বাজিয়ের গান আর সংগীত শুনলুম আর কিছু কাজাকী নাচও দেখলুম। রাশিয়াতে প্রত্যেকটি রিপাব্লিক এক-একটা আলাদা আলাদা দেশ। শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা আর সব কাজকর্ম চলে স্থানীয় ভাষায়। কন্‌সার্টের নাচ-গানের মধ্যে অধিকাংশই কাজাক ভাষায়। নাচগুলিও বেশির ভাগ কাজাক গ্রামের জিনিস। কিন্তু তার মধ্যে গ্রাম্যতা-দোষ নেই, আছে মার্জিত রুচির পরিচয় আর বৈচিত্র্য। তিন-চার জন নামজাদা গাইয়েকে শ্রোতারা কিছুতেই ছাড়ে না। হাততালি দিয়ে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনল। যারা অভিনয় করে বা গান করে তাদের সঙ্গে দর্শক ও শ্রোতাদের হৃদয়ের যোগ মস্কৌতেও দেখেছিলুম, এখানেও তাই। এরা আর্টিস্টদের সব দিক দিয়ে উৎসাহ দিতে জানে, উৎসাহ দেয়। Roza Baglanova নামে একটা মেয়ে— বয়স খুবই কম— গান করবার অসাধারণ ক্ষমতা, তাকে একটার জায়গায় ছয় বার ফিরে ডেকে ছটা গান করিয়ে নিলে। ভাষা জানি না, কিন্তু আমরাও মুগ্ধ হয়ে শুনলুম। তার একটা কারণ কাজাক গানের সুর অনেকটা আমাদের দেশের মতো। ঠিক একরকম নয়, কিন্তু একই জাতের— কোথাও মনে হয় যেন ভাটিয়াল সুরের আভাস, কোথাও যেন ভৈরবী।

আল্‌মা-আতায় সিনেমা-স্টুডিয়ো দেখতে গিয়েছিলুম। এখানে সিনেমার জন্যে একটা স্বতন্ত্র বিভাগ আছে, তার জন্য আলাদা একজন মন্ত্রী। অন্য অন্য রিপাব্লিকেও এই ব্যবস্থা। আল্‌মা-আতায় সিনেমা-মন্ত্রী নিজে আমাদের সব দেখিয়ে দিলেন। এখানকার স্টুডিয়ো বছর পাঁচেক আগে স্থাপিত হয়েছে, এখন এখানে কাজ করে আড়াই শ লোক। বছরে এখন কুড়িখানা বড়ো ফিল্ম তৈরি করে— কাজাক দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সাহিত্য, এইসব বিষয় নিয়ে। অন্য অন্য রিপাব্লিকে এই ভাবে তাদের নিজেদের ভাষায়, নিজেদের সাহিত্য, দেশ বা জাতির কথা নিয়ে ফিল্ম তৈরি করে। এর মধ্যে

ভালো ভালো ফিল্ম বাছাই করে নিয়ে অন্য রিপাব্লিকের ভাষাতে তর্জমা করা হয়। আল্মা-আতা স্টুডিয়োতেও অন্য প্রদেশের ফিল্মের কথা-অংশ তর্জমা করে। এই ভাবে রাশিয়ায় সবগুলি দেশের মধ্যে, ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও, ফিল্মের আদান-প্রদান চলছে। সবই সরকারী। কত কাটতি হবে তার জন্য ভাবনা নেই। ভালো ফিল্ম হলে সারা রাশিয়ায় তার চল হবে।

এখানে আর্টিস্ট ফটোগ্রাফার আর সকলে যারা কাজ করে তারা মাহিনা পায় মোটামুটি মস্কৌরই মতো। তাই বেশি টাকার লোভে নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। নিজের দেশে বসে, নিজের ভাষায় ভালো ফিল্ম তৈরি করতে পারলেই হল। যদি সত্যিই ভালো হয় তবে অন্যসব দেশ থেকে তার চাহিদা হবে। সরকারী হলেও সব জায়গায়ই টাকা দিয়ে ফিল্ম নিতে হয়, টাকা দিয়ে সিনেমা দেখতে হয়। কাজেই লোকের ভালো না লাগলে উপর থেকে ফতোয়া দিয়ে বাজে ফিল্ম চালাবার জো নেই। ভালো ফিল্ম হলে সব দেশেই চলবে। কাজেই আর্টিস্টের পক্ষে টাকায় বা খ্যাতিতে কোনোদিকেই কম পড়বে না। সেই জন্য ছোটো ছোটো প্রদেশেও এরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেদের ভাষায় ফিল্ম তৈরি করার সুযোগ পায়। শুধু ফিল্ম কেন, প্রত্যেকটা দেশ নিজের ভাষায় নিজেদের সাহিত্য, নিজেদের নাচ-গান-সংগীত সব কিছুরই উন্নতি করতে পারে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভালো ভালো জিনিসগুলি সমস্ত রাশিয়াতে ছড়িয়ে যায়।

রাশিয়া থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর দুর্দিন-দুর্ভিক্ষের মধ্যেই এরা নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে— এদের ঐতিহাসিক বিরাট নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ঘটে নি। ·· রাশিয়ার নাট্যমঞ্চে যে কলা-সাধনার বিকাশ হয়েছে, সে অসামান্য। তার মধ্যে নূতন সৃষ্টির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে। এখনও থামে নি। ওখানকার সমাজবিপ্লবে এই নূতন সৃষ্টিরই অসমসাহস কাজ করেছে। এরা সমাজে রাষ্ট্রে কলাতত্ত্বে কোথাও নূতনকে ভয় করে নি।"[৩]

মস্কৌতে বসেই নানা জায়গার অপেরা নাচগান দেখেছিলুম— য়ুক্রেন, আজ়ারবাইজান, খিরগিজ়, বাষ্কিরিস্থান, বুরাৎ-মঙ্গোলিয়ান, উজ়বেক, তুর্কমেন, ক্যারল-ফিন, আরো কত কী। আল্মা-আতায় এসে বুঝতে পারলুম যে, এই বৈচিত্র্যের উৎস এরা ছড়িয়ে দিয়েছে প্রত্যেকটি প্রদেশ ও নেশনের মধ্যে। তাই রাশিয়ায় ললিতকলার নতুন সৃষ্টি চলেছে সমস্ত দেশ জুড়ে।

আল্মা-আতায় আমরা দুটো কারখানা দেখতে গিয়েছিলুম। একটা সুতা-তৈরির, আর অন্যটা খুব ভারি সব মেশিন তৈরির। ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আধুনিক। প্রত্যেক কারখানায় ছোটো ছেলেদের জন্য কিণ্ডারগার্টেন, ডিস্‌পেন্সারি, আর পায়োনিয়র্‌স্ ক্যাম্প, কর্মীদের জন্য ডিস্‌পেন্সারি, ছুটির সময়ে বিশ্রামগৃহের ব্যবস্থা। মজুর, ইঞ্জিনিয়র, ম্যানেজার সকলের মাহিনা মোটামুটি মস্কৌরই সমান। প্রত্যেকটি মজুরকে বেশি পরিমাণে ভালো জিনিস তৈরি করার জন্য নানারকমের উৎসাহ দেওয়া হয়। বেশি জিনিস তৈরি করতে পারলে টাকা তো বেশি পাবেই, তা ছাড়া নানারকম সামাজিক সম্মান লাভ হবে। সব উপরে আছে স্টালিন-পুরস্কার, তাতে পঞ্চাশ হাজার বা এক লক্ষ রুব্‌ল একসঙ্গে পাওয়া যায়। সব

---

৩ রাশিয়ার চিঠি। ৩ অক্টোবর ১৯৩০

জায়গাতেই দেখলুম প্রত্যেক মানুষকে বলছে, যত পারো বেশি কাজ করো, ভালো করে কাজ করো। সব দিক দিয়ে উন্নতির পথ খোলা রয়েছে।

এদেশে মেয়েরা পঞ্চাশ বছরে আর পুরুষেরা পঞ্চান্ন বছর বয়সে অবসর গ্রহণ ক'রে পেন্সন নিতে পারে। কিন্তু ইচ্ছা করলে সকলেই পেন্সন পাওয়ার পরেও কাজ করে যেতে পারে, তাতে কোনো বাধা নেই। তাতে পুরা মাহিনাও পাবে, পেন্সনও পাবে।

আল্মা-আতায় বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেলুম এদের কারখানাগুলি সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। পথে আসতে আসতে দেখলেম, একেবারে মরুভূমির মতো দেশের মাঝখানে বড়ো বড়ো ফ্যাক্টরি খাড়া করেছে— Akmolinsk, Karaganda, Balkhash এইরকম কত জায়গায় নতুন নতুন শহর গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটা প্রদেশেই শুনলুম এইরকম ব্যবস্থা। সব জায়গাতেই কারখানা-শিল্পের বিস্তার প্রবলবেগে অগ্রসর হচ্ছে। শ্বেত-রাশিয়ার সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই।

লেখায় পড়েছিলুম যে, এদের লক্ষ্য রাশিয়ার সবগুলি দেশ ও জাতির হবে সমান অধিকার। আল্মা-আতায় এসে নিজের চোখে দেখলুম যে, এখানকার কাজাক জাতের মানুষগুলি মস্কৌর শ্বেত-রাশিয়ার মানুষদেরই মতো শিক্ষা স্বাস্থ্য লালিত-কলা শিল্প-বাণিজ্য সব বিষয়েই মোটামুটি সমান সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। ঐকান্তিক পার্থক্য কোথাও নেই। শুধু কাজাকদেশ বা আল্মা-আতা নয়, অন্যসব দেশ বা রিপাব্লিকেও এই একই ব্যবস্থা। এদের চেষ্টা, সমস্ত বৈষম্য ঘুচিয়ে দিয়ে এদের দেশের নানা বিভিন্ন জাতির মধ্যে এরা সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "কাজ সামান্য নয়। য়ুরোপ-এশিয়া জুড়ে প্রকাণ্ড এদের রাষ্ট্রক্ষেত্র। প্রজামণ্ডলীর মধ্যে যত বিভিন্ন জাতের মানুষ আছে, ভারতবর্ষেও এত নেই। তাদের ভূপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য অনেক বেশি। বস্তুত এদের সমস্যা বহুবিচিত্র-জাতি-সমাকীর্ণ, বহুবিচিত্র-অবস্থা-সংকুল বিশ্ব-পৃথিবীরই সমস্যারই সংক্ষিপ্ত রূপ।"[৪]

আল্মা-আতায় গিয়ে মনে হল যে, এই নানা বিভিন্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য ও ঐক্য স্থাপনের কাজে এরা প্রবল ভাবে অগ্রসর হচ্ছে।

আল্মা-আতা শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটা গ্রামে Luchvostoka বা 'পূর্ব-রশ্মি' নামে একটা Kolkhoz বা ঐকত্রিক খেত দেখতে গিয়েছিলুম। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে এর কাজ শুরু হয়। এখন দেড় হাজার পরিবারের ৫১০০ জন লোক মিলে এই ব্যাপার। এদের জমির পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ হেক্টর অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ বিঘা হবে। গম আলু, পেঁয়াজ, রসুন, কপি ও অন্যান্য সব্জির চাষ আছে। গমের খেত দেখলুম দিগন্তবিস্তৃত, কোথায় শেষ হয়েছে বোঝা যায় না। দেখলুম, সাড়ে সাত শ বিঘা জুড়ে একসঙ্গে আলুর খেত। সবই অবশ্য কলের লাঙলে চাষ হয়। বেশির ভাগ অন্যসব কাজও হয় কলে, বৈদ্যুতিক শক্তিতে। এ ছাড়া ফলের বাগান আছে পাঁচ শ। আর গোরু ভেড়া আর ঘোড়া, এইসব পশুশালা। কাজাকদেশটা ঘোড়ার জন্য বিখ্যাত। খুব সুন্দর দেখতে সব ঘোড়া। আর koumis নামে বিখ্যাত ঘোড়ার দুধ দিয়ে তৈরি পাতলা দইয়ের মতন জিনিসও চেখে দেখলুম।

কলখজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মোটামুটি কো-অপারেটিভের মতো। সারা বছরের কাজের উপরে

৪ রাশিয়ার চিঠি। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

খরচ-খরচা বাদে যা লাভ হয় তার খানিকটা অংশ থাকে কলখজের নতুন ঘরবাড়ি তৈরি বা কলকব্জা-সরঞ্জাম কেনবার জন্য, আর বাকি সমস্ত টাকা ভাগ করে দেওয়া হয় সারা বছরে যে যতটা কাজ করেছে সেই অনুপাতে। খোঁজ নিয়ে জানলুম যে, পুরো কাজ করে এমন লোকের মাসে গড়ে কলখজ থেকে আয় হয় নয় শ বা হাজার রুব্‌ল। কলখজের প্রতি পরিবারে সাধারণত স্বামী আর স্ত্রী দুজনেই কাজ করে থাকে। কাজেই প্রত্যেকটি পরিবারের কলখজ থেকে মাসে আয় হয় আঠারো শ বা দু হাজার রুব্‌ল। এর উপরে প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব বা খাস জমি আছে আধ হেক্‌টর— প্রায় চার বিঘা; আর প্রায় সকলেই নিজস্ব গোরু-ভেড়াও পালন করে। নিজেদের উৎপন্ন জিনিস ওরা নিজেরাই বিক্রি করে, আর তার থেকেও বেশ খানিকটা রোজগার করে। কাজেই একটা চাষী পরিবারের গড়ে মাসে দু হাজার বা আড়াই হাজার রুব্‌ল আয় হয়। কারখানায় কাজ করে এমন একটা পরিবারের আয়ও এইরকমই। বরং চাষী-পরিবারের অবস্থাই একটু ভালো। চাষীর হাতেই নাকি এখন বেশি পয়সা।

কলখজের শিশুদের জন্য সাতটা বিদ্যালয় আছে, তার মধ্যে একটাতে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত পড়ানো হয়, যেমন শহরে। গ্রামেই আছে ডিস্‌পেন্সারি, ছোটো হাসপাতাল। তা ছাড়া কাছেই আল্‌মা-আতা শহর। কিন্তু যেসব গ্রাম শহর থেকে অনেক দূরে তার জন্যেও চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা আছে। মস্কো থেকে আসবার পথে সাত-আটটা এয়ার-পোর্টে দেখলুম অনেক ছোটো ছোটো অ্যাম্বুলেন্স-প্লেন তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলি ওড়ে একটু আস্তে, ঘণ্টায় নব্বই বা এক শ মাইল; আর খুব অল্প জায়গার মধ্যে উঠতে-নামতে পারে। খবর পেলেই এইরকম প্লেনে চড়ে ডাক্তার সুদূর গ্রামে চলে যায়, আর দরকার হলে রুগীকে কাছের কোনো শহরে নিয়ে আসে। সবই সরকারী খরচে। রুগীকে এক পয়সাও দিতে হয় না।

শিক্ষা আর চিকিৎসা সম্বন্ধে দেখলুম গ্রামের লোকেরা ঠিক শহরের লোকের মতই সবরকম সুযোগ-সুবিধা পায়। গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি তো আছেই। শহরের বড় লাইব্রেরি থেকেও গ্রামে গ্রামে বই পাঠানো হয়। যেমন মস্কোর বিখ্যাত লেলিন লাইব্রেরি থেকে গত বছরে তিন লক্ষ বই বাইরে ডাকে পাঠিয়েছে। এ ছাড়া সরকারী সিনেমা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। শুধু এক কাজাকস্থানেই এই রকম ভ্রাম্যমাণ সিনেমা আছে তিন শ।

কলখজের নানারকম ব্যবস্থা দেখলুম। যেমন নিজেদের ক্লাব। নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে, এখনো ছবি-আঁকা দরজায় রঙ দেওয়া চলছে। বড়ো বড়ো থাম দেওয়া একতলা বাড়ি। সামনের দিকে একটা বড়ো বারান্দা। তার পরে একটা বড়ো ঘর; তাতে চার শ লোক অনায়াসে একত্র হতে পারে। তার পাশে নাট্যমঞ্চ। খাটানো স্টেজ। অর্কেস্ট্রার জন্য জায়গা, তাতে পঞ্চাশ জন বাজাবার লোক বসতে পারে। আর পাঁচ শ লোকের জন্য বসবার আসন। এখানে ওদের অ্যামেচার অভিনয় নাচ গান সংগীত হয়। তা ছাড়া বাইরে থেকে সিনেমা আর নানারকম অপেরা, অভিনয়, গানের দলকে ভাড়া করে নিয়ে আসে। বড়ো বড়ো নামজাদা দলও মাঝে মাঝে এসে থাকে। ক্লাব-বাড়ির সামনে নানারকম খেলার ব্যবস্থা। খোলা আকাশের নীচে নাচবার জন্য একটা বড় নীচু কাঠের মঞ্চ। এইরকম আরো কত ব্যবস্থা।

দেখলুম যে, শিক্ষা চিকিৎসা আর সংস্কৃতি এই তিন বিষয়ে গ্রামের লোকদের জন্য শহরের

মতোই ব্যবস্থা করার চেষ্টা। গ্রাম আর শহরের মধ্যে কোনো ঐকান্তিক ভেদ যাতে না থাকে। নতুন শহরগুলির রাস্তায় রাস্তায় থাকবে গাছের সারি আর বাড়িতে থাকবে বাগান, সমস্ত শহর হবে সবুজ। আর অন্যদিকে প্রত্যেক গ্রামেই শিক্ষার ভালো ব্যবস্থা, বিদ্যালয়, লাইব্রেরি। চিকিৎসার ব্যবস্থা, ডিস্‌পেন্সারি, হাসপাতাল। আর নাচ, গান, সংগীত, অভিনয়, সিনেমা সবই পৌঁছিয়ে দেবে গ্রামের ভিতরে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী।··গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনোদিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।··রাশিয়ায় দেখেছি গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা। এই চেষ্টা যদি ভালো করে সিদ্ধ হয় তা হলে শহরের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধি নিবারণ হবে। দেশের প্রাণশক্তি চিন্তাশক্তি দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আপন কাজ করতে পারবে।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ এই কথা লিখেছিলেন একুশ বছর আগে। সুদূর কাজাকদেশের একটা ছোটো গ্রামে গিয়ে সেদিন স্পষ্ট দেখতে পেলুম যে এদেশে গ্রাম ও শহরের বৈপরীত্য এরা সত্যিই অনেক পরিমাণে ঘুচিয়ে এনেছে। গ্রামের লোকের কাছে সব রকম সুযোগ-সুবিধা এরা পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়ার জন্য আর এখন এদের লোভ থাকবে না। এই রকম করে এরা গ্রাম ও শহরের সভ্যতাকে মিলিয়ে দেবে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "রাশিয়ার স্মৃতি আজও আমার সমস্ত মন অধিকার করে আছে। তার প্রধান কারণ, অন্যান্য যেসব দেশে ঘুরেছি তারা সমগ্রভাবে মনকে নাড়া দেয় না। তাদের নানা কর্মের উদ্যম আছে আপন আপন মহলে। কোথাও আছে পলিটিক্স, কোথাও আছে হাসপাতাল, কোথাও আছে বিশ্ববিদ্যালয়, কোথাও আছে ম্যুজিয়ম— বিশেষজ্ঞরা তাই নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে সমস্ত দেশটা এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে, সমস্ত কর্মবিভাগকে এক স্নায়ুজালে জড়িত করে, এক বিরাট দেহ, এক বৃহৎ ব্যক্তিরূপ ধারণ করেছে। সব কিছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে।"[৬]

আল্‌মা-আতায় গিয়ে মনে হল, রাশিয়ায় নতুন করে সমাজ, নতুন করে দেশকে সৃষ্টি করার এই বিরাট উদ্যম দেখতে পেলেম তার একটা সমগ্র-রূপে। মস্কৌতে ফিরে এসে লেনিন-লাইব্রেরি থেকে ধার করে আনা 'রাশিয়ার চিঠি' আবার পড়লুম, আর বারে বারে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি। একুশ বছর আগে রাশিয়ায় কাজের সূচনা যখন সবে আরম্ভ হয়েছে বা হয় নি সেই সময়েই তাঁর কবির চোখে ভবিষ্যৎ-রাশিয়ার উজ্জ্বল ছবি কী স্পষ্ট করেই তিনি দেখেছিলেন। একুশ বছর পরে মস্কৌতে বসে বসে বারে বারে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করলুম আর তাঁর চোখের দেখা দিয়ে দেশটাকে দেখতে পেলেম।

মস্কৌ। জুলাই ১৯৫১

---

৫ রাশিয়ার চিঠি। উপসংহার

৬ রাশিয়ার চিঠি। ৩ অক্টোবর ১৯৩০

জাতীয়তার উন্মেষে সাময়িক পত্র

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

পূর্ব প্রবন্ধে[১] সিপাহী-যুদ্ধের সময় পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বাংলার পত্র-পত্রিকার অবদানের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। সিপাহী-যুদ্ধকালে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যেরূপ সাহস ও স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে বাঙালীদের উপর আরোপিত অপবাদের ক্ষালন করিয়াছিলেন তাহাও আমরা দেখিয়াছি। ইহার দুই বৎসরের মধ্যেই বাংলার জনসাধারণ একটি ব্যাপারে শ্বেতকায় সমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলনে লিপ্ত হয়। নীলকরগণ মফস্বল অঞ্চলে, যশোহর নদীয়া ফরিদপুর ঢাকা ময়মনসিংহ পাবনা রাজশাহী দিনাজপুর মালদহ প্রভৃতি জেলায়, নীলচাষ ব্যপদেশে দীর্ঘকাল নীলচাষী রায়তদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন চালায়। প্রজাগণ ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হইয়া অবশেষে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে জোট বাঁধিয়া নীলকরদের অত্যাচারে বাধা দিতে সংকল্প করে। 'মৃত্যুও স্বীকার, তবু আর নীল বুনিব না'— এই হইল তাহাদের প্রতিজ্ঞা। নীলচাষীদের এই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 'নীল-বিদ্রোহ' বলিয়া আখ্যাত করিতেও ছাড়েন নাই। আর নীলচাষীদের শায়েস্তা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা নানারূপ মিথ্যা ছল-চাতুরীর আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহারা যে নীলকর-সমাজের বন্ধু ও সহায়ক ছিলেন একথা বলাই বাহুল্য।

এক দিকে নীলকর, অন্য দিকে জেলার শাসক ম্যাজিস্ট্রেট, উভয়ের চাপে পড়িয়া 'বিদ্রোহী' কৃষকগণ 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রব ছাড়িল। ইহার উপর সরকার ১৮৬০ সনের মার্চ মাসে এই মর্মে এক আইন জারি করিলেন যে, চুক্তিভঙ্গকারী রায়তদের ফৌজদারী আইনে দণ্ড দেওয়া হইবে। এই আইনের দ্বিতীয় অংশে নীলচাষের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য এক নীল-কমিশন গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তী মে মাসে নীল-কমিশন গঠিত হইল। তাঁহারা অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই সময় নীলকর ও জেলা-শাসকের অনাচার যেন চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। অধিকাংশ সংবাদপত্রই তখন ইংরেজ-পরিচালিত। তাহারা স্বভাবতঃই নীলকরদের সপক্ষ। এই সময় 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় অসহায় কৃষক-কুলের পক্ষে দাঁড়াইলেন। বিভিন্ন জেলা হইতে অত্যাচারের কাহিনী সম্বলিত পত্র পেট্রিয়টে প্রকাশিত হইতে লাগিল। নদীয়া ও যশোহরে যে-সকল অকথ্য অত্যাচার চলিতেছিল তাহার কথা বিভিন্ন পত্রের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল। নদীয়া-কৃষ্ণনগর হইতে কয়েকখানি পত্র লেখেন পরবর্তী কালের বিখ্যাত নেতা ও জনসেবক ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ[২] এবং যশোহর হইতে লেখেন 'অমৃত বাজার

---

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা। কার্তিক-পৌষ ১৩৫৮

২ মনোমোহনের জীবনীকার রামগোপাল সান্যাল লিখিয়াছেন, "Mr. Manomohun, who as a citizen of Krishnaghur, had ample opportunity of knowing the hardships and oppressions committed upon them of the Indigo Planters, used to write almost every week, long letters to that journal [*The Hindu Patriot*] on this all-absorbing topic of the day,"—*General Biography of Bengal Celebrities both living and dead* —Ramgopal Sanyal, p. 19. (1889.)

পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ।[৩] বলা বাহুল্য, উভয়েই ছদ্মনামে লিখিতেন। শিশিরকুমারের পত্রসমূহের অনেকগুলির নিম্নে স্বাক্ষর থাকিত "M. L. L."। উভয়েই তখন অল্পবয়স্ক যুবক।

পেট্রিয়ট-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীল-আন্দোলনের সপক্ষতা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ইহাকে সুপথে পরিচালনা করিবার জন্যও অনেক সময় উপদেশ দিতেন। নিজ পত্রে সপ্তাহের পর সপ্তাহ 'ইণ্ডিগো ডিস্ট্রীক্ট্‌স' স্তম্ভে নীলচাষীদের দুঃখের কথা ব্যক্ত করিতেন। ১৮৬০, ১৯শে মে তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নীলচাষীদের এই অভ্যুত্থানকে অভিনন্দিত করিয়া তিনি যে প্রবন্ধ লেখেন তাহা বাংলার রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিবে। প্রবন্ধ-শেষে তিনি বলেন:

The revolution has caused the Ryot Community a vast mass of suffering. They have been beat, insulted, bound, starved, imprisoned, ousted from home, deprived of their property, subjected to every form of oppression one can imagine. Villages have been burnt, men carried off. women violated, stores of grain destroyed, and every means of coercion has been used. Yet the Ryots have not yielded ; they have not ceased to aspire after the freedom which they feel to be their birth-right and which they have been told the law assures them. Let them but suffer on a few weeks more, and they will gain their darling object. A revolution will have been effected in their social condition, the beneficial effects of which will reach all the country's institutions. The defects of our laws, the vices of our courts, the inefficiency of our police, the oppression systematically practised by some classes, and the general prevalence of anarchy will have been exposed in a manner never hitherto made—in a manner which will make reform inevitable.

ভীষণ অত্যাচার-অনাচারের মধ্যেও কৃষকেরা যে অবনমিত হয় নাই, বরং নিজেদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে, ইহাতে 'পেট্রিয়ট' সম্পাদক এই আশাই পোষণ করিয়াছিলেন যে, এ বিপ্লবের ফলে বাঙালী জাতির চেহারা বদলাইয়া যাইবে, দেশের সমুদয় প্রতিষ্ঠানই বিশোধিত হইবে। আইনের ফাঁক, আদালতের দুর্নীতি, পুলিশের অকর্মণ্যতা, শ্রেণীবিশেষের অকথ্য অনাচার এবং অরাজকতার প্রাবল্য এমন ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িবে যে, তৎসমুদয়ের সংস্কার না হইয়াই পারিবে না। পেট্রিয়ট-সম্পাদকের এই আশা যে কার্যে রূপায়িত লইয়াছিল, পরবর্তী ইতিহাস তাহারই সাক্ষ্য দেয়। নীল-বিপ্লব বা আন্দোলনের মত সত্যকার 'জাতীয়' আন্দোলনকে সমর্থন ও নিয়মিত করিতে

রামগোপাল সান্যাল উক্ত পুস্তকের ৮৮ পৃষ্ঠায় নীল-আন্দোলন বিষয়ে 'পেট্রিয়টে'র পত্র-লেখক রূপে মনোমোহন ঘোষ ব্যতীত নীলদর্পণকার দীনবন্ধু মিত্র, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নদীয়ার ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার) এবং গিরিশচন্দ্র বসুরও (কৃষ্ণনগরের দারোগা) নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

৩ প্রবাসী, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৫৮ সংখ্যায় শিশিরকুমার ঘোষের পত্রাবলী সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

গিয়া হরিশ্চন্দ্র নিজেও কম বিপন্ন হন নাই। ঐ সময়ের কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ'ও নীল-আন্দোলনের পোষকতা করিয়াছিল। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, মফস্বলের খ্রীস্টান মিশনারীরাও অনেকে প্রজাদের পক্ষ লয়েন।

২

প্রজাবন্ধু হরিশ্চন্দ্রের অকাল-বিয়োগে (১৬ই জুন ১৮৬১) 'হিন্দু পেট্রিয়েটে'র উপরে নীলকরদের প্রকোপ পড়ে। পরিচালনা-ভার হস্তান্তরিত হইয়া কাগজখানি এই সময় কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। সেযুগের বিখ্যাত সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় যথাক্রমে 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন' নামক মাসিক ১৮৬১ সনে ফেব্রুয়ারি মাসে এবং 'বেঙ্গলী' নামে সাপ্তাহিক ১৮৬২ সনের ৬ই মে তারিখে প্রকাশিত হয়। এ দুইখানি পত্র-পত্রিকা জাতীয়তাবাদ প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু 'পেট্রিয়টে'র ন্যায় জনসাধারণের পক্ষপাতী পত্রিকার অভাব অনুভূত হইতেছিল। এই অভাব কথঞ্চিৎ নিরাকৃত হয় ১৮৬২, ১লা আগস্ট তারিখে প্রকাশিত পাক্ষিক 'ইণ্ডিয়ান মিরর' দ্বারা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে কৃষ্ণনগরের প্রজাদরদী যুবক মনোমোহন ঘোষ এই পত্রিকাখানির সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত সহকর্মী ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন ইহার বৈষয়িক দিক দেখাশুনা করিতেন। মনোমোহন ঘোষ বিলাত গমন করিলে পত্রিকাখানির দায়িত্ব কেশবচন্দ্র নিজেই সম্যক্ লইলেন। সম্পাদকীয় কার্যে নরেন্দ্রনাথ সেন সাহায্য করিতে থাকেন। তিনি পরে ইহার সম্পাদক হন। ১৮৬৫ সনে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতানৈক্য উপস্থিত হওয়ায় কেশবচন্দ্র স্বতন্ত্র ভাবে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অর্থ-সাহায্যে নবগোপাল মিত্র 'ন্যাশনাল পেপার' নামক সাপ্তাহিক ৭ই আগস্ট ১৮৬৫ তারিখে প্রকাশ করিলেন। এই 'নাশনাল পেপার' হইতেই আমাদের জাতীয় জীবনে এক নূতন অধ্যায় সূচিত হয়।

মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তথাকার শিক্ষিত অধিবাসীদের মধ্যে মাদকদ্রব্য পরিহার, পরস্পর মেলামেশার সুষ্ঠু ব্যবস্থা, জাতীয় আচার-আচরণ পোশাক-পরিচ্ছদের পুনঃপ্রচলন প্রভৃতি নানা বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম সহকর্মী; জাতীয় ভাবাদর্শ তাঁহাতে যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। তিনি মেদিনীপুরে উক্ত উদ্দেশ্যে যে সভা স্থাপন করেন তাহার নাম দেন 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'। এই সভার কার্যক্রম একখানি ইংরেজী অনুষ্ঠানপত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি প্রচারার্থ কলিকাতায় প্রেরণ করেন। নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশনাল পেপারে' ইহা প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৭৮৭ শক, চৈত্র) এটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেন। এ সম্বন্ধে তখনকার নানা পত্র-পত্রিকাতে আলোচনাও দেখিয়াছি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বা স্বাদেশিকতার একখানি 'চার্টার' বা সনন্দ এই অনুষ্ঠানপত্রখানি। ইহার দুইটি ভাগ: একটি বহিরঙ্গ, অপরটি অন্তরঙ্গ। স্বকীয় আচার-আচরণ, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, আহার-পদ্ধতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়াম-কুস্তী ইত্যাদি সংস্কারান্তর পুনঃস্থাপন সম্পর্কে আলোচনা উহার বহিরঙ্গের অন্তর্ভুক্ত; অন্তরঙ্গের দিকে রহিয়াছে— আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান, সংগীতবিদ্যা কৃষি শিল্প প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন ও পুনঃপ্রচলনের বিষয়। নবগোপাল মিত্রও

'ন্যাশনাল পেপারে' এই বিষয় লইয়া আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন, এই অনুষ্ঠানপত্রের ভাব লইয়া নবগোপাল হিন্দুমেলা স্থাপন করেন।

বস্তুতঃ উপরি-উক্ত বিষয়সমূহ সম্মুখে রাখিয়াই আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে হিন্দুমেলা ১৮৬৭ সনের ১২ই এপ্রিল সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পনর বৎসর পর্যন্ত ইহার কাজ সমানে চলিয়া তৎকালীন ভারত-সভা প্রবর্তিত জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে লীন হইয়া যায়। হিন্দুমেলা 'জাতীয় মেলা' নামেও আখ্যাত হইয়াছিল। সত্যসত্যই ইহা সর্ব বিষয়ে জাতীয় আদর্শ ই প্রচার করিত। 'জাতীয়' সাহিত্য, 'জাতীয়' সংগীত, 'জাতীয়' নাট্যশালা, 'জাতীয়' বিদ্যালয়, 'জাতীয়' ব্যায়ামশালা, 'জাতীয়' সভা, 'জাতীয়' শিক্ষা প্রবর্তনে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রেরণা জোগাইয়াছে হিন্দুমেলা, বা জাতীয় মেলা। তখনকার দিনের কি প্রাচীন কি প্রগতিশীল, কি ধীরপন্থী কি উগ্রপন্থী সমুদয় পত্র-পত্রিকাই হিন্দু মেলার আদর্শ প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তবে নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশনাল পেপার'ই ছিল হিন্দুমেলার মুখপত্র। ইহার ইংরেজী বিশুদ্ধ ছিল না, সুপাঠ্য তো ছিলই না। তথাপি জাতীয় আদর্শ প্রচারে 'ন্যাশনাল পেপারে'র কৃতিত্ব ছিল অপরিসীম ও অনন্যতুল্য। পত্রিকাখানির সপ্তবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে নবগোপাল যাহা লেখেন তাহা মোটেই অতিরঞ্জিত নহে। তাঁহার কথায়—

It is a sufficient consolation to us to think that since we have begun our career, a great change has taken place in the minds of the educated youths of Bengal. The tide of denationalisation has sustained an ebb· · People have begun to disbelieve in the theory that for a nation's progress they have simply to learn the art of borrowing. They have begun firmly to believe in the doctrine that to secure everlasting good to themselves, they should have a basis of their own.

It is a still greater cosolation to us to think that since we have begun our career, a great movement has found its footing here— we mean the great movement of National Gathering, which has roused the sleeping energies of the people and stimulated their physical activity, which has afforded an impetus to the advancement of our national art and industry and which, should God grant it a long life, will doubtless bring an incalculable amount of good to our countrymen.[৪]

এখানে যে 'ন্যাশনাল গ্যাদরিঙে'র কথা বলা হইল তাহাই জাতীয় মেলা। দূরদূরান্ত হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আসিয়া ইহাতে যোগদান করিতেন। এই হিসাবে ইহা কংগ্রেসের পূর্বজ। ইহার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল— স্বদেশী শিল্পের প্রদর্শনী ও ব্যায়াম প্রদর্শন।

৪ *The National Paper*, August 7, 1872 হইতে বর্তমান লেখক কর্তৃক 'জাতীয়তার নবমন্ত্র' পুস্তকে উদ্ধৃত।

৩

রাজনীতি জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু জাতীয়তাই রাজনীতি নহে। ইহার গতি-প্রকৃতি কতকটা ভিন্ন ধরনের। 'ন্যাশনাল পেপার' হিন্দুমেলার মুখপত্ররূপে জাতীয়তার উন্মেষেই প্রয়াসী হইয়াছিলেন। রাজনীতির ছলাকলার মর্মভেদ করিয়া শাসকের অভিপ্রায় এবং শাসিতের ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণ করিতে অন্যরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ইহাতে সুদক্ষ ছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান মিররে'ও রাজনীতির আলোচনা চলিত নিয়মিত ভাবে। বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া 'সোমপ্রকাশ'ই (১৫ই নবেম্বর ১৮৫৮) প্রথম রাজনীতির আলোচনা শুরু করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার' নামীয় মাসিক পত্রে শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিষয়ক প্রবন্ধাদি ছাড়াও এবম্প্রকার রাজনীতির আলোচনা আর-এক ধাপ অগ্রসর হয়। তখনই যে শাসক ও শাসিতের মধ্যে জাতিবৈরিতা প্রকট হইয়া উঠিতেছিল, শিক্ষা-দর্পণের একাধিক প্রবন্ধে তাহার আভাস আমরা পাই। বাস্তবিক পক্ষে সেযুগের পত্র-পত্রিকার মধ্যে শিক্ষাদর্পণেই সর্বপ্রথম 'জাতিবৈরিতা' কথাটির উল্লেখ পাইতেছি। ইহাই পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'জাতি-বৈর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শিক্ষাদর্পণের প্রবন্ধাদিতে রাজনীতির আলোচনা সম্পূর্ণ স্বাদেশিকতার ভিত্তিতেই করা হইত। সহপাঠী রাজনারায়ণ বসুর অনুষ্ঠানপত্র-খানিকেও ভূদেব স্বাদেশিকতার মাপকাঠিতে যাচাই করিয়া সম্পূর্ণ উপযুক্ত মনে করিতে পারেন নাই।

এইরূপ আলোচনার ভাষা ব্যঞ্জনা ধরন-ধারণ ইহার পরে প্রকাশিত একখানি সাপ্তাহিকের মধ্যেই বিশেষ ভাবে অনুসৃত হইতে দেখি। বস্তুতঃ প্রতিষ্ঠাবধি ইহার মধ্যেই জাতিবৈরিতা যেন স্পষ্ট রূপ পাইয়াছিল। এই পত্রিকাখানির নাম 'অমৃত বাজার পত্রিকা'। ১৮৬৮ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারি যশোহরের অন্তর্গত পোলো-মাগুরা (পরে, অমৃত বাজার) গ্রাম হইতে শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় বাংলা সাপ্তাহিকরূপে ইহা বাহির হয়। শিশিরকুমার একসময়ে ভূদেবের বিশেষ অনুগ্রহ ও প্রীতি লাভ করিয়া-ছিলেন। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' প্রথম বর্ষে সম্পূর্ণ বাংলা ছিল। প্রথম প্রস্তাবেই পত্রিকা লিখিলেন :

"আমাদের বিশেষ যত্ন থাকিবে যে, যে স্বার্থশূন্য মহাত্মা ইংরাজ বাহাদুরেরা আমাদের দেশ, পরম অত্যাচারি যবন অধিকার হইতে স্বীয় হস্তে লইয়া আমাদের এত উন্নতি করিয়াছেন— যাহারা কেবলমাত্র আমাদের হিত ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, রাজ্যশাসনের ন্যায় অতি ক্লেশকর ও কঠিন কার্য্যে আমাদিগকে হস্তক্ষেপণ করিতে দেন না, তাহাদিগের রীতি, নীতি, উদ্দেশ্য, স্বার্থশূন্যতা, ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের নিকট যে ঋণপাশে আবদ্ধ আছি, তাহা পরিশোধের যত্ন করি।"[৫]

এই উক্তির অন্তর্নিহিত শ্লেষ বিশেষ লক্ষণীয়। ইংরেজ রাজপুরুষদের অপকীর্তির কথা প্রকাশ করিতে গিয়া পত্রিকা শীঘ্রই তাঁহাদের কোপদৃষ্টিতে পতিত হন। সেই সময়, ৯ই জুলাই সংখ্যায় পত্রিকার আদর্শ এইরূপ ব্যক্ত হইল :

"বলের দ্বারা সত্য লুকাইয়া রাখা আর কাপড় দিয়া আগুন বাঁধার চেষ্টা সমান। আমরা প্রায়ই স্পষ্ট কথা বলি। যে ঘটনা যে রকম তাহা সাধারণকে স্পষ্ট করিয়া দেখাই। কাহার অনুরোধে কিংবা কাহাকে বিরক্ত করিবার ভয়ে কোমল করিয়া লিখি না। ফল আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কর্তৃপক্ষকে প্রার্থনা

৫ বর্তমান লেখকের "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" (১৩৫৪), পৃ ১৪ দ্রষ্টব্য। পরবর্তী উদ্ধৃতিটিও ইহা হইতে গৃহীত।

করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় ; আমাদের দেশীয়েরা কিরূপ অবস্থায় আছেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কিরূপ হীনাবস্থায় আছেন তাহা তাঁহাদিগকে দেখানই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা ফটগ্রাফার মাত্র। সামাজিক ও রাজনৈতিক ফটোগ্রাফ লইয়া আমরা এদেশীয়দিগকে দেখাইয়া থাকি, যদি ফটোগ্রাফি তুলিতে এরূপ ছবি উঠে যে, কেহ অন্যের মুখের ভাত কাড়িয়া খাইতেছে ; বলবান দুর্ব্বলের গলা টিপিতেছে ; অভদ্র অপমান করিতেছে ; একজনের ন্যায্য স্বত্ব অন্যকে দেওয়া হইতেছে ; বিচারক অবিচার করিতেছেন, তবে আমাদের হাত কি ?"

'পত্রিকা'র শিরোভূষণ হইতেও তাহার উদ্দেশ্য কতকটা ধরা যায়। ১৮৬৮, ৭ই মে হইতে কিছুকাল প্রতিসংখ্যায় এইরূপ শিরোভূষণ ছিল :

"অধীনতা কালকূটে মরি হায় হায়।
করেছে কি আর্য্যসুতে চেনা নাহি যায়॥"

বিধবা বিবাহ, সমাজ-সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা পত্রিকায় স্থান পাইলেও রাজনীতিই ছিল ইহার মুখ্য আলোচ্য বিষয়। আর ইহার নিরিখে সকল বিষয় যাচাই করিয়া কোন্‌টি জাতির পক্ষে মঙ্গলকর, কোন্‌টি অমঙ্গলকর তাহা পত্রিকা নির্ণয় করিতেন। হিন্দুমেলা পত্রিকার পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়াছিল। শাসকবর্গের কার্য-কলাপের কঠোর সমালোচনা করিলেও, রচনাত্মক কার্যাদির নির্দেশেও এখানি বিশেষ তৎপর ছিলেন। ষষ্ঠ দশকের শেষদিকে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কোনো কোনো নেতা ভারতবর্ষে বিলাতের আদর্শে পার্লামেন্টারী বা প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয় ব্যক্ত করেন। পত্রিকা ১৮৭০ সনে তিনটি ইংরেজী প্রবন্ধে (Parliamentary Government in India) প্রমাণাদি প্রয়োগে দেখাইলেন যে, ভারতবর্ষে আশু প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রবর্তিত না হইলে ভারতবাসীর উন্নতির আশা নাই। শাসক এবং শাসিতের স্বার্থ এতই বিভিন্ন যে, একের দ্বারা অন্যের মঙ্গল সাধন কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। শাসক জাতির উপর নির্ভর করিলে কোনোদিনই আমাদের সত্যকার কল্যাণ সাধিত হইবে না। 'পত্রিকা'র এই মতবাদকে অত্যধিক উগ্র বলিয়া তখন কেহ কেহ ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু কালে তাহার উক্তিই যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

'পত্রিকা' প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কিভাবে এ প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করা যায় তাহারও উপায় নির্ণয় করিলেন। এদেশে বেসরকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে সেখানে আমরা সংঘবদ্ধভাবে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কার্য্য করিতে শিক্ষা লাভ করিব। ষষ্ঠ দশক হইতেই মফস্বলে— ঢাকা মুর্শিদাবাদ বর্ধমান রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। সপ্তম দশকে আরও নানা জেলা সহরে পত্র-পত্রিকা বাহির হইল। ঐ ঐ অঞ্চলে যাহাতে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াও স্থানীয় লোকেরা রাজনীতি চর্চায় অগ্রসর হন 'পত্রিকা' তাহার প্রস্তাব করিলেন। 'পত্রিকা'র পক্ষে শিশিরকুমারের অগ্রজ হেমন্তকুমার ঘোষ বিভিন্ন জেলা শহরে ও বর্ধিষ্ণু গ্রামে গিয়া রাষ্ট্রীয় সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রেরণা জোগাইলেন। দেখিতে দেখিতে ঢাকা ফরিদপুর বরিশাল কৃষ্ণনগর বহরমপুর রাজশাহী বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় সভা স্থাপিত হইল। এইসকল সভাকে একই সূত্রে গ্রথিত করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় সভা প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব করিলেন 'অমৃত বাজার পত্রিকা'। এই সময় জাতির স্বার্থহানিকর আইনসমূহ একে একে বিধিবদ্ধ হইতে থাকে।

কর্তৃপক্ষের হুমকিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মচ্যুত হইলেন, বরোদার গাইকয়াড়ও গদি হইতে অবসৃত হন। এইসকল বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে আন্দোলন পরিচালনার জন্যও একটি কেন্দ্রীয় সভা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে লাগিল। ইহারই ফল— 'পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ-প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান লীগ' (২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৫) এবং আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতসভা (২৬শে জুলাই ১৮৭৬)। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' প্রথম হইতেই এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী হইয়াছিলেন বলিয়া এখানে ইহার কথাই বেশী করিয়া বলা হইল। 'সাধারণী', 'সহচর', 'প্রতিধ্বনি' প্রভৃতি পত্রিকাও এ বিষয়ে কম উৎসাহী ছিলেন না।

৪

এখন আবার একটু পিছাইয়া আসা যাক। শিক্ষিত সাধারণকে সংঘবদ্ধ করিয়া স্বোপার্জিত বিদ্যাবুদ্ধি দেশের সেবায় লাগানোই ছিল ঐসকল পত্র-পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মূক গ্রামবাসী জনসাধারণের কথা কে বলিবে? নারীজাতির উন্নতির বিষয়েই বা কে মাথা ঘামাইবে? ষষ্ঠ দশক হইতেই জাতীয় উৎকর্ষের অত্যাবশ্যক উপায়রূপে কোনো কোনো শিক্ষিত মণ্ডলী এ দুইটির দিকে অভিনিবিষ্ট হইলেন। বামাবোধিনী সভা কর্তৃক উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় মাসিক 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (আগষ্ট ১৮৬৩) এবং ফরিদপুরের লোনসিংহ হইতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পাক্ষিক 'অবলা-বান্ধব' (২২শে মে ১৮৬৯) প্রকাশে নারীজাতির মধ্যে জ্ঞান প্রচারের বিশেষ উপায় হয়। হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) ১৮৬৩ সনের এপ্রিল মাসে কুমারখালি গ্রাম হইতে 'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা' শীর্ষক একখানা মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 'গ্রামবাসী প্রজারা যে যে-যে ভাবে অত্যাচারিত হইতেছে, তাহা পার্লামেণ্টের কর্ণগত করিলে, অবশ্যই তাহার প্রতিকার এবং তাহাদিগের নানাপ্রকার উপকার সাধিত হইবে"— এই উদ্দেশ্যে হরিনাথ উক্ত পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু হরিনাথের এই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সরকার কর্তৃক অত্যাচারের প্রতিকার সাধনে দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল। ১৮৭২-৭৩ সনে পাবনায় যে প্রজা-বিদ্রোহ হয় তাহা এইরূপ অন্যায় অত্যাচারেরই প্রতিক্রিয়া। তখন জেলার শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষ জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের এইরূপ বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করিলেও শেষ পর্যন্ত তাঁহারাও বাঁকিয়া বসেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' "সাম্যের" অন্তর্গত প্রবন্ধ নিচয়ে এবং সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের "Arcyde" ছদ্মনামে রেভাঃ লালবিহারী দে'র 'দি বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' প্রজার স্বার্থরক্ষার বিষয় আলোচনা করিয়া শিক্ষিত সাধারণের এবং উচ্চ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ইহার দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত শ্রমজীবী' শীর্ষক একখানি মাসিক (মে ১৮৭৪) শ্রমজীবীদের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত করেন। তাহাদের মধ্যে সংস্কারমূলক কার্যাদি পরিচালনাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার' বাংলায় সংবাদপত্র-জগতে যুগান্তর আনয়ন করে। এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ইতিপূর্বে আর বাহির হয় নাই। সাধারণের মধ্যে জ্ঞান ধর্ম বিস্তারই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার শিরোভূষণ ছিল এই :

"ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে কিন্তু ঘটে উঠা দায়।

জ্ঞান ধর্ম্ম চাও যদি অবারিত দ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।"

অতি সরল ভাষায় প্রস্তাবাদি লিখিত হওয়ায় স্বল্পশিক্ষিত লোকের পক্ষেও ঐসব বুঝা কঠিন হইত না। রাজনীতিতে মধ্যপন্থী হইলেও জাতীয় উন্নতিমূলক বিবিধ কার্যের ইহা সমর্থন করিতেন। কেশবচন্দ্রের ভারত-সংস্কার সভার মুখপত্ররূপে ইহা সেবা-শিক্ষা-সাহিত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের আলোচনায় পূর্ণ থাকিত। জাতিগঠনের কার্যে 'সুলভ সমাচার' অত্যন্ত সহায় হয়।

একটু আগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র উল্লেখ করিয়াছি। বৈশাখ ১২৭৯ বঙ্গাব্দে এখানি মাসিকপত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার প্রকাশ হইতে আমাদের জাতীয় জীবনে এক নবযুগের সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল।" বাঙালীর মনের কথা এত সোজা করিয়া আর কে বলিতে পারিত? বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় পত্র-সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন :

"· ·বাঙ্গালি কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালি অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্ এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালি হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি, বা ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃতসিংহের ধর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিব না। গিলটি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্য নারী জীবনযাত্রার সহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালি স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক, সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালির সমুদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই।· ·

"সমগ্র বাঙ্গালির উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্‌কালে বুঝিবে এ মত প্রত্যাশা করা যায় না।· ·সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোনকালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।· ·"

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা শুরু করিয়া দিলেন। 'বঙ্গদর্শন'কে কেন্দ্র করিয়া যে গোষ্ঠী তৈরী হইতেছিল তাঁহারা প্রত্যেকেই মাতৃভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ বাংলাভাষাকে আশ্রয় করিয়া ফুলে ফলে সুশোভিত হইবার সুযোগ পাইল। তখনকার আকাশে বাতাসে যেসকল জাতীয় ভাবাদর্শ লুটোপুটি খাইতেছিল 'বঙ্গদর্শনে' তাহা একে একে কায়া পরিগ্রহ করিয়া সাধারণের ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসিয়া পড়িল। বঙ্কিমগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়া হইতে ১১ই কার্তিক ১২৮০ বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক 'সাধারণী' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যায়ই 'জাতি-বৈর' শীর্ষক প্রবন্ধে শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন :

"মানুষের স্বভাবই এমন নহে যে বিজিত হইয়া জেতার প্রতি ভক্তিমান হয় অথবা তাহাদিগকে হিতাভিলাষী নিস্পৃহ মনে করে এবং জেতাও কখনই বল প্রকাশে কুণ্ঠিত হইতে পারে না। কেননা

আমরা প্রাচীন জাতি, অদ্যাপিও মহাভারত রামায়ণ পড়ি, মনু যাজ্ঞবল্কের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতে অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা করি। যতদিন এসব বিস্মৃত হইতে না পারিব ততদিন বিনীত হইতে পারিব না, মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতি-বৈর আমাদের প্রকৃত অবস্থার ফল— যতদিন দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, যতদিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্ব-গৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতি-বৈরের শমতার সম্ভাবনা নাই। এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে।"

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সমসময়ে নাট্যকার মনোমোহন বসুর সম্পাদনায় 'মধ্যস্থ' সাপ্তাহিক আকারে বাহির হয় (২রা বৈশাখ ১২৭৯)। দ্বিতীয় বর্ষে অগ্রহায়ণ মাস হইতে ইহা মাসিকে পরিণত হয়। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 'আর্য্যদর্শন' মাসিকপত্র প্রকাশ করেন বৈশাখ ১২৮১ বঙ্গাব্দ হইতে। এই দুইখানি পত্রিকাও স্বাদেশিকতার প্রতিমূর্তি ছিল। হিন্দুমেলার ভাব মনোমোহনের 'মধ্যস্থে' যেন মূর্তিমান হইয়া ধরা দিয়াছিল। 'আর্য্যদর্শন' এদেশে বিপ্লববাদ প্রচারের প্রথম পথপ্রদর্শক। ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডি, কাভুর প্রমুখ নব্য ইটালির নেতৃবৃন্দের বিপ্লবাত্মক জীবনী ইহাতে প্রকাশ করিয়া যুবক-মনে বিপ্লবাদর্শ দৃঢ়মূল করিতে তিনি প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে, শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'ভারতী' সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন ষোল আনা 'স্বদেশী' মানুষ; 'ভারতী'ও শিল্প-সাহিত্যাদির আলোচনার মধ্য দিয়া জাতীয়তা প্রচার আরম্ভ করিয়া দেন।

৫

বাংলা এ সময় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সমগ্র ভারতে অগ্রগণ্য ছিল, একথা লোকমান্য টিলক প্রমুখ ভিন্ন প্রদেশ-বাসীরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত বাংলা ইংরেজি সংবাদপত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশের অনাচার-অত্যাচারের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইত। ১৮৭১ সনের ওহাবী মোকদ্দমা হইতে ১৮৭৮ সনের আফগান যুদ্ধ পর্যন্ত তাঁহারা কোনোটিই প্রায় বাদ দেন নাই। ১৮৭৭-৭৮ সনে শাসনকর্তৃপক্ষের অনাচার যেন চরমে উঠিল। মাদ্রাজে ভীষণ দুর্ভিক্ষ, কিন্তু সেখানকার সাহায্যের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া ১৮৭৭ সনের জানুয়ারি মাসে দিল্লীর দরবারে তামাশায় সরকার অজস্র টাকা জলের মত খরচ করিলেন। আফগান যুদ্ধে ভারতবাসীর কি স্বার্থ? কিন্তু তাহাতেও ভারতীয় কোষাগার হইতে ব্যয় বরাদ্দ হইল। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া বাংলা ভাষায় পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলি নির্ভীকভাবে সরকারী কার্যের তীব্র সমালোচনা করিতে পূর্ব হইতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' অগ্রণী হইলেও, কলিকাতার 'সহচর' 'সাধারণী' ও 'সোমপ্রকাশ,' ঢাকার 'হিন্দু হিতৈষিণী' এবং ময়মনসিংহের 'ভারত-মিহির'ও কম যান নাই। ছোটলাট স্যর এশ্‌লি ইডেন দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদের ডাকাইয়া রীতিমত ধমকাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা নিরস্ত হইলেন না। 'পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষকে আলাদা ডাকাইয়া তিনি সমঝাইতেও চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে ভারত সরকারের

আইন-সভা ১৪ই মার্চ ১৮৭৮-এ একদিনের অধিবেশনেই 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' বা দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন পাশ করাইয়া লইলেন। কর্তৃপক্ষের নজর ছিল সকলের চেয়ে বেশী 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র উপর। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই বাংলা অংশ বর্জ্জন করিয়া শিশিরকুমার ইহাকে সম্পূর্ণ একখানি ইংরেজি কাগজে পরিণত করিয়া কর্তৃপক্ষের চক্ষে ধূলা দিলেন। 'সোমপ্রকাশ', 'সহচর' প্রমুখ কোনো কোনো কাগজের প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হইল। এই আইনের বিরুদ্ধে ভারত-সভা এদেশে ও বিলাতে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করেন। ১৮৮০ সনে বিলাতে সাধারণ নির্বাচনে মিঃ গ্লাডস্টোনের নেতৃত্বে উদারনৈতিক দল জয়লাভ করিলে এদেশে লর্ড রিপনকে বড়লাট করিয়া পাঠান হয়। রিপন অবিলম্বে এই আইন প্রত্যাহার করেন।

২১শে মার্চ ১৮৭৮ তারিখ হইতে প্রকাশিত 'ব্রাহ্ম পাব্লিক ওপিনিয়ন' জাতীয় আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখিলেন। ১লা জানুয়ারী ১৮৭৯ হইতে ভারত-সভার প্রধান উদ্যোক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেঙ্গলী' সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। তদবধি এই সাপ্তাহিকখানি ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সুষ্ঠু বিশ্লেষণে এবং অনাচার-অবিচারের তীব্র সমালোচনায় অগ্রসর হন। তখন ভারত-সভা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন উপস্থিত করেন তাহারও বিশেষ অনুপ্রেরণা দেন এই পত্রিকাখানি ১৮৮৩ সনে এক দিকে যখন ইল্‌বার্ট আন্দোলনের সূচনা হয়, অন্য দিকে 'বেঙ্গলী'পত্রে হাইকোর্টের বিচারপতি নরিসের বিচারকার্যের সমালোচনায় সুরেন্দ্রনাথ আদালত অবমাননার মামলায় জড়িত হইয়া পড়েন এবং দুই মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহা স্থায়ী রূপ লাভ করে প্রথমে 'জাতীয় সম্মেলনে' এবং পরে 'কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠায়।

এই সময় কলিকাতায় ভারতবাসীর রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে পর পর দুইখানি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। ১৮৮১ সনের ১০ই ডিসেম্বর 'বঙ্গবাসী' আত্মপ্রকাশ করে। সেযুগের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রগতিশীল লেখকগণের রচনায় অল্প কালের মধ্যেই এখানি সুধীসমাজের গ্রাহ্য হয়। রাজনীতিতে উগ্রপন্থী হইলেও সামাজিক বিষয়ের আলোচনায় ইহা ছিল রক্ষণশীল। প্রগতিশীল লেখকগণ ক্রমে ইহার সংস্রব ত্যাগ করিলেন। ইহার পরে ১৮৮৩ সনের ১৫ই এপ্রিল 'সঞ্জীবনী' নামে একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইল। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, গগনচন্দ্র হোম ও পরেশনাথ সেন একযোগে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে ইহা ভারত-সভার প্রগতিশীল মতবাদের সমর্থক ছিলেন। ৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৩—২২শ সংখ্যা হইতে সঞ্জীবনীর রচনাস্তম্ভের মধ্যে "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা"র একটি কাল্পনিক চিত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত হইতে থাকে। তখনকার প্রগতি মূলক জাতীয় আন্দোলনের ইহাই প্রতীক। কংগ্রেস-পূর্ব যুগে সমগ্র ভারতের জাতীয় আন্দোলনে তৎকালীন বঙ্গের পত্র-পত্রিকা কতখানি রসদ জোগাইয়াছে বর্তমান আলোচনা হইতে তাহা সহজেই অনুমেয়।[৬]

---

৬ এই অধ্যায়ের বাংলা সাময়িক-পত্র সংক্রান্ত কিছু কিছু তথ্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বাংলা সাময়িক-পত্র', ১ম ও ২য় খণ্ড, হইতে গৃহীত।

ভ্রম-সংশোধন। কার্তিক-পৌষ ১৩৫৮ সংখ্যা। পৃ ৯২ ছত্র ২৪। 'জেম্‌স ক্লার্ক মার্শম্যান' স্থলে 'জন ক্লার্ক মার্শম্যান' হইবে।

গ্রন্থপরিচয়

শাশ্বত বঙ্গ। কাজী আবদুল ওদুদ। প্রকাশক কাজী খুরশীদ বখ্‌ত, ৮বি তারক দত্ত রোড, কলিকাতা। মূল্য ৫৲, কাপড়ে বাঁধাই ৬।০।

জবাহরলাল তাঁর আত্মকাহিনী উৎসর্গ করেছেন এই বলে: 'কমলাকে, যে আর নেই'। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের প্রবন্ধসংকলনে উৎসর্গপত্র নেই, কিন্তু গ্রন্থের নামটাই উৎসর্গপত্র। শাশ্বত বঙ্গকে, যে আর নেই, অথচ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যার বন্দনা-গান করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যাকে ভালোবেসেছিলেন হাজার বছর ধরে যে ইতিহাসের ও ভূগোলের দৃষ্টিতে এক ছিল, এক ছিল হিন্দু-মুসলমানের চেতনায়, সে আর নেই, অথচ আছে জনকয়েক স্বপ্নদ্রষ্টার মানসে। তাঁরা হিন্দুও নন, মুসলমানও নন, তাঁরা প্রেমিক। তাঁরা ধ্যানী। তাঁদের বিশ্বাস তাঁরা ঘোষণা করে যাবেন, যদিও নিকটভবিষ্যতে ভাঙা দেশ জোড়া লাগবে না। জোড়া লাগবে কি সুদূর ভবিষ্যতেও? আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় ভার্জিনিয়া প্রদেশ দু ভাগ হয়ে যায়। গৃহযুদ্ধ কবে শেষ হয়েছে, নব্বই বছর পরেও দেখি পশ্চিম-ভার্জিনিয়া স্বতন্ত্র রয়ে গেছে। আশ্চর্য হব না, যদি পশ্চিম-বঙ্গের বেলা তাই হয়।

কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি কাজী সাহেবের 'গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে' পাঠ করে। এ প্রবন্ধ আগে আমার চোখে পড়ে নি। এর থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি—

"মুসলমান যদি সত্যই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে থাকে যে, যে কারণেই হোক হিন্দুর সঙ্গে তার মিল কোনো দিন হয় নি কোনো দিন হবেও না, তবে তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই তাদের দুই পক্ষের জন্যই ভাল। কিন্তু বিচ্ছিন্ন তাকে হতে হবে ন্যায়ানুমোদিত ও সার্থক পথে, অর্থাৎ দেশকে বিভক্ত করতে হবে এমনভাবে যাতে কোনো পক্ষেরই বেশী ক্ষতি না হয় আর দুই পক্ষেরই ভবিষ্যৎ যথাসম্ভব নিরাপদ হয়। বর্তমান যে-ব্যবচ্ছেদ মুসলমান চাচ্ছে তা যেমন অসংগত তেমনি বিপদসংকুল, তার কারণ, যে-হিন্দুকে মুসলমান বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না তারা প্রায় সমসংখ্যক রয়ে যাচ্ছে মুসলিম রাজ্যে। এর পরিবর্তে মুসলমানদের এমন বাসভূমির দাবি করা উচিত যেখানে অমুসলমান প্রায় কেউ থাকবে না, যারা থাকবে তারা থাকবে বিদেশী হিসাবেই। সেজন্য মুসলমানদের চলে যাওয়া উচিত ভারতবর্ষের এক প্রান্তে— ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তই এজন্য প্রশস্ত মনে হয়, যাঁরা পাকিস্তানের আদি উদ্‌ভাবয়িতা তাঁরাও এই ক্ষেত্রের কথাই ভেবেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যত মুসলমান নূতন বাসভূমির বাসিন্দা হতে চাইবে তাদের সবাইকেই সে-সুযোগ দিতে হবে। মুসলমানের এমন সংকল্প যদি হিন্দু ও জগৎ জানতে পারে তবে এর প্রতি তারা শ্রদ্ধান্বিত হবে মুসলমানের ঐকান্তিকতা ন্যায়বোধ ও ত্যাগস্বীকার দেখে। এর জন্য যদি মুসলমানকে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হয় তবে সেটিও জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। বলা বাহুল্য কেবল এমন একটা চরম ব্যবস্থার দ্বারাই হিন্দু আর মুসলমানের দীর্ঘকালের বিবাদের একটা সন্তোষজনক অবসান সম্ভবপর, অন্য ব্যবস্থায় বিচ্ছেদ পূর্ণাঙ্গ হবে না। তাই সামান্য কারণে বিবাদের সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়ে যাবে।"

এর পরে তিনি তাঁর সওয়াল পোর্সিয়ার মতো আরো পরিষ্কার করেছেন শাইলকের জন্যে—

"কিন্তু এমন চরম ব্যবস্থা কি ব্যাপকভাবে ভারতের মুসলমান কাম্য জ্ঞান করতে পারবে? মুসলিম নেতারা হিন্দুমুসলমান-বিরোধের যে-ছবি দেশের সামনে জগতের সামনে ধরেছেন তা যদি সত্য হয় তবে মুসলমানদের পারা উচিত, কেননা অন্য কোনো প্রশস্ত পথ নেই। যদি সবাই না পারে তবে যারা পারে তারা গিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে স্বাধীন রাজ্য গড়ুক। কিন্তু যারা পারবে না তাদের এর পরে আর হিন্দুমুসলমানের বিরোধের কথা মুখে আনা চলবে না, কেননা, হিন্দু ও মুসলমানের অতীত যাইই হোক, বোঝা গেল, মিলেমিশে না থেকে তাদের উপায় নেই। তাই এই মিলমিশের চর্চাই সম্মিলিত ভারতে করতে হবে একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। হিন্দুর মুসলিম-বিদ্বেষ আর মুসলমানের হিন্দু-বিদ্বেষ সেখানে শুধু নিন্দনীয় নয়, দণ্ডনীয় বিবেচিত হবে। আর নতুন সম্মিলিত ভারত গঠিত হবে সাম্যবাদের ভিত্তির উপরে: ধর্ম হবে ব্যক্তিগত ব্যাপার, ভারতবর্ষের নব-নাগরিকদের জাতিধর্মনির্বিশেষে বুঝতে হবে যে তাদের প্রাচীন ধর্মের একালের অর্থ ব্যাপক মনুষ্যত্ব-সাধন, তাই ধার্মিক হবার জন্যে তারা ফিরে যেতে চেষ্টা করবে না কোনো অতীত ব্যবস্থার দিকে, তাদের গতি হবে নব নব জ্ঞান ও কল্যাণ আহরণের অভিমুখে— সমস্ত জগৎকে সব মানুষের জন্য স্বর্গে পরিণত করার কাজে; অতীতের কোনো ধর্মব্যাখ্যা যদি এর পরিপন্থী হয় বুঝতে হবে তা ভুল ব্যাখ্যা।"

পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে ওদুদ সাহেব পূর্বপাকিস্তান সমর্থন করেন নি। তিনি তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তিনি বলেছেন, "আমাদের নবনেতাদের গভীর ভাবেই ভাবা উচিত বাংলার মুসলমানের সঙ্গে পঞ্জাবের মুসলমানের অঙ্গাঙ্গী যোগ ঘটাতে গিয়ে দুয়েরই বিকাশ ব্যাহত করার মতো মহা অনর্থ তাঁরা ঘটাবেন কি না। এর উপর রয়েছে বাংলার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থিতি— বাংলার অতিগুরু নদনদী-সমস্যা যার দিকে মহাপ্রাণ আবুল হুসেন বিশ বছর পূর্বে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, বাংলার বৈজ্ঞানিকেরাও যার দিকে দেশের শাসক ও জনসাধারণ সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ত্রুটি করছেন না। এই একটি সমস্যাই হয়ত দেশের সর্বসাধারণকে দেখিয়ে দেবে হিন্দুমুসলমান-বিরোধের মতো তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে যারা এতটা সময় ব্যয় করতে পারে তারা কত বড় কৃপার পাত্র।"

হায়, এই কৃপার পাত্ররাই তুচ্ছ ব্যাপারকে উচ্চ ব্যাপারে পরিণত করে ওদুদ সাহেবের প্রবন্ধ রচনার কয়েক মাস পরে। এ প্রবন্ধ ১৯৪৬ সালের মে মাসে লিখিত। তার পরে কলকাতার দাঙ্গা, নোয়াখালির হাঙ্গামা, বঙ্গব্যবচ্ছেদ, গান্ধীহত্যা। ইংরেজ বিশ বছর আগে থেকে তার পলিসি স্থির করে রেখেছিল। হিন্দু-মুসলমানে বোঝাপড়া হলেই সে ভারতের শাসনভার ছেড়ে দেবে। বোঝাপড়া এমনভাবে হবে যাতে বাঁদরের হাতে পিঠে ভাগের নিক্তি থাকে। তাই শেষ পর্যন্ত হল। ইংরেজ শাসনভার ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ব্যালান্স অব্ পাওয়ার নিজের হাতে রেখেছে। পাকিস্তান বলতে বোঝায় বাংলাদেশের বেশীর ভাগ। সেখানে বাঙালী বলে কেউ নেই। আছে পাকিস্তানী বলে নতুন একটা নেশন বা জাতি, ধর্মে মুসলমান। হিন্দু যারা আছে তারা সমান নাগরিক নয়, তারা জিম্মী। ভারত-রাষ্ট্রে পশ্চিম-বঙ্গ নামে একটি রাজ্য আছে, সেখানকার অধিবাসীরা হিন্দুমুসলমান-নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গীয়। এখনো তারা অভ্যাসবশত বাঙালী বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু কিছুদিন পরে 'পশ্চিম' বিশেষণটা তাদের

পরিচয়ের সঙ্গে জুড়ে যাবে। এক পুরুষ বা দু পুরুষ বাদে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ঐতিহ্য পর্যন্ত আলাদা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বাংলার ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার আত্মবিশ্বাস সব কিছুরই ঘটেছে রক্তাল্পতা। শাইলক এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে গিয়ে বহু পরিমাণ রক্তস্রাব ঘটিয়েছে। কেবল কায়িক অর্থে নয়, মানসিক অর্থেই বেশী। পোর্সিয়ার সওয়াল কোনো কাজে লাগে নি।

তা হলে কি আমাদের কোনো আশা নেই? আছে বৈকি। সেইজন্যেই তো এ গ্রন্থের নামকরণ 'শাশ্বত বঙ্গ'। ইতিহাস-ভূগোলের বাংলাদেশ আর নেই, একজোড়া বিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য গড়ে উঠছে; শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, বিরুদ্ধ। কিন্তু এহো বাহ্য। ভিতরে ভিতরে বাঙালীর সঙ্গে বাঙালীর একটা মিল আছেই, থাকবেই। সে মিল ধর্মগত নয়, মর্মগত। কাজী ইমদাদুল হক সাহেবের বিখ্যাত উপন্যাস 'আবদুল্লাহ্' সমালোচনা প্রসঙ্গে ওদুদ সাহেব লিখেছেন, "তবু আবদুল্লাহ্‌র মাতা, হালিমা ও রাবেয়ার অন্তরের যে মাধুর্যটুকুর সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচিত করিয়েছেন তা মনোরম। এই মুসলিম অন্তঃপুরিকাদের দিকে চাইলেই ভাল করে বোঝা যায়, বাংলার হিন্দু ও মুসলমান বাহ্যত যতই বিভিন্ন হোক বাস্তবিকপক্ষে তাদের বিভিন্নতা কত নগণ্য— নেই বল্লে হয়ত অত্যুক্তি হয় না।"

না, অত্যুক্তি হয় না। বাঙালীর মেয়ে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক তার স্বভাব ছাড়ে নি, ছাড়বেও না। গোলাপকে যে নামেই ডাক সে তেমনি মধুর। আমাদের মা-বোনের মুখের ভাষা কোনো দিন আরবী ফারসী হয় নি, সেই শাড়ীই পরে আসছে তারা বখ্‌তিয়ার খিলিজির আমলের আগে থেকে। পাকিস্তানী ডিকটেটরদের শস্ত্র ও শাস্ত্র এখানে ব্যর্থ। কোনো উপায়েই তারা আবদুল্লাহ্‌র মাতা, হালিমা ও রাবেয়াকে শরৎচন্দ্রের রমা বা বিন্দু বা পোড়াকাঠের থেকে আলাদা করতে পারবে না। তারা বাংলাদেশের হৃদয় পায় নি, পেয়েছে শরীরের একাংশ।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থে। কাজী সাহেবের কাছে এঁরা সকলেই সমান আপন। নজরুলের চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কম আপন নন। কিন্তু কাজী সাহেবের পরম শ্রদ্ধার পাত্র রবীন্দ্রনাথ ও পরম প্রীতির পাত্র নজরুল। তাঁর সমসাময়িকদের অধিকাংশের মনোভাব তাঁর অনুরূপ। তবে তাঁর নিজের পথ ঠিক রবীন্দ্রনাথের বা নজরুলের পথ নয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ওদুদ সাহেবের নিজস্ব একটা স্থান আছে ও থাকবে। একদা তিনি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন। এই আন্দোলন গোঁড়া মুসলমানদের উষ্মার কারণ হয়েছিল। ষাঁড়ের সামনে লাল রুমালের মতো। তাঁর দুঃসাহসিকতার জন্যে তিনি বিপন্ন হয়েছিলেন বলে জানি। কিন্তু তাঁর ভিতরকার সত্যাগ্রহী বিপদের কাছে নত হয় নি। হজরত মোহম্মদ ও মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টান্ত তাঁকে নিঃশঙ্ক করেছে। কিন্তু তাঁর 'বুদ্ধির মুক্তি' সাধনায় যে দু জন তাঁর গুরু বা মুর্শিদ তাঁদের নাম গ্যেটে ও রামমোহন। এঁদের সঙ্গে তিনি অভিন্নহৃদয়। এক হিসাবে এঁদেরই কাজ তিনি করে যাচ্ছেন। 'সম্মোহিত মুসলমান' শীর্ষক তাঁর একটি পুরাতন রচনার থেকে কিছু উদ্ধৃত করি—

"জীবনের অর্থই যেন আধুনিক মুসলমান বোঝে না। বুদ্ধি, বিচার, আত্মা, আনন্দ, এ সমস্তের গভীরতার যে আস্বাদ তা থেকে তাকে বঞ্চিত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। জগতের পানে সে তাকায় শুধু সন্দিগ্ধ আর অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে— এর কোলে যেন সে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, একে যেন সে চেনে না। কেমন এক অস্বস্তিকর অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে সারা জীবন সে ভীত ত্রস্ত হয়ে চলেছে। মুসলমানের, বিশেষ করে

আধুনিক মুসলমানের, এই অবস্থা লক্ষ্য করেই বলতে চাই— সে সম্মোহিত। সে শুধু পৌত্তলিক নয়; সে এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌত্তলিকতারও চরম দশা বলা যেতে পারে— তার মানবসুলভ সমস্ত বিচারবুদ্ধি, সমস্ত মানস উৎকর্ষ আশ্চর্যভাবে স্তম্ভিত! বর্তমান তার জন্য কুয়াসাচ্ছন্ন, দিগ্‌দেশবিহীন, অতীত ভবিষ্যৎ তার নেই। সময় সময় দেখা যায় বটে সে তার অতীতকালের বীরদের, রাজাদের, ত্যাগীদের, মনীষীদের কথা বলছে। কিন্তু এ শেখানো বুলি আওড়ানোর চাইতে এক তিলও বেশী-কিছু নয়। জীবনকে সত্যভাবে উপলব্ধি করবার দুর্নিবার প্রয়াসের মুখেই যে উচ্ছ্রিত হয় যুগে যুগে মানুষের বীরত্ব, ত্যাগ, শাস্ত্রজ্ঞান, মনীষা, তার প্রাচীন ইতিহাসে এর যোগ্য প্রমাণের অভাব নেই। হজরৎ ওমর ও ইব্‌নে জুবেরের মতো বীর-কর্মীদের, সাদী-ওমরখাইয়ামের মতো মনীষীদের, গাজ্জালি-রুমির মতো সাধকদের, জীবনের অন্তস্থলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবনরহস্যের সেই গহনে উঁকি দেবে, এই সম্মোহিতের কাছ থেকে তা আশা করা কত দুরাশা! এ সমস্তই যে তার কাছে শুধু নাম— পঠন-অযোগ্য অক্ষরের মতো কালের পটে কতকগুলো আঁচড়। তার জন্য একমাত্র সত্য শাস্ত্রবচন। অথবা তাও ঠিক নয়, শাস্ত্রবচনের পিছনে যে সত্য- ও শ্রেয়ঃ-অন্বেষী মানবচিত্তের স্পন্দনের অপূর্বতা রয়েছে শাস্ত্রবচনের মাহাত্ম্য-উপলব্ধির সেই দ্বার তার জন্য যে রুদ্ধ। প্রকৃত সম্মোহিতের মতো তার জন্য একমাত্র সত্য প্রভুর হুকুম— স্থূলবুদ্ধি শাস্ত্রব্যবসায়ী প্রভুর হুকুম। সেই প্রভুর হুকুমে কখনো কখনো ভবিষ্যতের অসংলগ্ন স্বপ্ন সে দেখে— কখনো 'প্যান ইলাম'এর স্বপ্ন, কখনো এই তের শত বৎসরের সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত বর্তমান পরিবেষ্টন, যেন জাদুমন্ত্রে উড়িয়ে দিয়ে সেই তের শত বৎসরের আগেকার 'শরীয়ত'এর হুবহু প্রবর্তনার স্বপ্ন।"

এই রচনাটির বিশ বছর পরে স্বপ্ন হয়ে উঠল বাস্তব। পাকিস্তান-রূপে।

সম্মোহিত মুসলমানকে দেশ ও কালের সঙ্গে তাল রেখে চলতে শেখানোই ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই আন্দোলন কেবল মুসলমানকে নিয়ে ব্যাপৃত ছিল না। পাশের বাড়ীতে যে হিন্দু বাস করে তার সম্বন্ধে সজাগ ও সপ্রেম ছিল। কী করে তার সঙ্গে মিলন হবে এ বিষয়ে ভাবতে ভাবতে পঁচিশ বছর আগে ওদুদ সাহেব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান মানুষকে এই দুই দলে ভাগ করে দেখা অসত্য— এ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণভাবেই জাগ্রত হতে হবে। তা হলে সহজেই আমরা বুঝতে পারব, হিন্দুমুসলমানের এই বিরোধের মূল শুধু এই দুই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের ভিতরেই প্রোথিত নয়। আমাদের এই অভিশপ্ত দেশের মানুষ বহুকাল ধরে দুঃস্বপ্নে কাটিয়েছে— এমন দুঃস্বপ্ন দেখা মানুষের ইতিহাসে খুব নতুন নয়— নিজেদের শুধু হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখা সেই দুঃস্বপ্নেরই জের টেনে চলা।· · আমরা শুধু হিন্দু ও মুসলমান নই— আমরা মানুষ। সেই মানুষের অনন্ত দুঃখ, অনন্ত সুখ, অনন্ত রূপ। সে আজ আমাদের সামনে অস্পৃশ্যঅন্ত্যজ-রূপে এসেছে, মহাপ্রেমিকরূপে এসেছে, হিন্দু মুসলমান খৃস্টান রূপে এসেছে। কিন্তু শুধু এই-ই তার চরম অভিব্যক্তি নয়, মানুষের ইতিহাসের ধারা এইখানে এসেই থেমে যায় নি। মানুষের নব নব দুঃখ, নব নব সুখ, নব নব রূপ, কালের পর্যায়ে পর্যায়ে আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। সেসমস্তের দিকে যদি আমরা না তাকাই, শুধু হিন্দু ও মুসলমান মানুষের এই কোনো একটা যুগের রূপকে তার চরম রূপ বলে মনে করি, তবে শুধু এই পরিচয়ই দেওয়া

হবে যে, 'আমরা অন্ধ। আর অন্ধ চিরদিনই হাৎড়ে হাৎড়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলে, অল্প সময়ের জন্যও বুক ফুলিয়ে রাজপথ দিয়ে চলবার অধিকার তার নেই'।[১]

এ সম্বন্ধে তিনি আরো ভাবতে ভাবতে দশ বছর আগে যেখানে পৌছলেন তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'সংস্কৃতির কথা'য়। কিছু উদ্ধৃত করি—

"হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জীবন ভিন্ন আর কিছু যদি এদেশে সম্ভবপর না হয় তবে হিন্দু-সংস্কৃতি মুসলমান-সংস্কৃতি আর্য-সংস্কৃতি সেমীয়-সংস্কৃতি এসব কথা হয়ে পড়ে দায়িত্বহীন, এবং এসবের প্রচলন আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে যত কম হয় ততই মঙ্গল— ততই চিন্তার সৌখীনতা আমাদের ঘুচবে আর আমরা সত্যাশ্রয়ী হব। সার্থক সমাজ-সত্তার দিক দিয়ে বাংলার মুসলমান অথবা হিন্দু বাংলার অথবা বিশাল ভারতবর্ষের অংশ ভিন্ন যখন আর কিছু নয় তখন তার সাংস্কৃতিক জীবনের সার্থকতা লাভের পথ এই বিশাল সত্তার সঙ্গে তার গূঢ় যোগ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই— ঝরনার সার্থকতা যেমন নদীর পুষ্টিসাধন ক'রে— এ সত্য যত অকপট ভাবে স্বীকার করা যাবে ততই শক্তি ও শ্রী লাভের পথে আমরা অগ্রসর হব। আজকার অসার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তর থেকে সার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তরে উপনীত হতে হলে যেসব ধাপ আমাদের অতিক্রম করতে হবে তার কিছু নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে এই ভাবে: ১. দেশে অভুক্ত ও কর্মহীন কেউ থাকবে না। ২. একান্ত বীভৎস না হলে কোনো সমাজেরই ধর্মাচার অশ্রদ্ধেয় বিবেচিত হবে না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে যে— যা প্রাচীন তা প্রাচীন বলেই বরণীয় নয়, বরণীয় তার বর্তমান কার্যকারিতার জন্যে। ৩. হিন্দু-মুসলমানের পোশাক ও নামের ব্যবধান থাকবে না অথবা অস্বীকার করা হবে। ৪. সামাজিক আদান-প্রদান— বিবাহ-আদি সমেত— সর্বত্র সহজ হবে। ৫. আইন সমস্ত দেশের জন্যে এক হবে।"

দশ বছর আগে ওদুদ সাহেব যে প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছিলেন তা যে কোনো একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর প্রত্যয়, যথা জবাহরলালের। একে বলা যেতে পারে সেক্যুলার মনোভাব। এই মনোভাবের প্রতিবাদ কেবল মুসলমান সমাজে নিবদ্ধ নয়, হিন্দু সমাজেও পরিব্যাপ্ত ছিল ও আছে। কাজী সাহেবের পাঁচটি প্রস্তাবের মধ্যে চারটি— শেষ চারটি— কি হিন্দু জনমত নির্বিবাদে গ্রহণ করবে? ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয়। জাতিগঠনও বটে। সে কাজের প্রায় সবটাই বাকী। ধর্মের গায়ে আঁচটি লাগবে না, সমাজের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, অথচ জাতিগঠন আপনা-আপনি হয়ে যাবে, এও এক প্রকার সম্মোহন। সম্মোহিত হিন্দুকে এ কথা সমঝানো শক্ত। সে জাতিভেদও রাখবে, জাতিগঠনও করবে, যত রকম উল্টোপাল্টা উদ্‌ভট ব্যাপারের গোঁজামিলকে বলবে সমন্বয় বা যত পথ তত মত। শিবরাম চক্রবর্তী একবার লিখেছিলেন, আজকের জগৎ থেকে অতীতের বীজকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করতে হবে। বিশ বছর আগে এ কথা পড়ে আমি বিরক্ত হয়েছিলুম। কিন্তু এই বিশ বছরে আমার যে শিক্ষা হয়েছে তা প্রায় শিবরামের কাছাকাছি যায়। যা নিছক অতীত, যার মধ্যে চিরন্তনের বীজ নেই, তাকে প্রকৃতি তার নিজের হাতে ধ্বংস করে। মানুষ যদি তাকে আঁকড়ে ধরতে চায় তবে মানুষ নিজে বিনষ্ট হয়। হিন্দু বা মুসলমানের উপর ইতিহাসের পক্ষপাতিত্বের কারণ দেখি নে। ব্রিটিশ শাসন এদেরকে

---

১ 'মিলনের কথা'

একপ্রকার কৃত্রিম পরমায়ু দিয়েছিল। নইলে এত দিন এদের টিকে থাকার কথা নয়। হয় এরা বদলাবে, নয় এরা সরে যাবে। আজকের দুনিয়ায় এত লোকের খোরাক নেই যে যারা নতুন কিছু করবে না, দেবে না, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবেই। কাজী সাহেবের প্রথম প্রস্তাব তাদেরই জন্যে যারা বাকী চারটি প্রস্তাবে রাজী। নারাজদের জন্যে প্রথম প্রস্তাবও নয়। প্রকৃতির কাছে আশার প্রত্যাশা করতে পারে কেবল সেই মানুষ যে প্রকৃতির অভিপ্রায় অনুসারে বিবর্তিত হতে প্রস্তুত। যে ধর্মের, যে সমাজের বিবর্তন নেই সে প্রবলের আশ্রয়ে থেকে দেড় শ বছর যুদ্ধবিগ্রহ এড়িয়েছে, বিপ্লবের মুখে পড়ে নি। তা বলে চির দিন এড়াবে, কোনো দিন পড়বে না, এ কি সম্ভব!

এই ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া সমালোচকের সাধ্য নয়। এত বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা আছে এতে যে 'শাশ্বত বঙ্গ' না বলে 'শাশ্বত বিশ্ব' বলা বলতে পারা যেত। এবার কাজী সাহেবের সাহিত্যিক সন্দর্ভ দিয়ে সমাপন করা যাক। 'রবীন্দ্রকাব্যপাঠ' শীর্ষক লেখাটি আমার চোখে পড়ে সাতাশ বছর আগে, যখন আমি ছাত্র। তার আগে তাঁর অন্য কোনো রচনা দেখি নি। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হই।

'"রবীন্দ্রকাব্যপাঠে"র ভূমিকা' থেকে উদ্ধৃত করছি তাঁর বক্তব্যের একাংশ—

"রবীন্দ্রনাথের এই তীব্র অনুভূতির ক্রমাগত পরিবর্তন আর সঙ্গে সঙ্গে রূপে হিল্লোলিত হয়ে ওঠা, এই দিক দিয়ে তাঁকে কবিগুরু বলা যেতে পারে। ইয়োরোপে এমনি প্রতিভা গ্যেটে। এই দুই মহাপ্রতিভাই প্রচলিত মত-বিশ্বাস অনুসারে বড় স্রষ্টা নন, যেমন বড় স্রষ্টা ব্যাস হোমর বা শেকস্‌পীয়র। কিন্তু মানস-সৃষ্টির অন্য অর্থে এঁরা মহা-স্রষ্টা; এঁরা রূপ দিয়েছেন নিজেদের অন্তরের গূঢ় অনুভূতিতে বিশ্বজনের অনুভূতি। মানুষের যে অনুভূতি একটু ভাবলে বুঝতে পারা যায় তা কত সূক্ষ্ম কত রকমারি। (পারস্য-সাহিত্যে আত্তার, হাফিজ, রুমী প্রভৃতির ভিতরে এমন আত্ম-সৃষ্টির বেদনা উপলব্ধি করা যায়। তাই হাফিজের দুই একটি চরণ জায়গায় জায়গায় তুলেছি)।— রবীন্দ্রকাব্যের দিকে যখন আমরা দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখতে পাই মানস-জগতের বিচিত্র অনুভূতি কি অদ্ভুতভাবেই তাঁর লেখনীমুখে আত্ম-প্রকাশ করেছে। অনেক জায়গাতেই তিনি যেন জাগ্রতভাবে কথা বলছেন না, কথা আপনি যেন তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে এবং নূতন নূতন অর্থে প্রকাশ পাচ্ছে।

"প্রথম বয়স থেকে 'চৈতালি' পর্যন্ত কাব্য লিখে যদি রবীন্দ্রনাথের লেখনী স্তব্ধ হয়ে যেত তবে বলা যেত, তিনি কবি, কিন্তু খুব বড় স্রষ্টা নন— যেমন বড় স্রষ্টা ব্যাস হোমর বা কালিদাস। তার পরে তাঁর ভিতরে যে পরিবর্তন এসেছে, তাঁর জীবন যে নূতন খাতে প্রবাহিত হয়েছে, তা থেকে তাঁর কাব্যকীর্তির অন্য অর্থ দাঁড়িয়েছে।

"পরে-পরের সৃষ্টি সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে, খুব বড় শিল্পী তিনি নন, অনবদ্য রূপ ফলানোর চেষ্টা তাঁর ভিতরে বেশী নয়। কিন্তু তাঁর প্রতিভা শুধু কবি-প্রতিভা নয়, এ বিশেষভাবে একটি আধ্যাত্মিক প্রতিভা। অথবা তাঁর প্রতিভা কবি-প্রতিভাই বটে, তবে সে প্রতিভার প্রকাশ রূপের চাইতে মানস-গতিতেই বেশী। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য পাঠ না করলে তাঁর প্রকৃত মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায় না। সব কবি সম্বন্ধে কিন্তু এ-কথা খাটে না।

"রবীন্দ্র-প্রতিভা সেই যে প্রথম যৌবনে জাগ্রত হয়েছে তার পর আজ পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দীর দীর্ঘ

দিন ও দীর্ঘ রাত্রির ভিতরে এ যেন তন্দ্রাচ্ছন্নও হয় নি। জগতের অথবা জীবনের অনির্বাণ রহস্য তাঁর অনির্বাণ সন্ধানী চিত্তে নব নব প্রেরণার সৃষ্টি করে চলেছে। এই যে সদা-জাগ্রত ভাব, শুধু জ্ঞানে নয়, অনুভূতিতেও, এই সদা-জাগ্রততার জন্যই তাঁর সমগ্র রচনা একখানি গ্রন্থ হিসাবে পাঠ করা দরকার, এবং সেই ভাবে পাঠ করলেই এই প্রতিভার ভিতরে রয়েছে কি বল কি স্বাস্থ্য তা উপলব্ধি করা যাবে, এবং তারই ফলে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে একে আত্মসাৎ অথবা প্রয়োজন মতো অতিক্রম করে নবতর সৃষ্টি সম্ভবপর হবে। বড় সৃষ্টির ভিতরে যে পূর্ণ তপস্যার এবং সেবায় আত্ম-সমর্পণের ভাব রয়েছে সমগ্রতার দিক দিয়ে দেখলে রবীন্দ্র-কাব্যে সেটি পাওয়া যাবে। এ ভাবে দেখলে রবীন্দ্র-কাব্য এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ বটে, তবে তা সুখপাঠ্য এই জন্য ভীতিকর নয়।"

কাজী সাহেবের বয়স তখন কত! ত্রিশ বছরও নয়। এত অল্প বয়সে এত সুন্দর ভূমিকা লেখা বিস্ময়কর বৈকি। তবে এর সমস্তটার সঙ্গে একমত হওয়া দুষ্কর। আমি তো মনে করি রবীন্দ্রনাথ খুব বড় শিল্পী এবং অনবদ্য রূপ ফলানোর চেষ্টা তাঁর মধ্যে বেশী। কাজী সাহেবের পরিণত বয়সের রচনায় এর সমর্থন আছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'কবিগুরু স্মরণে' লিখিত হয়। তাতে দেখছি— "কবি কে? যিনি কথার সঙ্গে কথা গাঁথার দক্ষতা অর্জন করেছেন? কখনো নয়। কবি তিনি যিনি সচেতন— মনে ও দেহে। এই কবিত্বের পরম পূর্ণবিকাশ যেন রবীন্দ্রনাথ— পায়ের নখ থেকে মাথার চুলের আগা পর্যন্ত তিনি সচেতেন।"

আজকের বাংলাসাহিত্যের সমালোচনা-বিভাগে ওদুদ সাহেবের চেয়ে শক্তিমান পণ্ডিত দু-একজন আছেন, কিন্তু তাঁর মতো জীবন-অধ্যয়নে সুনিপুণ স্থিতধী সুধী আর একজনও আছেন কি না সন্দেহ। তিনি কেবল বই পড়ে বইয়ের বিচার করেন না, মানুষের ভিতরে যে আছে তাকে দেখেই চিনতে পারেন। গভীর অনুসন্ধিৎসা তাঁকে নিয়ে গেছে এমন-এক স্তরে যেখানে নেই কোনো সাম্প্রদায়িকতা বা দলীয়তা বা মতবাদদুষ্ট বৈজ্ঞানিকতা। 'একালের জীবন ও একালের সাহিত্য' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"জাতীয়তাবাদীদের মতো নৈরাশ্যপরায়ণ আন্তর্জাতিকতাবাদীরা নন দেখা যাচ্ছে। দেশের জীবনের, অথবা ভাবজীবনের, বর্তমান সংকট সম্বন্ধে তাঁরা বেশ হুশিয়ার, আর এও দেখা যাচ্ছে যে এই সংকট থেকে উদ্ধারের পথ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না যদিও আশা করছেন যে উদ্ধার তাঁরা পাবেন। কিন্তু তাঁদের যা সম্বল তা দেখে বলা যায়— সফলতার সম্ভাবনা তাঁদের জন্য কম। তাঁদের অনেক কথা যুক্তিপূর্ণ। জীবন্ত ইয়োরোপের দিকে তাঁরা যে দেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন এও ভাল কাজ করেছেন, কেননা জ্ঞান ও শক্তি সংক্রামক। যুগে যুগে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের রূপ বদলায় তাঁদের এই মত ভাববার মতো— অন্তত উড়িয়ে দেবার মতো নয়। তবু তাঁদের দীনশক্তি না বলে উপায় নেই এই কারণে যে তাঁদের প্রধান সম্বল উৎসাহ-প্রাচুর্য— যাকে বলা হয় অনুভূতি, সেই শ্রেষ্ঠ ধনে আজো তাঁরা বঞ্চিত। অবশ্য উৎসাহ-প্রাচুর্যের মূলেও অনুভূতি রয়েছে। কিন্তু যে-অনুভূতি মানুষকে সৃষ্টি-শক্তি দান করে তার প্রকৃতি উৎসাহ-প্রাচুর্যের চাইতে স্বতন্ত্র রকমের। এ সম্পর্কে রুশ সাহিত্য একটি ভাল দৃষ্টান্ত। জনসাধারণের কল্যাণকামনা সব দেশের চিন্তাশীলরাই করেছেন, কিন্তু রুশ সাহিত্যিকদের মনে ক্রিয়া করেছিল যে ভাব তার নাম জনসাধারণের শুভকামনা দিলে তার যোগ্য পরিচয় দেওয়া হয় না, তার নাম দেওয়া উচিত— জনসাধারণের অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্যে অসীম প্রত্যয়।—অনুভূতি ও

প্রত্যয় এই দুটি কথা আজ আমার একান্ত শ্রদ্ধার উপহার আপনাদের সামনে। মনে হয়, ভাগ্য যে আমাদের প্রতি বিমুখ হয়েছেন তাঁকে নূতন করে জয় করবার উপায় রয়েছে এই দুটি কথার মধ্যে।"

তেরো বছর পরেও এ দুটি কথা সমান তাৎপর্যপূর্ণ।

অন্নদাশঙ্কর রায়

বঙ্গসাহিত্যে নারী। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী। মাঘ ১৩৫৭। আট আনা।

সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী। ফাল্গুন ১৩৫৭। আট আনা।

বাংলার স্ত্রীশিক্ষা (১৮০০-১৮৫৬)। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বিশ্বভারতী। অগ্রহায়ণ ১৩৫৭। আট আনা।

বেথুন বিদ্যালয় শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ। Bethune School & College Centenary Volume (1849-1949). Bethune College, Calcutta. Price Rs. 10.

প্রথম তিনটি পুস্তিকাই বিশ্বভারতী-প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের অন্তর্গত। এ কথা বললে সেই সঙ্গেই বলা হয় যে, প্রতিটির লেখক নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এবং লেখকগণ স্বনামধন্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা পুরাতত্ত্বের উদ্ধারকেই জীবনের ব্রত রূপে অবলম্বন করেছেন, তা পাঠকমাত্রেই জানেন।

সাহিত্যের সঙ্গে রসের যোগই আমরা স্বভাবতঃ করে থাকি; কিন্তু এঁরা যে ক্ষেত্রকর্ষণ মনোনীত করেছেন, তা'তে মাটি-কোপানোর শুষ্ক পরিশ্রম বড় বেশি! অবশ্য সে মজুরিও পোষায়, যদি তাঁরা নতুন তথ্য সংগ্রহ পূর্বক অতীত ইতিহাসের এক খণ্ড বর্তমানের চোখের সামনে ধরে দিতে পারেন। আমরা বিনা পরিশ্রমেই ফললাভ করছি বলে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। সেদিন কাগজে দেখে খুশি হলুম যে, অনুরূপ গবেষণার জন্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেছেন। যদিও স্বেচ্ছাপ্রবর্তিত এই কাজ তিনি পুরস্কারের আশায় করেন নি; তবু তার মর্যাদা বুঝে দেশের লোকে যে তাঁকে পুরস্কৃত করেছেন, এতে কার না আনন্দ ও উৎসাহ হয়?

এরকম বইয়ে সাহিত্যরস না পেলেও সাহিত্যকারের পরিচয় পাওয়া যায়, তাও কম মূল্যবান নয়; বিশেষতঃ বঙ্গনারীর কাছে। আমি তো ব্যক্তিগত ভাবে বলতে পারি যে, পড়তে পড়তে মনে হয় যেন নিজেরই দীর্ঘজীবনের পাতার পর পাতা উলটিয়ে যাচ্ছি— শেষ থেকে প্রথম দিকে। এই সুভূষিত গ্রন্থদ্বয়ের প্রায় প্রত্যেক ছবিই হয় আমার বাপের বাড়ির, নয় শ্বশুরবাড়ির নিকট-আত্মীয়ের, কিম্বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর। ছবিগুলি উঠেওছে ভালো। আমার তো মনে হয় এই ছবিগুলি না থাকলে বইয়ের অঙ্গসৌষ্ঠব অর্ধেকের উপর নষ্ট হত।

"All all are gone, the old familiar faces."

কিন্তু শুধু-হাতে চলে যান নি; কিছু দিয়েও গেছেন, নিয়েও গেছেন। সাহিত্যগগনে চন্দ্রসূর্য কেউ না হলেও, মর্তে নিজ নিজ মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে মাতৃমন্দির আলোকিত, নিজ নিজ মনোমুকুল ফুটিয়ে মাতৃমালঞ্চ সুবাসিত করে গেছেন। "আমি যাব না গো অমনি চলে', মালা তোমার দিব গলে।"

সেকালের খৃস্টান মহিলারাই যে আমাদের বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন সে কথা ভাবলে ইংরেজ রাজত্ব-ফলে আমাদের খতিয়ানে লোকসানের অংশ বেশ কিছু কমে যায়। অবশ্য তাঁদের

এই প্রচেষ্টার মূলে হয়তো খৃস্টধর্ম প্রচারের স্বার্থ নিহিত ছিল। তাহলেও পরবর্তী নিঃস্বার্থতর ধর্মনিরপেক্ষ স্ত্রীশিক্ষা তাঁদের এই ভিত্তির উপরেই স্থাপিত হয়েছিল, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই; এবং সেই পরিমাণে পথপ্রদর্শকের সম্মান তাঁদের প্রাপ্য। কত বাধাবিঘ্ন, বদ্ধমূল সংস্কার, কত বিরোধ-বিচ্ছেদ অতিক্রম করে কতকাল কত অধ্যবসায় কত ধৈর্য ধরে তবে একটা জনহিতকর সমাজসংস্কারও প্রবর্তন করতে পারা যায়, তা আজকালকার এই অবাধ অনায়াস স্ত্রীস্বাধীনতা-স্ত্রীশিক্ষার দিনে আমাদের মাঝে মাঝে মনে করা দরকার; জানা দরকার এখনকার সুগম পথ আগে কত দুর্গম ও বন্ধুর ছিল। এবং কে বা কারা তা আমাদের জন্য জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছেন।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু যেমন শিশুসাহিত্যের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ বইগুলির পুনর্মুদ্রণের আবেদন জানিয়েছেন,[১] আমি কি তেমনি নারী-সাহিত্যের লুপ্তরত্নোদ্ধারের আবেদন আধুনিক পুস্তকপ্রকাশকদের কাছে করলে একেবারে ব্যর্থমনোরথ হব?

চতুর্থ বইটি যদিও বিষয়গুণে পূর্ববর্তী বই তিনটির সগোত্র এবং পূর্বোক্ত পিছন পানে তাকাবার সহায়ক, তাই একত্র সমালোচনার দাবি করতে পারে; তবু অনেক বিষয়ে এর স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ আয়তনে অনেক বড়; দ্বিতীয়তঃ স্পষ্টতঃ প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত: একটি বেথুন কলেজের শতবর্ষের ইতিহাস, দ্বিতীয়টি ঐ সময়ের মধ্যে স্ত্রী দ্বারা ও তাঁদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের তালিকা; তৃতীয়তঃ, মূলতঃ ইংরেজি ভাষায় লেখা; যদিও পরিশিষ্টে চারটি কালোপযোগী বাংলা প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দুই ভাষাতেই শতবার্ষিকী উৎসবের বিবরণাদি আছে। এবং সেই উপলক্ষ্যেই বইটি প্রকাশিত।

প্রথমেই বাইরের খোসা বা মলাট থেকে সমালোচনা শুরু করলে বলতে হয় প্রচ্ছদপটি বেশ সুরুচি-সম্পন্ন অথচ অভিনব; প্রবীণে-নবীনে মিশে আধুনিক কেতাদুরস্ত। ভিতরকার ছবিগুলিও বইটির শ্রীবৃদ্ধি করেছে। তার মধ্যে প্রথমে অনেকগুলি উল্লিখিত পুস্তিকার অনুরূপ, কারণ বহু লেখিকা বেথুন স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্রী। নতুন চিত্রের মধ্যে আছে বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও হিতৈষী পুরুষদের এবং খ্যাতনামা মহিলাদের ও শতবার্ষিকী সংক্রান্ত ছবি। এবং এইগুলিই এই বইয়ের বিশেষত্ব। নানাক্ষেত্রে খ্যাতনামা যেসব বঙ্গনেতা বেথুন স্কুল গড়ে তোলবার জন্য কতভাবে কতদিন ধরে কত সাহায্য ও পরিশ্রম করেছেন— রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখুজ্জে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বসু এবং আরো অনেক মহাত্মা— যখন গর্বিতা আধুনিকারা সকল বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষতার দাবি করবেন, তখন যেন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে এঁদের স্মরণ করেন। আর বেথুন (বীটন) সাহেবের কথা কি বলব?—নিজে যেমন উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চমনা ছিলেন, পরদেশী মেয়েদের সেই উচ্চশিক্ষা দিয়ে এর পর জাতিকে সমগ্রভাবে উন্নীত করবার যে সত্যব্রত তিনি গ্রহণ এবং উদযাপন করে গেছেন, তার বিবরণ চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে আমাদের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে লেখা থাকবে ও তাঁর পুণ্যকীর্তি দ্বারা তাঁর স্বদেশীয়দের অনেক পাপকার্যের ক্ষালন হবে। নিজসাধনার সুদূরপ্রসারী সিদ্ধি তিনি দেখে যেতে পারলেন না, এই দুঃখ।

বেথুন কলেজের ছাত্রী আমি কোনো দিন ছিলুম না, কিন্তু তার সঙ্গে আমার আজীবন স্মৃতি জড়িত। আমার অনেক আত্মীয়া ওখানে পড়েছেন, সেকালে প্রতি বৎসর পুরস্কারবিতরণী সভায়

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা। কার্তিক-পৌষ ১৩৩৮। পৃ ১১৪

নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের কাউকে কাউকে প্রাইজের ভারে টলমল হতে দেখেছি, ওখানে পরীক্ষা দিতে গেছি, ওখানে গান শেখাতে গেছি, ওখানে মাতৃদেবীর সঙ্গে ক'নে খুঁজতে গেছি, ওখানে প্রথম 'মায়ার খেলা'র অভিনয় ও সখী-সমিতির শিল্পমেলায় যোগ দিয়েছি, ওখানে মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিরক্ষাকল্পে মেয়েদের প্রাথমিক আধো-আধো-ভাষিণী সভায় উপস্থিত থেকেছি, যখন প্রস্তাব সমর্থনকারিণীরা সলজ্জে 'আমি অনুমো—' পর্যন্ত কোনো রকমে বলে বসে পড়তেন ; ওখানে, কোন উপলক্ষ্যে ঠিক মনে নেই, গাড়িবারান্দার বড় বড় থামগুলো পর্যন্ত চট দিয়ে এমন ভাবে মোড়া হতে দেখেছি যে. পুরুষের কলুষ দৃষ্টি তো দূরের কথা, মাছিটি পর্যন্ত গল্‌বার জো ছিল না। হায় রে! কোথায় গেল সেই অসূর্যম্পশ্যা, কোথায় গেল সে পরদা, কোথায় গেল সেই গেটের কাছে পরের বাড়ির মেয়েদের এক নজর দেখতে পাবার লোলুপ আগ্রহে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা। এখন নিত্যনৈমিত্তিক বাসে ট্রামে উঠতে বসতে মেয়েরা গিস্‌গিস্ করছে দেখে দেখে সম্ভবতঃ অমৃতেও অরুচি হয়ে গেছে। বাইরের দিক থেকে ঘরের দিকে চোখ ফেরালেও সেই এক হাত লম্বা ঘোমটা টানা, সেই ফিস্‌ফিস্ করে কথা কওয়া, সেই 'বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না'ও বহুকাল হল উঠে গেছে।

আমি বলি "যেতে দাও গেল যারা" ; কালে কালে বহু অদলবদল হবেই। তবু কতকগুলি সদ্‌গুণকে বলব "তুমি যেয়ো না যেয়ো না"। যথা, শ্রী হ্রী ধী স্নেহমমতা আতিথ্য সেবাপরায়ণতা। যে কলেজেই পড়ুক, যে বিদ্যাই শিখুক আর যে দেশেই থাকুক, বাঙালি মেয়েকে যেন বাঙালি বলে চেনা যায়— এই আমার সবিনয় নিবেদন।

বৃদ্ধবয়সে একবার মুখ খোলবার অবকাশ দিলে আর পায় কে?—একেবারে কলের জলের মত উপদেশবাণী ঝরতে থাকে, আর রক্ষা রাখে না। করতে বসেছিলুম তো বেথুন স্কুল-কলেজের শতবার্ষিকী স্মারক পুস্তকের সমালোচনা ; তার মধ্যে শ্রী হ্রী ধী কত কি অবান্তর কথা চলে এল।

কিন্তু মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আলোচনাক্ষেত্রে কি ঐ কথাগুলি সত্যই এত অবান্তর? যে-কোনো শিক্ষায়তনের কথা ভাবতে গেলে কি স্বতঃই মনে আসে না তার হাতে-গড়া ছাত্রীগুলি কিরকম দাঁড়াবে, সেইটেই বিবেচ্য ; তারা যে মূর্তি ধরবে তা'তেই তার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে?— এখানে আর-একটি কথার পুনরুল্লেখ করতে চাই, যা আগে অনেকবার বলেছি। কারণ, "আজি তোমায় আবার চাই শোনাবারে যে কথা শুনায়েছি বারে বারে"— কথাগুলি শুধু প্রেমের পর্যায়ে প্রযুজ্য নয়, অনেক স্থলেই খাটে। সে কথাটি এই যে, শিক্ষিত মেয়েমাত্রেরই উপর একটি দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে সেটা যেন তাঁরা মনে রাখেন, অর্থাৎ তাঁদের জীবনে মনে আচারে ব্যবহারেই প্রমাণিত হবে যে স্ত্রীশিক্ষা দেশের পক্ষে মঙ্গল কি অমঙ্গল, অতএব সাবধান। বক্ষ্যমাণ বইয়েতেই প্রকাশ যে, বেথুন কলেজের অনেক ছাত্রীই নানাক্ষেত্রে স্বনামধন্যা হয়েছেন— সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, অধ্যাপনায়, রাজনীতিতে, সমাজসেবায়, নারীমঙ্গলের কার্যে। বৈদিক যুগে স্ত্রীলোকের যত উচ্চ পদবী থেকে থাকুক না কেন, এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই যে মুসলমান যুগের পর থেকে তাঁদের সব দিকে অধোগতি হয়েছিল। সেই মজ্জমান জনকে প্রথমে বিদ্যাশিক্ষার তৃণ থেকে আরম্ভ করে শেষে কাছি পর্যন্ত দিয়ে কিভাবে অজ্ঞানের অন্ধকূপ থেকে জ্ঞানের আলোকতীরে টেনে তোলা হয়েছে, তারই ইতিবৃত্ত এই বইয়ে পাওয়া যাবে।

তবু এহ বাহ্য। আমি জানতে চাই পারিবারিক জীবনে এঁরা কি করেছেন, কি সুফল দেখিয়েছেন—

অধিকতর সুগৃহিণী সুমাতা সুকন্যা সুপড়শী হতে পেরেছেন কি না। কারণ যতই বলো, যতই করো, ভগবান ও মানুষে মিলে মেয়েদের যে গৃহনির্মাতার পদে অভিষিক্ত করেছেন তা ফলেন পরিচীয়তে। অবশ্য এখানে অধিকাংশের কথাই হচ্ছে, ও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম স্বীকার করেই নিয়ম জারি করা হচ্ছে। অসাধারণ হবার সম্ভাবনা বা স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে চাচ্ছে না। এই বইয়েতেই একজন য়ুরোপীয় মহিলা বলেছেন, আমরা সকলেই মাদাম কুরী হতে পারি নে। ভাগ্যে পারি নে। ভেবে দেখ তা হলে আমাদের সমাজের অবস্থা কি হত! তবু তাঁরও মেয়ে হয়েছে। এবং নিশ্চয়ই তাকে রেডিয়ম খাইয়ে মানুষ করেন নি।

আমার এক কেম্ব্রিজ (গার্টন ?) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী আত্মীয়ার শাশুড়ি বলেছিলেন, 'ছোট বউমা এত লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু তাকে তো সেই ধোবার খাতা লিখতে হচ্ছে!' আমিও বলি, তাই যদি হয় তবে পাশকরা মেয়েরা শুধু ধোবার খাতা লেখা নয়, সংসারের সব কাজই যেন সুশৃঙ্খলাপূর্বক করতে শেখে ও গৃহস্থালীর কোনো কাজকে হেয়জ্ঞান না করে, তখনই বলব তাদের শিক্ষা সার্থক হয়েছে।

কারো কারো মুখে শুনি ঘরের নতুন বউকে সুখ্যাত করে বলছে, 'সে যে বি.এ. পাশ করেছে তা বোঝাই যায় না।' কিন্তু আমি এর প্রতিবাদে বলতে চাই যে বি.এ. পাশ করেছে সেটা বুঝতে পারা চাই বই কি। কিন্তু বুঝব কিসে?—তার অহংকারে নয়, দেমাকে নয়, ঘরসংসারের কাজে অমনোযোগে বা অপটুতায় নয়, কৌচে শুয়ে টিকৃটিকির উপন্যাস পড়বার আগ্রহে নয়; বুঝব তার গৃহের পারিপাট্যে, তার ছেলেমেয়ের সুশিক্ষায়, তার নম্র ভদ্র চালচলনে, তার স্বজনবাৎসল্যে, তার কর্তব্যনিষ্ঠা ও সময়ের সদ্ব্যবহারে। তার পূর্ববর্তিনীদের গুণাবলী থেকে বিযুক্ত না হয়ে বরং ওতে আরো কিছু সদ্‌গুণ যুক্ত হবে, এই আশাই করব।

বস্তুতঃ আমার মনে হয় আজকালকার শিক্ষিতাদের প্রধান কর্তব্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত সেকালের ও একালের গুণের সমন্বয় সাধন করা। "বলিতে সহজ বটে, করিতে তা নয়।" কিন্তু কোন্ সাধনাটাই বা সহজ? যথা, রাঁধাবাড়া আবশ্যক মত করতে হবে ও জানতে হবে সবই, কিন্তু সেটা করতে হবে যা'তে খাবার স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর হয় এবং সমস্ত দিন তার আয়োজনে অপব্যয়িত না হয়। "যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না?" সংসারের শত কাজ করা সত্ত্বেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। শুধু ঘরের লোক নয়, অপরিচিত পরের সঙ্গেও সহজভাবে মেলামেশার অভ্যাস রাখতে হবে। শুধু ময়লা কাপড় ধোলাই নয়, সমাজের আবর্জনাও যতটুকু পারো পরিষ্কার করতে হবে। সব ফর্দ দিতে গেলে অনর্থক পুঁথি বেড়ে যায়। নমুনা স্বরূপ এইগুলিই যথেষ্ট। সড়ক ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি, আর নয়। এই ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার অপরাধ আমার নয়, যাঁরা কলম ধরিয়েছেন তাঁদের।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

স্বরলিপি

টোড়ি। ঝাঁপতাল

আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ   প্রভাতকিরণে,
পবিত্র কর-পরশ পেয়ে   ধরণী লুটিছে তাঁহারি চরণে।
আনন্দে তরুলতা   নোয়াইছে মাথা,   কুসুম ফুটাইছে শত বরনে।
আশা-উল্লাসে   চরাচর হাসে—
কী ভয়, কী ভয় দুঃখ-তাপ-মরণে॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি : শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

সা সা II {ঋা মা । মমা -পা পা । পা পা । পদা -পণা দা I
আ জি এ নে ছে০ ০ তাঁ হা রি আ০ ০০ শী

I পা -া । -া -া -দপা । (মা পা । মপা -দণা দপা I
র্বা ০ ০ ০ ০দ্ প্র ভা ত০ ০০ কি০

I মজ্ঞা -রজ্ঞমা । জ্ঞা -া -া । -ঋা -জ্ঞঋা । সা -া সা)} I
র০ ০০০ ণে ০ ০ ০ ০০ আ ০ জি

I ^প^দা দা । দা -র্সা র্সা I ণা র্সা । ণদা -পদণা দা ।
প বি ত্র ০ ক র প র০ ০০০ শ

। পমা -পা । মজ্ঞা -া -া I জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞদা -পণা দপা ।
পে০ ০ য়ে০ ০ ০ ধ র ণী০ ০০ লু০

। মপা মজ্ঞা । জ্ঞা -া মা I জ্ঞা -ঋা । ঋা -া জ্ঞঋা ।
টি০ ছে০ তাঁ ০ হা রি ০ চ ০ র০

। সা -া । সা -া সা II
ণে ০ "আ ০ জি"

-সা -া -া II {পা -দা । দা -র্সা র্সা । র্সা র্সা । র্সনা -র্সা র্সা I
০ ০ ০ আ ০ ন ন্ দে ত রু ল০ ০ তা

I দা দা । না -র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -র্ঋা । র্সনা -র্সা -পা} I
নো য়া ই ০ ০ ছে মা ০ থা০ ০ ০

I [প]ণা দা । পা -দপা মা । [ম]দা -া । [দ]র্সা -া র্সা I
কু সু ম ০০ ফু টা ০ ই ০ ছে

I পা ণা । দা -পমা পা । [ম]জ্ঞা -া । ঋা -সা সা II
শ ত ব ০০ র ণে ০ "আ ০ জি"

-সা -া -া II {পা -দা । দা -র্সা র্সা । র্সা -া । র্সনা -র্সা র্সা I
০ ০ ০ আ ০ শা ০ উ ল্লা ০ সে০ ০ চ

I দা -া । না -র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -র্ঋা । র্সনা -র্সা -পা} I
রা ০ চ ০ ০ র হা ০ সে০ ০ ০

I [প]ণা দা । পা -দপা মা । [ম]দা দা । [দ]র্সা -া র্সা I
কী ভ য় ০ ০ কী ভ য় দুঃ ০ খ

I পা -ণা । দা পমা পা । [ম]জ্ঞা -া । ঋা -সা সা II II
তা ০ প ম০ র ণে ০ "আ ০ জি"

ভ্রমসংশোধন : পৃ ১৭০ পাদটীকা। কার্তিক-পৌষ ১৩৩৮ স্থলে কাতিক-পৌষ ১৩৫৮ হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তামার plaqueএর ছাপ।
মূল plaque কলাভবনে রক্ষিত

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৯

চিঠিপত্র

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ওঁ

শনিবার

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত

শ্রদ্ধাস্পদেষু,
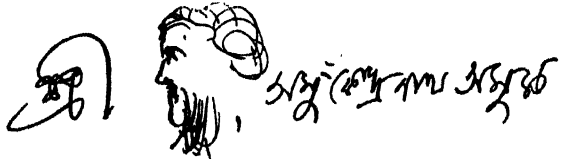
আমি এখন একটা ভারি interesting বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত আছি— তাই একটুতেই interruption বোধ হয়। Boxometry তৈয়ার কচ্চি— অর্থাৎ বাক্স তৈয়ার করিবার Mathematical Formula.

আমি financier কিরূপ তা আপনি বিলক্ষণ জানেন। যোগেন্দ্র বসু Ass. Secretary— তিনিই পাকা পোক্ত রকমে পঞ্চায়ত manage কচ্চেন। আমি তাঁকে অক্ষয়বাবুর টাকা চুকিয়ে দেবার জন্যে লিখিয়াছিলাম— তার জবাব এখনো পাইনি; আর, এখন আমি Boxometryতে এমনি মসগুল যে, পঞ্চায়তের খবর নিতে আমার তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই— আমি যোগেন্দ্রবাবুকে আর-একবার খোঁচা দিয়ে তার result আপনাকে এবং অক্ষয়বাবুকে লিখে পাঠাব।

২

ওঁ

পার্ক ষ্ট্রীট

১৪ই জ্যৈষ্ঠ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনারও বাত— আমারও বাত— "so we have sympathy" [See *Merry Wives of Windsor*, Shakespeare] আমি মনে করেছিলেম ওখানে গেলে আমার বাত সারবে— 'সে গুড়ে

বালি!' আপনি তো খুব বেড়ান্— আপনার কেন এ বালাই? আপনি কি বেড়ানো বন্ধ করেছিলেন? Most probably তাতেই হ'য়ে থাকবে। এখন, আপনি আমাকে watch করুন্ (telescopically), আপনাকে আমি watch করি— ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

রেখাক্ষর has taken flight with his friend volapuk into the summerland. অতএব let the dead past bury the dead. বাক্যতত্ত্ব is a misnomer। আমি যা নিয়ে এখন ব্যস্ত—it is a kind of Novum organum—a new something-o-metry—যার এখনো নামকরণ হয় নাই। উহা এখন বাক্যতত্ত্ব ছাড়াইয়া অনেক উচ্চে উঠিয়াছে।

৩

ওঁ

কলিকাতা
১৭ই চৈত্র
১৭৯০

স্মরিয়ে তব চরিত্র অনুপম।
মনোমাঝে ঘণ্টা বাজে, নমোনমঃ, নমোনমঃ ॥

কবিতাপরাধ মার্জনা করিবেন। এখনো চাতক জলবিন্দুর জন্য হাঁ করিয়া আছে, কিন্তু আর কতদিন— আর কতদিন— যে হাঁ করিয়া থাকিবে। হে অমৃত-বারিদ যাচকের প্রতি সদয় হউন!

সহিয়ে সহিয়ে, রহিয়ে রহিয়ে,
আর সহিতে না পারি।
জিঘাংসা আমার জেনেছে কেদার,
তোমার নিকটে কিন্তু হারি ॥

আমি পিপাসাতুর, শুষ্ককণ্ঠ, এই যাহা লিখিলাম এই ঢের, দুই এক ছত্র না পাইলে কলম আর চলে না, আর কিছু দিন আপনার স্নেহের স্রোত বন্ধ হইলে আমি রাগ করিয়া কলম কালি কাগজ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ঢালিয়া ঢুলিয়া, ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া একাকার করিব। অতএব এরূপ ভয়ানক দুর্গতি হইতে আপনি আমাকে কোনরূপে রক্ষা করুন।

নিদাঘার্ত্ত উদ্ভিদ
প্রচুর জলবর্ষণাভিলাষী
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

৪

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদ মুনিবর

আপনি একেবারেই চুপ করিয়া গেলেন— very good— এ দীন কিন্তু চুপ করিবার পাত্র নহে ;— যথা,—

দেওঘর হ'তে বেরোলো মন্ত্র
একটি শব্দ হইল "ফুস্" ।
বা'বেল্ কোরান পুরাণ তন্ত্র
উড়ি পলাইল করিয়া "হুস !"
নিখিল ধরায় একটি জাতি
সে জাতির নাম ভালমানুষ !
কোলাকুলি করে প্রণয়ে মাতি
ইংরাজ ফরাসি তাতার রুষ্ ॥
সবাই আকাশ-কুসুম তুলে,
কেহই করে না চাষ ।
মধু খুঁজি পায় আকাশ-ফুলে
তাই খায় বারো মাস ॥
শুখায়ে সবাই হ'ল আধ-মরা
রহিল ক-খানি হাড় ।
অসার বাছিতে সসাগরা ধরা
হইয়া গেল উজাড় ॥
শরীর যাহার আছিল ঢেঁকি
শুখাইয়া হ'ল তুল ।
সূক্ষ্ম শরীর রহিল টেঁকি,
ক্রমে তা'ও নিরমূল ॥
নাপিত যেমন টানিয়া ক্ষুর
ছাড়ায় মুখের ছাল ।
মানুষ তেমনি করিল দূর
আবরণ জঞ্জাল ॥
আরোহণ করি মুখের হাওয়া
আসিয়াছে সার ধর্ম্ম ।
কিন্তু তাহা কি ধরিয়া পাওয়া
তোমার আমার কর্ম্ম ?
মূলার খৃষ্টান—মূলার তবে
সার-ধর্ম্মী হ'ল কিসে ?
মালা জপিতেছ "হরি হরি" রবে,
দ্বেষ কেন নিরামিষে ॥
বৈষ্ণব অথচ আমিষ খুঁজে
এ-এক নূতন ধারা !
সারধর্ম্মী হ'য়ে মানুষ পুজে
—ভাবিয়া হইনু সারা ॥
অসার যে জন ছাড়িতে নারে
কেমনে সে পাবে সার ।
কথায় সবাই সারাতে* পারে
কাজের বেলায় ছার ॥
বৈষ্ণব বলিবে "আমিও অই"—
ব্রাহ্ম বলিবে "আমিও !"
আড়ালে ফুটা'বে গালি'র খই
সামনে ছিটা'বে অমিয় ॥

আজ এই পর্য্যন্ত
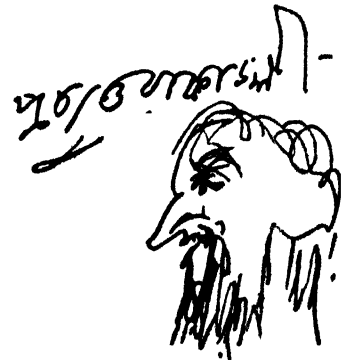
* অর্থাৎ সা'র ফলাইতে। [—লেখক]

আমার দুই দুই পত্রের প্রত্যুত্তরে আপনার পত্র না পাওয়াতে আমি রাগ করিয়া এই পত্র লিখিলাম— আপনার সার-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমার প্রকৃত opinion কি— তাহা হাতে রাখিলাম।

৫

ওঁ

I stand reproved! সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি। এ মুলুকে একজনও নিস্তারিখ লোক আজ পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া পাইলাম না—অজ্ঞাতসারে আমি তাহাদের দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি,— আমি তারিখী হইলাম—ইহা স্মরণ করিলে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—আমি একটা ভয়ানক precipiceএর উপরে ছিলাম—আপনি ভাগ্যে আমাকে বলিলেন তাই আমার চেতন হইল— নহিলে আমার কি দশা হইত বলিতে পারি না! ভারতীতে আমার দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদ দেখিয়াছেন কি?—তদ্বিষয়ে আপনার কলমের কতিপয় আঁচড় is what I am in need of। যোগীন এখন কি করিতেছেন—তাঁহাকে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ দিবেন। আপনার ওখানে ক-জন ব্রাহ্ম? তাঁহারা কি দলীয় ব্রাহ্ম, না বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম? যদি বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম হ'ন তবে তাঁহাদিগকে আমার কোলাকুলি এবং নমস্কার দিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি আমার পরিচিত? আপনি যদি আমাকে কোন-না-কোন একটা উপলক্ষে formally নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান (উপলক্ষ একটা ছুতা মাত্র), তবে আমি gladly দেওঘরে আপনার cheering atmosphere-এ ঝাঁপ দিই—নচেৎ আমার নিজের পয়সা খরচ করিয়া যাইতে হয়—which is out of the question, as my purse contains only বিশুদ্ধ Space— Pure Kantian Space.

পোস্টমার্ক
১৩ নভেম্বর ১৮৮৬

৬

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

ওঁ

ভাই সতু

লিখ্‌চি মনের খেদে। সৌদামিনী একা ছিলেন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ী।—

জোড়াসাঁকোর বাড়ী এখন আর নাই— সোমকে দেখ্‌বে শুন্‌বে কে? মহর্ষি পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত গার্হস্থ্য ধর্মনিয়মাদির প্রতি ভক্তিনিষ্ঠা এবং প্রাণের টান তেমন আর কাহার? আমাদের এ বাড়ী ও বাড়ী সে বাড়ীর পুরাতন বিবরণ বৃত্তান্তের repository তেমন আর কে? ভায়েদের সুখের দুঃখের অংশিনী তেমন আর পাওয়া যাইবে কোথায়? সৌদামিনী gone and all is darkness— ঈশ্বর একমাত্র ভরসা।

অ্যানড্রুজ সাহেবকে যে দুখানা চিঠি লিখেছ দেখিলাম তো সব, কিন্তু ভাই— British Govern-

mentকে এখনো তুমি চেনো নাই ! তৎসম্বন্ধে আমার মতামত যদি জিজ্ঞাসা কর তবে তাহা এক কথায় এই যে, All that glitters is not gold। তোমার চিঠি দুখানা দেখবার দিন দুই পূর্বে আমি গান্ধীকে যে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহার নকল অত্রসম্বলিত পাঠাইলাম।

তোমার সমদুঃখসুখ বড়দাদা

ওঁ

শান্তিনিকেতন
সোমবার

ভাই সতু

তোমার চিঠি পেয়ে আমি কী যে সুখী হয়েছি বল্‌তে পারি না। তুমি খুসী হবে শুনে যে, তোমার সঙ্গে আমার আদবেই মতভেদ নাই। সৌদামিনীর দিব্যধাম প্রয়াণের কথা তোমার সঙ্গে বাঁটাবাঁটি করিয়া ক্ষণেকের জন্য অনেকটা শান্তি লাভ করিলাম। Politicsএ তোমার আমি বড়দাদা আর সেইজন্য তোমার নীচে পড়া দূরে থাকুক্— তোমার চেয়ে আমি আরো এককাটি সরেস। আমার বিশ্বাস এই যে, British Governmentএর pressure বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের মাথার উপর থেকে অপনীত হয়, তবে আমাদের কী যে শোচনীয় দশা হইবে তাহা এক মুখে বলা যায় না। এখন এই ঘোরতর দুরবস্থার মধ্যেও যখন আমাদের চক্ষু ফুটিতেছে না— তখন British Governmentএর pressure অন্তর্ধান করিলে— আমাদের দিশী Governorএরা, অত্যাচারী জমিদারেরা, Priest-ridden উচ্চবংশীয়েরা এবং স্বার্থপর ধনাঢ্যেরা যে, হাতে মাথা কাটিবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নাই। British Government আমাদের পল্লীগ্রামস্থ জমিদারদের Government অপেক্ষা শতসহস্রগুণে ভাল। এ কথা খুব ঠিক যে, তুমি যেমন লিখেছ, Governor & the Governedএর মধ্যে gap বাড়ানো অনর্থের মূল— gap কমানো শ্রেয়ের মূল। শেষোক্ত missionএ রবি কতকটা কৃতকার্য্য হয়েছেন— এবং আশানুরূপ কৃতকার্য্য হোন্ ইহা আমার আন্তরিক প্রার্থনা। To be our own master ought to be our sole end and endeavour—এটা বুদ্ধদেবের সর্ব্বপ্রধান উপদেশ, এই উপদেশটি আমরা যে পরিমাণে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব সেই পরিমাণে আমরা স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিব— ইহা বেদবাক্য। গান্ধীর জানা উচিত যে, আমাদের দেশের উচ্চবংশীয় এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা নিম্নশ্রেণীদের প্রতি যেরূপ অবজ্ঞাসূচক নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন এবং এখনো পর্য্যন্ত করিতে ক্ষান্ত হন নাই— আমাদের সেই পাপের ফল আমরা ভোগ করিতেছি, অতএব Charity begins at home। British Government কাজ একটি করেন অতিশয় গর্হিত— সেটা এই যে, আমাদের দেশের যে কোনো লোক দেশের হিতসাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন (যেমন তিলক প্রভৃতি)— অম্নি Government তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হন— তাই আমি বর্ত্তমান British Governmentএর মর্ম্মান্তিক বিরোধী পক্ষ। আজ এই পর্য্যন্ত। বস্।

তোমার সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী
বড়দাদা

৮

ওঁ

ভাই সতু

তুমি একজন হাড়পাকা co-operator ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত। আমি একজন হাড়পাকা non-co-operator dittoদিগের সহিত। এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্। এ অবস্থায় তকরাতকরি নিষ্ফল। অ্যাক কাজ করা যা'ক্,— জ্যোতিভায়া অনুভয় পক্ষ, তাঁহাকে মধ্যস্থ মানা যাক্। জ্যোতি বলিবে, সন্দেহ নাই, যে, বড়দাদা non-co-operation নিয়ে দিব্য আনন্দে আছেন সে আনন্দে cold water throw করা উচিত হয় না, মেজদাদা co-operation নিয়ে দিব্য আরামে আছেন— সে আনন্দে cold water throw করাও উচিত হয় না। তাছাড়া— দুই দাদার দুই আনন্দের দুইখানা ছবি তুলিতে আমার বড় সাধ গিয়াছে— আমার সেই সাধের মনোরথটির অচরিতার্থ অবস্থায় তাহার কচি মস্তকে বাদবিতণ্ডার গদাঘাত করা দুই দাদারই অনুচিত কার্য্য। আমার মূলমন্ত্র তাই silence is golden।

তোমার স্নেহেবাঁধা
বড়দাদা

৯

ওঁ

শান্তিনিকেতন
২০ আষাঢ়

ভাই সতু

Minor Scaleএর গীত তোমার মুখে আমি কখনো শুনি নাই— তোমার গত পত্রে তাহা শুনিয়া আমার মন ব্যথিত হইল। The best medicine is

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। গীতা

তুমি যা লিখেছ

"স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে"
"চক্ষু নিস্তেজ"—

এ কথাটা লেখ্‌বার পূর্বে তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল যে, যাঁকে তুমি লিখ্‌চ তিনি তোমার বড়দাদা— সুতরাং তোমার কাছে তিনি হার মানিবার পাত্র নহেন। আমার চক্ষু এবং স্মরণশক্তি ছ্যাকরা গাড়ির বেতো ঘোড়ার মত চাবুকের চোটে দুই চারি পা দৌড়োয়— আর থেমে দাঁড়ায়; আর-ঘা কতক চাবুকের চোটে আবার দুই চারি পা দৌড়ে চলে, দৌড়ে চলেই পথের মাঝে থেমে দাঁড়ায়। এই রকম করে— আমি কোনো-মত-প্রকারে গন্তব্যপথ অতিবাহন কচ্চি। আর কত দিন এরূপ uphill work টেনে নিয়ে যেতে পারব that is the question। কাজেই আমার মাথার মধ্যে যা কিছু আছে— বেলা

থাকতে তাহা ঝেড়ে ফেলে— মনস্তরীকে বীতভার করা আবশ্যক। কাজেই ছ্যাকরা গাড়ির অথবা গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদিগকে গুরু বলিয়া মান্য করিয়া ভগ্নাবশিষ্ট brainএর উপরে নির্দয় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি— যেহেতু তা বই উপায়ান্তর নাই। আমার রোগের সুপথ্য হচ্চে— brain বেচারীকে বিশ্রাম করানো। কিন্তু গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে মুহুর্মুহু চাবুক না কষিলে তাহার যেন হাত সুড়সুড় করে, আমারও তেমনি একটা রোগ জন্মিয়াছে। করুণাময় বিশ্ববিধাতা তোমাকে শান্তি বিধান করুন এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

তোমার বড়দাদা

১০

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

দিনু

"অনিল আমাকে লইএছে" এটা তুমি ভুল বুঝেছ। আমি সতুকে যা লিখেছি সেটা real truth। বাড়িশুদ্ধ সবাই জানে যে, আমি বাল্যাবধি হাড়পাকা non-co-operator।

রাজনারায়ণ বসুর সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের সৌহৃদ্যের কথা দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার 'গুম্ফ-আক্রমণ কাব্যে' ("রাজনারায়ণ বসুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কাব্য রচিত হয়") এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

প্রবীণ সাধুর সঙ্গে বিপ্র-যুবা বিনাভঙ্গে
বহুকাল সখ্য-ডোরে বাঁধা।
বয়সের যে অনৈক্য তার প্রতি নাহি লক্ষ্য
সে অনৈক্যে প্রীতির কি বাধা।

পরস্পরের মধ্যে সর্বদা সাক্ষাৎ না হইলেও নিয়মিত পত্রবিনিময় দ্বারা সে অভাবের কথঞ্চিৎ পূরণ হইত—

দীন দ্বিজের রাজ-দর্শন না ঘটিবার কারণ
টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা
না রহে কোনো জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধী কিছুই কিছু না
খালি ভস্মে ঘি ঢালা॥
ইচ্ছা সম্যক্ তব দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু
এ কি দৈবের শাস্তি॥

এই প্রসঙ্গে ৫ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রাজনারায়ণকে লিখিত কতকগুলি চিঠি ইতিপূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে— বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২ সংখ্যায় দুইখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত ১ ও ২ সংখ্যক পত্র রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্রী শ্রীবাসন্তী চক্রবর্তীর সৌজন্যে, ৩-৫ সংখ্যক পত্র শ্রীঅমল হোমের সৌজন্যে মুদ্রিত হইল।

১ ও ২ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত Boxometry বা কাগজের বাক্স রচনাপ্রণালী ও রেখাক্ষর বর্ণমালা প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বাল্যকথা'য় লিখিয়াছেন—

"তত্ত্বজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটি সৌখীন কলা তাঁর মনোরাজ্য অধিকার করে বসল— বাক্স রচনাপ্রণালী, আর রেখাক্ষর বর্ণমালা। এতে এত সময় নষ্ট করা হল কেন? জিজ্ঞাসা করলে বড়দাদা হেসে বলেন, এ শুধু ছেলেখেলা নয়, এ দুই বিদ্যা সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত। লিখতে বসলে লেখবার নানা সরঞ্জাম চাই, কাগজ, কাগজ রাখার বাক্স, পকেট বই— এই সকল সামগ্রী আগে থাকতে সংগ্রহ করতে হয়— তাই লেখাপড়ায় দিনকতক ক্ষান্ত দিয়ে বড়দাদা লেখবার জিনিস তয়েরির কাজে মন দিলেন। একদিকে যেমন কাগজের কারুকার্য, অন্যদিকে লিখনপ্রণালী সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করে রেখাক্ষর বর্ণমালার সৃষ্টি করলেন। সাহিত্যব্যবসায়ীর যাতে সময় সংক্ষেপ হয় এই উদ্দেশ্য। এই দুই শখের বিদ্যায় তাঁর বিস্তর সময় ও পরিশ্রম ব্যয় হল। এই দুই বিদ্যা যদিও সামান্য তবু বড়দাদা অসামান্য ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে তাদের আয়ত্ত করতে নিযুক্ত রইলেন। তার জন্যে চিন্তা, শিক্ষা ও সাধনা যা কিছু প্রয়োজন কিছুই বাকী রাখেন নাই। বাক্সতত্ত্বের জন্য সমুদয় গণিতশাস্ত্র মন্থন করে তাঁর কাজের উপযোগী বিষয়সকল সংগ্রহ করতে হয়েছে, সেইসংক্রান্ত নূতন নিয়মাবলী প্রস্তুত করতে হয়েছে। এই তো গেল বাক্স-প্রকরণ। রেখাক্ষর সেও এক অপূর্ব বস্তু, তাতে কত কবিত্বরস, কতরকম রেখাপাতের কৌশলের ছড়াছড়ি, না দেখলে তার মর্যাদা বোঝা যায় না। সম্প্রতি এই রেখাক্ষরপদ্ধতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে।—"

'Boxometry' সম্বন্ধে তিনি ইংরেজিতে একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। 'কাগজের বাক্স রচনা' নামে চৈত্র ১২৯৫ 'ভারতী ও বালকে' তিনি একটি পদ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন— তাহার মুখবন্ধ—

"সূত্রে না গাঁথিয়া— আটায় না জুড়িয়া— শুদ্ধ কেবল কাগজ কাটিয়া মুড়িয়া এবং তাহার দুই একস্থানে ছিদ্র কাটিয়া— ডালা এবং তালা সমেত সর্বাঙ্গসুন্দর বাক্স রচনার নূতন একটি প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া নিম্নে তাহা পদ্যে লিপিবদ্ধ করা হইল। কাজচলা গোচের রীতিমত একটা বাক্স— ছেলে-খেলা গোচের নহে। যিনি চক্ষে দেখিয়া বুঝিয়া লইতে ইচ্ছা করেন— প্রণেতা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।"

বাক্স রচনা শেষ হইলে—

ভিতর বাহির আর চৌদিক পরখি
বলিবে "ক্যাবাত! এ যে অপূর্ব নিরখি।"
ভার হবে সে তোমায় সামলিয়া রাখা
বাক্স পেয়ে পে'লে যেন লাখ শখানি টাকা॥

কাগজের বাক্স রচনা শেষ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যসন ছিল।

'রেখাক্ষর-বর্ণমালা' ১৩১৯ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তবে ১২৯২ ('বালক') সাল হইতে তিনি সাময়িক পত্রে এ সম্বন্ধে রচনা প্রকাশ করিতেছেন দেখিতে পাই। উল্লিখিত গ্রন্থ ব্যতীত, দ্বিজেন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে মুদ্রিত, সচিত্র, আখ্যাপত্রহীন একখণ্ড রেখাক্ষর বর্ণমালা (প্রথম ভাগ, পৃ ১-৮৬; দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ৮৭-১১৮) আমাদের গোচর হইয়াছে। সম্ভবত উহা সুপ্রচারিত হয় নাই, বন্ধুসমাজেই আবদ্ধ ছিল।—গত সংখ্যায় প্রকাশিত তিন সংখ্যক পত্রের স্বাক্ষর রেখাক্ষরের নিদর্শন।

৫ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের "দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ" প্রবন্ধ ভারতী ও বালক ১২৯৩ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ লইয়া সেকালে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল— যথা, দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ পৌষ সংখ্যায় তাহার প্রত্যুত্তর দেন।— ৪ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত 'সারধর্ম' রাজনারায়ণ বসুর গ্রন্থ (১৮৮৬)।— ১০ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত অনিলচন্দ্র মিত্র শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ও দ্বিজেন্দ্রনাথের সহকারী ছিলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুরাগী ছিলেন, গান্ধীজির আত্মজীবনীর একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।—অসহযোগ ও ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথের মতামত গত সংখ্যায় প্রকাশিত চিঠিতে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীইন্দিরা দেবীর সৌজন্যে এই সংখ্যায় প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত কয়েকখানি চিঠিতেও ঐ সকল বিষয়ে তাঁহার অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে।— ১ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত অক্ষয়বাবু সম্ভবত অক্ষয়কুমার দত্ত।—৬ ও ৭ সংখ্যক চিঠিতে উল্লিখিত সৌদামিনী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা, (১৮৪৭-১৯২০); সোম=মহর্ষির পুত্র (১৮৫৯-১৯২২)।

প্রমথ চৌধুরী

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। রচনার অনতিপরিসর বন্ধনের মধ্যে কোনো বিষয়ে লেখকের বক্তব্যের আলোচনা ও মীমাংসার প্রকাশ প্রবন্ধের মূল অর্থ ও আদি রূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে ও তাঁর সমকালে বাংলায় প্রবন্ধের রূপ ছিল মোটের উপর এই অনলংকৃত আদি রূপ— রামমোহন রায়ের ধর্মালোচনায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ-সংস্কারের তর্কবিতর্কে, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক ও সামাজিক প্রবন্ধগুলিতে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন নানা রচনার মধ্যে প্রবন্ধরচনায় হাত দিলেন তখন তাঁর সাহিত্যের সোনার কলমে প্রবন্ধের মধ্যে এল বক্তব্যের অতিরিক্ত উপরিপাওনা, যাতে রচনা হয় সাহিত্য। প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে উঠল। সেই অবধি বাংলায় সাহিত্যধর্মী প্রবন্ধের চলন হয়েছে। বিষয়ের নানাত্বে এবং প্রবন্ধলেখকদের রুচির ও শক্তির তারতম্যে বাংলার প্রবন্ধসাহিত্যে বৈচিত্র্য এসেছে, যেমন এসেছে অন্যসব ভাষায়।

সাহিত্যধর্মী প্রবন্ধ ভাষা থেকে আটপৌরে নিরাভরণ প্রবন্ধকে বাতিল করে না। ভাষার যা প্রথম কাজ, বক্তব্যকে ব্যক্ত করা, তা চিরকালই থাকবে তার প্রধান কাজ। অনেক বিষয় আছে যাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধের চরম সাফল্য বক্তব্যকে সুব্যক্ত করা। রাঙিয়ে বলা কি সাজিয়ে বলা যেখানে হাস্যকর। অস্থানে কবিত্ব, অর্থাৎ ঔচিত্যজ্ঞানের অভাব। বিজ্ঞান কি ইতিহাসের কোনো তথ্যের সুপরিচয় দিতে যা প্রয়োজন সে হচ্ছে বিষয়ের পূর্ণ পরিচ্ছন্ন জ্ঞান, যে বিচার ও যুক্তিতে তথ্যের প্রতিষ্ঠা তার পারম্পর্যের নীরন্ধ্র ধারণা, এবং সে জ্ঞান ও ধারণাকে পাঠকের মনে স্বচ্ছন্দে অবিকৃত পৌঁছে দেবার বাক্যরচনার কুশলতা। অলংকরণ এখানে বোঝা চাপানো। পাঠকের মনের পথে ঝটিতি গতির বাধা। এখানে রচনার যে গুণের প্রয়োজন সে হচ্ছে শুধু প্রসাদগুণ। অবশ্য এ প্রসাদগুণ আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়, সর্বজনসাধ্যও নয়। আমাদের দেশের প্রাচীন ভাষ্যকার-টীকাকারদের মধ্যে যাঁরা প্রথমশ্রেণীর, তাঁদের রচনা এ রকম রচনার উৎকৃষ্ট নমুনা। যেমন এ যুগের কোনো কোনো বিজ্ঞানীর শিক্ষিতসাধারণের জন্য রচিত প্রবন্ধ। কখনো হঠাৎ হাতের গুণে এ রচনাও সাহিত্য হয়ে ওঠে। সাহিত্যের সুপরিচিত রং ও ভূষণে নয়। রচনা থাকে তেমনি নিরাভরণ। বিষয়ের জ্ঞান ও তার প্রতিষ্ঠার প্রণালীর বিশদ বিবরণ দেওয়া ছাড়া রচনায় আর-কোনো অবান্তর উদ্দেশ্যও থাকে না। তবুও সে রচনা কেবল বুদ্ধিকে উদ্রিক্ত ও তৃপ্ত করে না, মনকেও মুগ্ধ করে। আটপৌরের যা অতিরিক্ত তা বুদ্ধিকে বিষয় ও যুক্তির অনুধাবন থেকে অন্যমনা করে না, জ্ঞান ও বিচারকেই মনে কেটে বসিয়ে দেয়। নিরাবরণ কেজো শরীর অবয়ব-সংস্থানের সুঠামে কেজো থেকেও হয় মনোহারী। ছবিতে রং নেই, কিন্তু রেখাঙ্কনের কৌশল কেবল বস্তুকে আঁকে না, তার অন্তরকেও প্রকাশ করে। শংকরের বেদান্তসূত্রভাষ্যের প্রস্তাবনা এর উদাহরণ। গত শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ সেদিনের নবলব্ধ জ্ঞান সাধারণ্যে প্রচারের জন্য প্রবন্ধ লিখেছেন। তার মধ্যে আচার্য হাক্সলির প্রবন্ধগুলি এ রকম রচনার ভালো উদাহরণ। বিষয় ও উদ্দেশ্যে আটপৌরে

হয়েও অসাধারণ। অন্য বিজ্ঞানীদের অনুরূপ প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা করলেই প্রভেদ বোঝা যায়। আইন ও তার ইতিহাস বিষয়বস্তুতে নীরস। অধ্যাপক মেইটল্যাণ্ড ইংলণ্ডের আইনের এক ইতিহাস লিখেছেন, এবং সে ইতিহাস নিয়ে ছোট-বড় অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানে ও আবিষ্কারে তা পরিপূর্ণ, ঐতিহাসিকের একনিষ্ঠ সত্যভাষণ তার প্রতি পাতায়। কিন্তু এই নীরস উপকরণ মেইটল্যাণ্ডের হাতে পেয়েছে আশ্চর্য গড়ন। কোনো বাহ্যিক উপচারে নয়। নীরসকে সরস ক'রে প্রকাশের অসাধারণ লিপিকৌশলে। মেইটল্যাণ্ডের পূর্বে ইংলণ্ডের আইনের সম্পূর্ণতর ইতিহাস রচনা হয়েছে, যেমন অধ্যাপক হোল্ডস্‌ওয়ার্থের ইতিহাস। তথ্য পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শনের আধার। চোখ বুজে নির্ভর করা যায়। কিন্তু মেইটল্যাণ্ডের সঙ্গে তফাত আইনসর্বস্ব পাঠকের কাছেও অজ্ঞাত থাকে না। যে শক্তি সম্পূর্ণ কর্মক্ষম, আর যে শক্তি কর্মকে আয়ত্ত ক'রেও দশ আঙুল উর্ধ্বে থাকে তাদের যে তফাত। বাংলা প্রবন্ধে এ রকম রচনার বড় দৃষ্টান্ত প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'। বিগত যুগের ইংরেজ সিবিলিয়ান অ্যাস্‌কলি সাহেব বাংলাদেশের চাষের জমির স্বত্ব-স্বামিত্বের এক ঐতিহাসিক বিবরণ লিখেছিলেন। পরিষ্কার ঝরঝরে সুপাঠ্য লেখা। বাংলাদেশের রায়তের অবস্থা ও সে-অবস্থার ইতিহাসের বিশদ বর্ণনা। প্রমথ চৌধুরীর রচনার বিষয়ও ঐ এক কথা। কিন্তু সে কথা তাঁর হাতে হয়েছে 'রায়তের কথা'।

২

বাংলা ১৩২১ সালের বৈশাখ থেকে সবুজ পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হয়। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় নানা বিষয়ে যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন তাদের রচনাকাল তখন থেকে মোটামুটি কুড়ি-পঁচিশ বছর। এ সময়ের পূর্বে তাঁর লেখা প্রবন্ধের সংখ্যা অতি অল্প। যদিও বাংলা গদ্যরচনায় সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষার যে যুদ্ধে চলিত ভাষার পক্ষের নেতা হিসাবে প্রমথ চৌধুরীর বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পরিচয়, তার কয়েকটি প্রবন্ধ এ সময়ের পূর্বে লেখা। 'কথার কথা' এ সময়ের অনেক পূর্বে ১৩০৯ সালের ভারতীতে প্রকাশ হয়; 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা' ও 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' এর অনতিকাল পূর্বে ১৩১৯ সালের শেষের দিকে ভারতীতে প্রকাশ হয়।

এর সমকালে ও অনতিপূর্বকালে দুইজনের লেখা প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধগুলির মূল্য ও বিশেষত্ব হৃদয়ংগম হয়। সে দুইজন হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ। সাহিত্যের সমালোচনায়, কি রাষ্ট্র ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায়, বাংলা কবিতার ছন্দবিচারে, কি বাংলা ব্যাকরণের রীতি ও বাংলা শব্দতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে— সর্বত্র পড়েছে মহাকবির মনের ছাপ, সর্বত্র মহাকবির বাগ্‌বৈভব। বিচারে যুক্তির মধ্যে এল উপমা। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ান্তরের স্পর্শে অদ্ভুত ঐক্যের আলোর চমক পথ আলো ক'রে দিল। প্রতিপক্ষের মনে হল এ অন্যায়। লড়াই চলছিল লাঠিতে-লাঠিতে, তার মধ্যে তলোয়ারের ধার ও দীপ্তি আনা। ভাষা ও প্রকাশকে অনুদ্‌বেজিত রেখে শ্রোতার মনে আবেগ-সঞ্চারের যে কৌশল মহাকবির আয়ত্ত তার দোলা এসব প্রবন্ধে লেগেছে। বিষয়ভেদে সে দোল মন প্রকাশ্যে উপভোগ করছে, বিষয়ভেদে সে দোল মৃদুর চেয়েও মৃদু। বুদ্ধি ভাবে যা-কিছু আয়োজন তাকে চলার পথে দ্রুত এগিয়ে নেবার জন্য।

কিন্তু অজ্ঞাতে পায়ে লেগেছে ছন্দের দোল। মহাকবির গদ্য, সুতরাং ভুলেও কোথাও পদ্যগন্ধী নয়। ভাষাপ্রয়োগের কলাকৌশল রয়েছে প্রচ্ছন্ন। কিন্তু ব্যক্ত হয়েছে এমন গদ্যে যা গদ্যলেখকের অসাধ্য। এ রকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ; যেমন দুর্লভ মহাকবির আবির্ভাব। আর তার চেয়েও দুর্লভ মহাকবির প্রবন্ধরচনায় প্রেরণা। এ রচনা নানা শ্রেণীর প্রবন্ধের এক শ্রেণী নয়। এ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। পাগল ছাড়া এর অনুকরণের কথা কোনো লেখক কল্পনা করে না।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন সেকালের বেসরকারি কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ছাত্রদের পদার্থবিজ্ঞানের ক খ পড়াতেন। সেই প্রাথমিক বিজ্ঞান পড়াতে পরীক্ষা দেখাবার জন্য যে সামান্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তারও বালাই ছিল না। সেসবের জায়গায় ছিল কালো বোর্ড আর সাদা চক। বিজ্ঞানের এই প্রাইমারি বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয় রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন সর্ববিজ্ঞানবিদ্যার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। কিন্তু মহাপণ্ডিত বললে তাঁর পরিচয় হয় না। বহু বিজ্ঞানের শিকড় থেকে ফুলফল পর্যন্ত সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানমাত্র নয়, সেসব বিজ্ঞানের গতি ও প্রকৃতিতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল অসাধারণ। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানের পরিণতি, এবং সে শতাব্দীর শেষ দিকে তার নবপর্যায়ের সূচনার তথ্য ও তত্ত্বে তাঁর মন ভরে ছিল। সে জ্ঞান ও চিন্তার অল্প কিছু পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাঁর প্রথম দিকের নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে। আজ যেসব বাঙালি বিজ্ঞানী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও নববিজ্ঞানের চমৎকার পরিচয় দিচ্ছেন রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদের গুরু। তাঁর সর্বজ্ঞানরসিক অনুসন্ধিৎসু মন বিজ্ঞানেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারে নি। বেদবিদ্যা ও বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন থেকে আরম্ভ ক'রে মহাভারত ও মহাজন-চরিতকথার মধ্য দিয়ে বাংলার মেয়েলি ছড়া পর্যন্ত সে মনের স্বচ্ছন্দ গতি। ইংরেজ সমালোচক যে মনকে বলেছেন 'বাদশাহী হীরা'। জ্ঞানের আলো পড়লে শতমুখ থেকে কিরণ ঠিকরে আসে। রামেন্দ্রসুন্দরের শেষের দিকের প্রবন্ধগুলি তাঁর এই বহুমুখী জ্ঞান ও চিন্তার পরিচয়। তাঁর বিশাল জ্ঞান ছিল তাঁর মনের লীলাক্ষেত্র, তাকে বহন করতে হত না। তাঁর লেখা প্রবন্ধ তাঁর মনের প্রতিচ্ছবি। জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা তিনি বলেছেন অতি সহজে; তার পরিধির কথা ভাবলে তবে মনে বিস্ময় আসে। তাঁর গভীর চিন্তা পাঠকের মনে চিন্তা আনে কিন্তু তার প্রকাশ গম্ভীর নয়। ভাষা অবলীলায় ভাবকে প্রকাশ করছে, কিন্তু তার গতি লঘু নয়। পদক্ষেপে মহার্ঘ শালীনতা। গভীর জ্ঞান ও চিন্তা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা। কিন্তু তার মধ্যে দেখা দিয়েছে অনাবিল হাসি। জ্ঞানীর বিমুক্ত মনের পরিচয়।

৩

গৌতম বুদ্ধ আর্য ছিলেন, না, প্রত্যন্তবাসী আর্যেতর জাতির বংশধর, এ তর্ক প্রাচীন। এথ্‌নলজির প্রমাণে এর মীমাংসার কথায় প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন—

"একদল আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, শাক্যসাত্বতাদি কুল আর্যবংশীয় নয়। কিন্তু এ মত যে সত্য তার কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই। এ স্থলে এথ্‌নলজি নামক উপবিজ্ঞানের আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে। তবে এইটুকু বলে রাখা দরকার যে, এথ্‌নলজিস্টদের হাত এখন আমাদের মাথা থেকে নেমে নাকের উপর এসে পড়েছে, সম্ভবতঃ পরে দাঁতে গিয়ে ঠেকবে। যাঁরা মস্তকের পরিমাণ থেকে মানবের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং হীনত্ব নির্ণয় করতেন তাঁদের মস্তিষ্কের পরিমাণ যে স্বল্প ছিল এ সত্য এথ্‌নলজিস্টরাই

প্রমাণ করেছেন। এখন এঁদের বিজ্ঞানের প্রাণ নাসিকাগত হয়েছে। কিন্তু সে প্রাণ যতদিন না ওষ্ঠাগত হয় ততদিন এঁরা শাক্যসিংহের জাতি নির্ণয় করতে পারবেন না। কেননা বুদ্ধদেবের দন্ত রক্ষিত হয়েছে, নাসিকা হয় নি।"[১]

অনুমান করা কঠিন নয় রবীন্দ্রনাথ যদি এ আলোচনা করতেন কৌতুকের শুভ্রহাস্যে ও দুটি-একটি উপমার বিস্ময়ের চমকে একটি রসবস্তু গড়ে উঠত। রামেন্দ্রসুন্দরের হাতের বিজ্ঞানবুদ্ধির তীক্ষ্ণ আলোতে এ অপবিজ্ঞানের সমস্ত ফাঁক প্রকট হত। প্রমথ চৌধুরী বিজ্ঞানের চর্মে ঢাকা অজ্ঞানের বুকে সোজাসুজি ছুরি বসিয়েছেন। সে ছুরির ধার ও ঔজ্জ্বল্য চোখে ধাঁধা লাগায়। কিন্তু সে ছুরি যে খুন করার ছুরি তাতে সন্দেহ থাকে না। এই অল্প কয়েক লাইন লেখার মধ্যে নানা জ্ঞানের ইঙ্গিত ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। যে মারাত্মক ব্যঙ্গ এর লক্ষ্য তাতে ভার ও ধার জোগানোই এদের কাজ।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধের অনেকগুলি এই রকম বিতর্কমূলক। কোনো প্রাচীন কি নবীন প্রচলিত ও প্রচারিত মতকে পরীক্ষা ক'রে প্রায়ই তার উচ্ছেদ করা এদের লক্ষ্য। এ পরীক্ষায় যুক্তি ও তর্কের অনেক বিচার, দেশি ও বিদেশি তথ্য ও তত্ত্বের বহু আলোচনা। সে বিচার ও আলোচনার সামর্থ্য অল্প লেখকেরই থাকে। তার মূলে আছে অসামান্য ধীশক্তির বহু বছরের নানা জ্ঞান ও চিন্তার অনন্যমনা চর্চা। কিন্তু পাঠকের মনে এসব প্রবন্ধের প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ এ বিচার ও আলোচনার বিষয়বস্তুর নয়। বিচার ও আলোচনায় প্রবন্ধ কোথায় পৌঁছল সে মীমাংসারও নয়। যা প্রথম থেকে পাঠকের মনকে সজাগ ও মুগ্ধ রাখে সে হচ্ছে বিচার ও আলোচনার প্রকাশের ভঙ্গি।

এইসকল প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী যে রচনারীতি এনেছেন বাংলা সাহিত্যে তা নূতন। যেসব প্রবন্ধ বিতর্কমূলক নয় তারও রচনারীতি নূতন। বিষয়বৈচিত্র্যের অবধি নেই। ভাষা সাহিত্য, শিক্ষা সভ্যতা, প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস, সমাজ পলিটিক্স, চিরন্তন ও সাময়িক সকলের সেখানে স্থান। নানা জ্ঞান ও বিদ্যার অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ করেছেন যেন সহজ ঘরোয়া কথায়। যা প্রাচীন, সুতরাং নমস্য ও তর্কাতীত, বর্তমানের আলো ফেলে তার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। যা আধুনিক ও সাময়িক অতিপ্রাচীনের মধ্যে তার ছবি আবিষ্কার ক'রে মানুষের মন ও চরিত্রের মূল ঐক্য দেখিয়েছেন। আর, সকল আলোচনাকে অনুস্যূত করে আছে এক দীপ্তিমান রসিকতার সুতীক্ষ্ণ সরসতা। পদবিন্যাসমাত্র যা মনকে অপহরণ করে। লেখকের মনের গড়ন-ভঙ্গি ছাড়াও যে এ রসিকতার মূলে আছে জ্ঞানের বৈচিত্র্য ও বহুজ্ঞানচর্চায় শাণিত বুদ্ধি পাঠকের সে কথা প্রথমে মনে হয় না।

প্রবন্ধগুলি যখন সবুজ পত্রে প্রকাশ হচ্ছিল তাদের শব্দচয়ন ও শব্দগ্রন্থনের কৌশল, সংহত প্রকাশের পারিপাট্য পাঠকের মনকে যে সবচেয়ে দখল করেছিল তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। বলার ভঙ্গি বলার বিষয়কে মনে ছাপিয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে অংশটা প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভার একান্ত নিজস্ব তা ছাড়া তাঁর রচনারীতি বাংলা গদ্যরচনা, প্রবন্ধ ও সমধর্মী রচনাকে বহুল প্রভাবিত করেছে, লেখকদের জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে। সাধু বনাম চলিত ভাষার তর্কে প্রমথ চৌধুরীর জয়ের চিহ্ন যেমন আজ বাংলা গদ্যরচনার সারা

---

১ 'আর্যধর্মের সহিত বাহ্যধর্মের যোগাযোগ'। সবুজ পত্র, ১৩২২ মাঘ

শরীরে, তেমনি তার রচনারীতির প্রভাব বাংলা গদ্যে আজ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাক্-প্রমথ যুগের তুলনায় আজকের বাংলা গদ্য অনেক সংহত, তার গতি অনাড়ষ্ট, জটিলকে স্বচ্ছন্দপ্রকাশের প্রসাদগুণ তার অনেক বেশি। এর মূলে প্রমথ চৌধুরীর আদর্শের প্রভাব অনেকখানি। বাংলা গদ্যের ভাষা ও রচনারীতিতে তিনি যে পরিবর্তন এনেছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর বড় দান বলে তা স্বীকৃত হবে। কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গিতে তাঁর বলার বিষয় যদি চাপা পড়ে তা হবে দেশের দুর্ভাগ্য। এই ঋজু কঠিন তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে তিনি যা বলেছেন তার প্রধান কথা হচ্ছে মন ও সাহিত্যের মুক্তির কথা। সে কথা বলার প্রয়োজন চিরকাল থাকবে। এবং আজকের দিনে তার প্রয়োজন বোধ হয় সবচেয়ে বেশি।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। আজ আমরা যাকে বলছি 'প্রগতি-সাহিত্য' বা 'সমাজসচেতন সাহিত্য' তার তর্ক খুব প্রখর হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিক কারণে। কিন্তু সবুজ পত্র যখন প্রথম প্রকাশ হচ্ছে সে তর্কের তখন অপ্রতুল ছিল না। মানুষের সমাজের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন; তার শ্রেণীভেদের, তার ধনোৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার, তার রাষ্ট্রশক্তির মূল উৎসের। এ আলোচনা তখন বেশ চলেছে; কারণ সময়টা প্রথম মহাযুদ্ধের উদ্যোগ- ও ভীষ্ম- পর্ব। এ আলোচনায় প্রমথ চৌধুরীর মন ছিল মোটের উপর এই পরিবর্তনের পক্ষে। কিন্তু যখন দাবি উঠল যে সাহিত্যের কাজ এই পরিবর্তনের পথকে সুগম করা, সাহিত্যিককে হতে হবে এই পথ তৈরির ইন্‌জিনিয়ার তখন তিনি সাহিত্যের মূল প্রকৃতির কথাটি বললেন পরিষ্কার করে 'সবুজ পত্রের মুখপত্রে'—ওঁ প্রাণায় স্বাহা ব'লে যার আরম্ভ। একটা অংশ তুলে দিচ্ছি—

"··এ কথা সত্য যে, মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্-ছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়। সাহিত্য হাতে হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনো-কোনো কথায় মন ভেজে; এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। শব্দের শক্তি অপরিসীম। ··তাই আমরা কথায় মরি কথায় বাঁচি। মন্ত্র সাপকে মুগ্ধ করতে পারে কি না জানি নে, কিন্তু মানুষকে যে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোটা ভারতবর্ষ। সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কারকে বাধা দিতে পারে তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্য। মানুষমাত্রেরই মন কতক সুপ্ত আর কতক জাগ্রত। আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে আছে সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র মন বলে ভুল করি—নিদ্রিত অংশটুকুর অস্তিত্ব আমরা মানি নে, কেননা জানি নে। সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে জাগরূক করে তোলা।"

আজকের দিনে এর টীকায় বলা প্রয়োজন যে ঘুমপাড়ানি গান শুধু মা-ঠাকুরমার মুখের প্রাচীন ছড়া নয়, যা শুনে শিশুরা ঘুমিয়ে পড়ে। অতিনবীন সব ছড়া আছে যা'র সুরে অনেক বয়স্ক শিশুর মনের একদিক ছাড়া আর সব দিক ঘুমে সচেতন হয়। সাহিত্যের এক ফল সমস্ত মনকে জাগরূক করা। বিশেষ কাজের জন্য যাকে postulate স্বীকার করতে হয়, তা যে জ্ঞানের axiom নয় সে সম্বন্ধে মনকে সজাগ রাখা।

'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী আবার লিখেছেন—

"সাহিত্যকে কোনো-একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের উপায়স্বরূপ করে তুললে তাকে সংকীর্ণ করে ফেলা

অনিবার্য। আমরা সামাজিক জীব, অতএব নূতন-পুরাতনের যুদ্ধেতে একপক্ষে-না-একপক্ষে আমাদের যোগ দিতেই হবে, কিন্তু আমাদের সমগ্র মনটিকে যদি আমরা এই যুদ্ধে নিয়োজিত করি তাহলে আমরা সনাতনের জ্ঞান হারাই। যা কোনো-একটি বিশেষ যুগের নয়, কিন্তু সকল যুগেরই হয় সত্য নয় সমস্যা, তাই হচ্ছে মানবমনের পক্ষে চিরপুরাতন ও চিরনূতন, এক কথায় সনাতন। এই সনাতনকে যদি রাধাকুমুদবাবু নিত্যবস্তু বলেন, তাহলে সাহিত্যের যে নিত্যবস্তু আছে এ কথা আমি অস্বীকার করব না; কিন্তু ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিকেরা তা অগ্রাহ্য করবেন। একান্ত বিষয়গত সাহিত্যের হাত থেকে মুক্তি লাভ করবার ইচ্ছা থেকেই 'art for art' মতের উৎপত্তি হয়েছে। কাব্য বল, ধর্ম বল, দর্শন বল, এসকল হচ্ছে বিষয়ে নির্লিপ্ত মনের ধর্ম। এই সত্য উপেক্ষা করার দরুন ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে।"

কিছু বিচিত্র নয় যে, যেখানে 'সমাজসচেতন' 'প্রগতি'-সাহিত্যের আজ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি সেখানেই তার উপদ্রবের পাল্টা দেখা দেবে 'art for art' সাহিত্য ও সাহিত্য-বিচার, রাষ্ট্রের চাপ যখন একটু আলগা হবে।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি বহু জায়গায় ছড়ানো রয়েছে; অনেক পাঠকেরই দুষ্প্রাপ্য। তার পঞ্চাশটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশ হচ্ছে 'প্রবন্ধসংগ্রহে'। এই পুনঃপ্রকাশে পাঠকের সঙ্গে প্রবন্ধগুলির নূতন পরিচয় হবে। নানা কষ্টিপাথরের বিচারে প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের বড় সম্পদ। প্রবন্ধগুলিতে মনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আহ্বান, উপদেশে ও আচরণে। প্রাচীন ও নবীন সংস্কারের অন্ধতা থেকে মুক্তি, অর্থহীন বন্ধন থেকে মুক্তি। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির মনে এই মুক্তির বাণীর প্রতিষ্ঠা হোক।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সদ্য-প্রকাশিত 'প্রবন্ধসংগ্রহে'র ভূমিকা

সমালোচকের প্রতি

তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম,
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে,
তোমাদের কড়া কথা শুনে।
তার চেয়ে ভালো শতগুণে
দেয়া চির লেখায় অলম্,
তোমাদের পড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম।

—প্রমথ চৌধুরী, 'পদ-চারণ'

রবীন্দ্রসাহিত্যে অশোক

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের 'কথা' গ্রন্থখানির (১৯০০) অধিকাংশ কবিতাই এমন কতকগুলি ঐতিহাসিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত যাতে ভারতবর্ষের ত্যাগ বীর্য ও মহত্ত্বের আদর্শ উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়। উপনিষদের পর্ব থেকে মরাঠা পর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সকল কালের ইতিহাস থেকেই তিনি উক্ত আদর্শের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম ও মহত্তম আদর্শ যে রাজর্ষি অশোক, তাঁরই কোনো উল্লেখ নেই কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের মতে 'ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ তাহার উপনিষদ্, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম'। সুতরাং 'কথা' কাব্যটিতে যে বৌদ্ধ উপাখ্যান থেকে বহু উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, তা কিছু বিচিত্র নয়। স্বয়ং বুদ্ধদেবের চরিত্রমহিমার ছবি ফুটে উঠেছে কয়েকটি কবিতায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বিশ্বপ্রেমের আদর্শ যাঁর চরিত্র ও কর্মকে আশ্রয় করে সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েছে, কথা কাব্য তাঁর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। কথা কাব্যের পরেও রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতায় বা নাটকে অশোকের উল্লেখ দেখা যায় না। অথচ বৌদ্ধ কাহিনী ও আদর্শ মুখ্যত তাঁর কাব্য-নাটকের যোগে বাঙালির কাছে সুপরিচিত হয়েছে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। এ প্রসঙ্গে মালিনী, নটীর পূজা, চণ্ডালিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামান্য পশুবলির বেদনা তাঁকে রাজর্ষি বিসর্জন লিখতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। কিন্তু কলিঙ্গযুদ্ধে অসংখ্য নরবলির যে অনুশোচনা ধর্মপ্রাণ অশোককে চিরকালের জন্য সমরপরিহারে প্রবর্তনা দিয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথের মহৎ লেখনীকে কিছুমাত্র প্রেরণা জোগাল না। অথচ সামান্য ক্রৌঞ্চবধের দুঃখে বাল্মীকিপ্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। অশোকের কাহিনীতে যে কাব্য ও নাটক রচনার উপযোগিতা নেই, তাও নয়। আমাদের দেশে বোধ করি কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেনই সর্বপ্রথমে অশোকচরিত্রের মহত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর 'অশোক-চরিত'ই (১৮৯২) সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে অশোকবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। এই বইখানি সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তকার সুকুমার সেন বলেন, "অশোকচরিত বাঁঙ্গালা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ জীবনী-গ্রন্থ। বইটিতে লেখকের লিপিচাতুর্যের ইতিহাসনিষ্ঠার এবং অনুসন্ধিৎসার সবিশেষ পরিচয় আছে। পরিশিষ্ট-স্বরূপে 'অশোকচরিত' নামে একটি উপাদেয় ক্ষুদ্র নাট্য রচনা সংযোজিত হইয়াছে"। বোঝা যাচ্ছে, ঐতিহাসিকের কাছেও অশোকচরিতের নাটকীয়তার আকর্ষণ ছিল। অতঃপর ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৯০৭) এবং গিরিশচন্দ্রও (১৯১১) 'অশোক' নামে নাটক রচনা করেন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও অশোক-কাহিনীতে ভারতীয় গাথাকাব্যের উপযোগিতার বিষয় অনুভব করেছিলেন (মহাভারতী, ১৯৩৬)। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে অশোকচরিত্রগত ভারতমহিমা কিছুমাত্র স্পন্দন জাগাল না কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে।

'কথা' কাব্যের পরে রবীন্দ্রনাথ আর গাথা-কবিতা লেখেন নি বলা চলে। সুতরাং অশোক সম্বন্ধে কোনো গাথা লিখলে কথা-রচনার সময়েই লিখতেন এ কথা মনে করা অসংগত নয়। কথার অধিকাংশ

কবিতাই ১৮৯৭-৯৯ সালে লেখা। এর বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। 'মালিনী' (১৮৯৬) রচনার সময় থেকেই এই বইটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখা যায়। এই বইএর 'অশোকাবদান' অবলম্বনে অশোকের উপরে গাথা-কবিতা রচনা করা অনায়াসেই চলত। কিন্তু অশোকাবদানের উপাখ্যানগুলি বাস্তবতা- ও মহত্ত্ব- বর্জিত। সম্ভবত এজন্যই উক্ত অশোকাবদান থেকে তিনি গাথা বা নাটক রচনার কোনো প্রেরণা পাননি। কৃষ্ণবিহারী সেনের 'অশোকচরিত' (১৮৯২) বইখানিও তাঁর কাছে অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়। কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা হিসাবেই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক কৃষ্ণবিহারী দীর্ঘকাল ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৬৫ সালে 'নব-নাটক' রচনার সময়ে দেখি তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আবার ১৮৮২ সালে ঠাকুরবাড়ির উৎসাহে রাজেন্দ্রলালের সভাপতিত্বে যে 'সারস্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় তার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণবিহারী ও রবীন্দ্রনাথ। যাহোক, কৃষ্ণবিহারীর 'অশোকচরিত' জীবনীখানি যতই সুলিখিত হোক এবং তাঁর 'অশোকচরিত' নাটিকাখানিও যতই উপাদেয় হোক, রবীন্দ্রনাথ তার থেকে কোনো রচনার প্রবর্তনা পান নি। এমনও হতে পারে যে, কৃষ্ণবিহারীই একটি নাটিকা রচনা করেছেন বলেই তিনি এ বিষয়ে 'মালিনী'র ন্যায় নাট্য রচনায় বিরত ছিলেন, আর গাথা-রচনার উপযোগী উপাখ্যানও উক্ত ইতিহাস-গ্রন্থে পান নি। এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই ঐতিহাসিক উপকথা অবলম্বনেই গাথা-নাটকাদি রচনা করেছেন, ইতিহাসের প্রধান চরিত্র বা মূল আখ্যানকে কখনও অবলম্বন করেন নি। রাজর্ষি, বিসর্জন, মুকুট, বউঠাকুরানীর হাট, প্রায়শ্চিত্ত, মালিনী, কথা, নটীর পূজা, চণ্ডালিকা প্রভৃতির কথা স্মরণ করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। ইতিহাসের মূলধারা বা প্রধান চরিত্র তাঁর চিন্তাকে উদ্রিক্ত করেছে এবং সময় বিশেষে প্রবন্ধরচনার উপাদান জুগিয়েছে, কিন্তু কাব্যনাট্যাদি রচনায় প্রবৃত্ত করে নি। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক চিন্তার গভীরতা ও বিস্তার কতখানি, তা তাঁর ইতিবৃত্তবিষয়ক প্রবন্ধসমূহের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। বস্তুত এসব প্রবন্ধ সংকলন করে 'ইতিহাস' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশের বিশেষ সার্থকতা আছে।

২

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ অতি গভীর। ভারতীয় সংস্কৃতির যিনি একজন মুখ্য ব্যাখ্যাতা, তাঁর পক্ষে ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি গভীর আগ্রহ না থাকাই বিচিত্র। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে দুটি চরিত্রে, সে দুই চরিত্র বুদ্ধ ও অশোক। বুদ্ধ-চরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সুবিদিত। অশোক-চরিত্রের প্রতিও তেমনি শ্রদ্ধা থাকাই প্রত্যাশিত। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে অশোকের কথা তেমন সুপরিজ্ঞাত নয়। তার কারণ কি ? মনে হতে পারে যে, বুদ্ধদেব আদর্শচরিত্র ধর্মপ্রবর্তক, তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা থাকাই স্বাভাবিক ; অশোক তো সে পর্যায়ভুক্ত নন, তিনি হচ্ছেন মুখ্যত ইতিহাসের রাষ্ট্র-রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ তো ধর্মবিকাশের ইতিহাসকে নিয়ে নয় ; রাষ্ট্র ধর্ম সমাজ সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি যে-বিভাগেই ভারতীয় মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে সেখানেই তাঁর আগ্রহ। তা ছাড়া রাজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার, যদুনাথ, বাংলাদেশের এই তিনজন যশস্বী ঐতিহাসিকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যিনি দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন, তাঁর পক্ষে তো ভারতীয় ইতিহাসের

সর্বক্ষেত্রেই, বিশেষত অশোকের ন্যায় মহৎ চরিত্রে, আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। আসল কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ অশোকচরিত্রকে কাব্যনাট্যাদি অনুভূতির ক্ষেত্রে অবতারণ করেন নি, ঐতিহাসিক মননের ক্ষেত্রে রেখেই তিনি তাঁর মহত্ত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি প্রবন্ধরচনাকালে প্রয়োজনমত অশোকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্য স্বভাবতই তাঁর কাব্যনাটকাদিব মতো জনপ্রিয় নয়; তাই অশোক সম্বন্ধে তাঁর অভিমতও সুবিদিত নয়।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী থেকে অশোক সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্‌ধৃত করে দেখাতে চেষ্টা করা অশোকচরিত্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল।

তার আগে দেখা দরকার, অশোকচরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখা দেয় কখন। আমার মনে হয়, বিংশ শতকের পূর্বে সে আগ্রহ যথোচিত পরিমাণে জন্মে নি। তৎপূর্ববর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যে অশোকপ্রসঙ্গ আমার চোখে পড়ে নি। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে এডুইন আর্নল্ডের *Light of Asia* কাব্য এবং ঐতিহাসিকদের গবেষণার ফলে বুদ্ধচরিত্রের প্রতি আমাদের দেশে শ্রদ্ধান্বিত আগ্রহের সঞ্চার হয় প্রচুর পরিমাণেই। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেবচরিত' নাটকে (১৮৮৭) এবং নবীনচন্দ্রের 'অমিতাভ' কাব্যে (১৮৯৫) তার সাক্ষ্য রয়েছে। অশোকচরিত্রের প্রতি তৎকালে তেমন আগ্রহ দেখা দেয় নি। রমেশচন্দ্রের *History of Civilisation in Ancient India* (১৮৯০) গ্রন্থের একটি অধ্যায় এবং কৃষ্ণবিহারীর 'অশোকচরিত্র' (১৮৯২), তৎকালে এই দুটি ছাড়া ইংরেজিতে বা বাংলাতে অশোক সম্বন্ধে আর কোনো বই ছিল না বললেই হয়। আর এই দুটি বইও এ বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি। বস্তুত অশোকের জীবনেও উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত কাহিনী ও কিংবদন্তীর কুয়াশা ভেদ করে যথার্থ ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে ভালো করে ফুটে উঠতে পারে নি। বিংশ শতকের একেবারে গোড়া থেকেই অশোকচরিত্র ভারত-ইতিহাসের উদয়াচলে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেল। ১৯০১ সালে Heritage of India গ্রন্থমালায় ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের *Asoka, The Buddhist Emperor of India* নামক প্রামাণিক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। ওই বৎসরেরই একেবারে শেষ দিকে প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম' নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানির প্রতি বাঙালির মন আকৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে অশোকের যথার্থ ইতিহাস আলোচিত হয়েছে অতি বিশদ ভাবেই। তার দু বছর পরেই প্রকাশিত হয় রিস্‌ ডেভিড্‌সের সুবিখ্যাত *Bnddhist India* বইখানি। ঠিক এই সময়েই দেখি রবীন্দ্রনাথও তাঁর কোনো কোনো প্রবন্ধে অশোক সম্বন্ধে অতি সশ্রদ্ধ উল্লেখ করছেন। সেগুলি একটু মন দিয়ে অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ অশোকের বিবরণ ইতিহাস হিসাবেই গভীরভাবে মন দিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৯০৩ সালে 'সাহিত্যের সামগ্রী' নামে একটি প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১৩১০ কার্তিক) প্রসঙ্গক্রমে অশোক সম্বন্ধে তিনি যা লিখলেন তা উদ্‌ধৃত করি।—

"জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্‌ অশোক আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, পাহাড় কোনো কালে মরিবে না, সরিবে না— অনন্তকালের পথের ধারে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নব নব যুগের পথিকদের কাছে এক কথা চিরদিন ধরিয়া আবৃত্তি করিতে থাকিবে। পাহাড়কে তিনি কথা কহিবার ভার দিয়াছিলেন।

"পাহাড় কালাকালের কোনো বিচার না করিয়া তাঁহার ভাষা বহন করিয়া আসিয়াছে। কোথায় অশোক,

কোথায় পাটলিপুত্র, কোথায় ধর্মজাগ্রত ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন। কিন্তু, পাহাড় সেদিনকার সেই কথা-কয়টি বিস্মৃত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে। কতদিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে— অশোকের সেই মহাবাণীও কত শত বৎসর মানবহৃদয়কে বোবার মত কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়াছে। পথ দিয়া রাজপুত গেল, পাঠান গেল, মোগল গেল, বর্গির তরবারি বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্রবেগে দিগ্‌দিগন্তে প্রলয়ের কশাঘাত করিয়া গেল, কেহ তাহার ইশারায় সাড়া দিল না। সমুদ্রপারের যে ক্ষুদ্র দ্বীপের কথা অশোক কখনও কল্পনাও করেন নাই, তাঁহার শিল্পীরা যখন তাঁহার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিতেছিল তখন যে দ্বীপের অরণ্যচারী দ্রুয়িদগণ আপনাদের পূজার আবেগ ভাষাহীন প্রস্তরস্তূপে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছিল, বহু সহস্র বৎসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটি বিদেশী আসিয়া কালান্তরের সেই মূক ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। রাজচক্রবর্তী অশোকের ইচ্ছা এত শতাব্দী পরে একটি বিদেশীর সাহায্যে সার্থকতা লাভ করিল। সে ইচ্ছা আর কিছুই নহে, তিনি যত বড়ো সম্রাট্‌ই হোন, তিনি কি চান কি না চান, তাঁহার কাছে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ, তাহা পথের পথিককেও জানাইতে হইবে। তাঁহার মনের ভাব এত যুগ ধরিয়া সকল মানুষের মনের আশ্রয় চাহিয়া পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। রাজচক্রবর্তীর সেই একাগ্র আকাঙ্ক্ষার দিকে পথের লোক কেহ বা চাহিতেছে কেহ বা না চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে।

"তাই বলিয়া অশোকের অনুশাসনগুলিকে আমি যে সাহিত্য বলিতেছি তাহা নহে। উহাতে এইটুকু প্রমাণ হইতেছে, মানবহৃদয়ের একটা প্রধান আকাঙ্ক্ষা কী। ইহা আর কিছুই নয়, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।" —সাহিত্যের সামগ্রী (১৯০৩)। 'সাহিত্য'

এই অংশটুকু পড়লে অনায়াসেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ অশোকের প্রতি শুধু যে শ্রদ্ধাই পোষণ করতেন তা নয়, তিনি অশোক-ইতিহাসের মূল উপাদান যে অনুশাসনাবলী তার পাঠোদ্ধারের বিবরণ প্রভৃতি বিষয়েও গভীর ঔৎসুক্য পোষণ করতেন। এ প্রসঙ্গেই বলা উচিত যে, বিদেশী প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে পাহাড়ে খোদাই-করা ব্রাহ্মীলিপির মূক ইঙ্গিতপাশ থেকে অশোকের বাণীর উদ্ধার সাধন করে তাঁর অভিপ্রায়কে সার্থকতা দান করলেন, সেই বিদেশী মনস্বীর নাম জেম্‌স প্রিন্‌সেপ (১৭৯৯-১৮৪০)। তিনি ১৮৩৪ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির পাঠনির্ণয় করতে সমর্থ হন। তারই ফলে অশোকের অনুশাসনগুলির পাঠ তথা অর্থ উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অশোক আপনার কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর" করতে চেয়েছিলেন, তাঁর হৃদয়ের আদর্শকে চিরস্থায়িত্ব দিয়ে মানুষের হৃদয়ে অমর করে রাখাই ছিল তাঁর অন্তরের কামনা। এ কথা যে সত্য তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে অশোকের পর্বতলিপিগুলিতেই। তাতে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, তাঁর পৌত্র-প্রপৌত্র প্রভৃতি উত্তরপুরুষরাও তাঁরই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক এই হচ্ছে তাঁর ইচ্ছা। অন্যত্র বলেছেন, তাঁর ধর্মলিপিগুলিকে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে লিখে রাখবার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলি চিরস্থায়ী হোক এবং তাঁর প্রজারা এগুলির অনুবর্তন করুক। 'এতায় অথায় অয়ং ধংমলিপি লিখিতা : চিরথিতিক ভোতু তথা চ প্রজা অনুবততু' (পর্বতলিপি ৫)।

৩

১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়া[১] দর্শন করতে যান (১৩১১ আশ্বিন)। সঙ্গে ছিলেন সস্ত্রীক আচার্য জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা, রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আরও কয়েক জন। তার কয়েক মাস পরেই দেখি 'উৎসবের দিন' নামে এক প্রবন্ধে তিনি অশোকের জীবনাদর্শের মর্ম ব্যাখ্যা করছেন (বঙ্গদর্শন, ১৩১১ মাঘ)। এ প্রবন্ধে বুদ্ধগয়ার উল্লেখ নেই। কিন্তু এর দু বছর পরে লেখা আর-এক প্রবন্ধে বুদ্ধগয়ার শিল্পকলার প্রসঙ্গে অশোকের জীবনাদর্শের অন্য-এক বিশিষ্টতার পরিচয় দেন। সে কথা একটু পরেই যথাস্থানে বলা যাবে। তার আগে 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।—

"এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট্‌ অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তারকার্যে মঙ্গলসাধনকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কি সুতীব্র তাহা আমরা সকলেই জানি। সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মত গৃহ হইতে গৃহান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন, তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল না। ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে, ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য; ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে এক মুহূর্তে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড় বড় রাজার বড় বড় সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত, বিস্মৃত, ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির আবির্ভাব, ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাহা-কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গৌরব হইতে, তাহার সহায়তা হইতে মানুষ আর কোনোদিন বঞ্চিত হইবে না। আজ মানুষের মধ্যে সমস্ত স্বার্থজয়ী এই অদ্ভুত মঙ্গলশক্তির মহিমা স্মরণ করিয়া আমরা পরিচিত-অপরিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" —উৎসবের দিন (১৯০৫)। 'ধর্ম'

এই অংশটিতে কাব্যের হৃদয়াবেগ এবং ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠা দুইই সমপরিমাণে বিদ্যমান আছে। এটি পড়বার সময় কবির তীব্র অনুভূতি হৃদয়ে এমনই গভীরভাবে সঞ্চারিত হয় যে, অশোকের উপর কোনো কবিতা নেই বলে আক্ষেপ বোধ করবার আর কোনো অবকাশ থাকে না। বস্তুত 'শিবাজি-উৎসব' কবিতাটির মূলে রয়েছে যে ব্যগ্র হৃদয়াবেগ, এই অশোক-প্রশস্তিটির মধ্যেও তারই স্পন্দন অনুভূত হয়। দুটি প্রশস্তি রচনারই উপলক্ষ্য হচ্ছে উৎসবদিনের পক্ষে স্বাভাবিক শ্রদ্ধামিশ্রিত আনন্দ-নৈবেদ্য রচনার ব্যাকুলতা। অথচ সে শ্রদ্ধা ও আনন্দ রবীন্দ্রসুলভ গভীর সত্যনিষ্ঠার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এখানেই কাব্য ও ইতিহাস পরস্পরের অনুষঙ্গী হয়েছে।

উদ্ধৃত অংশটিতে অশোকের শ্রান্তিহীন সেবাপরায়ণতা ও রাজশক্তিকে মঙ্গলের দাসত্বে নিয়োগের কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এই মঙ্গলনিষ্ঠতা শুধু যে বিশ্বের দুঃখনিরসন তথা সেবার ব্রতকেই প্রেরণা

---

১ রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়ায় আবার যান ১৯১৪ সালে (১৩২১ আশ্বিন)। গীতালির কয়েকটি গান এখানে রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে নিকটবর্তী বরাবর পর্বতে অশোকনির্মিত গুহাগৃহ দেখতে যান। কিন্তু অপ্রত্যাশিত বাধায় তাঁকে পথ থেকেই ফিরে আসতে হয়। দ্রষ্টব্য 'চিঠিপত্র', তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২০; রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৬১।

জোগায় তা নয়, যথার্থ সৌন্দর্যসৃষ্টির কামনাকেও গতি ও শক্তি দান করে এই মঙ্গলবুদ্ধি। এ বিষয়টা অতি বিশদভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে 'সৌন্দর্যবোধ' নামক প্রবন্ধটিতে। তাতে দেখি রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়ার শিল্পসৌন্দর্যের প্রসঙ্গে অশোকের মঙ্গলসাধনব্রতের কথাই উত্থাপন করেছেন (বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ পৌষ)। এই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্‌ধৃত করি।—

"সৌন্দর্য যেখানেই পরিণতি লাভ করিয়াছে সেখানেই সে আপনার প্রগল্‌ভতা দূর করিয়া দিয়াছে। সেখানেই ফুল আপনার বর্ণগন্ধের বাহুল্যকে ফলের গূঢ়তর মাধুর্যে পরিণত করিয়াছে; সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্যের সহিত মঙ্গল একান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"সৌন্দর্য ও মঙ্গলের এই সম্মিলন যে দেখিয়াছে সে ভোগবিলাসের সঙ্গে সৌন্দর্যকে কখনোই জড়াইয়া রাখিতে পারে না। তাহার জীবনযাত্রা সাদাসিধা হইয়া থাকে; সেটা সৌন্দর্যবোধের অভাব হইতে হয় না, প্রকর্ষ হইতেই হয়। অশোকের প্রমোদ-উদ্যান কোথায় ছিল? তাঁহার রাজবাটীর ভিতের কোনো চিহ্নও তো দেখিতে পাই না। কিন্তু অশোকের রচিত স্তূপ ও স্তম্ভ বুদ্ধগয়ায় বোধিবটমূলের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শিল্পকলাও সামান্য নহে। যে পুণ্যস্থানে ভগবান্‌ বুদ্ধ মানবের দুঃখনিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, রাজচক্রবর্তী অশোক সেইখানেই, সেই পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রেই, কলাসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিজের ভোগকে এই পূজার অর্ঘ্য এমন করিয়া দেন নাই।" —সৌন্দর্যবোধ (১৯০৬)। 'সাহিত্য'

অশোক শুধু যে বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের মঙ্গলময় স্মরণক্ষেত্রকেই কলাসৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন তা নয়। বস্তুত বুদ্ধদেবের স্পর্শপূত প্রত্যেকটি স্থানকেই অশোক সৌন্দর্যসৃষ্টির দ্বারা স্মরণীয় করে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ গৌতমবুদ্ধের জন্মক্ষেত্র লুম্বিনিগ্রাম এবং ধর্মচক্রপ্রবর্তনক্ষেত্র সারনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪

রবীন্দ্রনাথ অনেকস্থলেই অশোকের নাম করেন না, কিন্তু অশোকের কথা স্মরণ করেই যে তিনি মন্তব্য করছেন তাও অস্পষ্ট থাকে না। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে (প্রবাসী, ১৩১৯ বৈশাখ) একস্থানে তিনি মন্তব্য করেছেন—

"যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন, তখনও ধর্মসমাজে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এ ভেদ লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তখন সমাজে আর সমস্ত ভেদই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তখন ক্ষত্রিয়েরা জনসাধারণের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলাইয়া গিয়াছিল।" —ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা (১৯১২)। 'পরিচয়'

'বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন' বলতে যে অশোকের রাজত্বকালই সূচিত হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। এ অনুমানের পক্ষে সন্দেহাতীত প্রমাণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, ধর্মসমাজের এই বিভাগের উল্লেখ। অশোকের অনুশাসনগুলিতে পুনঃপুনই ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের কথা পাওয়া যায় এবং এই শব্দ দুটিও প্রায় সর্বত্রই একত্র সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। যেমন, তৃতীয় পর্বতলিপিতে আছে 'বাহ্মণসমনানং সাধু দানং'। আর, এ কথাও সত্য যে, অশোক-অনুশাসনে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ ছাড়া অন্য প্রকার সমাজভেদের কথা নেই বললেই হয়; ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বিভাগগুলির যে কিছুমাত্র উল্লেখ নেই তাও সত্য। তবে, অশোকের আমলে ব্রাহ্মণ-শ্রমণ ছাড়া 'আর সমস্ত ভেদই লুপ্তপ্রায়' হয়েছিল কি না, বিশেষত ক্ষত্রিয়রা জনসাধারণের

মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিল কি না, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা সম্ভব নয়। যাহোক, 'বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন' যে অশোকের রাজত্বকালেরই জ্ঞাপক তাতে দুইমত হতে পারে না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ অশোককে বিশেষভাবে বৌদ্ধনৃপতি এবং তাঁর রাজত্বকালকে বিশেষভাবে বৌদ্ধযুগ বলে মনে করতেন, এই অনুমানের হেতু আছে। ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁর পূর্বোক্ত পুস্তকে অশোককে THE BUDDHIST EMPEROR OF INDIA এই বিশেষণের দ্বারা চিহ্নিত করেছেন ; রিস্ ডেভিড্স্ও তাঁর বইএর নাম দিয়েছেন *Buddhist India* ; সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম' বইতে অশোককে বৌদ্ধরাজা রূপেই উপস্থাপন করেছেন। আমার মনে হয়, এসব কারণেই রবীন্দ্রনাথও বৌদ্ধযুগ বলতে বিশেষভাবে অশোকের রাজত্বকালের কথাই মনে করতেন। এরকম যে মনে করতেন তার প্রমাণ দিচ্ছি।

১৯১২ সালে ইউরোপযাত্রার প্রাক্‌কালে 'যাত্রার পূর্বপত্র' নামে এক প্রবন্ধে (তত্ত্ববোধিনী, ১৩১৯ আষাঢ়) রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেন।—

১"বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনোকালে হয় নাই।"

—যাত্রার পূর্বপত্র (১৯১২)। 'পথের সঞ্চয়'

এখানে 'বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কাল' বলতে যে অশোকের রাজত্বকালকেই বোঝাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। শিল্প ও সাম্রাজ্যশক্তির চরম বিকাশের কথাতেও এই অনুমানই সার্থক হয়। উক্ত প্রবন্ধেরই আর-এক অংশে এ সিদ্ধান্তের দৃঢ়তর সমর্থন পাওয়া যায়—

"বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে যখন প্রেমের সেই ত্যাগধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল তখনি সমাজে তাহার এমন-একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল যাহা সম্প্রতি য়ুরোপে দেখিতেছি। রোগীদের জন্য ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা, এমন কি পশুদের জন্যও চিকিৎসালয় এখানে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং জীবের দুঃখনিবারণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল ; তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করিয়া ধর্মাচার্যগণ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া পরদেশীয় ও বর্বরজাতীয়দের সদ্‌গতির জন্য দলে দলে এবং অকাতরে দুঃখ বহন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখরূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীর্যবান্ মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষা দান করিয়াছিল। সেজন্যই ভারতবর্ষ সেদিন ধর্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে, পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল। তখন য়ুরোপের খ্রীস্টানসভ্যতা স্বপ্নের অতীত ছিল।"

নামত উল্লিখিত না হলেও অশোকের রাজত্বই যে এই অংশটুকুর লক্ষ্য সে কথা বলে দেবার অপেক্ষাও নেই। কাব্যের আবেগস্পর্শহীন সরল পরিস্রুত ভাষায় অশোক-রাজত্বকালের ইতিহাসকে অতি সংহত আকারে এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এটুকু পড়তে পড়তে কোনো কোনো স্থলে অশোকের বাণী যেন কানে ধ্বনিত হতে থাকে ; অশোকানুশাসনের অনেক কথাই যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষার মধ্যে নবজন্ম পরিগ্রহ করে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। অশোকের দ্বিতীয় পর্বত-লিপিতে আছে—

"সর্বত বিজিতমহি দেবানং প্রিয়স রাঞো এবমপি প্রচংতেসু· ·দ্বে চিকীছা কতা, মনুসচিকীছা চ

পস্নচিকীছা চ। ওসুধানি চ মনুসোপগানি চ পসোপগানি চ যত যত নাস্তি সর্বত্র হারাপিতানি চ রোপাপিতানি চ। মূলানি চ ফলানি চ যত যত নাস্তি সর্বত্র হারাপিতানি চ রোপাপিতানি চ। পংথেসু কূপা চ খানাপিতা ব্রছা চ রোপাপিতা পরিভোগায় পসুমনুসানং॥"

এর অর্থ॥ দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোকের) রাজ্যের সর্বত্র এবং প্রত্যন্ত (অর্থাৎ প্রতিবেশী) রাজ্যগুলিতেও মানুষ ও পশুর জন্য দ্বিবিধ চিকিৎসা-ব্যবস্থা করা হয়েছে॥ মানুষ এবং পশুদের উপযোগী তরুগুল্মাদিও যেখানে যেখানে নেই সেইসব স্থানেই এনে রোপণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ফল-মূলও যেখানে যা নেই সেখানে তা এনে রোপণ করা হয়েছে। পশু ও মানুষের পরিভোগের জন্য পথে পথে কূপ খনন ও বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে॥

অশোক যে সর্বমানবের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণসাধনাকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন, এ কথা তাঁর অনুশাসনের নানা স্থানেই পাওয়া যায়। আর, অস্ত্রশক্তির দ্বারা দিগ্‌বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মশক্তির দ্বারা বিশ্ববিজয়ই অশোকের অনুশাসনাবলী তথা তাঁর জীবনাদর্শের মূল কথা, তাও সর্বজনবিদিত। এসব কথার সমর্থনে অশোকবাণী বহুলপরিমাণে উদ্‌ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। ত্রয়োদশ পর্বতলিপি থেকে দু-একটি উক্তির উদ্‌ধৃতিই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। যেমন, 'এযে চ মুখ্‌মুতে বিজয়ে দেবনং প্রিয়স যে ধংসবিজয়ে।··যে হিদলোকিক্য-পারলোকিক্যে'। অর্থাৎ, অশোকের মতে ধর্মবিজয়ই শ্রেষ্ঠ বিজয়, তাতে ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকেরই কল্যাণ হয়।

তৎকালে বৌদ্ধ ধর্মাচার্যগণের অকাতর দুঃখবহনের ফলে কি ভাবে 'বর্বর জাতীয়দের সদ্‌গতি' সাধিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকের অভিমত উদ্‌ধৃত করি—

"The missions of King Asoka are amongst the greatest civilizing influences in the world's history ; for they entered countries for the most part barbarous and full of superstition, and amongst these animistic peoples Buddhism spread as a wholesome leaven." —L. J. Saunders, *The Story af Buddhism* (১৯১৬)। পৃ ৭৬

বৌদ্ধযুগে অর্থাৎ অশোকের সময়ে ভারতবর্ষীয় সমাজে যে প্রেমমূলক ত্যাগধর্মের বিকাশ ঘটেছিল, আধুনিক যুগে তার প্রতিরূপ দেখা যায় সাম্প্রতিক য়ুরোপের খ্রীস্টান সভ্যতার মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির পক্ষেও ইংরেজ ঐতিহাসিকের সমর্থন পাওয়া যায়।

অশোকের রাজত্বে (খ্রী-পূ ২৭২-৩২) চিকিৎসা ও আরোগ্যদানের দ্বারা মানুষ ও পশুর সেবার যে আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল, তা ভারতবর্ষের চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল এবং তার প্রভাবও স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘকাল। অশোকের তিরোধানের ছয় শত বৎসরেরও অধিক কাল পরে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে (খ্রী ৩৮০-৪১৩) চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ান ভারতবর্ষে আসেন। তিনি এদেশে ছিলেন মোট ছয় বৎসর (খ্রী ৪০৫-১১), তার মধ্যে তিন বৎসরই কাটান মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, সে সময়ে পাটলিপুত্রে একটি অতি উৎকৃষ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল; এটি পরিচালিত হত দেশের শিক্ষিত উদারহৃদয় ব্যক্তিদের সমবেত অর্থসাহায্যে; রাজ্যের সমস্ত দরিদ্র ও অসহায় লোকেরা এখানে আসত সর্ববিধ রোগের চিকিসার জন্যে; রোগের উপশম না হওয়া পর্যন্ত রোগীরা এখানেই থাকত এবং প্রত্যেকেই তার প্রয়োজনমত ওষুধ ও পথ্য দুইই পেত বিনামূল্যে; রোগীদের

সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও ছিল খুব ভালো। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা এই—

"It may be doubted if any equally efficient foundation was to be seen elsewhere in the world at that date; and its existence, *anticipating the deeds of modern Christian charity*, speaks well both for the character of the citizens who endowed it, and for the genius of *the great Asoka, whose teaching still bore such wholesome fruit* many centuries after his decease."

—*Early History of India* (চতুর্থ সং)। পৃ ৩১২-১৩

আলোচ্যমান প্রসঙ্গের পক্ষে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় কথাগুলিও বক্রাক্ষরে চিহ্নিত করে দিলাম। যা হোক, স্মিথের এই অভিমত থেকে প্রতিপন্ন হয়ে যে, আধুনিক ইউরোপের খ্রীস্টান সভ্যতার প্রেম ও ত্যাগের মহান্ আদর্শ অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের যুগেই এদেশের সমাজে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ঐতিহাসিক সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত 'যাত্রার পূর্বপত্র' থেকে যে দুটি অংশ উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যে কল্পনা ও ভাবাবেগের স্পর্শমাত্রও নেই, আছে নিছক ঐতিহাসিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত একান্তরূপে বাস্তব জীবনাদর্শগত গভীর চিন্তার ছাপ।

রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকে একমাত্র বুদ্ধদেব ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোনো প্রাচীন ঐতিহাসিক ব্যক্তিই বোধ করি অশোকের মত এমন অকুণ্ঠ ও অজস্র প্রশস্তির অঞ্জলি লাভ করতে পারেন নি।

বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্র

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

মানুষ চিরদিনই কৌতূহলী। তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সংসারে অনন্তশাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। মূর্তিশাস্ত্র সেই অনন্তশাস্ত্রের অন্যতম। যেথানে দেথা যায় সেইথানেই মূর্তি রহিয়াছে। নানা প্রকারের মন্দির নানাস্থানে রহিয়াছে। প্রত্যেকটির ভিতর এক বা ততোধিক মূর্তির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। নানান দেশের যাদুঘরে নানান মূর্তি সংরক্ষিত রহিয়াছে। কথনও কথনও ঘরের ভিত খুঁড়িবার সময়, কথনও-বা পুষ্করিণী খনন করিবার সময়, কথনও-বা নদীর জলে জমি ধ্বসিয়া যাইবার সময়, কথনও পুরাতন শহরের খোদকাজের সময় মূর্তি বাহির হইয়া থাকে। সেই মূর্তিগুলি কি, কোন্ দেবদেবীর, সেগুলি কোন্ সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল, কোন্ ধর্ম অনুসারে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের হাতের অস্ত্রশস্ত্রগুলি কি এবং কেন দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলির শিল্পকর্ম কি ধরনের, এবং তাহার সহিত অন্য শিল্পের সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে এবং দর্শকের মনে স্বতঃই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। মূর্তিশাস্ত্র এইসকল নানামুখী প্রশ্নের উত্তর দিবার যথাসাধ্য প্রয়াস করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন মন্দিরে, বিভিন্ন যাদুঘরে এবং বিভিন্ন পুরাতন শহর খুঁড়িবার সময় প্রাপ্ত মূর্তি সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। এই ভাগগুলি প্রধানতঃ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম অনুসারে করা হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন, এই তিন ধর্মের অনুযায়ীরা নানাপ্রকারের মূর্তির কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং ভাস্কর দ্বারা বহুবিধ মূর্তি প্রস্তুত করাইয়া মুখ্য ও গৌণ দেবদেবী রূপে মন্দিরে সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। মূর্তিশাস্ত্রের সেইজন্য প্রধান কর্তব্য, মূর্তিগুলি ধর্ম অনুসারে বিভাগ করা এবং মূর্তিগুলির কোন্‌টি হিন্দু, কোন্‌টি বৌদ্ধ, এবং কোন্‌টি জৈন তাহা ঠিক করা।

মূর্তি বলিতে আমরা একটি প্রতীক বা নিদর্শন বলিয়া মনে করি। এই প্রতীক কোন্ ধর্মের, কোন্ সভ্যতার, কোন্ দর্শনের এবং কোন্ তত্ত্বের তাহা ঠিক করা মূর্তিবিদের কার্য। হিন্দু ও জৈন মূর্তি ছাড়িয়া দিয়া এথানে কেবল বৌদ্ধমূর্তির পরিচয় দেওয়া হইবে। বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্রও এক প্রকাণ্ড সমুদ্র বিশেষ; এস্থলে বিস্তারিত বিবেচনা করা সম্ভবপর নহে। তাই মোটামুটি এবং অতি প্রয়োজনীয় গুটিকতক তথ্যই প্রকাশ করা যাইতে পারে।

এক কথায় মূর্তি দেখিলেই তাহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া শাস্ত্রের মুখ্য উপকারিতা, তাহা বোধ হয় পাঠকদের বলিয়া দিতে হইবে না। এই আলোচনা যে শুধু শিক্ষার্থীগণের উপকারে আসিবে তাহা নহে, যাঁহারা মূর্তি লইয়া নাড়াচাড়া করেন এমন প্রত্নতাত্ত্বিকগণেরও কাজে লাগা সম্ভব।

মালমসলা

মূর্তিশাস্ত্রের মালমসলা দুই তরফ হইতে পাওয়া যায়। এক তো পাওয়া যায় নানাপ্রকারের প্রস্তর-নির্মিত, ধাতুনির্মিত মূর্তি হইতে এবং মন্দিরে বা পুঁথিতে অঙ্কিত ছবি হইতে; দ্বিতীয় প্রকারের

মালমসলা পাওয়া যায় বৌদ্ধ সাহিত্য, ধর্ম ও তন্ত্র গ্রন্থ হইতে। এইসকল গ্রন্থে দেবদেবীর নানা-প্রকারের ধ্যান এবং মূর্তিকল্পনা পাওয়া যায়। পুস্তক হইতে প্রাপ্ত ধ্যানের সঙ্গে যখন প্রস্তর বা ধাতুমূর্তি সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায় তখনই মূর্তির আসল পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে মূর্তির ধ্যানের সহিত প্রস্তর- বা ধাতু- মূর্তির এতটুকুও তফাত থাকা উচিত নহে। যদি থাকে তাহা হইলে দেবতার পরিচয় অসম্পূর্ণ এবং সময়ে সময়ে ভ্রান্ত হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্রের ভিত্তি বস্তুতঃ একখানি তন্ত্রগ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রন্থের নাম সাধনমালা। যতগুলি পুঁথি সাধনমালার পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে একখানি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। এই পুঁথিখানি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিমালায় রক্ষিত আছে। পুঁথিখানির একটি পাতায় নেবারী সংবতে গ্রন্থ সংগ্রহের তারিখ দেওয়া আছে। এই তারিখটি ২৮৫ নেবারী সংবৎ অর্থাৎ খৃস্টাব্দ ১১৬৫। সাধন-মালায় ৩১২টি সাধনায় অগণিত দেবদেবীর বর্ণনা, মূর্তির ধ্যান এবং পূজাপদ্ধতি, মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রয়োগাদি দেওয়া আছে। এই পুস্তকখানি বরোদার গায়কবাড ওরিয়েন্টাল সিরিজে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন সে পুস্তক নিঃশেষিত এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

আর একখানি বিশেষ দামী পুঁথি নিষ্পন্নযোগাবলী। এ পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন একজন প্রাচীন বাঙালি পণ্ডিত। তাঁহার নাম মহাপণ্ডিত অভয়াকর গুপ্ত। তিনি বিক্রমশীল মহাবিহারে গবেষণার কার্য করিতেন, এবং বিস্তর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সময় ১১৩০ খৃস্টাব্দের সন্নিকটে। নিষ্পন্নযোগাবলীতে প্রায় ছয় শত দেবদেবীর বিবরণ দেওয়া আছে, এবং প্রত্যেকটি মূর্তিকল্পনা মূর্তিবিৎদিগের কাছে মহা মূল্যবান।

প্রস্তরের মূর্তি, ধাতুমূর্তি ও চিত্রে অঙ্কিত মূর্তি প্রায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের যে যে স্থানে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, কিংবা যে যে স্থানে বৌদ্ধপন্থী রাজাদের রাজত্ব ছিল, সেইসকল স্থান হইতেই মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। বহুস্থানে প্রাচীন ভগ্নাবশেষ খুঁড়িয়া বাহির করিবার সময়ও প্রচুর বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সারনাথ, ওদন্তপুরী বিহার, বিক্রমশীল বিহার, কুক্কুটপাদগিরি, নালন্দা, বুদ্ধগয়া, পাহাড়পুর, মহোৎসবপুর বা মহোবা, কুশীনগর, শ্রাবস্তী ইত্যাদি বহুস্থানের খনন-কার্য করিবার সময় অগণিত মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া রাস্তায়-ঘাটে, দেওয়ালে, মন্দিরে যে কত বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। বাংলায় বিহারে আসামে উড়িষ্যায় এবং উত্তরপ্রদেশে এইরূপ বহু মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্তিগুলি মূর্তিশাস্ত্রবিৎ-দিগের এবং ভারতবাসীদের বহুমূল্য সম্পদ। বড়ই সুখের বিষয় যে, মূর্তিগুলি সযত্নে সরকারী যাদুঘর-গুলিতে রক্ষিত হইতেছে। সরকারী যাদুঘরগুলির মধ্যে কলিকাতা পাটনা লক্ষ্ণৌ সারনাথ নালন্দা ও ঢাকার যাদুঘরই উল্লেখযোগ্য। এইগুলিতে নানাপ্রকারের বিচিত্র বৌদ্ধমূর্তি সংরক্ষিত রহিয়াছে। রাজসাহী, খিচিঙ, ও ময়ুরভঞ্জের যাদুঘরগুলিতেও কিছু কিছু বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশি ও বিভিন্নপ্রকারের দেবতামূর্তি, চিত্র, প্রস্তর- ও ধাতু- মূর্তি এবং বৌদ্ধ সাহিত্য দর্শন ও তন্ত্রের সংগ্রহ কেবল নেপালেই দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, নেপালে এখনও বৌদ্ধধর্ম জীবিত অবস্থায় বর্তমান। সেইজন্য এই স্থানে মহাযানী ও বজ্রযানী বৌদ্ধদিগের সংখ্যা অনেক বেশি। তাঁহারা এখনও শাস্ত্রোক্ত রীতিতে পূজা পাঠ ইত্যাদি করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেকের ঘরেই কিছু-না-কিছু দেবপ্রতিমা পূজার জন্য রক্ষিত থাকে। কাঠমাণ্ডুতে এবং নিকটবর্তী ললিতপত্তন

শহরে শত শত বৌদ্ধ মঠ ও বিহার আছে। এইসকল বিহার এক-একটি যাদুঘর বিশেষ। কোনো কোনো বিহারে পাঁচশতাধিক প্রস্তর- ও ধাতু- মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্তিবিৎদিগকে এইসকল বিহারগুলি স্বর্গের আনন্দ দিয়া থাকে। যেসকল মূর্তি কোথাও পাওয়া না, যেসকল দেবতা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইসকল মূর্তি ও দেবতা নেপালের বিহারগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কম ভাগ্যের কথা নহে।

তিব্বত, চীন, মাঞ্চুরিয়াতে বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম প্রবেশলাভ করিয়াছিল। এইসকল দেশের বজ্রযানী বৌদ্ধেরা মূর্তিপূজক হিসাবে ভারতীয়দিগের শিষ্য ছিল, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মাঞ্চুরিয়ার পিকিঙ শহরে রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন কয়েকটি মন্দির আছে। এই মন্দিরে প্রায় দুই সহস্র বৌদ্ধদেবতার ধাতুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্তিগুলির নিম্নে চীন ও তিব্বতী ভাষায় তাহাদের নাম খোদাই করা আছে। এই মূর্তিগুলির ছায়াচিত্র আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ওয়াল্‌টার ইউজিন ক্লার্ক সাহেবের নিকট পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। তিনি গবেষণা করিয়া মূর্তিগুলির উপর একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পুস্তকখানির নাম *Two Lamaistic Pantheons,* ইহা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। মূর্তিশাস্ত্রের গবেষকদিগের নিকট এই পুস্তক একটি অমূল্য সম্পদ। দেখা গেল যে পিকিঙের এই মূর্তিগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয় ছাঁচে প্রস্তুত এবং নিষ্পন্নযোগাবলীতে প্রদত্ত ধ্যান অনুসারেই শিল্পীরা বেশির ভাগ মূর্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও তিব্বতে বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়, তাহাদের ভিতর কতক কতক ভারতবর্ষে লোপ পাওয়া সত্ত্বেও তিব্বতে রক্ষিত আছে। চীন জাপান মঙ্গোলিয়াতেও কিছুকিছু বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। এগুলির রূপকল্পনা ভারতেই হইয়াছিল। তাহা ছাড়া খাঁটি তিব্বতী, চৈনিক, জাপানী, মাঞ্চুরীয় মূর্তি প্রচুর তৈয়ারি হইয়াছিল এবং এখনও পাওয়া যায়। এ বিষয়ে এস্থানে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

দেবদেবীর উৎপত্তি

এখন বিচার করা যাক, বৌদ্ধ দেবদেবীর উৎপত্তি কি প্রকারে হইল এবং কি ভাবেই বা তাহাদের মূর্তি কল্পিত হইল। এই বিষয় অনুধাবন করিতে হইলে বৌদ্ধ তন্ত্রসাহিত্যের শরণাপন্ন হইতে হয়। বৌদ্ধ তন্ত্র মতে সৃষ্টির আদি ও অকৃত্রিম উৎপত্তি স্থল একমাত্র শূন্য। এই শূন্যের অর্থ সৎ, বিজ্ঞান ও মহাসুখ, অর্থাৎ শূন্য চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। এই শূন্য ঘনীভূত হইয়া প্রথমে শব্দরূপে দেখা দেন এবং পরে শব্দ হইতে পুনরায় ঘনীভূত হইয়া দেবতারূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদের আদি তন্ত্র গুহ্যসমাজগ্রন্থে এই বিবর্তনের একটি জাঁকালো বিবরণ দেওয়া আছে। সেখানে দেখা যায়, কায়বাক্‌চিত্তবজ্র সমাধিগ্রহণ করিতেছেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাধিতে সমাধিস্থ হইবার পর এক-একটি শব্দ উত্থিত হইতেছে। এবং এই ধ্বনি ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া এক একটি ধ্যানিবুদ্ধ আকারে পরিণত হইতেছে।

শূন্য জগতের কারণরূপে আপনাকে প্রথমে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। এইগুলিই স্কন্ধ-নামে পরিচিত এবং হিন্দুদিগের পঞ্চভূতের ন্যায় জগৎকারণরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এই পঞ্চস্কন্ধের নাম রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই পঞ্চস্কন্ধও অনাদি অনন্ত কাল হইতে বিদ্যমান এবং স্বভাব তাহাদের শূন্যাত্মক। কর্মবশে যখন এই পাঁচ স্কন্ধ একত্র হয় তখনই দৃশ্যমান জীবে পরিণত হইয়া থাকে।

শূন্যকে বজ্রযানে 'বজ্র' আখ্যা দেওয়া হয়। তাহার কারণ শূন্য বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, সারবান্‌, ছিদ্ররহিত, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহী ও অবিনাশী। শূন্যের নামই বজ্র এবং যে যানে শূন্যের সহিত মিলিত হওয়া যায় তাহাকেই শূন্যযান বা বজ্রযান বলা হয়। বজ্রযানের অনুগামীরা এক পৃথক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

দেবমূর্তির দর্শন ও দেবদেবীর পূজা বজ্রযানের এক বিশেষত্ব। যেহেতু দেবতার দর্শন না হইলে তাঁহাদের রূপ জানা যায় না, তাই তাঁরা দেবতার দর্শনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু দেবতার দর্শন সহজসাধ্য নয়। ইহার জন্য দরকার অধ্যাত্মজ্ঞান, আত্মোন্নতি এবং আধ্যাত্মিক সাধনা। সেইজন্য সাধনা-মার্গে বজ্রযানীরা এককালে ব্রতী হইয়াছিলেন। সাধনার জন্য দরকার হয় শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা এবং দেবতা-দর্শনের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ। জগৎ শূন্যময় বলিয়া সতত ভাবনা, এবং জগতের কল্যাণের জন্য সতত করুণার্দ্রচিত্ত হওয়াও এই সাধনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহাদের এই গুণগুলি আছে তাঁহারা বৌদ্ধই হউন বা অন্য ধর্মাবলম্বীই হউন, দেবতা দর্শন করিতে সক্ষম হন।

প্রথমতঃ শরীরশুদ্ধি করিয়া একটি পবিত্র ও নির্জন স্থানে বসিয়া সাধনা করিতে হয়। যে দেবতার দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষা হয় সেই দেবতার মন্ত্র জপ করিতে হয়, এবং তাহার বীজমন্ত্র হৃদয়দেশে চিন্তা করিতে হয়। কিছুদিন অভ্যাসের পর চিত্ত স্থির হয় এবং সাধনার সময় দেবতা ছাড়া ও তাহার মন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো দিকে মন ধাবিত হয় না। তাহার পর দৃঢ়চিত্তে একান্তমনে ধ্যান ও জপ করিতে করিতে জাপক ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যান। যখন ইন্দ্রিয়াদি বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় তখন তাহাকে সমাধি বলে। এই সমাধিতে সম্পূর্ণ সুষুপ্তি অবস্থা আনয়ন করে। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থায় মানব তাহার সময় যাপন করিয়া থাকে। জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয় বহির্জগতের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রাখিয়া থাকে; স্বপ্ন অবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল সক্রিয় থাকে; কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় কোনোরূপ চেতনা থাকে না। এই সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয় এবং সেই সময় মানব শক্তির ভাণ্ডার পরমাত্মার নিকট হইতে নিজের প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করিয়া থাকে। বৌদ্ধদের কথায় জীবাত্মা বোধিচিত্ত বা করুণা ও পরমাত্মা শূন্য, বজ্র বা আদিবুদ্ধ।

যখন সাধক দেবতা-দর্শনের উদ্দেশ্যে ধ্যান ও জপ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, তখন তাহার বোধিচিত্ত শূন্যের সহিত মিলিত হয়। শূন্যের সহিত মিলিত হইবার পর ক্রমশঃ পাঁচ প্রকারের নিমিত্তের দর্শন হইয়া থাকে। প্রথমে চিত্তাকাশে মরীচিকার দর্শন হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে ধূমের আকার দর্শন হইয়া থাকে, তৃতীয় পর্যায়ে খদ্যোতিকার ন্যায় আলোকবিন্দুর দর্শন হয়, চতুর্থ পর্যায়ে একটি দীপালোকের ন্যায় দৃশ্য দেখা যায়, এবং পঞ্চম বা শেষ পর্যায়ে সতত আলোক দেখিতে পাওয়া যায়— সেটা দেখিতে সম্পূর্ণ মেঘশূন্য আকাশের ন্যায়।

এইরূপে ক্রমশঃ ধ্যানমার্গে অগ্রসর হইলে পূর্ণসমাধি আসে, এবং সেই সময়ে সাধক হঠাৎ যে দেবতার সাধনা করিতেছে সেই দেবতার দর্শন লাভ করে। আরও এই মার্গে অগ্রসর হইলে দেবতাকে সর্বদাই দেখিতে পায় এবং নিজেকেও সেই দেবতারূপে অনুভব করিতে পারে। এবং এই দেবতাযোগের ফলে উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করে এবং নানাপ্রকার লৌকিক ও অনুত্তর সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

জগৎকারণ শূন্য সদাসর্বদা পবিত্র ও শুদ্ধ স্বভাব। তাহার কোনোরূপ বাসনা নাই। বোধিচিত্ত

বাসনাযুক্ত এবং অনেক প্রকারের। বাসনার তীব্রতায় শূন্য ভাবনা করিলে শূন্যের যে বিকার হয় তাহা সেই বাসনা অনুযায়ীই হইয়া থাকে। এক বাসনায় যেমন এক দেবতার দর্শন হয়, সেইরূপ অন্য প্রকারের বাসনায় অন্য প্রকার দেবতার উদ্‌ভব হইয়া থাকে। এইরূপ নানাপ্রকারের বোধিচিত্ত হইতে নানাপ্রকার দেবদেবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাসনার যেহেতু অন্ত নাই, সেই হেতু দেবতাও অনন্ত। এই অনন্ত দেবতা লইয়াই দেবসংঘ গঠিত হয়।

কিন্তু দেবতা যতই হউক না কেন, তাহাদের উৎপত্তিস্থান কিন্তু এক অনাদি-অনন্ত শূন্যতা বা বজ্র। ভাবনাবশে শূন্যে স্ফোট বা বুদ্‌বুদ হইয়া থাকে এবং তাহাকে বৌদ্ধেরা 'স্ফূর্তি' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। শূন্যের এই স্ফূর্তিই দেবতারূপে দেখা দেন, কিন্তু তাঁহারা স্বভাবতঃই নিঃস্বভাব, ঠিক শূন্যেরই মত। তাই দেবতারা শূন্যাত্মিকা। বৌদ্ধতন্ত্রে বলে, সাধনা করিলে প্রথমে শূন্যতার বোধ হয়, দ্বিতীয়ে বীজমন্ত্রের দর্শন হয়, তৃতীয়তঃ বীজমন্ত্র হইতে বিম্ব অথবা দেবতার অস্পষ্ট আকার দেখা যায়, এবং অবশেষে দেবতার সুস্পষ্ট মূর্তি দর্শন হইয়া থাকে। সে মূর্তি অতি মনোহর, সর্বাঙ্গসুন্দর, কল্পনার অতীত, দিব্য বর্ণে রঞ্জিত এবং নানাপ্রকার দিব্য বস্ত্র অলংকার ও অস্ত্রশস্ত্রে শোভিত। একবার দেখিলে তাহা আর জীবনে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

সংক্ষেপে ইহাই বৌদ্ধ দেবতার উৎপত্তির কথা। দেবতা-দর্শন একটা আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাপার। ইহার জন্য অনেক সময় দিতে হয়, অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, সংযম করিতে হয়, অনেক যোগযাগাদি অভ্যাস করিতে হয়। দেবতার সাধনা যাহারা করিত তাহারা সারাজীবনই এই কার্যে ব্যাপৃত থাকিত। ইহা ছিল তাহাদের মুখ্য পেশা। দেবতা-দর্শনকে কিংবা সাধনাকে গৌণ পেশা করা যায় না, করিলেও সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।

দেবতা-দর্শনের পশ্চাতে এক বিরাট দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। তবে ইহা সকলের জন্য প্রশস্ত মার্গ নহে। ইহা সাধকের মার্গ, যোগীর মার্গ।

মূর্তিপূজার ইতিহাস

বৌদ্ধধর্মের দুইটি মুখ্য বিভাগ আছে। একটি হীনযান ও অপরটি মহাযান। কালক্রমে এই দুটি যান প্রায় দুইটি বিভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত হইয়াছিল। হীনযান পুরাতন এবং মহাযান আধুনিক। হীনযান বুদ্ধের বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মহাযান দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দুইটি পন্থের ভিতর নানারূপ বিভেদ আছে। কিন্তু মুখ্যতঃ একটিরই উল্লেখ এখানে করা দরকার। হীনযানে নিজের মুক্তিই প্রধান লক্ষ্যবস্তু, কিন্তু মহাযানে নিজের মুক্তির স্থান নাই। জগতের সকল মনুষ্য পশুপক্ষী ইত্যাদির মুক্তি আগে, তার পর নিজের মুক্তি। জগৎ যতক্ষণ বন্ধনাবস্থায় থাকে ততক্ষণ তাহাদের মুক্তির জন্য প্রয়াস ও সর্বপ্রকারে ত্যাগ স্বীকার করাই বোধিসত্ত্বের প্রধান কার্য।

হীনযানে দেবদেবীর বালাই নাই। এমনকি বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের মূর্তি পর্যন্ত বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় চারি শত বৎসরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌতম বুদ্ধ মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ভ্রাতা নন্দ যখন তাঁহাকে প্রণাম করেন তখন বুদ্ধ তাঁহাকে

নিবৃত্ত করিয়া বলেন, প্রণামাদি দ্বারা তিনি সুখী হইবেন না। তিনি সুখী হইবেন তখনই যখন নন্দ পূর্ণ উদ্যমে সদ্ধর্মের পালন করিবে।

হীনযানে কিছুকিছু হিন্দু দেবতার নাম পাওয়া যায়। বুদ্ধ যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন সেই সময় ইন্দ্র এবং ব্রহ্মা আসিয়া সেই দিব্যজ্ঞান পৃথিবীতে প্রসার করিতে অনুরোধ করেন। তাহা ছাড়া ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গরাজ্যেও দেবতাদের বাস ছিল। কুবের ও বসুধারার নামও দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রাচীন শিল্প সম্প্রদায়ে যদিও বুদ্ধের মূর্তি দেখা যায় না, তথাপি বুদ্ধের ব্যবহৃত বস্তুর ও প্রতীকের মূর্তি অনেক জায়গায় পাওয়া গিয়াছে। বুদ্ধের পাগড়ি পদচিহ্ন বোধিবৃক্ষ ধর্মচক্র ইত্যাদি বহুবিধ চিহ্ন পাথরে খোদা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বুদ্ধগয়া সাঁচী ভারুত ও অমরাবতীর শিল্পই প্রধান। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতক হইতে প্রথম শতকের মধ্যে এই সম্প্রদায়গুলি গঠিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। খৃস্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত করা হয় নাই। তাহার বদলে তাঁহার প্রতীকগুলিকেই প্রস্তরে খোদাই করিয়া রূপ দেওয়া হইয়াছিল। বুদ্ধগয়ার বুদ্ধের জীবন-বৃত্তান্তের ছবি, মায়াদেবীর স্বপ্ন এবং নানা প্রকারের যক্ষনাগের মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে।

বুদ্ধের মূর্তি কোন্ শিল্পে প্রথম তৈয়ারি হইয়াছিল, ইহা লইয়া নানা মুনির নানা মত আছে। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, গান্ধার ভাস্কর্যে গ্রীক বৌদ্ধেরা প্রথম ভগবান বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারি করিয়াছিলেন। আবার কোনো পণ্ডিত বলেন, মথুরা ভাস্কর্যও প্রথম বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারি করিবার দাবি করিতে পারে। তবে সব দিক অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, প্রথম বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারি করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভবপর নহে, কারণ উহা একটু অসম্মানকর। কাজেই বোধ হয় এ কার্যটি বিদেশীয় বৌদ্ধদিগের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল। এ বিষয়ে অধিক বিচার নিষ্প্রয়োজন।

গান্ধার ভাস্কর্যে মূর্তি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সবই বৌদ্ধ এবং বুদ্ধের কাহিনীর পরিবেশে নিবদ্ধ। বুদ্ধের নানারূপ মূর্তি নানা মুদ্রায় নানা ভাবে নানা অবস্থায় গান্ধারে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়াও জম্ভল মৈত্রেয় হারীতী এবং বোধিসত্ত্বদের মূর্তিও গান্ধারে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মথুরা ভাস্কর্যেও প্রায় এইসব মূর্তিই দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সেগুলির প্রস্তুতপ্রণালী ছাঁচ ও ঢঙ আলাদা। এখানেও বুদ্ধের নানা মুদ্রায় নানাবিধ মূর্তি, তাঁহার জীবনের দৃশ্যাবলী, কুবেরের মূর্তি এবং যক্ষ নাগাদির প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়। গান্ধার এবং মথুরা শিল্পকলার নিদর্শনগুলি অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে গুপ্ত-সময়ের পূর্ব পর্যন্ত হীনযানের প্রভাবই অধিক ছিল এবং মহাযানের দুই-একটি বোধিসত্ত্ব ছাড়া আর কোনো দেবতার বড় একটা লক্ষণ দেখা যায় না। গুপ্তকালেও এই অবস্থাই বিদ্যমান ছিল।

গুপ্তকালের বহু পরে পালেদের রাজত্বের সময় বাংলায় এবং বিহারে নানাপ্রকারের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে; এবং এই মূর্তিগুলি অধিকাংশই বজ্রযানের দেবতামণ্ডলের। এই মূর্তিগুলি হইতেই বুঝা যায় যে, বজ্রযান সে সময় পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং বজ্রযানের দেবদেবীরা বিশেষ লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। সারনাথে বিক্রমশীলায় ওদন্তপুরীতে কুর্কিহারে বুদ্ধগয়ায় রাঢ়দেশে পূর্ববঙ্গে আসামে ও উড়িষ্যায় অদ্ভুত অদ্ভুত মূর্তি তৈয়ারি হইয়াছিল; এবং এই মূর্তিগুলি ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যেসকল দেবতার মূর্তি এইসকল শিল্প-সম্প্রদায়ে দেখা যায়

তাহাদের মধ্যে ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর উচ্ছুষ্মজম্ভল মঞ্জুশ্রী তারা অবলোকিতেশ্বর বসুধারা মারীচী পঞ্চধ্যানিবুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব হেরুক পর্ণশবরী ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে।

বাংলা-বিহারের শিল্পকলা মুসলমান-আক্রমণের পর নেপালে গিয়া উপস্থিত হয়। বড় বড় পণ্ডিত তাঁহাদের পুঁথিপাঁজি, দেবতার বিগ্রহাদি লইয়া নেপালে পলায়ন করেন, এবং সেখানে গিয়া শত শত নূতন মঠ স্থাপন করেন। ইহাতেই কোনোরূপে বৌদ্ধধর্ম ও বজ্রযান বাঁচিয়া যায়। বজ্রযানের দেবদেবীরাও একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচেন। বাংলার শিল্পকলা নেবারী শিল্পকলার সংমিশ্রণে নূতন রূপ ধারণ করিয়া এক অপূর্ব শ্রীতে মণ্ডিত হয়। নেবারীরা যে কত সুন্দর সুন্দর মূর্তি গড়িয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। একবার নেপালে ভ্রমণ না করিলে তাহা কল্পনা করা অসম্ভব।

অজন্তা ইলোরা এবং বৌদ্ধ গুহাগুলিতেও কিছু কিছু বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা যে তান্ত্রিক বজ্রযানের দেবতাগুলির সহিত বিশেষ পরিচিত ছিল তাহা বোধ হয় না। হয়তো বজ্রযানের অভ্যুদয়ের পূর্বেই এইসকল গুহা নির্মিত হইয়াছিল। কিংবা বাংলা বিহার আসাম উড়িষ্যার বজ্রযান এতদূর তখন পর্যটন করিয়া উঠিতে পারে নাই।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে এই, তান্ত্রিক বজ্রযানের উৎপত্তিস্থান কোথায় ছিল। তিব্বতীদের ধর্মপুস্তকে বলে, তন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল উড্ডিয়ানে। এই উড্ডিয়ান যে কোথায় ছিল তাহার সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সাধনমালায় উড্ডিয়ান কামাখ্যা সিরিহট্ট ও পূর্ণগিরি এই চারিটি তন্ত্রের মুখ্য পীঠস্থান বলিয়া উল্লেখ আছে। এই চারিটি জায়গা বজ্রযোগিনীর পূজার জন্য বিখ্যাত ছিল। খুব সম্ভব এই চারিটি পীঠস্থানে বজ্রযোগিনীর একটি করিয়া মন্দিরও ছিল। আসামের কামাখ্যা বিখ্যাত; সিরিহট্ট আজকালকার শ্রীহট্ট; পূর্ণগিরি আসামস্থিত পূর্ণতীর্থের সহিত এক পর্যায়ে কেহ ফেলিয়া থাকেন। কিন্তু চারিটি পীঠস্থানের প্রধান পীঠ উড্ডিয়ানের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব এই উড্ডিয়ানের নাম কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া মূল নামটি লোপ হইয়া গিয়াছে। বিক্রমপুর পরগণায় একটি গ্রাম আছে তাহার নাম বজ্রযোগিনী। বজ্রযোগিনীর মন্দির বা পূজার প্রাধান্য এই গ্রামে ছিল বলিয়া এই বৌদ্ধ দেবী বজ্রযোগিনীর নামে গ্রামের নামকরণ করা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। বজ্রযোগিনী দেবীর সহিত উড্ডিয়ানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বজ্রযোগিনীর মন্দির তৈয়ারি হইবার পূর্বে গ্রামটির একটা নাম নিশ্চয় ছিল। সেই নামটি উড্ডিয়ান বলিয়া কল্পনা করাই সমীচীন। যদিও নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

কামাখ্যা সিরিহট্ট পূর্ণগিরি ও উড্ডিয়ানই তন্ত্রের আদি পীঠ। পূর্ববঙ্গ ও আসামই তন্ত্রের আদি স্থান। এই স্থানে তান্ত্রিক বজ্রযানের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং এই স্থান হইতেই নিকটবর্তী প্রদেশগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নালন্দা বিক্রমশীলা সারনাথ ওদন্তপুরী জগদ্দল ইত্যাদি বিদ্যাপীঠগুলিতে বজ্রযানের অনুশীলন হইত। সেসকল স্থানে তন্ত্র ও যোগ মার্গের উপদেশ দেওয়া হইত এবং ছাত্রও তৈয়ারি করা হইত। সমগ্র বাংলায়, বিহারে এবং উড়িষ্যায় বজ্রযানের প্রভাব অত্যধিক ছিল এবং এইসকল স্থানেই বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি সর্বাপেক্ষা বেশি পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ সাহিত্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর সাধনার কথা গুহ্যসমাজতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই তন্ত্রখানির রচনায় অসঙ্গের কিছু হাত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। অসঙ্গ খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বসুবন্ধু বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত। লামা তারানাথ নামক

এক তিব্বতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতের মতে তন্ত্রের উৎপত্তি পূর্বেই হইয়াছিল, কিন্তু প্রায় তিন শত বৎসর লুপ্ত অবস্থায় ছিল এবং গোপন ভাবে গুরুশিষ্যপরম্পরায় লুক্কায়িত ছিল। পাল-রাজত্বের সময় সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা উহা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বজ্রযানের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবলভাবে চলিয়াছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের আদিতে মুসলমান আক্রমণ হয় এবং সে সময়ে অনেক মঠ ও বিদ্যাপীঠ ধ্বংস হয়। তাহার পর হইতেই বজ্রযান ভারতে নিষ্প্রভ হইয়া যায় এবং কিছু কাল পরে বিলুপ্ত হয়। বজ্রযানের অনুযায়ীরা হয় হিন্দু সমাজে মিলিয়া যায়, নয় মুসলমান হইয়া যায়। চৈতন্যদেব অনেককে বৈষ্ণব করিয়া দেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও ধারণা ছিল বৌদ্ধদের ভিতর তন্ত্র ছিল না এবং তাহারা দেবদেবীর উপাসনা করিত না। কিন্তু এখন তন্ত্রসাহিত্যের গ্রন্থ কিছু-কিছু প্রকাশ হওয়ায় সে ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। এখনও সহস্র সহস্র বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। এইগুলি যতদিন না প্রকাশিত হয় ততদিন বজ্রযানের পূর্ণ স্বরূপ জানা সম্ভব হইবে না।

লেখকের প্রকাশিতব্য 'বৌদ্ধ দেবদেবী' গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাত।

মঙ্গল নাটগীত-পাঁচালি-কীর্তনের ইতিহাস

শ্রীসুকুমার সেন

ভারতীয় সাহিত্যে গৃহকল্যাণের অর্থে মঙ্গল শব্দের ব্যবহার ঋগ্‌বেদের কাল থেকে চলে এসেছে। যে সূর্যা-বিবাহের সূক্তটি (১০.৮৫) বিবাহের মন্ত্র রূপে প্রচলিত আছে তাতে নববধূকে বলা হয়েছে 'সুমঙ্গলী'। কল্যাণময় গার্হস্থ্য উৎসব-অনুষ্ঠান বোঝাতে 'মঙ্গল' কথাটি মিলছে অশোকের অনুশাসনে (নবম গিরি-লিপি)। উৎসব-অনুষ্ঠানে মঙ্গলময় দেবলীলাগীতির অর্থে শব্দটি পাই হরিবংশে। 'যাত্রা' শব্দের বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহারও এখানে রয়েছে। বরবধূর নাম-সংবলিত নারীগীত মঙ্গলগানের উল্লেখ আছে বাণভট্টের হর্ষচরিতে ("বধূবরগোত্রগ্রহণগর্ভানি শ্রুতিসুভগানি মঙ্গলানি গায়ন্তীভিঃ")। সেকালে গার্হস্থ্য ও সামাজিক আনন্দানুষ্ঠান ছিল প্রধানত তিন রকমের— উৎসব, সমাজ এবং যাত্রা। উৎসব ছিল ভোজনপানের অনুষ্ঠান, এখনও যেমন বৈষ্ণব-বাউলের মধ্যে 'মচ্ছব' (মহোৎসব) কথাটি চলে। আদিতে উৎসব বোঝাত সোমযাগ বা সোমপানের অনুষ্ঠান। 'সমাজ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'একসঙ্গে জড় হওয়া', তার থেকে বিশিষ্ট অর্থ দাঁড়িয়েছিল 'মেলা', যেখানে বহু জনের সমাগম, মল্লক্রীড়া ও রণকৌশল প্রদর্শন এবং সেই সঙ্গে কখনো কখনো খানা-পিনা-নাচ-গানের হল্লোড়। অশোকের সময়ে 'সমাজ'-অনুষ্ঠানে শেষোক্ত ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতার বাহুল্য ঘটেছিল তাই তিনি সাধারণভাবে হুকুম দিয়েছিলেন যে তাঁর রাজ্যমধ্যে 'সমাজ' অনুষ্ঠান চলবে না ("ন চ সমাজো কতব্যো")। তবে যে 'সমাজ'-অনুষ্ঠানে অনাচার-ব্যভিচার ছিল না তাতে তাঁর নিষেধ ছিল না ("অস্তি পি তু একচা সমাজা সাধুমতা দেবানং প্রিয়স প্রিয়দসিনো রংঞো")। ঋগ্‌বেদে 'সমাজ' অর্থে 'সমন' শব্দটি প্রায়ই দেখা যায়, বিশেষ করে এই উপমায়— সমনং ন যোষা (=মেয়েরা যেমন মেলায় ছোটে)। 'যাত্রা'-র অর্থ ছিল 'মিছিল করে যাওয়া'। আমোদ-প্রমোদের জন্যে হলে বলত 'বিহারযাত্রা', আর ধর্মকর্মের জন্যে হলে বলত 'ধর্মযাত্রা'। অশোক তাঁর অষ্টম গিরি-অনুশাসনে বলেছেন যে আগেকার রাজারা বিহারযাত্রায় যেতেন মৃগয়া অথবা অন্যরকম চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে। তিনি কিন্তু দশম রাজ্যবর্ষে ধর্মযাত্রা ক'রে গিয়েছিলেন বুদ্ধগয়ায় ("অতিকাতং অন্তরং রাজানো বিহারযাতাং ঞয়াসু এত মগব্য। অঞানি চ এতারিসানি অভীরামকানি অহুংসু সো দেবানং প্রিয়ো প্রিয়দসি রাজা দসবাসাভিসিতো সংতো অয়ায় সংবোধিং তেনেসা ধম্মযাতা")। যাত্রার এই দুদিক এখনকার দিন পর্যন্তও চলে এসেছে; মেলা অর্থে 'জাত' কথাটিতে রয়েছে বিহারযাত্রার অর্থ, আর নাটপালার গীত-অভিনয়ে রয়ে গেছে ধর্মযাত্রার প্রভাব। রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বৎসরে অশোক হুকুম করেছিলেন যে তাঁর প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ও বড় বড় কর্মচারীরা পাঁচ-পাঁচ বছর অন্তর মিছিল করে 'টুর্‌'-এ বেরোবেন সদাচার ও নীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে। এই মিছিল যাত্রাকে বলা হয়েছে 'অনুসংযান' (তৃতীয় গিরি-অনুশাসন)। অশোক নিজেও ধর্মপ্রচারের জন্যে শোভাযাত্রা বার করতেন, তাতে থাকত এখনকার দিনের বিয়ের মিছিলের মতই আতশবাজি, বাজনাবাদ্যি, কাগজের বাড়িঘর জীবজন্তু হাতি ইত্যাদি ("ত অজ দেবানং প্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো ধম্মচরণেন ভেরীঘোসো অহো ধম্মঘোসো বিমানদসণা চ হস্তিদসণা চ অগিখংধানি চ অঞানি চ দিব্যানি রূপানি দসয়িৎপা জনং"—চতুর্থ গিরি-অনুশাসন)।

রাজারা উৎসব-সমাজের অনুষ্ঠান করে প্রজাদের আনন্দ দিতেন। অশোকের প্রায় দু-তিন শ' বছর পরে কলিঙ্গের রাজা খারবেল তৃতীয় রাজ্যবর্ষে যে অনুষ্ঠান করেছিলেন তাঁর গিরি-লিপিতে তার একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। তাতে নাচ-গান-বাজনারই প্রাধান্য ("ততিয়ে পুন বসে গন্ধববেদবুধো দপনতগীতবাদিত-সংদসনাহি উসবসমাজকারাপনাহি চ ক্রীড়াপয়তি নগরিং")।

নাচ-গানের মিছিল করতে করতে সমুদ্রতীরে অথবা নদীতীরে গিয়ে সেখানে একত্র হয়ে অথবা নৌকার উপর চড়ে নাচগান খানা-পিনা অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট নাম হল 'যাত্রা' খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর আগেই। হরিবংশে এই অর্থে পাচ্ছি 'সমুদ্রযাত্রা'। এখনকার দিনেও এই অর্থে পশ্চিমবঙ্গে পাই 'জাত' (যাত্রা)। নদীর ধারে পুণ্যদিনে (সাধারণত পৌষ-সংক্রান্তিতে অথবা পয়লা মাঘে) স্নান উপলক্ষ্য করে যে মেলা বসে তারই নাম জাত। কিছুদিন আগেও দেখা গেছে যে নদীর মানায় জাতে চলেছে লোক দলে দলে ময়ূরপঙ্খী নৌকার মত সাজানো গোরুর গাড়ীতে গান-বাজনা করতে করতে। হরিবংশে সমুদ্রযাত্রার যে প্রসঙ্গ আছে (বিষ্ণুপর্ব ৮৯. ৭-৮) তার সঙ্গে এর ধারাবাহিক যোগাযোগ নজরে পড়ে। হরিবংশের বর্ণনা থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে সমুদ্র-যাত্রায় মেয়েরা সাজ সেজে দেশি (অর্থাৎ প্রাকৃত) ভাষায় 'মঙ্গল' গান গাইত, এবং সে মঙ্গল-গানের বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা।

চক্রুর্হসন্ত্যশ্চ তথৈব রাসং তদ্দেশভাষাকৃতিবেশযুক্তাঃ।
সহস্ততালং ললিতং সলীলং বরাঙ্গনা মঙ্গলসম্ভৃতাঙ্গাঃ॥
সঙ্কর্ষণাধোক্ষজনন্দনানি সঙ্কীর্তয়ন্ত্যোঽথ চ মঙ্গলানি।
কংসপ্রলম্বাদিবধং চ রম্যং চানূরঘাতং চ তথৈব রঙ্গে॥

'সুন্দরীরা মঙ্গল-ভূষা ক'রে বিবিধ দেশের ভাষা আকৃতি ও বেশ নিয়ে মঙ্গলচিহ্ন অঙ্গে ধারণ ক'রে সহাস্যে হাতে তাল দিতে দিতে মধুরভাবে লীলাভরে তান ধরলে এবং রঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণ-বলরামের প্রিয় কংস-প্রলম্ব-চাণূর-প্রভৃতি-অসুরবধবর্ণনাময় মনোহর মঙ্গল-গীতাবলী সঙ্কীর্তন করতে লাগল।'

প্রাচীন নৌ-বিহারযাত্রার এইরীতি পরবর্তী কালেও চলে এসেছে। দৌলৎ কাজীর 'লোর-চন্দ্রাণী' কাব্যের উপক্রমে তার ভালো বর্ণনা আছে। আগেই বলেছি, একালের 'জাত'-এ গোরুর গাড়ীকে ময়ূরপঙ্খী নৌকার মত সাজিয়ে গান গাইতে গাইতে যাওয়ার মধ্যেও তার চিহ্ন রয়ে গেছে।

গৃহস্থের দ্বারে এসে ভিক্ষার্থী 'মঙ্গল' গান গাইছে, এই ব্যাপারের উল্লেখ পাই সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্ব'এ (আনুমানিক ১১৫০) উদ্ধৃত একটি কৌতুকরসের শ্লোকে,

জরদ্গবঃ কম্বলপাদুকাভ্যাং দ্বারি স্থিতো গায়তি মঙ্গলানি।
তং ব্রাহ্মণী পৃচ্ছতি পুত্রকামা রাজন্ রুমায়াং লশুনস্য কোঽর্ঘঃ॥

'কম্বলের জুতো পায়ে দুয়ারে দাঁড়িয়ে জরদ্গব মঙ্গল-গীতাবলী গাইছে। তাকে পুত্রকামা ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করছে, রাজা, রুমায় রশুনের দর কি?'

২

দ্বাদশ শতাব্দীর অন্তিমে লেখা হয়েছিল জয়দেবের রাধাবিরহ নাটগীতখানি যা মহাকাব্যের ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে গীতগোবিন্দ নামে প্রথিত হয়েছে। জয়দেবের গীতিকাব্য আসলে চব্বিশটি পদাবলীর সমষ্টি।

সংস্কৃত শ্লোকগুলির অধিকাংশ সেগুলির সঙ্গে সম্পর্কবিরহিত না হলেও অনাবশ্যক নিশ্চয়ই। প্রস্তুত বিষয়ের সঙ্গে সর্গান্তিক শ্লোকগুলির কোন সংস্রব নেই। বোঝা দুরূহ নয় যে সেগুলির আমদানি হয়েছে শুধু মহাকাব্যোচিত সর্গবিভাগের প্রয়োজনেই। অবশ্য এই সর্গবিভাগ যথাসম্ভব নাটগীতির দৃশ্যবিভাগই মেনে নিয়েছে। সর্গগুলির নামকরণে অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুসরণ করা হয়েছে, মূলস্থানীয় নাট্যগীতির বা গীতিকাব্যের নয়। যেমন,[১] 'সামোদ-দামোদর' (প্রথম), 'অক্লেশকেশব' (দ্বিতীয়), 'বিদগ্ধমাধব' (তৃতীয়), 'বিরহিণীবর্ণনে মুগ্ধমাধব' (চতুর্থ), 'অভিসারিকাবর্ণনে সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষ' (পঞ্চম), 'বাসকসজ্জাবর্ণনে ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ' (ষষ্ঠ), 'বিপ্রলব্ধাবর্ণনে নাগরনারায়ণ' (সপ্তম), 'খণ্ডিতাবর্ণনে বিলক্ষলক্ষ্মীপতি' (অষ্টম), 'কলহান্তরিতাবর্ণনে সানন্দমুকুন্দ' (নবম), 'মানিনীবর্ণনে চতুরচতুর্ভুজ' (দশম), 'সানন্দগোবিন্দ' (একাদশ), 'স্বাধীনভর্তৃকাবর্ণনে প্রীতপীতাম্বর' (দ্বাদশ)।

গীতগোবিন্দের উপক্রমণিকার চতুর্থ শ্লোকে লক্ষ্মণসেনের সভাকবিদের রচনার তৌলন মূল্যবিচার আছে। এ শ্লোকটির কোনোই সংগত স্থান নেই জয়দেবের "প্রবন্ধ"এ। গীতগোবিন্দের সর্গবিভাগ এবং শ্লোক-সংযোজন যে পদাবলীময় মূল রচনাতে পরে ঘটেছিল তার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে অষ্টম দশম ও একাদশ সর্গের প্রথম শ্লোকে। অষ্টম সর্গের প্রথম শ্লোকে বলা হচ্ছে যে অনেক কষ্টে রাত কাটাবার পর সকালে রাধার কাছে কৃষ্ণ হাজির হয়ে অনুনয়বিনয় করছেন।

অথ কথমপি যামিনীং বিনীয়
স্মরশরজর্জ্জরিতা প্রভাতে।
অনুনয়বিনয়ং বদন্তমগ্রে
প্রণতমপি প্রিয়মাহ রাধা॥

অষ্টম ও দশম সর্গের মধ্যে একটা গোটা দিন কেটে গেল। দৃশ্যের ও নাট্যের কোনো পরিবর্তনের কোনই ইঙ্গিত নেই। দশম সর্গের প্রারম্ভ-শ্লোক থেকে বুঝছি যে সন্ধ্যাবেলায় রাধার সুমুখী সখীকে কৃষ্ণ তাঁর মনোভাব নিবেদন করছেন।

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদ্‌গদপদং হরিরিত্যুবাচ॥

একাদশ সর্গের প্রথম শ্লোকে দেখি যে সন্ধ্যাবেলায় সাজসজ্জা করে কৃষ্ণ কুঞ্জশয্যার দিকে এগিয়েছেন।

সুচিরমনুনয়েন প্রীণয়িত্বা মৃগাক্ষীং
গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুঞ্জশয্যাম্।
রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে
স্ফুরতি নিরবসাদাং কাপি রাধাং জগাদ॥

পদাবলীময় গীতগোবিন্দ-নাটগীতের যে বিশ্লেষণ পরে করছি তার থেকে বোঝা যাবে যে কাব্যের

১ ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে লেখা পুথির অনুসরণে।

ঘটনাটুকু এক রাত্রির ব্যাপার— সন্ধ্যা থেকে বড় জোর ভোর। পুরাণে কৃষ্ণের গোপীবিলাসও তাই— রাত্রির ব্যাপার, দিনের নয়। গীতগোবিন্দ-মহাকাব্যে ঘটনার জের টানা হয়েছে দু রাত্রি এক দিন ধরে। এ শুধু অনাবশ্যক নয়, পদাবলীর বর্ণনা অনুসরণ করলে অসম্ভাবিত এবং অনপেক্ষিতও বটে। অষ্টম সর্গের প্রথম পদটি সপ্তদশ পদাবলীর মুখবন্ধ। পদাবলীর প্রথমেই আছে

রজনিজনিতগুরুজাগরাগকষায়িতমলসনিমেষম্।

এখানে শ্লোক-সংযোজয়িতা ভুল করেছেন 'রজনি'র অর্থ সারারাত মনে করে। সেইজন্যে তাঁকে মানিনী রাধাকে কুঞ্জদ্বারে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়েছে সারা দিনরাত অনুনয়-উত্তর শোনবার জন্যে। কৃষ্ণকে দেখে রাধার মান উথলে উঠল। তিনি বললেন,

হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্।

এর জবাব দিলেন কৃষ্ণ রাধার পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে,

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

দিবালোকে দন্তরুচিকৌমুদীর তিমিরহরণের কথা ওঠে না। আর মানিনী প্রণয়িনীর জবাব বারো-চোদ্দ-ষোল ঘণ্টা পরে দেওয়াও চলে না। শ্লোক-সংযোজয়িতা ঠিক সেই ভুলই করেছেন ; অষ্টম সর্গের 'প্রভাত' কাটান্ করতে হয়েছে দশম ও একাদশ সর্গে 'প্রদোষ' দিয়ে। একাদশ সর্গের শ্লোকে আরো একটি গলতি ধরা পড়েছে। জয়দেবের পদাবলীপ্রবন্ধের ভূমিকা তিনটি মাত্র— রাধা, কৃষ্ণ, সখী। তাহলে এই শ্লোকে উল্লিখিত 'কাপি' আসে কোথা থেকে। অতএব এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে শ্লোকগুলি পরে যোগ হয়েছে, তবে অপরের দ্বারা এমন অনুমান করবার আবশ্যকতা অপরিহার্য্য নয়। শ্লোকগুলি জয়দেবের লেখা হতে বাধা নেই, হয়ত দুই একটি ছাড়া।[১] গীতপ্রবন্ধ লিখে পরে তাকে কাব্যের অথবা নাটকের আকার দেওয়া পরবর্তী কালের সাহিত্যে অজ্ঞাত নয়। জয়দেবের কাব্যের গানগুলিকে বিশ্লেষণ করলে সেগুলির মধ্যে একটি নাট্যগীতিকাব্যের সুস্পষ্ট রূপ ধরা পড়ে। এইটিই মূল গীতগোবিন্দ, "মঙ্গলম্ উজ্জ্বলগীতি"। উজ্জ্বলগীতি কথার ব্যাখ্যার আবশ্যক নেই। কাব্যটি মঙ্গল, কেন না প্রত্যেক গানের ভনিতায় শুভভাবনা ও কল্যাণকামনা— কবির অথবা শ্রোতার— আছেই। যেমন, "শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্, কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতম্।" "বিহিতপদ্মাবতীসুখসমাজে, কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি ভণতি জয়দেবকবিরাজ-রাজে।" "শ্রীজয়দেবভণিতমিতি গীতম্, সুখয়তু কেশবপদমুপনীতম্।" বলা বাহুল্য গানে রচয়িতার বা রচয়িতার প্রিয়জনের অথবা গুরুজনের নাম দেওয়ার রীতি বেশ প্রাচীন, অন্তত কালিদাসের কাল অবধি পৌঁছয়। তুলনীয়, মেঘদূতে "মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা"।

প্রথম গানটি নান্দীর মত, বিষ্ণুর দশাবতার-বন্দনা— "প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্।" দ্বিতীয়টি প্রস্তাবনা-গীত, বিষ্ণুর বিচিত্র উপাস্য রসরূপের স্তুতি— "শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল।"

তৃতীয় গানে পালা শুরু। যমুনাবিধৌত পুলিনে বৃন্দাবনে কুঞ্জকুটীরে সরস বসন্তসমারোহ, তার মধ্যে

---

১ প্রথম শ্লোক লক্ষ্মণসেনের রচনা বলে অনুমান করি। মদীয় বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ ২৯-৩০ দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ তরুণীদের নিয়ে নৃত্য-উৎসবে মত্ত। এই দৃশ্য সখী রাধাকে দেখালে দূর থেকে। "ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।"[২]

চতুর্থ গানে ওই দৃশ্যেরই কাছের থেকে বর্ণনা। "চন্দনচর্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী।" এ দৃশ্য দেখে রাধার পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল। একদা এই সুখসৌভাগ্য যে বিশেষ করে তারই ছিল। পঞ্চম গানে এই কথাই রাধা সখীকে বলছে, "সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্।"

ষষ্ঠ গানে রাধা প্রথমসমাগম-স্মৃতির নেশায় মেতে উঠেছে। কৃষ্ণ-মিলনের উৎকণ্ঠাও তার জেগেছে। সখীকে ধরে বসল দূতীগিরি করবার জন্যে, "সখি হে কেশিমথনমুদারং, রময় ময়া সহ"।[৩]

সপ্তম গানে দৃশ্যপরিবর্তন হয়েছে। কৃষ্ণ দেখতে পেয়েছেন যে রাধা তাঁকে তরুণীবৃন্দপরিবৃত দেখে অভিমানে আত্মগোপন করেছে। রাধার অন্বেষণে কৃষ্ণ বেরিয়েছেন খেদ করতে করতে, "মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন।"[৪]

এদিকে সখীও বেরিয়েছে কৃষ্ণের খোঁজে। পথে দুজনের দেখা। সখী কৃষ্ণের কাছে রাধার বিরহদশা নিবেদন করলে দুটি (অষ্টম-নবম) গানে। "নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।" "স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।"[৫]

দশম গানে সখী ফিরে এসে রাধাকে ভোলালে কৃষ্ণের বিরহদশার বর্ণনা করে, "বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।" পরের গানে সে বলছে রাধাকে যমুনাতীরে কুঞ্জকুটীরে অভিসার করতে, সেখানে কৃষ্ণ তার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষমাণ, "রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।"[৬]

দ্বাদশ গানে সখী কৃষ্ণের কাছে এসে বলছে, বিরহখিন্না রাধা কোনক্রমে বাসরে ('বাসগৃহে') এসে পৌঁছেছে কিন্তু তোমাকে না দেখে সে মুষড়ে পড়েছে। "পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।"[৭]

কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় থেকে থেকে রাধা ধৈর্য্যহারা হয়ে উঠেছে। তার বিরহদুঃখকে বাড়িয়ে দিয়েছে সখীর বঞ্চনা। ত্রয়োদশ গানের ধুয়ায় এই দুঃখবেদনারই আকুলতা, "যামি হে কমিহ শরণং সখীবচনবঞ্চিতা।"

পরের গানটিতে রাধা কল্পনা করছে যেন অধিকগুণবতী আর কোনো নারী কৃষ্ণকে বশ করে তাঁর সঙ্গে বিলাস করছে, "স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা।"

পঞ্চদশ গানে কৃষ্ণকে অনন্যুরাগী কল্পনা করে রাধা সখীকে বলছে, বৃথাই এতক্ষণ বনের মধ্যে বসে রইলুম, "কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং বদ সখি বিটপোদরে।" ষোড়শ গানে রাধা কল্পিত প্রতিনায়িকার সৌভাগ্য স্মরণ করছে।[৮]

অবশেষে কুঞ্জের বাইরে কৃষ্ণের মূর্তি দেখা গেল। তাঁর ক্লান্ত দৃষ্টি রাধাকে রুষ্ট করলে। রাধা

---

২ এইখানে মহাকাব্যের প্রথম সর্গ শেষ।

৩ এইখানে মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গ শেষ।

৪ এইখানে মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গ শেষ।

৫ এইখানে মহাকাব্যের চতুর্থ সর্গ শেষ।

৬ এইখানে মহাকাব্যের পঞ্চম সর্গ শেষ।

৭ এইখানে মহাকাব্যের ষষ্ঠ সর্গ শেষ।

৮ এইখানে মহাকাব্যের সপ্তম সর্গ শেষ।

বললে, যাও ফিরে যার কাছে ছিলে—"হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্, তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্" (ধুয়া, সপ্তদশ গান)।[৯]

অষ্টাদশ গানে সখী রাধাকে বোঝাচ্ছে, আর মান করে নিজেকে বঞ্চিত ক'রো না—উপহাসাস্পদও ক'রো না, "হরিরভিসরতি বহতি মৃদু পবনে, কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে। মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে (ধুয়া)।"[১০]

উনবিংশ গানে কৃষ্ণের কাতর অনুনয়, "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমির-মতিঘোরম্।"[১১]

বিংশ গানে সখী বলছে, লজ্জা পরিহার করে চল কৃষ্ণকে অনুসরণ করে কুঞ্জনীড়ে, আমি তোমার হাত ধরে আছি, "স্মরশরসুভগনখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলং, চল বলয়ক্বণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলম্।"

তবুও রাধা ব্রীড়াকুণ্ঠিত রয়েছে দেখে সখী জোর গলায় গান ধরলে (একবিংশ গান), "মঞ্জুতরকুঞ্জতল-কেলিসদনে, প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ বিলস রতিরভসহসিতবদনে।" তখন দুজনে মুখ তুললে, চোখা-চোখি হল। রাধার মানও ভাঙল। সহর্ষ কৃষ্ণের রূপ বর্ণিত হয়েছে দ্বাবিংশ গানে, "রাধাবদনবিলোকন-বিকসিতবিবিধবিকারবিভঙ্গম্।"[১২]

তার পর শেষ দৃশ্য। ত্রয়োবিংশ গান কৃষ্ণের, উক্তি "কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশম্।" অবশেষে চতুর্বিংশ গানে রাধা কৃষ্ণকে বলছে তার বিপর্য্যস্ত প্রসাধন ঠিকঠাক করে দিতে।[১৩]

তিনটি ছাড়া সব গানই হয় সখীর নয় রাধার নয় কৃষ্ণের উক্তি। শেষের গান দুটি যথাক্রমে কৃষ্ণের ও রাধার উক্তি হলেও সে দুটির ধুয়া যথাক্রমে সখীর ও সূত্রধারের উক্তি, "ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুসর রাধিকে"; "নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে।" শেষ গান বলেই বোধ হয় অধিকারী বা দোহার ধুয়ায় যোগ দিত। বন্দনা দুটিও সম্ভবত অধিকারী একলা অথবা দোহার মিলে গাইত। দ্বাবিংশ গানটিও বর্ণনাত্মক। এটিও বোধ করি অধিকারীর গান। মনে হয়, যেমন পরবর্তী কৃষ্ণযাত্রায় তেমনি এখানেও অধিকারীই সখীর কাচ কাচত। সংখ্যায় সখীর গানই বেশি (১০), তার পরে রাধার (৮), তার পর কৃষ্ণের (৩)।

৩

জয়দেবের নাটগীত "প্রবন্ধ" কেমন করে যে গাওয়া হত তার আভাস পাওয়া যায় বৃহৎ-ধর্ম্মপুরাণে উল্লিখিত গঙ্গাবতরণ কাহিনীতে। দেবসভায় বিষ্ণুর সম্মুখে শিব একটি নাটগীত গাইছেন। নাটের বিষয় জয়দেবের প্রবন্ধেরই মত। সখী-দূতী এসে কৃষ্ণের কাছে বলছে, রাধা কুঞ্জগৃহে অপেক্ষা করে রয়েছে তুমি চল। কৃষ্ণ গেলে রাধা তাকে অভ্যর্থনা করলে। এখানে দুটিমাত্র গানের টুকরা আছে, জয়দেবের ধরণে। একটি গান্ধার রাগে সখী-দূতীর উক্তি, "কেশব কমলমুখীমুখকমলম্।" দ্বিতীয়টি শ্রী রাগে রাধার উক্তি, "রসিকেশ কেশব হে, রসসরসীমিব মামুপযোজয় রসময় রসনিবহে।"

৯ এইখানে মহাকাব্যের অষ্টম সর্গ শেষ।

১০ এইখানে মহাকাব্যের নবম সর্গ শেষ।

১১ এইখানে মহাকাব্যের দশম সর্গ শেষ।

১২ এইখানে মহাকাব্যের একাদশ সর্গ শেষ।

১৩ এইখানে মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গ শেষ।

গান্ধার রাগের স্থর ভাঁজতেই গান্ধার-রাগবেশী কৃষ্ণের আবির্ভাব। গান ধরতেই দূতী হাজির। দ্বিতীয় গানখানি গাইবার সময়ে শ্রী-রাগিণীর বেশধারিণী রাধার আবির্ভাব হল। গান দুটি কিন্তু পালার অধিকারী শিবই গেয়েছিলেন। এখানে কৃষ্ণ ও রাধা মূক অভিনেতা হতে পারে, যেমন পুরানো মৈথিল-বাংলা-নেপালি পাত্রনৃত্য বা পাতা-নাচে এবং হয়ত পতঞ্জলির উল্লিখিত শোভনিক-অভিনয়ে।[১৪] অথবা পুতুল-প্রতিমাও হতে পারে, যেমন পতঞ্জলির চিত্রে [১৫] এবং পুরানো বাংলার পাঁচালি-প্রবন্ধের মৌলিক রূপে।[১৬]

৪

জয়দেবের পরে যে নাটগীতিটি পাচ্ছি তার ভাষা সংস্কৃত নয়, প্রাদেশিক লৌকিক ভাষা— মৈথিল। এটি হরিহরসিংহের (রাজ্যচ্যুতি ১৩২৪) সভাসদ্ উমাপতি ওঝার 'পারিজাতহরণ নাটক'। জয়দেবের পদাবলী মহাকাব্যের ফ্রেমে বাঁধা, উমাপতির পদাবলী সংস্কৃত নাটকের কাঠামোয়। জয়দেবের পদাবলীর তুলনায় উমাপতির পদাবলীতে নাটকীয়তা অর্থাৎ ঘটনাবাহুল্য সমধিক। এখানেও মনে হয়, মৈথিল পদাবলীগুলিই নাটকটির মূল রূপ। এই মূল নাটগীতের নাম যে 'পারিজাতমঙ্গল' ছিল তা সূত্রধারের উক্তিতেই মিলে,— "আদিষ্টোঽস্মি· ·শ্রীহরিহরদেবেন যথা উমাপত্যুপাধ্যায়বিরচিতং নবপারিজাতমঙ্গলম্ ।"

পারিজাতমঙ্গলের গানগুলির ভনিতায় যথারীতি কবির শুভভাবনার ও কল্যাণকামনার প্রকাশ আছে। যেমন, "যদুনাথ সাথে বিহার হরষিত সহস ষোড়শ নায়িকা, ভন গুরু উমাপতি সকলনৃপপতি হোথু মঙ্গলদায়িকা।" "হিমগিরিকুমরি-চরণ হৃদয় ধরি সুমতি উমাপতি ভানে।"

পারিজাতমঙ্গলে সবশুদ্ধ একুশটি গান। গীতগোবিন্দে যেমন এখানেও তেমনি প্রথম গানটি সাধারণ বন্দনা (দুর্গার), দ্বিতীয় গানটি বিষয়ের উপযোগী শিবদুর্গার রসমূর্তির স্তব। তৃতীয় গানটি 'শ্রীকৃষ্ণপ্রবেশক' অর্থাৎ রঙ্গভূমিতে প্রবিশ্যমান কৃষ্ণের বর্ণনা। চতুর্থ গীতে কৃষ্ণ-রুক্মিণীর বসন্তবিহার বর্ণনার দৃশ্য, "কর জোরি রুকুমিনী কৃষ্ণসঙ্গ বসন্তরঙ্গ নিহারহীঁ।" পঞ্চম গীত 'নারদ প্রবেশক'। ষষ্ঠ গীতে নারদের স্বগতোক্তি, "জাএব হরিক সমাজে, পাএব নয়নসুখ আজে।" সপ্তম গীতে নারদ ইন্দ্রপ্রদত্ত পারিজাত ফুল কৃষ্ণকে দিচ্ছেন। অষ্টম গীত 'সত্যভামা প্রবেশক'। নবম গীতে সত্যভামা সখীকে জানাচ্ছেন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের উৎকণ্ঠা। কৃষ্ণ ফুলটি দিয়েছেন রুক্মিণীকে, তাই পেয়ে রুক্মিণী নিজেকে ধন্য মনে করেছে দশম গীতে, 'আজ জন্মফল ভেলা সব পরিতেজি হরি মোহি ফুল দেলা।"

তার পর দৃশ্যপরিবর্তন। রুক্মিণীর সৌভাগ্য দেখে সত্যভামা মান করেছে। সখী কৃষ্ণকে সে কথা জানিয়ে দিয়ে মানভঞ্জনের অনুরোধ করছে একাদশ গীতে, "মাধব অবহু করিঅ সমধানে, সুপুরুষ নিঠুর রহয় ন নিদানে।" দ্বাদশ গীতে সত্যভামা সখীকে সান্ত্বনা দেবার ছলে কৃষ্ণের নির্দয়তার বর্ণনা করছে, যার ধুয়া,

হরি সউঁ প্রেম আস কয় লাওল পাওল পরিভব ঠামে
জলধর-ছাহরি তর হম সুতলহুঁ আতপ ভেল পরিণামে।

---

১৪ "যে তাবদেতে শোভনিকা নামৈতে প্রত্যক্ষং কংসং ঘাতয়ন্তি প্রত্যক্ষং চ বলিং বন্ধয়তীতি।"

১৫ "চিত্রেষপ্যুদ্গূর্ণা নিপতিতাশ্চ প্রহারা দৃশ্যন্তে কংসকর্ষণ্যশ্চ।"

১৬ পাঁচালি শব্দের মূল পঞ্চালিকা (অর্থাৎ পুত্তলিকা)।

সখি হে মন জহু করিঅ মলানে
আপন করম ফল হম উপভোগব তোহেঁ কিঅ তেজহ পরানে।

ত্রয়োদশ গীতে কৃষ্ণের অনাগমনে সত্যভামার খেদ, যার ধুয়া

সজনি অব জীবন কিঅ কাজে
পহু মোহি হীন করু অপযশ জগ ভরু সহই ন পারিঅ লাজে।

চতুর্দশ গীতে কৃষ্ণের অনুনয়, রাত ভোর হয়ে এল তবুও মানিনীর মান ভাঙে না,

অরুণ পুরব দিশি বহলি সগরি নিশি গগন মগন ভেল চন্দা
মুনি গেলি কুমুদিনী তইও তোহর ধনি মুনল মুখ অরবিন্দা।

পঞ্চদশ গীতেও তাই, তবে অনুনয় দাঁড়িয়েছে লোভনে,

পীন পয়োধর গিরিবর-সাঁধি
বাহু ফাঁস ধনি ধরু মোহে বাঁধি।

ষোড়শ গীতে সত্যভামা নিজের অভাগ্যের দুঃখ জানাচ্ছে কৃষ্ণের কাছে,

সবহু পাওল অবকাশ
মাধব জগ ভরি ভেল উপহাস।

সপ্তদশ গীতে সত্যভামা সন্ধির সর্ত দিচ্ছে, এক আধটি ফুল নয় গোটা গাছটা চাই,

মাধব করহ হমর সমধানে
দেহ মোহি পারিজাত-তরু দানে।

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণেরও প্রয়াণ পারিজাত গাছের সন্ধানে। সত্যভামা অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে পারিজাত-তরুর ও কৃষ্ণ-মিলনের আশায়, অষ্টাদশ গীতে।

উনবিংশ গীতে সত্যভামার কাছে নারদ কর্তৃক ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও জয়লাভ বর্ণনা।

বিংশ গীতে সত্যভামাকর্তৃক পারিজাত-তরু অভ্যর্থনা।

একবিংশ গীতে ভরতবাক্য,

জলধর সময় করথু জলদানে
ভরলি রহথু ধরণী ধনধানে।

পারিজাতমঙ্গলের পাত্রপাত্রী পাঁচ জন, কৃষ্ণ, নায়িকাদ্বয়— রুক্মিণী ও সত্যভামা, সত্যভামার সখী, ও নারদ। কৃষ্ণের গান দুটি (১৪,১৫), রুক্মিণীর একটি (১০), সত্যভামার সাতটি (৯,১২,১৩,১৬,১৭,১৮,২০), সখীর একটি (১১) আর নারদের তিনটি (৬,৭,১৯)। বাকি সাতটি গান— বন্দনা দুটি (১,২), প্রবেশক তিনটি (৩,৫,৮), কৃষ্ণ-রুক্মিণীর বসন্তবিহার বর্ণনা (৪) ও ভরতবাক্য-স্থানীয় সমাপন গীত (২১) সূত্রধার-অধিকারীর গাওয়া বলে ধরে নেওয়া যায়।

৫

মঙ্গল-নাটগীতের প্রথম পর্ব জয়দেবের পদাবলীতে পেলুম। সেখানে নাটের চেয়ে গীতেরই প্রাধান্য। দ্বিতীয় পর্ব মিলল উমাপতির পারিজাতমঙ্গলে। তাতে গীতের প্রাধান্য থাকলেও নাটের গুরুত্ব

বেড়েছে। তৃতীয় পর্ব পাচ্ছি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে।[১৭] সেখানে গীতকে ছাপিয়ে নাট বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যথার্থই গীতি-নাট্যকাব্য। এখানে সংস্কৃত শ্লোকময় যে কাব্যিক কাঠামো রয়েছে তা নিতান্ত শ্লথ, তাকে কাঠামো না বলে চিত্রডোর বলাই সংগত।

বড়ু চণ্ডীদাসের গীতসর্বস্ব নাট্যকাব্যটি তের পালায় বিভক্ত,— জন্মখণ্ড, তাম্বূলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড, ও রাধাবিরহ। জন্মখণ্ড প্রস্তাবনার মত, এতে সবকটি গানই বর্ণনাময়। অন্য সব পালায় গান অধিকাংশই পাত্রপাত্রীর উক্তি। জয়দেবের কাব্যগীতির মত এখানেও তিনটি মাত্র ভূমিকা— কৃষ্ণ, রাধা ও দূতী (বড়ায়ি)।

বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের পালাগুলি যে নাটগীতির ঠাটে নাচা-গাওয়া হত তার প্রমাণ রয়েছে গানগুলির শীর্ষকে। জয়দেবের গীতে ও উমাপতির গানে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। গীতগোবিন্দের অনেক পুঁথিতে তালেরও উল্লেখ আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের গানে রাগের ও তালের উল্লেখ তো সর্বত্রই আছে, সেই সঙ্গে প্রায়ই আছে আর কতকগুলি অপ্রাপ্তপূর্ব পারিভাষিক শব্দ— দণ্ডক, লগনী, চিত্রক লগনী, দণ্ডক লগনী, প্রকীর্ণক লগনী, বিচিত্র লগনী দণ্ডক, প্রকীর্ণক চিত্রক লগনী, প্রকীর্ণক চিত্রক লগনী দণ্ডক, ইত্যাদি। এই শব্দগুলি যে গীত-অভিনয় সঙ্কেতের নির্দেশক তা নির্ণয় করা দুরূহ নয়।

'দণ্ডক' হচ্ছে বর্ণনাত্মক (descriptive) বা বিবৃতিময় (narrative) গান। সংস্কৃত 'দণ্ডক' ছন্দ এই সঙ্গে স্মরণীয়; সংস্কৃতে দণ্ডক টানা বর্ণনাময় গদ্যঘেঁষা ছন্দ। মধ্য-বাঙ্গালা সাহিত্যে সুসংবদ্ধ আখ্যায়িকা অর্থে 'দাঁড়া' শব্দের প্রয়োগ স্মরণীয়।[১৮] 'দণ্ডক' গীতপদ্ধতির উদাহরণ,

(ক) বর্ণনাময় দণ্ডক

বোল এক বোলোঁ রাধা সুণ আহ্মারে
খণ্ড কোপ ভয় দেহ শৃঙ্গারে।
নীল কুটিল শোভে চিকুরে
প্রভাত আদিত শিথে সিন্দূরে।
ভ্রূহি কাম ধনু নয়ন বাণে
নাসিকা ণালিক যন্ত্র সমানে।.[১৯]

(খ) বিবৃতিময় দণ্ডক

সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।
ইহার মরণ হএ কমন উপাএ
সব্ধেই চিন্তিআঁ বুয়িল ব্রহ্মার ঠাএ।

---

১৭ কাব্যের নাম পুঁথির আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের দেওয়া।

১৮ যেমন, মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীকে বলেছেন "মাণিকদত্তের দাণ্ডা"; মাণিকরাম গাঙ্গুলির কথায় ধর্মমঙ্গল-আখ্যায়িকা "লাউসেনি দাঁড়া"।

১৯ দানখণ্ড।

ব্রহ্মা সব দেব লঞাঁ গেলান্তি সাগরে
স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে।
তোহ্মে নানা রূপেঁ কইলে আসুরের খএ
তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ।..[২০]

'লগনী' দ্বিসংলাপময় (dialogue) নাট্যরসাশ্রিত গীতপদ্ধতি। জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণরত্নাকরে উল্লিখিত "লগনী নাচো" এই ধরণের পদ্ধতির প্রাচীনত্বের সূচক। লগনীর উদাহরণ,

কৃষ্ণ বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান
শুন তোহ্মে ভাল রাধা পাঞ্জী পরমান।
রাধা নিতি দধি বিকে জাওঁ মথুরার হাটে
মিছাই কাহ্নাঞি তোঁ আগোলসি বাটে।
কৃষ্ণ আতি বিতপনী রাধা পরিধান পাট
আলকে তিলক তোর শোভএ ললাট।
রাধা বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার সভাএ
কার কাঁচ আলিতে না দেওঁ মোএঁ পাএ।
কৃষ্ণ বারহ বরিষের দাণ সুনহ মুগধী
মোহোর করমেঁ তোহ্মা আনি দিল বিধী।
রাধা রাখোয়াল কাহ্নাঞিঁ তোর রাখোয়াল মতী
পাঁতরে একসরী পাইলেঁ নিমাথিতী।
কৃষ্ণ রাখোয়াল হঞাঁ তোর কংসের গোসাঞিঁ
ত্রিভুবনে আহ্মা সম আর বীর নাহিঁ।
রাধা কাহাক দেখাহ তোহ্মে এত বীরপণে
টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে।
কৃষ্ণ তোর কংসে মোর কিছ করিতে না পারে
তোহ্মারি সে রূপেঁ মোরে মারিবারে পারে।
রাধা না বোল না বোল কাহ্নাঞি হেন পাপ বাণী
তোহ্মা ভালে জানো আহ্মো আইহনের রাণী।
কৃষ্ণ বারহ বরিষেকের দিঞাঁ যাহা দাণে।
ভনিতা গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥[২১]

দ্বিসংলাপ গানে যদি বিবৃতির ঠাট থাকে তবে হয় 'দণ্ডক লগনী' বা 'লগনী দণ্ডক'। যেমন,

কৃষ্ণ ভার বহিব তাত না করিবোঁ মো আনে
বড়ায়ি সাখিএঁ বোল সত্য বচনে।

---

২০ জন্মখণ্ড। ২১ দানখণ্ড।

রাধা কোণ কাজে লাগি আহ্মে সত্য করিব
ভার বহিলেঁ তোর বচন ধরিব।
কৃষ্ণ মোর লোভ হয়িল তোর দেখি পয়োভার
সেসি কারণে আহ্মে বহিব তোর ভার।
রাধা লোভ হয়িলেঁ কাহ্নাঞি আরতী না করী
গোপত কাজত কাহ্নাঞি ছয় আখি বারী।
কৃষ্ণ পুনমীর চান্দ রাধা বদন তোহোর
তাত মজি গেল মোর নয়নচকোর।
রাধা তোহ্মার চরিত্র আহ্মে বুঝিতেঁ না পারী
কথা না আছিলাহা হেন আছিদর ভারী।
কৃষ্ণ আহ্মার চরিত্র তোহ্মে জাণহ সকল
এবেঁ ঝাঁট কর রাধা যৌবন সফল।
রাধা ভার [না] বহিলে মো না মানো স্থরতী।

ভনিতা গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গতী ॥[22]

দ্বিসংলাপ গানে যদি চেষ্টিতের (action) বা উদ্যোগের (contemplated action) ইঙ্গিত থাকে তবে হয় 'চিত্রক লগনী' বা 'লগনী চিত্রক'। যেমন,

কৃষ্ণ মনত হরিষ কর ঈষত হাসিআঁ
আপণ ইছাএ রাধা নাএ চড়সিআঁ।
মাঝ নাঅত রাধা ওলাহ পসার
পার কইলেঁ কৌড়ী লইব তোহ্মার।
আহ্মার বচন রাধা না করহ আন।

চেষ্টিত আপণে কাণ্ডার ধরিল দেব কাহ্ন।

রাধা আহুঠ হাথ নাঅখানী তোর পাঁচ পাটে
আনেক যতনে আণি চাপাইল ঘাটে।
ধিরেঁ ধিরেঁ কাহ্নাঞি মো আইলোঁ নিকটে
নিহুড়িআঁ চাহোঁ পাণি লইছে মোকটে।
ডরে মোর কাহ্নাঞি শরীর কাম্পএ
সাধ নাহিঁ পার হয়িতেঁ হেন ভাঙ্গা নাএ।
কৃষ্ণ আবুধ গোআলিনী না বুঝসি কাজ
এহি নাএ পার করোঁ সকল রাজ।

---

২২ ভারখণ্ড।

পসার পাম্বাআঁ থোহ ডহরার মাঝে
পানি ফুটি সিঞ্চ তোহ্মে না করিহ লাজে।[২৩]

সচেষ্টিত দ্বিসংলাপ গানের অংশ বর্ণনাত্মক বা বিবৃতিময় হলে হয় 'বিচিত্র (চিত্রক) লগনী দণ্ডক'। যেমন,

রাধা — কাহ্নাঞি তোর কথা শুণী বড়ায়ির মুখে
কহিতেঁ না পারোঁ তাক যত পাইলোঁ দুখে।
তোহ্মার বিরহে মোঁ হয়িলোঁ বেআকুলী
তেকারণে তোর বাঁশী নিলোঁ বনমালী।

কৃষ্ণ — রাধা, বিরহে আকুলী ভৈলা আপণার দোষে
আহ্মার বাঁশী তোঁ চোরায়িলি রোষে।
আহ্মার খাঁখার যবেঁ না করহ তোহ্মে
তবেঁ কি বিরহসুখ তোক দিএ আহ্মে।

রাধা — কাহ্নাঞি, যে কারণে খাঁখার তোহ্মার মোঞঁ কৈলোঁ
তেকারণে বিরহ আনলে পুড়ি মৈলোঁ।
আর কভোঁ চঞ্চল না করিহ মনে
মোক রোষ না করিহ কাহারো বচনে।

কৃষ্ণ — তোক প্রতি মোর মণে নাহিঁ কিছু রোষে
এহা তত্ত্ব করী জাণী দেহ মোর বাঁশে।
বাঁশী দিআঁ কর মোর মন সোআথ
সহজেঁ তোহ্মাক সুখী হইব জগন্নাথ।

রাধা — বিরহে আকুলী যবেঁ চাহোঁ মো তোহ্মারে
তখন আসিহ তোহ্মে আতি অবিচারে।
হের ভালমতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞি বাঁশী
আজি হৈতে চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী।

কৃষ্ণ — সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী
আর তোর অহিত না করে বনমালী।

বর্ণনা — হেনমতেঁ বাঁশী পাআঁ হরষিত মণে
কালী নই তীরে হৈতে ঘর গেলা কাহ্নে।
পাছে রাধিকা লআঁ বড়ায়ি গেলী ঘর
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥[২৪]

---

২৩ দানখণ্ড।

২৪ বংশীখণ্ড।

গানে একাধিক দ্বিসংলাপময় ও বর্ণনাবিবৃতিময় অংশ থাকলে হয় 'প্রকীন্ন (প্রকীন্নক)[২৫] লগনী'। যেমন,

বর্ণনা বোলেন্ত কাহ্নাঞি নাঅ কুলত চাপাআঁ
আইস সব গোআলিনী নাএ চড়সিআঁ।
যমুনা দেখিআঁ মনে ডরায়িলী রাহী
বুইল পার কর আগু মোর সব সহী।

কৃষ্ণ পাঞ্চ গুটী পাট নাঅ গঢ়ন আহ্মার
একেঁ একেঁ সব সখি করি তোর পার।

রাধা দধি দুধ লআঁ যাব মথুরা নগর
সাবধানে সব সখি ঝাঁট পার কর।

বর্ণনা রাধার বচনে কাহ্নাঞি হরষিত মনে
ঝাঁট পার করায়িল সব সখিগণে।
সঙ্গে বড়ায়ি করী বোলে গোআলিনী
ঝাঁট পার কর বডায়ি খর বড় পাণী।

কৃষ্ণ তীন ভরা না সহে নাখানী আহ্মার
কেনমনে বড়ায়ি লআঁ রাধা হৈবেঁ পার।

বিবৃতি এ বচন শুণী রাধা মন কৈল সার
বুইল ঘাটিআল আগু বড়ায়ি কর পার।
নাঅত চড়িল যবেঁ একলী বড়ায়ি
মনের উল্লাসে পার করিল কাহ্নাঞি।
পাছে পার হয়িতেঁ রাধিকারে বড় ডর
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥[২৬]

'প্রকীন্ন (প্রকীন্নক) লগনী' যদি আদ্যন্তবর্ণনাবিবৃতি-আত্মক হয় তবে 'প্রকীন্ন (প্রকীন্নক) লগনী দণ্ডক' যেমন,

বড়ায়ি বচনেক বোলোঁ স্থন রাধা গোআলী
দধিভার লআঁ জাউ তোর বনমালী।

রাধা দধিভার লঅ তোহ্মে শুন বনমালী
নহোঁ তোর যোগ মোএঁ আবালী গোআলী।

কৃষ্ণ দধিভার লইব আহ্মে এবা কোন কাজ
দেবের দেব হআঁ পাইব বড় লাজ।…

---

২৫ সংস্কৃত 'প্রকীর্ণ, প্রকীর্ণক' শব্দের অর্থ ছড়ানো, মিশ্রিত।

২৬ দানখণ্ড।

বিবৃতি এ বোল সুনিআঁ কাহ্নাঞি মনের উল্লাসে
ভার লএ উলটিআঁ চন্দ্রাবলী হাসে।

রাধা ভার সম কর দধি যেহ্ন নাহি টলে
দধি নঠ হৈলেঁ মারিবোঁ মাগু কিলে।

বিবৃতি ভার সজী করি লৈল নান্দের নন্দন '
ভনিতা গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥[২৭]

গানে চেষ্টাময় একাধিক দ্বিসংলাপ অংশের সঙ্গে বর্ণনা বিবৃতি অংশ থাকলে হয় 'চিত্রক প্রকীর্ণ (প্রকীর্ণক) লগনী দণ্ডক'। যেমন,

বড়ায়ি সুণ নাতিনী রাধা আহ্মার উত্তর
বাঁশী বাইআঁ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর।
হেন বুঝোঁ গেলা কাহ্ন বনের ভীতর
তথাঁ গিআঁ চাহী তাক কিছু নাহি ডর।

রাধা মুগধী বড়ায়ি তোতে নাহিঁ কিছু বুধী
হাথেঁ হাথেঁ ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী।
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন
তথাঁ আবসি পাইব নান্দের নন্দন।

বিবৃতি রাধার বচনে বড়ায়ি গেলী বৃন্দাবন
তথাঁ হেন রাধিকারে বুইল বচন।

বড়ায়ি আগু জাঅ রাধা কাহ্ন চাহিতেঁ আপুযী
তবেঁসি মেলিব তোকে দেব চক্রপাণী।

বর্ণনা বড়ায়ির বচন শুণী উল্লসিতমতী
একসরী বৃন্দাবনে রাধা কৈল গতী।
দেখিআঁ গোঠ রাখিতেঁ বুলে বনমালী
মদনে মুরুছা গেলী রাধা চন্দ্রাবলী।
মুখে জল দিআঁ বড়ায়ি ততিখনে
অথবেথেঁ রাধিকারে করায়িল চেতনে।
বুলিতেঁ লাগিলী রাধা পাইআঁ চেতনে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥[২৮]

---

২৭ এটি ছাড়া কোন 'লগনী' গানে ত্রিসংলাপ নেই। গানটি ভারখণ্ডে আছে।

২৮ রাধাবিরহ।

'প্রকীর্ণক লগনী' গানে হৃদয়াবেগযুক্ত চেষ্টিতের প্রাধান্য থাকলে হয় 'কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক লগনী'। যেমন,

বিবৃতি কাহ্নাঞিক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে

বড়ায়ি চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে।
লুনী সম দেহ তার রসের সাগরে
সংপুন্ন যৌবনে রতি ভুজ দামোদরে।
বিলম্ব না কর স্থূণ সুন্দর মুরারী
রাধার পরাণে দুখ সহিতেঁ না পারী।

বর্ণনা বদন চুম্বিয়া মাথে হাথ বুলাই
হাথে ধরিআঁ কাকুতী কইল বড়ায়ি।
বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাই।

বড়ায়ি রাধাক তোষহ বোল পালহ কাহ্নাঞি।

বর্ণনা চিত্তের হরিষে বড়ায়ির কথা শুণী
ঈসত হাসিআঁ কাহ্ন হৃদয়ত গুণী।

কৃষ্ণ বুইল মনোহর বেশ করু গোআলিনী
পাসে আসী বৈসু বোলোঁ মধুরস বাণী।

বিবৃতি সত্বরেঁ কহিল সব রাধিকার পাশে।
রাধার খণেক ভৈল যুগ সদৃশে

ভনিতা বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥[২৮]

৬

জয়দেবের পদাবলী আর বড়ু চণ্ডীদাসের নাট্যকাব্য একভাবেই নৃত্য (?)-গীতাভিনীত হত বলে মনে করি।[২৯] জয়দেব গাইতেন আর পদ্মাবতী নাচতেন—এ কাহিনীর প্রাচীনত্ব ষোড়শ শতাব্দীর এদিককার নয়। কোচবিহারের ছোট রাজা শুক্লধ্বজ তাঁর গীতগোবিন্দটীকায় এই কথা বলেছেন, এবং তাঁর সভাকবি রামসরস্বতীও সে কথার পুনরুক্তি করেছেন 'জয়দেব' কাব্যে,[৩০]

কৃষ্ণের গীতক[৩১] জয়দেবে নিগদতি
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী।

জয়দেব-পদ্মাবতীর সঙ্গীতাভিজ্ঞতায় ভালো গল্প আছে সেকশুভোদয়ায়।[৩২] 'পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী'

২৯ সেকালে এরই নাম ছিল 'নাটক'। তুলনীয় চর্যাগীতি, 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী, বুদ্ধনাটক বিষমা হোই।'

৩০ কালীরাম বড়ুয়া প্রকাশিত (১২৯০) পৃ ১৭।

৩১ বসন্ত রাগ: 'ললিত লবঙ্গলতা· ·'।

৩২ শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত (১৯২৭) পৃ ৬৯-৭১।

শুধু এই সাক্ষ্যই দেয় না, অধিকন্তু জানিয়ে দেয় যে জয়দেবের গানের দল ছিল এবং তিনি ছিলেন সে দলের অধিকারী। তাঁর এক দোহার পরাশরের নাম তো গীতগোবিন্দের শেষে পরিচয়শ্লোকেই আছে,

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুত-শ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু ॥[৩৩]

পরাশর ছিলেন বন্ধু, অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির অথবা মামার বাড়ির লোক। সুতরাং গানের দল ছিল ঘরোয়া।

মধ্য-বাংলা পাঁচালী কাব্যগীতিতে দোহারের নাম ছিল 'পালি'। এ নাম বড়ু চণ্ডীদাসের নাট্যকাব্যেও পাই,

বাঁশী বাজায়িল যবেঁ কাহ্নে
কোকিল কৈল পালি গানে
আগুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণ পবনে।[৩৪]

পরে 'পালি'-র বদলে সমার্থক 'জুড়ি' ও 'দোহার' চলিত হয়েছে। পরবর্তী কালের পদাবলীকীর্তনে ও কৃষ্ণমঙ্গল-মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল-ধর্মমঙ্গল পাঁচালিগানে এই রীতিই চলে এসেছে।

শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে নাটগীতাভিনয় করেছিলেন। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে তার যে উল্লেখ পাই তাতে বোঝা যায় যে তিনি রুক্মিণীহরণ ও বড়ু চণ্ডীদাসের অনুযায়ী রাধাবিরহ অভিনয় করেছিলেন।

উমাপতির পারিজাতমঙ্গলের মত ভাষাগীত- ও সংস্কৃতগদ্যপদ্য-যুক্ত সঙ্গীতনাটক পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা-মিথিলা-নেপাল-উড়িষ্যার রাজসভায় ও ধনি-পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত ছিল। গজপতি প্রতাপরুদ্রের প্রাদেশিক, চৈতন্যভক্ত রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভ', গোবিন্দদাস কবিরাজের 'সঙ্গীতমাধব', জগজ্জ্যোতিমল্লের ও প্রতাপমল্লের সভাকবি বংশমণি ওঝার 'মুদিতকুবলয়াশ্ব' (১৬২৮) ও 'গীতদিগম্বর' (১৬৫৫), জগজ্জ্যোতিমল্লের 'হরগৌরীবিবাহ' (১৬২৯), সিদ্ধিনরসিংহমল্লের ও শ্রীনিবাসমল্লের সভাকবি "দ্বিজ" রামভদ্রের 'হরিশ্চন্দ্র-নৃত্য' (১৬৫১) ও 'শিবমহিমা' বা 'ললিতকুবলয়াশ্ব' (১৬৬৫), জিতামিত্রমল্লের 'অশ্বমেধনাটক' (১৬৯০), ভূপতীন্দ্রমল্লের 'ভৈরবপ্রাদুর্ভাব' (১৭১৩), সরসরামের 'আনন্দবিজয়', ভারতচন্দ্রের অসম্পূর্ণ 'চণ্ডী নাটক' ইত্যাদি এই ধরণের ভাষা-সংস্কৃত-মিশ্র সঙ্গীতনাটক। বিদ্যাপতিও এইধরণের নাটগীত লিখেছিলেন বলে মনে হয়,[৩৫] তবে তার গদ্য অংশ সংস্কৃতে কি ভাষায় তা জানবার উপায় নেই। নেপালের রাজসভায় পুষ্ট সঙ্গীতনাটকের রীতি বোঝা যাবে নিম্নে উদ্ধৃত মুদিতকুবলাশ্বের অংশ থেকে।[৩৬]

প্রথমে

রঙ্গভূমিপূজাদি সর্বং কর্তব্যম্,

---

৩৩ সব পুথিতে এ শ্লোকটি না থাকলেও এর অকৃত্রিমত্ব অসংশয়িত।

৩৪ রাধাবিরহ।

৩৫ বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী পৃ ৪১-৪৩ দ্রষ্টব্য।

৩৬ পিশেল সঙ্কলিত *Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft* পৃ ৭-১০

তার পর

তালধর-গায়ন-ততবিততাদিবাদ্যযুক্তবাদকৈর্বামস্বরানুসারেণ বামপাদং প্রথমতো দত্বা মূলম্ উচ্চার্য্য রঙ্গং প্রবিশ্য সাধিতাঞ্জনেন তিলকং কর্তব্যম্। ততস্তালত্রয়ং দত্বা বাদ্যং বাদয়িত্বা দেবতাবন্দনং কর্তব্যম্। ততো নান্দীগীতং গাতব্যম্। তদ্ যথা

॥ রাজবিজয় ॥ একতালি ॥

রজতকনক রঙ্গ
ঈশ গোরি সঙ্গ।
একহি কলেবর বাসে
পুর আশে· ·

ততো জমনিকাং সংস্থাপ্য দক্ষিণহস্তেন জ্ঞানমুদ্রয়া জমনিকাপট্টং স্পৃশন্ সূত্রধারো নান্দীশ্লোকং পঠতি।· · নান্দ্যান্তে সূত্রধারঃ প্রবেশঃ॥ কোরাব॥ জতি॥ গণপতি মনে· ·॥ ইতি শ্লোকং পঠিত্বা পুষ্পমালাং ক্ষিপ্তা চরণচারণেন[৩৭] যথোক্তং নৃত্যতি॥ নচারী॥ কোরাব ·

অলমতিবিস্তরেণ। নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য। প্রিয়ে ইতস্তাবৎ। রাগবাদ্যশব্দেন প্রবিশ্য নটী॥ ·

ক্ষণং বিচিন্ত্য॥ প্রিয়ে স্মরণ ভেল। মৈথিল ভারদ্বাজগোত্র কবিপণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্রশর্ম-সুত শ্রীবংশমণি উঝাঞে কএল জে মোঞে কহিঅএলাহু তন্থিহি কুবলয়াশ্বমদালসাক চরিত্র নাম নাটক সে নাচহ॥

শেষে,

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গতমেতন্মদালসোপাখ্যানং।
দৃষ্ট্বা ভাষাগীতৈ র্নাট্যং রচিতং বিচিত্ররসভাবযুতম্॥· ·

বংশমণির নাটকটির গদ্য অংশ সবটাই সংস্কৃতে নয়। উপরে উদ্ধৃত অংশে মৈথিল আছে। মাঝে মাঝে বাংলাও আছে। যেমন,

হে প্রাণনাথ। আমার সমান দুঃখী পৃথ্বী বিষে দোসর না হৈবে। পহিরহি বাপমায়িকা ঘর সঁও রাক্ষস হরিয়া রাখিলো। পুনু বিবাহোত্তর তালকেতু পীড়া দিলো।

নেপাল-প্রবাসী মিথিলা-বাসীর লেখা বাংলা, তাই তাতে মৈথিলের ছাপ অসম্ভাবিত নয়।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে নেপালে সঙ্গীতনাটক পুরাপুরি ভাষা-রূপ নিলে।[৩৮] এইসব নাটকের অনেকগুলির গদ্য ও পদ্য অংশের ভাষা বাংলা। এতে বোঝা যায় যে বাংলায় এই ধরণের লেখা আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, মিথিলার মধ্য দিয়ে এই সব বাংলা-সংস্কৃত নাটক ও পদাবলী নেপালে পৌঁছেছিল। আরও জানা যায় যে নেপাল-রাজসভায় বাঙালী কবিপণ্ডিতের বিশিষ্ট স্থান ছিল।[৩৯]

প্রাচীন মঙ্গল-গীতি থেকে যে একদিকে সঙ্গীতনাটক (বা নাটপালা) ও অপরদিকে পাঁচালি-কীর্তন উদ্ভূত হয়েছিল তার প্রমাণ আগে দিয়েছি। নেপালের কোন কোন ভাষা-নাটকেও নাটপালা-পাঁচালির যোগসূত্র অচ্ছিন্ন রয়ে গেছে। নেপালে সঙ্গীতনাটকে সাধারণত 'দিবস' হিসাবে বিভাগ দেখা যায়। যেমন

---

৩৭ তুলনীয় জয়দেব, "পদ্মাবতী-চরণচারণ-চক্রবর্তী"।

৩৮ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'নেপালে ভাষা নাটক' (১৩২৪) দ্রষ্টব্য।

৩৯ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পৃ ৭৬৮-৭৭৪ ; বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী পৃ ৪৮-৫২।

মুদিতকুবলয়াথ পাঁচ দিবসের, "দ্বিজ" কাশীনাথের 'বিদ্যাবিলাপ' (১৭২০) সাত দিবসের, "দ্বিজ" কৃষ্ণদেবের 'মহাভারত নাটক' তেইশ দিবসের, "দ্বিজ" ধনপতির 'মাধবানল-কামকন্দলা' সাত দিবসের। এ ঠিক মধ্য-বাংলা মঙ্গল-পাঁচালির পালা-বিভাগেরই মত। চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল আট দিনে গাওয়া হত, ধর্মমঙ্গল বার দিনে। "দ্বিজ" গণেশের 'রামচরিত্র'[৩৮] পুরাপুরি বাঙ্গালায় লেখা। এতে নটী ও সূত্রধার নেই। আগাগোড়া গান, তাতে বর্ণনাও আছে। নাটপালায় ও পাঁচালির ঠিক মাঝামাঝি প্রবন্ধ এটি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে এর তুলনা চলে।

মঙ্গল-গীতি থেকে নাটপালার বিকাশের একটি মধ্যবর্তী রূপ মিলছে পুরানো অসমীয়া একোক্তিক (monologue) 'যাত্রা'য়[৪০] বা 'নাট'এ। এ নাটের ধারা অনেকটা সঙ্গীতনাটকেরই মত, তবে আকারে বড় নয়, আর, একটি ছাড়া গায়ক-অভিনেতা নেই। অধিকারীই একাধারে সূত্রধার, অভিনেতা, কথক এবং গায়ন। সংস্কৃত ভাণে যেমন এখানেও তেমনি সূত্রধারই সব ভূমিকার হয়ে কথা বলছে, গান গাইছে। ব্রজবুলিতে লেখা গানগুলি, সংস্কৃত শ্লোকগুলি, এবং গীতাভিনয়ের নির্দেশগুলিই মূল রচনা। সংলাপ অংশের যোজনা সূত্রধারের উপর নির্ভর করত। এ ধরনের রচনার মধ্যে শঙ্করদেবের নাটগুলিই সব চেয়ে পুরানো। এগুলি লেখা হয়েছিল কোচবিহারের রাজসভার আশ্রয়ে। 'সীতাস্বয়ংবর' বা 'রামবিজয়' নাট লেখা হয়েছিল "চিলা-রায়" শুক্লধ্বজের অনুরোধে (১৫৬৮)।

> শ্রীগোপালপদচ্ছত্রচ্ছায়ালালসমানসঃ।
> শুক্লধ্বজনৃপ এতৎ কারয়ামাস নাটকম্ ॥
> বিন্দুরন্ধ্রবেদচন্দ্রশাকে শঙ্কর-সংজ্ঞকঃ।
> শ্রীরামবিজয়ো নাম নাটকং বিদধেঽধুনা ॥

রচনার কিছু নিদর্শন[৪১]—

সূত্রধার। আহে সামাজিক লোক সখী মদনমঞ্জরী কনকাবতী চন্দ্রমুখী শশিপ্রভা এ সব সহিতে সে জনকনন্দিনী সীতা রামক চরণ চিন্তি প্রবেশ কয়ে আওত। তা দেখহ শুনহ নিরন্তরে হরি বোল হরি।

> গীত ॥ রাগ সুহাই ॥ একতালা ॥
> আয়ে জনকসুতা কয়ো পরবেশ
> পেক্ষয়ে বদন মন মন্মথ ক্লেশ। ধ্রু।
> মাণিক মুকুট কুণ্ডল করু কান্তি
> দশন ওতিম নব মুক্তিম পান্তি।

---

৪০ তুলনীয় শঙ্করদেবের 'কালিয়দমন'-এ সূত্রধারের উক্তি,

> ভো ভো সামাজিকাঃ যূয়ং শৃনুধ্বং শ্রদ্ধয়াধুনা।
> কৃষ্ণস্য কালিদমন-যাত্রা-বার্তাং নিবোধত ॥

এবং ভরতবাক্য,

> কৃষ্ণস্য কালিদমনং নাম যাত্রা চ কারিতা।
> যচ্চ ন্যূনাধিকং দোষং ক্ষম্যতাং ভগবন্ প্রভো ॥

৪১ হরিবিলাস গুপ্ত প্রকাশিত (১২৯১)।

ঈষত হাসি চান্দক রুচি চোর
নীল অলকে লোলে লোচন চকোর।
কঙ্কণ কেয়ূর রঞ্জন কায়
রামক চরণ চিন্তিয়ে চিত্ত লগাই।
পদপঙ্কজ পংক্তি করু রোল
রূপে ভুবন ভুলে শঙ্করে বোল॥

সূত্রধার। আহে সামাজিক লোক সে জনকনন্দিনী সীতা সখী সব সহিতে নৃত্য করিয়ে। সে জাতিস্মরী কন্যা পূর্বজনম কথা মনে পড়ল। তাহে স্মরি পড়ি ক্রন্দন কয়ে রহল। তাহা পেক্ষি সখী মদনমঞ্জরী কনকবতী বাহু মেলি পুছত।

মদনমঞ্জরী বোল। আহে প্রাণসখি তোহো রাজনন্দিনী কোন সম্পত্তি নাহি ঠিক। কি নিমিত্তে তোহো বারম্বার বিলাপ করহ। প্রাণসখি হামার শপথ তোহোরি পায়রে লার্গো। হামাত সত্বরে কথা কহ।

শ্লোক। ততঃ সীতা বিনিশ্বস্য চরিত্রং পূর্বজন্মনঃ।
সখীভ্যাং বর্ণয়ামাস রুদতী সুদতী সতী॥[৪২]

সূত্রধার। সীতা কিঞ্চিৎ স্বস্থ হুয়া অঞ্চলে আক্ষি মুখ মুছি নিশ্বাস ফোঁফারি সখী সবক সম্বোধি বোলল।

সীতা বোল। আহে সখী সব পরম অভাগিনীত কি পুছহ। হামো পূর্বজনমে ঈশ্বর নারায়ণক স্বামী ইচ্ছা কয়লো। অনেক কায়ক্লেশ করিয়ে বহুত বরিষ তপস্যা কয়লো। তদনন্তরে আকাশবাণী শুনলো— আহে কন্যা তোহো ওহি জনমে স্বামীক ভেণ্ট নাহি পাওব। আওর জনমে শ্রীরাম রূপে তোহাক বিবাহ করব। ইহা জানি হামো অগনিত প্রবেশি প্রাণ ছাড়লো। সে হামার করমে দৈববাণী বিফল ভেল। সে শ্রীরাম স্বামীকে চরণ ওহি জনমে ভেণ্ট নাহি ভেলো।

সূত্রধার। ওহি বুলি সীতা পরম তাপ উপজল। হা রাম স্বামী বুলি মোহ হুয়া মাটি লুটি যৈসে বিলাপ কয়ল তা দেখহ শুনহ নিরন্তরে হরি বোল হরি।··

সূত্রধার। তদন্তরে মিথিলাপুর পাই ঋষি সোদর সহিতে শ্রীরামচন্দ্র রাজসভা প্রবেশ কয়ল। জনক রাজা উঠিকহো রাম লক্ষ্মণ সহিতে বিশ্বামিত্রক আসনে বৈসাই কর যুড়ি যৈসে বুলিতে লাগল।

জনক বোল। হে ঋষিরাজ তোহারি আগমনে হামার মিথিলাপুর পবিত্র ভেল। তব দরশনে ময়ি মহা ভাগ্যোদয় মিলল।

সূত্রধার। রাজক বচন শুনি ঋষি আশীর্বাদ শ্লোক পড়ল।

শ্লোক। চিরঞ্জীর চিরঞ্জীব রাজন্ সজ্জনরঞ্জন।
গজবাজিরথৈশ্বর্য্যভার্য্যাত্রিভুবনৈঃ সহ॥

সূত্রধার। ঋষি বোল যে মহারাজ জনক তোহো পুত্র পত্নী সহিতে চিরঞ্জীব ভব।

সূত্রধার। জনক রাজা রাম লক্ষ্মণর রূপ নিরক্ষিয়ে পরম আশ্চর্য হুয়া মুনিত পুছত।··

---

৪২ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্লোকগুলিও এইরকম কাহিনী-সংযোগসূত্র (link) মাত্র।

৭

নাটগীতিতে ও যাত্রায় নাচে পাত্রপাত্রীর ভূমিকার সাজ করার ও সঙ সাজার নাম ছিল 'কাচ' (<কৃত্য) বা 'কাপ' (<কল্প)। মুখোস পরলে হত 'পাতা (<পাত্র) কাচ'। মঙ্গল বা পাঁচালি গানে সাধারণত কাচের আবশ্যক হত না। সেখানে মূল গায়ন (বা 'ওঝা') হাতে চামর মন্দিরা নিয়ে ও পায়ে নূপুর দিয়ে গান করত, প্রয়োজনমত অল্পস্বল্প নাচত ও অভিনয় ('ভাবকালি' = ভাবুকত্ব, আধুনিক 'ভাও বাতলানো') দেখাত। দীর্ঘ বর্ণনাময় অংশগুলি ('শিকলি') মূল গায়ন সুরে আবৃত্তি করে যেত, গীতি অংশগুলি ('নাচাড়ি') অঙ্গভঙ্গি করে নেচে নেচে ভাবকালি দেখিয়ে গাইত। সহকারী গায়নরা ('পালি' বা 'দোহার') ধুয়ার তান ধরে যেত এবং মাঝে মাঝে অধিকারী বা মূল গায়নকে বিশ্রাম করবার অবসর দিত। আর থাকত মার্দঙ্গিক এবং কখনো কখনো বাংশিক ও বীণাবাদক। রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তনে শিবদুর্গা কর্তৃক কৃষ্ণমঙ্গল-পাঁচালি গানের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে তাতে এই রকম ছবিই পাই—

কিন্নরগন্ধর্বগণ পঙ্ক্তে বেড়িল
কৃপাময়ী কৃষ্ণের কীর্তন যুড়ে দিল।
দেবগণ দোহার গণেশ গান মূল
নারদ তানপুরা হাতে হন অনকূল।
ভাব করে ভবানী আপনি ধরে তাল
নৃত্য করে কৃত্তিবাস বাজাইয়া গাল।

৮

পুরানো কৃষ্ণমঙ্গল-পাঁচালীতে কৌতুকরসের যোগান দিত জরতী বা বড়াই বুড়ি। তেমনি ধর্মমঙ্গল-পাঁচালিতে ভাজন বুড়ি, চণ্ডীমঙ্গলে জরতীবেশিনী দেবী। অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণ-যাত্রায় জরতীর স্থান গ্রহণ করলে মুনি-গোঁসাই নারদের শিষ্য ব্যাসদেব ('বাসদেব', 'বাসু'), কেন না ইতিমধ্যে পেশাদার-গুরুর তল্পিদার শিষ্যের ভূমিকা জনসাধারণের কাছে অতি পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

৯

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে যাত্রার তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক্ রীতি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পুরানো ভক্তিরসময় পদ্ধতি রয়ে গেল কৃষ্ণ-যাত্রায় বা 'কালিদমন'এ, চৈতন্য-যাত্রায়, চণ্ডী-যাত্রায়। নূতন অশ্লীল কৌতুকরসাত্মক রীতি খাড়া হল বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর, বিট-বারনারীর, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানীর, ভিস্তি-মেথরানীর সঙে, আর আদিরসাল ধারা পুষ্ট হল বিদ্যাসুন্দর-যাত্রায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই তিন ধারা প্রবল বেগে বয়ে এসেছে, তার পর তিন ধারাই এসে মিশেছে আধুনিক-রঙ্গমঞ্চ-প্রবর্তিত বাঙ্গালা নাটকে। তবে কৃষ্ণ-যাত্রা একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। নাটক-কথকতা-পাঁচালির প্রভাব স্বীকার করে তা রূপ নিয়েছিল গীতাভিনয়ে। কিন্তু সে রূপও এখন প্রায় মিলিয়ে এল।

পুরানো একোক্তিক নাটপালা ও পদাবলী-কীর্তনের প্রভাবপুষ্ট হয়ে নব রূপ গ্রহণ করলে অষ্টাদশ

শতাব্দীর শেষভাগে নূতন-পাঁচালি পদ্ধতিতে। একোক্তিক নাট-পালা থেকে এই নব-পাঁচালির প্রধান পার্থক্য হল গদ্য-উক্তির বদলে পদ্য-ছড়ার ব্যবহারে। দাশরথি রায় এই নূতন পাঁচালির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি।

এখন 'পালা' কথাটির অর্থ বিচার করি। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে (১৪৯৫) কথাটি প্রথম মিলছে। তার পরে চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল-ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি সব আনুষ্ঠানিকভাবে গেয় আখ্যান-কাব্যেই পাওয়া যাচ্ছে। পুরানো কৃষ্ণমঙ্গলে কথাটি পাই না, কারণ কৃষ্ণমঙ্গল আনুষ্ঠানিক ভাবে গান হত না। শব্দটি এসেছে প্রাকৃত ও অর্বাচীন সংস্কৃত 'পালি' ধাতু থেকে। এই ধাতুর এক মানে হচ্ছে 'ব্রত বা মানসিক উদ্‌যাপন নির্দিষ্ট ক্রম-অনুসারে কার্য-সম্পাদন'। এই অর্থ থেকেই একদিকে এসেছে 'ঠাকুর-পূজার পালা' (অর্থাৎ ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের নির্দিষ্ট কালে করণীয় পূজাক্রম), অপরদিকে এসেছে 'মঙ্গল-গানের পালা' (অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনে বা সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গাইতে হবে যে অংশটুকু)। 'পালি' শব্দটির প্রয়োগ সবচেয়ে আগে মিলছে মৃচ্ছকটিকের দশম অঙ্কে; চারুদত্তকে বধ্যস্থানে নিয়ে যাবার সময়ে একজন জল্লাদ অপরকে বলছে, আজ তোমার জল্লাদগিরির পালা—"অলে তুঅ অজ্জ বজ্‌ঝপালিআ"।

চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল শক্তিতন্ত্রের গান। শক্তিদেবীর বিশিষ্ট গুহ্য সংখ্যা 'আট'। তাই বোধ করি চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল আট দিন ধরে গাওয়া হত, এবং এই দুই মঙ্গল-গানের সাধারণ নাম 'অষ্টমঙ্গলা'। এই নামটির একটি পৃথক্ অর্থও আছে। শেষের যে গানটিতে গীতিকাহিনীর সংক্ষেপে বিবরণ দিয়ে দেবীর ঘটবিসর্জন ও স্বর্গগমন বিবৃত হত তারও নাম 'অষ্টমঙ্গলা'।

চণ্ডীমঙ্গল আরম্ভ হত মঙ্গলবারে, শেষও হত মঙ্গলবারে। রোজ দু পালা করে মোট ষোল পালা সাধারণত এইভাবে গাওয়া হত,— মঙ্গলবার দিনের বেলা সৃষ্টিপত্তন থেকে দক্ষযজ্ঞ, রাত্রিবেলায় গৌরীর বিবাহ থেকে গণেশের জন্ম; বুধবার দিনে কার্তিকের জন্ম থেকে কালকেতুর জন্ম, রাতে কালকেতুর বিবাহ ও পশুদের সঙ্গে যুদ্ধ; বৃহস্পতিবার দিনে দেবীর অনুগ্রহ, রাতে গুজরাট নগর পত্তন; শুক্রবার দিনে কালকেতু কাহিনী শেষ, রাতে খুল্লনার জন্ম ও বিবাহ এবং ধনপতির প্রথম বাণিজ্যযাত্রা; শনিবার দিনে খুল্লনার ছাগল-চরানো, রাতে খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির মিলন; রবিবার দিনে খুল্লনার পরীক্ষা, রাতে ধনপতির সিংহল গমন ও শ্রীমন্তের জন্ম; সোমবার দিনে শ্রীমন্তের অধ্যয়ন ও ডিঙ্গা-গঠন, রাতে শ্রীমন্তের সিংহল-গমন; মঙ্গলবার দিনে-রাতে মশান কাহিনী ও শ্রীমন্তের পিতৃপরিচয়, পিতাপুত্রের দেশাগমন, শ্রীমন্তের সঙ্গে জয়াবতীর বিবাহ, স্বর্গ-আরোহণ।

মনসামঙ্গল আরম্ভের কোনো নির্দিষ্ট দিন ছিল না। সব শুদ্ধ তের পালা, এবং তা এইভাবে গাওয়া হত,— প্রথম দিবস রাতে প্রথম পালা; দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ দিবস দিনে-রাতে দু পালা করে একাদশ পালা অবধি; সপ্তম দিবস শুধু রাতে দ্বাদশ পালা (জাগরণ); অষ্টম দিবস দিনে অষ্টমঙ্গলা, স্বর্গ-আরোহণ। মনসা-মঙ্গলের পালা-ভাগ মোটামুটি এইরকম— প্রথম সৃষ্টিপত্তন থেকে মনসার নির্বাসন, দ্বিতীয় সমুদ্রমন্থন ও দেবসমাজে মনসার প্রতিষ্ঠা, তৃতীয় পরীক্ষিতের কাহিনী ও সর্পসত্র, চতুর্থ হাসনের কাহিনী, পঞ্চম ধন্বন্তরির কাহিনী, ষষ্ঠ জালুমালুর কাহিনী, সপ্তম চাঁদোসদাগরের সঙ্গে মনসার বিবাদের সূত্রপাত, অষ্টম চাঁদোর মহাজ্ঞান হরণ, নবম চাঁদোর বাণিজ্য কাহিনী, দশম লখিন্দর-বেহুলার জন্ম ও বিবাহসম্বন্ধ, একাদশ লখিন্দর-বেহুলার বিবাহ, দ্বাদশ মনসার ভাসান, ত্রয়োদশ উপসংহার।

ধর্ম-ঠাকুর সূর্যদেবতা তাই তাঁর বিশিষ্ট গুহ্য সংখ্যা 'বারো'। সেই কারণে **ধর্মমঙ্গল অষ্টমঙ্গলা** নয় '**দ্বাদশ মঙ্গল**' (তুলনীয়, "**দ্বাদশ মঙ্গল** জুড়াইল শুভক্ষণে", রূপরাম)। গান হত বারো দিন ধরে, এবং পালাও বারোটি—সৃষ্টিপত্তন, শালে-ভর, লাউসেন-জন্ম, লাউসেন-চুরি, মল্ল-বধ, জালন্দা, জামতি, অঘোর-বাদল, ইছাই-বধ, কাঙুর, পশ্চিমোদয়, স্বর্গারোহণ। কোনো কোনো কবি পালার অদলবদল করেছেন। ঘনরাম বারো পালাকে ভেঙে চব্বিশ পালা করেছেন। **ধর্মমঙ্গল** গান ধর্ম-ঠাকুরের গাজনের অঙ্গ ছিল বলে গাওনার কোন নির্দ্দিষ্ট বার ছিল না। তবে এমনি গান হলে বোধ হয় শনিবারে শুরু হত। শনিবার ধর্ম-ঠাকুরের পবিত্রতম দিন ॥

ভারতীয় সাহিত্য[১]

অসমীয়া সাহিত্যের তিন যুগের তিন দিকপাল

একদিন ঋষিকবির সত্যদৃষ্টিতে অবিনাশী ভারতের অখণ্ডরূপের, তাহার ইতিহাসের অন্তরতম প্রবণতার গান আমরা শুনিয়াছিলাম 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'। আসামের সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে এই 'মিলাবে মিলিবে'র সত্যটি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আসামকে কেহ বলিয়াছেন মিউজিয়ামের দেশ, কেহ বলিয়াছেন ডাইনীর দেশ, ভূমিকম্প-বন্যার দেশ, কেহ বলিয়াছেন সোনার দেশ 'মিউং ডুন্ চুণখাম'। বহুর মিলিত উপচারে নানা স্তরের জীবনের ধারায় ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে অস্ট্রিক্ আসিয়াছে, নিগ্রোবটু আসিয়াছে, দ্রাবিড়মঙ্গোলীয় ও আর্যেরা আসিয়াছে, কত সংকরজাতি গড়িয়া উঠিয়াছে, রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে। শুধু মগধগৌড় হইতে লোক আসে নাই, মহাচীন হইতে, ব্রহ্মদেশ হইতে, শ্যাম হইতে দুর্বার স্রোতে কত মানুষের ধারা আসিয়াছে। আ চাম বা অপরাজিত তাহাদের যাত্রা। যুগযুগান্তর ধরিয়া কেহ পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরিয়াছে, কেহ শ্যামল প্রান্তরে নামিয়াছে, রাজ্য গড়িয়াছে, ভাঙিয়াছে ; কেহ বলিয়াছে আমরা স্বর্গদেবের সন্তান, বশিষ্ঠের উপাসক ; আবার কেহ মনে করিয়াছে যে তাহারা সোজা আকাশ হইতে নামিয়াছে—যেমন আঙ্গামী লোটা সেমা নাগারা। শুধু বাংলা নয়, মিথিলা কনৌজ কাশ্মীর গুজরাট দাক্ষিণাত্য হইতে শ্রমণ আসিয়াছে শিল্পী আসিয়াছে, তান্ত্রিক-কাপালিক শ্রাবক-শ্রাবিকা আসিয়াছে। সহজিয়ার দল, হাটকেশ্বরের পূজারীরা, নদীয়ার ব্রাহ্মণেরা, বৈষ্ণবগুরুরা, শিবভক্তেরা, শক্তি উপাসকেরা, সদ্ধর্মীরা, কিরাত বোড়ো খাসি নাগা অহমরা, কত পার্বত্য জাতি উপজাতি এই অপূর্ব মন্থনে যোগ দিয়াছে। ফলে আধুনিক আসামের সংস্কৃতি ও সভ্যতা এক বিচিত্র রূপায়ণে পরিণত হইয়াছে। সব স্তরের সব যুগের আগন্তুক-সংস্কৃতির কিছু-কিছু পরিচয় জাতীয় জীবনে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নানা ভৌগোলিক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে ও বাধায় এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে নাই। ইহারই মধ্যে বলিষ্ঠ আর্য সংস্কৃতি আগন্তুক হইলেও আত্মপ্রতিষ্ঠ। ইহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী ও সর্বগ্রাসী। ইহার পিছনে সারা ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও সাধনা। অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রাচীন কামরূপ রাজ্য উত্তর-ভারতের আর্যদের পূর্বাভিমুখী বিস্তৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। কালিকাপুরাণে বর্ণিত আছে যে, নরক বিদেহ রাজ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং কিরাতরাজ ঘোটককে বধ করিয়া প্রাগজ্যোতিষপুর অধিকার করেন। মহাভারত বা পুরাণাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও সপ্তম শতাব্দীর ভাস্করবর্মার নিধানপুর তাম্রশাসনে প্রাগজ্যোতিষাধিপতি নরক ও ভগদত্তের উল্লেখ আছে। ভাস্করবর্মা স্থানীশ্বরাধিপতি মহারাজ হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক 'প্রকৃষ্ট আর্যধর্মের রক্ষক' ও 'শশিশেখর প্রিয় পিনাকিনে'র ভক্ত, হিউয়েন্থসাং তাঁর বন্ধু। শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের মতে কামরূপের একটি গ্রামেই পঞ্চম শতাব্দীতে দুইশত ব্রাহ্মণবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। লামা তারানাথ বলেন যে, মগধগৌড় হইতে

---

১ এই প্রবন্ধমালার প্রথম রচনা, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন লিখিত 'ফকীরমোহন সেনাপতি : ওড়িয়া সাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি' বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিতাড়িত বহু বৌদ্ধ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী পূর্বাঞ্চলে কুকীদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। শংকরবিজয় গ্রন্থে কিংবদন্তী আছে যে, শংকরাচার্য কামরূপ আসিলে অভিনবগুপ্ত তাঁহাকে তান্ত্রিক অভিচারক্রিয়ার দ্বারা অসুস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দশম-একাদশ শতাব্দীতে লুইপা সরহপা মীনপা গোরক্ষপা কুক্কুরী ভুসুক প্রভৃতি সিদ্ধাচার্যরাও কামরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পরের যুগ বিকৃত তন্ত্রাচারের যুগ। মোটকথা এই কামরূপীয় আর্যসংস্কৃতিই আধুনিক অসমীয়া সংস্কৃতির মূলধারা জোগাইয়াছে। আজ অসমীয়া সাহিত্যের বিচারে বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকায় এই স্পষ্ট কথাটাই মনে রাখা উচিত যে, প্রাচীন কামরূপ রাজ্য বা তাহার স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী রাজ্যগুলি বর্তমান আসামের ভৌগোলিক সীমাতেই নিবদ্ধ ছিল না। আধুনিক উত্তর-বাংলাদেশের বহুস্থান জুড়িয়া তাহার সীমানা ছিল—

নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রি ব্রহ্মপুত্রস্য সংগমম্
করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনী—

বৈয়াকরণিক বররুচির মতে মহারাষ্ট্রী সৌরসেনী পৈশাচী ও মাগধীই প্রাচীন আর্যভাষার অপভ্রংশ এবং প্রাচীন কামরূপীয় প্রাকৃতই আধুনিক অসমীয়া ভাষার জনক ও অর্ধমাগধী বংশসম্ভূত। বাংলা ভাষাও একই গোত্র হইতে উদ্ভূত। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অসমীয়া ও বাংলার সাহিত্য বিচারে এই মূল কথাটি মনে রাখা উচিত। এইসব সাহিত্য প্রধানত লৌকিক সাহিত্য ছিল, জনগণের মুখে মুখেই ঘুরিত। সেইজন্য প্রাচীন বাংলা ও অসমীয়ায় প্রভেদ খুবই সামান্য।

এই সময়ে আসামের ইতিহাসে একটি দারুণ বিপ্লব ঘটে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীন হইতে আগত টাই জাতির শান্ শাখার একটি বংশ ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার উপর দিকে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে। ইহাদেরই আমরা 'আহোম' বলিয়া জানি। ব্রিটিশদের আগমনেই তাঁহাদের রাজ্য বিনষ্ট হয়। প্রায় ছয় শতাব্দী ধরিয়া এই সলিদেব বংশ আসামে আধিপত্য করেন, মুসলিম অগ্রগতিতে বাধা দেন, ব্রহ্মবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা যে, বর্তমান অসমীয়া ভাষা এই আহোমদেরই ভাষা। একথা সত্য যে, আহোমরা কতকটা নিজেদের ভাষা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং আর্যীকৃত অসমীয়ায় বহু আহোম শব্দ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে শক্তিশালী আর্যসংস্কৃতি ক্রমশ বিজেতাদের বিজিত করিয়া ফেলিল। ভাবে ভাষায় ধর্মে আচারে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য কিছু বজায় রাখিলেও তাঁহারা হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া সম্পূর্ণ আর্যনৃপতি রূপেই পরিগণিত হইলেন। প্রত্যেক অসম বুরঞ্জীতেই এই 'খুনলুঙ্গ-খুনলাই'এর কাহিনী অর্থাৎ ইন্দ্রপুত্রদের রাজ্যস্থাপনের কাহিনী পরিবেশিত হয়। এমন কি যজ্ঞস্থলে স্বর্ণগাভী তৈয়ারি করিয়া এই অনার্য রাজাদের তাহার উদরে প্রবেশ করাইয়া তাহাদের পুনর্জন্মেরও অভিনয় করাইয়া তাহাদের ইন্দ্রবংশীয় বলিয়া গ্রহণ করা হইত এবং এই 'ইন্দ্রবংশীয় রাজার বিবরণ' আমরা প্রত্যেক বুরঞ্জীতেই পাই। ইহাও কিংবদন্তী আছে যে বশিষ্ঠের অভিশাপে শ্যামা বিদ্যাধরীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে প্রথম স্বর্গনারায়ণ দেবের উৎপত্তি।

২

অসমীয়া সাহিত্যকে কালবিভাগে বিচার করিলে প্রাচীন মধ্য ও বর্তমান যুগে ভাগ করা যায়। অবশ্য আরও সূক্ষ্মভাবে প্রাচীন যুগকে গীতিযুগ, মন্ত্র ও ভণিতার যুগ, প্রাক্-বৈষ্ণবী যুগ এবং মধ্যযুগকে

শংকরী যুগ ও শংকরোত্তর বৈষ্ণবী যুগে বিভক্ত করা যায়। ব্রিটিশ আগমনের সঙ্গে বর্তমান যুগের উৎপত্তি ধরিলেও এই যুগেরও নানা ধারা বিদ্যমান। এই প্রবন্ধে আমরা প্রাচীন মধ্য ও বর্তমান এই বিভাগই সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিব। প্রাচীন যুগের প্রথম দিকে ডাকের বচন, খনার বচন, দোঁহা, ধাইনাম, গরখীয়া নাম, বিয়ানাম, বিহুনাম, বারমাহী গীত, আইর নাম, নাওখেলোবা গীত প্রভৃতিতে গ্রাম্য কবিদের সহজ সরল সাধারণ ভাবেরই প্রকাশ দেখি। তাদের ময়না, মলুয়া বা প্রিয়েরা জল খায়, দোলায় ওঠে, 'এতিয়াই গরু লই যাব এ' মালভোগ ধানের চিঁড়ার সঙ্গে 'লোনে মাছভাত' খায় ও তাদের প্রিয়াদের জন্য স্বপ্ন দেখে—

হার পিন্ধে টার পিন্ধে পিন্ধে সাতসরী
দেবাঙ্গ ভূষণ পিন্ধে ইন্দ্রে দেছে আনি।[১]

আবার পীরিতি লাগিলে 'চকুরে চকুরে চায়', 'বিনন্দ বাঁশি বাজে'। রামসীতার কাহিনী, হরগৌরী কৃষ্ণ রুক্মিণী উষা-অনিরুদ্ধর বিবাহকাহিনী তাহাদের জনচিত্তকে মুগ্ধ করে।

প্রাক্-শংকরী যুগে মাধব কন্দলীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে। তিনি রামায়ণকার বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ইনি কবি কৃত্তিবাসের পূর্বতন কবি বলিয়াই মনে হয়। বরপেটার কথাগুরুচরিতে উল্লেখ আছে যে, শংকরদেবের অধ্যাপক মহেন্দ্র কন্দলীর আচার্য বৃদ্ধ বাঘ আচার্য মাধব কন্দলীর শিষ্য ছিলেন। এই হিসাব অনুসারে শংকরদেবের প্রায় একশতবর্ষ পূর্বে মাধব কন্দলী বিদ্যমান ছিলেন। কন্দলী উপাধি বিশেষ, কোন্দলে বা তর্কে যাঁহারা পারদর্শী হইতেন তাঁহাদেরই 'কন্দলী' বলা হইত। অসমীয়া সাহিত্যে মহেন্দ্র কন্দলী, মাধব কন্দলী, অনন্ত কন্দলী, শ্রীধর কন্দলী, বড় কন্দলী, সাগর কন্দলী, রত্নাকর কন্দলী, রুচিনাথ কন্দলী প্রভৃতি বহু পণ্ডিতের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি নিজের আত্মপরিচয় দিতেছেন—

কবিরাজ কন্দলী যে আমাকে সে বুলি কয়
মাধব কন্দলী আরো নাম।
সপোনে সচিতে মঞি জ্ঞানকায় বাক্যমনে
অহর্নিশে চিন্তো রামরাম॥
শ্লোকে সংস্কৃতে আমি গাঢ়িবাক পরিচ্ছয়
করিলাহ সর্বজন বোধে।
রামায়ণ সুপয়ার শ্রীমহামাণিক্য যে
বরাহী রাজার অনুরোধে।

ইনি কোন্ মাণিক্য-উপাধিধারী রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন তাহা জানা নাই, কিন্তু সেই সময় কপিলী উপত্যকায় ভৌমপালবংশীয় কয়েকজন ক্ষুদ্র রাজা রাজত্ব করিতেন, পরবর্তী ত্রিপুরা-রাজবংশীয়দের সঙ্গেও হয়তো তাঁহাদের সম্পর্ক ছিল।

কন্দলীর প্রধান কৃতিত্ব এই যে, মূল বাল্মীকির রামায়ণের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি অবলম্বন করিয়া তিনি

১ অসমীয়া ভাষায় "র" কে ৰ ও 'ব' ৱ এই ভাবে লিখিত হয়।

লৌকিক ভাব ও ভাষার সাহায্যে রামায়ণকে অসমীয়া সমাজের জন্য নূতন করিয়া সৃজন করিলেন। মহাপুরুষ শংকরদেব মাধব কন্দলীকে 'পূর্ব কবি অপ্রমাদী' বলিয়া অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন। কথিত আছে যে, মাধবদেব আদিকাণ্ড ও শংকরদেব উত্তরাকাণ্ড পুনরায় রচনা বা সম্পাদন করিয়া কন্দলীর রামায়ণকে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কবি রামের প্রাসাদ বর্ণনা করিতেছেন—

রামর প্রাসাদ শোভে কৈলাস সমান
বিদ্যুতের কান্তি যেন জলে থানে থান
প্রাসাদ উপরে দিলা মাণিকর কান্তি
ইন্দ্রনীল মণি দিল থানে থানে জান্তি।

প্রাসাদের চিত্রাঙ্কনে দেখি বৃষযানে শংকর, পাতালে বন্দী বলি, গরুড়স্কন্ধবাহী বিষ্ণু, ইত্যাদি। বালীর পতনে তারার বিলাপ পতিপ্রাণা নারীর বিরহ বেদনাকে গাথায় মূর্ত করিয়াছে—

আকুল ব্যাকল করি ক্রন্দন করন্তে আছে
রাজার কোলাত পাটেশ্বরী।

সবাই কাঁদিতেছে—

স্বামীকে বেড়িয়া কাঁদে পাটেশ্বরী লোকে
সুগ্রীব কান্দন্ত অতি জ্যেষ্ঠ ভাইএর শোকে
রামচন্দ্র লক্ষ্মণ কান্দন্ত হনুমন্ত
সৈন্যসমে চারিপাত্র যার জাম্ববন্ত।

বালী যখন মৃত্যুশয্যায় তখন স্ত্রীপুত্রকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গীটিও কবির রসশক্তির পরিচয় দেয়—

দেখত অঙ্গদ চরণত পরি আছে
সব বন্ধু জনে বেঢ়ি কান্দে আগে পাছে
ডাইন হাতে অঙ্গদকো আলিঙ্গি ধরিলা
বাম হাতে ধরিয়া তারাক্ বোধ দিলা।

এবং সুগ্রীবকেও নিজের গলার মালা দিয়া 'শ্রেষ্ঠ ভাইক্ (অর্থাৎ বড় ভাই) লাগি না করিবা শোক্' এই উপদেশ দিয়া কবি বালীর মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

কবি সংস্কৃত সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন। বহু স্থলে হুবহু বাল্মীকির বর্ণনার শুধু অনুকরণ করেন নাই কাব্য ও অলংকার শাস্ত্র অনুমোদিত উপমা ও অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন 'রামমুখ পদ্ম মোর নয়ন ভ্রমর' তেমনি 'তিলফুল জিনি নাসা', 'ত্রিবলিত উদর', 'মুকুতার পান্তি সদৃশ দন্ত', 'মৃণাল সম ভুজ', 'চম্পক কলিকা সম আঙ্গুল'।

রামসীতাকে কেন্দ্র করিয়া আসমুদ্র হিমাচল ভারতের জনচিত্ত যুগে যুগে অপূর্ব রসাস্বাদ করিয়াছে, আসামেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সন্ধ্যাপ্রদীপের ক্ষীণ আলোতে আজও এইসব রসাপ্লুত কাহিনীর মধ্য দিয়া গ্রাম্য কথকঠাকুর অশিক্ষিত কাঠুরে চাষী শ্রমিকের মনে অমৃত বিতরণ করিতেছেন। এই

কবি তাঁহার বর্ণনানৈপুণ্যে, হাস্যরসের সরসতায়, কাব্যরসসৃষ্টি করিয়া পরম-পুরুষ রামকে জনসাধারণের মনে মিশাইয়া দিয়াছেন, ইহাই তাঁহার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

৩

দ্বিতীয় যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যমণি হইতেছেন শ্রীমন্ত শংকরদেব। তিনি সাধক ধর্মগুরু, বর্তমান অসমীয়া সমাজের স্রষ্টা। আসামের বাহিরে তাঁহার নামের সহিত অনেকেই পরিচিত নন বা সামান্য ভাবে পরিচিত। শুধু সাহিত্যিক হিসাবেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকা উচিত। তাঁর নানা নাটক, ব্রজবুলির গীত, ভটিমা, ভাগবতের অনুবাদ অবিস্মরণীয় ভাবে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবিদের, রসিক মহাজনদের মধ্যে আসন দান করে। অনবদ্য ভাব ভাষা পদলালিত্য ছন্দ রাগরাগিনীর যোজন তাঁহাকে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সমপর্যায়ে স্থান দেয়। সংস্কৃত কবি হিসাবেও তাঁর স্থান অতি উচ্চে। এই সাহিত্য ধর্মবিষয়ক ও ভক্তিমূলক কৃষ্ণকথা প্রচারই তাহার মূল উদ্দেশ্য।

শ্রীশংকরদেবের চরিতকার বলেন যে, শংকরদেবের আবির্ভাবের সময় সারা কামরূপ বিকৃত তন্ত্রাচার ও ধর্মের নামে ব্যভিচার-অনাচার-অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। কামরূপ-অনুসন্ধানসমিতি 'রাতিখোয়া' দলের কাহিনী শুনাইয়াছেন। এইসব লোকেরা দেবীর নিকট নিজেদের আত্মবলি দিবার সংকল্প করিত; এবং একবৎসর তাহারা যথেচ্ছা ভোগ করিবার অধিকার পাইত। যোগিনীসাধন, চারিচন্দ্রসাধন, দূতীযাগ, লতাসাধন, পঞ্চ-মকারের ব্যবস্থায় নরনারী লুব্ধ, তাহাদের কষ্টার্জিত সাধন ব্যয়িত ক্ষয়িত, সামান্য একটু শক্তির বিকাশেই তাহারা মুগ্ধ, আগমনিগমযামলের পবিত্র শিবোক্ত নির্বাণধর্ম বিকৃত পশ্বাচারে পরিণত। এই পরিবেশের মধ্যেই মহাপুরুষ শংকরদেবের আবির্ভাব। ১৩৭১ শকের আশ্বিন মাসে আলিপুখরীতে শিরোমণি ভুঁইয়া চণ্ডীবরের বংশে তাঁহার জন্ম ও ১১৮ বৎসর পরে সুদীর্ঘ জীবনের শেষে ১৪৯০ শকের ভাদ্রে তাঁহার তিরোভাব। প্রথম-জীবনে তিনি সাধারণ গৃহস্থেরই জীবন যাপন করিতেন। পরে তিনি বৎসরের পর বৎসর ভারতের তীর্থে তীর্থে পরিক্রমা করেন। সন্তপ্রধান ভক্ত কবীরের সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয় এবং দ্বিতীয় পরিক্রমায় নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। গীতা ও ভাগবতকে ভিত্তি করিয়া তিনি কৃষ্ণনামের মধ্য দিয়া একশরণ নামধর্ম ও বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ গড়িয়া তোলেন। ভগবান ব্রহ্মরূপী সনাতন, পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতলীলার উপরে তিনি মাধব। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। নাম, দেব, গুরু আর ভক্তি এই চারি বস্তুই মুক্তি আনিয়া দেয়। তাঁর সাধনা উদ্ধবের সাধনা, রাধার সাধনা নয়, রাগানুরাগমার্গী নয়, বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্যের ভিত্তিতে নয়, তিনি 'কৃষ্ণের কিংকর শংকর'। তিনি মূর্তিপূজার পক্ষপাতী ছিলেন না। গ্রামে গ্রামে 'নামঘর' ও 'নামঘোষা'র প্রবর্তন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে তিনি গণতান্ত্রিক বোধের প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার দিনে একেশ্বরবাদ, জাতিভেদের প্রথাকে প্রশ্রয় না দেওয়া, মূর্তিপূজার সম্বন্ধে উদাসীনতা, সংসারের মধ্যে থাকিয়াও বাসনাকে দূর করিয়া তত্ত্বৈষণা, নিরাসক্ত কর্ম করা প্রভৃতি উদার মতগুলি তাঁহাকে যুগধর্মের বহু উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তিনি তখনকার বিকৃত সমাজকে নূতন প্রেরণা দিলেন, সমাজব্যবস্থাকে নূতন করিয়া গড়িলেন। তাঁহার প্রতিভা যুগোপযোগী অপূর্ব সাহিত্যেও গড়িয়া তুলিল। শ্রীশংকরদেবের সাহিত্যকে কাব্য, কীর্তন, অঙ্কীয়া নাট ও বড়গীতে বিভক্ত করা যায়।

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে যেমন, অসমীয়া বৈষ্ণব সাহিত্যেও তেমনি কৃষ্ণকথাবিচার, ভগবদ্‌ভক্তি প্রচারই সাহিত্যের মূল কথা, রসসৃষ্টির প্রথম উপাদান— নানা পৌরাণিক উপাখ্যান তাহার যন্ত্র ও বাহন—

ভাওনা করিবে কৃষ্ণ পূজিবে লাগিয়া

তাঁহার উদ্ধবসংবাদ, হরিশ্চন্দ্রকাব্য, ভক্তিপ্রদীপ, গুণমালা, নিমিনবসিদ্ধিসংবাদ, রামায়ণ ও ভাগবতের অনুবাদ বৃহৎ অজামিল উপাখ্যান, সংস্কৃত ভক্তিরত্নাকর, কান্তিমালা-টীকা, পারিজাতহরণ, কালিয়দমন, রুক্মিণীহরণ, পত্নীপ্রসাদ প্রভৃতি নাটকগুলি তাঁহাকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের পর্যায়ে উন্নীত করে। আবার দেখি তিনি চিত্রাঙ্কনবিদ্যাও অভ্যাস করিতেছেন—

তুলি হাতে লৈয়া বৈকুণ্ঠের পট আঁকিলা· ·
হিঙ্গুল হারিতাল তেতিক্ষণে আনিলন্ত
যত্ন করি পটে বৈকুণ্ঠক লিখিলন্ত
বৃন্দাবন মথুরার যত লীলা
করিলন্ত পট তাত চিত্রক তুলিলা ॥

তাঁহার সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয় বলিয়া তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি। কালিয়দমন যাত্রার ভঙ্গিমা ছন্দ ও বচনবিন্যাস জয়দেবকে স্মরণ করাইয়া দেয়—

জয় জয় যদুকুল কমল প্রকাসক নামক কংসক প্রাণ
জয় জয় জগতক ভকতক ভিতি নিতি করু নিরজান
জয় জগ নায়ক মুকুতি দায়ক সায়ক সারঙ্গধারী
দুষ্ট অরিষ্টক্ মুষ্টিক মোড়ন চোড়ন বন্ধ মুরারী
ধরু গোবর্ধন বারণ বরিষণ ভেলি ইন্দ্রমদ দুর
ত্রিভুবন কম্পন কালি সর্পক দর্পক করলি চুর ॥

আবার এই নাটকটি আরম্ভ হইয়াছে একটি রসপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা—

শরৎ শশাঙ্ক কর কোমলাসু
নিশাসু শশ্বৎ সহ গোপিকাভিঃ
চকার কেলিং কলগীতনৃত্যৈঃ
স গোপমূর্তির্জয়তীহ কৃষ্ণঃ

রীক্ষ্যেন্দু মণ্ডলমখণ্ড মকুণ্ঠবোধো
বৃন্দাবনে সুকল বেণুবাদয়ৎ যঃ
সম্মোহনায় মধুরং ব্রজসুন্দরীণাং
তং গোপবেশমনিশং প্রণতোঽস্মি কৃষ্ণং ॥

আবার দেখি—

এ সখি কতহু কয়ালো হাম দুখ রুখ চোর।
দেহু দহে কাম আঙ্গি আলিঙ্গন কোর ॥

বিদ্যাপতি দেবের

হে সখি হামারি দুখক নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর ॥

প্রভৃতি পদ স্মরণ করাইয়া দেয়।

রুক্মিণীহরণ নাটের রুক্মিণীর রূপবর্ণনা বৈষ্ণব কবির উপযুক্ত—

ইসত হসিত মুখ চান্দ উজোর
দসন মোতিম জয় নয়নচকোর
মানিক মুকুট কুণ্ডল গণ্ড ডোল
কনকপুতলি তনু নিল নিচোল
করকঙ্কণ কেজুর ঝণকার
মানিক কাঞ্চি রচিত হেমহার
চলাইতে চরণ মঞ্জির করু বোল
রূপে ভুবন ভোলে শংকর বোল।

এইরূপ বহু পদের সন্ধান পাওয়া যায়।

অসমীয়া সাহিত্যে নাটকের স্থান অতি উচ্চে। প্রাচীন ওজাপালী রীতিই অসমীয়া নাটকের পূর্বপুরুষ। তাহার তিন রূপ—যাত্রা, ঝুমুর ও নাচ। শংকরদেবের নাটকগুলি রূপে, রসে, নাটকীয় সংঘাতে, কথাবার্তায় উজ্জ্বল। মধ্যযুগীয় সংস্কৃত মহানাটকের রীতিরও কিছু প্রভাব দেখা যায়। অসমীয়া নাটকে সূত্রধার, গায়ন ও বায়ন থাকেন। সূত্রধার আসিয়া মধ্যস্থের মত বিষয়বস্তু বুঝাইয়া দেন— অনেকটা গ্রীক কোরাসের মত। পরবর্তী শুভংকর কবির শ্রীহস্তমুক্তাবলীতে এইসব নৃত্যগীত, পুতুলনাচ, ধুলিয়ানাচ, ধেমেলিয়ানাচ, মুখোস নৃত্য প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যায়।

পারিজাতহরণ নাটকে দেখি ব্রজবুলি, সংস্কৃত ও অসমীয়া তিন ভাষার মাধ্যমেই নাটকটির দ্রুতগতি— রুক্মিণী ও সত্যভামার সঙ্গে গোবিন্দ প্রবেশ করিলেন— 'দেববাদ্য' বাজিল—

প্রবেশম করোৎ দেবো গোবিন্দো গরুড়াসনঃ।
রুক্মিণী সত্যভামাভ্যাং সহ চারু চতুর্ভূজঃ॥
কোটি মদন জিনি উজল মুরারী
সঙ্গে সত্যভামা রুক্মিণী বরনারী
শরীরক জ্যোতি জলয় দিশপাশ
কহ শংকর হরিদাসক দাস।

সত্যভামা এক মন্দিরে রহিলেন, শ্রীকৃষ্ণসহ রুক্মিণী আর-এক মন্দিরে। তার পর ইন্দ্র আসিলেন, শচী আসিলেন, নারদ আসিলেন। নারদ আসিয়াই 'কৃষ্ণক হাতে পারিজাত দিয়ে নারদ তাহেক মহিমা কহল। হে কৃষ্ণ ওহি পারিজাতক গন্ধ তিনি প্রহরক পথ যাই। ওহি পারিজাত যাহেক গৃহে রহে ধনজনবিভব তাহেক ছাড়য়ে নাহি। ওই দেবদুর্লভ পারিজাত যে নারী পরিধান করে সে পুষ্পক মহিমায়ে পরম সৌভাগিনী হয়। তাহাক ছাড়ি স্বামী কথাব যাইতে নাহি'।

তার পর স্ত্রীচরিত্র-অভিজ্ঞ নিপুণ নাট্যকার নারদের বর্ণনাকে সুনিপুণ করিয়া নাটকীয় গতিকে দ্রুত করিয়া তুলিলেন। রুক্মিণী সেই ফুল চাহিয়া লইলেন। নারদ সত্যভামার মন্দিরে গিয়া বলিলেন—

নারদ॥ আঃ হে দেবি সত্যভামা। তোমাক স্বামী শ্রীকৃষ্ণক বরি বিষম চেষ্টা দেখলে। হা, হা মার তোহো দুর্ভাগ্য ভেলি। হামু আজি সে জানল।

সত্যভামা॥ হে মুনিরাজ। তুহু কি কইছে, হামু কিছু বুজয়ে নাহি।

নারদ॥ হা হা তোহোক বিধি বঞ্চল। হে মার! কি কহব, কহিতে বর দুঃখ লাগে (হেট মাথা রহল)। তার পর যাহা হইবার তাহা হইল। সত্যভামার আগ্রহাতিশয্যে মুনি যেন অতিকষ্টে বলিলেন—

মুনি॥ তথে কৃষ্ণে কয়লি কি, তোহাক কটাক্ষ করিয়ে আপুন হাতে প্রিয়া রুক্মিণীক মাথে পরম সাদরে সে

দিব্য পারিজাত পিন্ধাৱল। আঃ তোহোক জীবন ধিকধিক্ সতিনীক অভ্যুদয় দেখি কি নিমিত্ত প্রাণ ধৱহ· ·

মুনের্বচন মার্কণ্য শোককোপপরিপ্লুতা।
মূর্চ্ছিতা পতিতা ভূমৌ যথা বাতাহতা লতা॥
কেশব হে বুজলোহো তোহো
জানলোহো তুহো ব্যবহারা॥

তার পর যথানিয়মে মানভঞ্জন ইত্যাদি।

সংগীতশাস্ত্রে ও স্বরযোজনায় তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। রাগ মধুমাধবী, তুরবসন্ত প্রভৃতি সংকর রাগেরও তিনি প্রচলন করেন।

প্রত্যেক সমাজের ইতিহাসেই দেখা যায় যে, যখনই কোনো ভাবপ্লাবন আসে তখনই সমাজজীবনে তাহার স্ফূর্তি নানাদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। শংকরী সাহিত্যেরও এইরূপ একটা সর্বজনীন প্রভাব ছিল। পুরুষোত্তম গজপতির দীপিকা-ছন্দ, হরিহর বিপ্রের অশ্বমেধপর্ব, হেমসরস্বতীর প্রহ্লাদচরিত্র, দুর্গাবরের বেহুলা-আখ্যান, মাধব কন্দলীর রামায়ণী কথায় অসমীয়া সাহিত্যের যে সূচনা, শংকরী যুগে ও সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহা ফুলে-ফলে-পল্লবে শোভিত হইয়া নানা দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। সাধারণ কাব্য-নাটক ছাড়াও আমরা পাই বকুল কায়স্থের 'কিতাবতমঞ্জরী' নামক গণিতের পুস্তক, কবিরত্ন দ্বিজের 'জ্যোতিষ চূড়ামণি', পুরুষোত্তম ঠাকুরের 'প্রয়োগ রত্নমালা' ব্যাকারণ। গৃহনির্মাণের ব্যবস্থাদায়ক পুঁথিও পাওয়া যায়, যেমন পাওয়া যায় 'হস্তিবিদ্যার্ণব' ও 'ঘোরা নিদান'। অতি প্রাচীন কাল হইতেই হস্ত্যায়ুর্বেদ প্রাচ্যভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া বুরঞ্জী সাহিত্য ও চরিত-সাহিত্য অসমীয়া সাহিত্যের এক-একটি স্বয়ম্পূর্ণ বিশিষ্ট দিক।

কৃষ্ণ ভারতীর সন্তনির্ণয়, ভট্টদেবের সংসম্প্রদায়ের কথা, রামনাথের সন্তমুক্তাবলী ও শংকরচরিত গুরুচরিত ধর্মসাহিত্যের অঙ্গ হইলেও জীবনী সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে। অসমীয়া ঐতিহাসিক বুরঞ্জী সাহিত্যের কথাও সকলেই জানেন। আবার এই যুগে যেমন অজাসুর-বধ, বকাসুর-বধ, শঙ্খচূড়-বধ প্রভৃতি বধ-কাব্যগুলি মাধব দেবের ভূমিলুটুয়া, পিপরাগুচুয়া, প্রভৃতি নাটক দৈত্যারি ঠাকুরের সম্যন্তহরণ, অনন্ত কন্দলীর সীতার পাতালপ্রবেশ জনমনকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে। তাহার পরের যুগে রামচন্দ্র বড়পাত্র গোঁহাইর হয়গ্রীব মাধব, রঙ্গনাথ দ্বিজের চণ্ডী, নীলকণ্ঠ দাসের দামোদরচরিত্র, অনন্ত আচার্যের আনন্দলহরী, দীনদ্বিজবরের মাধব সুলোচনা পাঁচালী, রুদ্ররাম কবির নীতিরত্ন, রামদ্বিজের মৃগাবতী-চরিত্র, রঘুনাথ দাসের কথা-রামায়ণ অসমীয়া সাহিত্যের বিস্তৃতির চিহ্নস্বরূপ।

8

১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে ইয়ান্দাবু সন্ধির পর আসাম ইংরেজদের অধিকারে আসে। ইংরেজ-অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই মিশনরীগণ ধর্মপ্রচার-উদ্দেশ্যে এই প্রদেশে প্রবেশ করেন। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের গোড়াপত্তনে ব্রাউন, ব্রান্সন, লেভি, ওয়ার্ড, গুর্নি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই যুগের প্রথম দিকে যে-সমস্ত অসমীয়া সাহিত্যসেবক অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া এই সাহিত্যের

পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বিকাশের পথ সুগম করেন তাঁহাদের মধ্যে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, হেমচন্দ্র বড়ুয়া ও গুণাভিরাম বড়ুয়ার নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বল্পায়ু কর্মবীর ঢেকিয়াল ফুকনের (১৮২৯-৫৯) নিবন্ধাবলী, হেমচন্দ্রের 'হেমকোষ অভিধান' ও 'অসমীয়া ব্যাকরণ', গুণাভিরামের 'সন্দর্ভনিচয়' উনবিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সাহিত্যকে নবজীবন দান করিয়াছিল।

আধুনিক যুগের শক্তিমান লেখকদের মধ্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার স্থান সর্বোপরি। উপন্যাস ছোটগল্প নাটক প্রহসন কবিতা গান প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগই তাঁহার দানে পুষ্ট হইয়াছে। রসরচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আসামের জাতীয়-সংগীত 'অ মোর আপোনর দেশ' তাঁহারই অক্ষয় কীর্তি। রচনাবলীর মধ্যে 'সাধুকথার কুকী' 'কদমকলি' 'কাকতর টোপোলা' 'পাচনি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কৃপাবর বরুবার কাকতর টোপালোর 'পুরণিতত্ত্ব' রসসাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি। অনেকে মনে করেন ইহা ডিকেন্সের পিকউইক পেপারের অনুকরণ।

তাঁহার 'অসমীয়া জাতি ডাঙ্গর জাতি' একটি রস রচনা। কবি সখেদে বলিতেছেন—

'আমার নাই কি—উমানন্দ আছে, কামাখ্যা আছে, জয়সাগরের দল আছে, শিবসাগরের দল আছে, ব্রহ্মপুত্র আছে, দীখৌ আছে, অসমীয়া শেক্সপিয়ের আছে, অসমীয়া শেলী আছে, অসমীয়া পপ্ অব বম আছে, অসমীয়া মার্টিন লুথার আছে। অসমীয়ার কলকারখানা বা নাই ? কঁহিয়ার পেরা কলর পরা এন্দুর মরা কললৈকে, বাড়ীয়ে ধাপে অসমীয়ার কলর অন্ত নাই। বিলাতত্ টেমচ্ আমার দিখৌ, বিলাতত্ জাহাজ আমার খেলনাও· ·

'মোমাই তামুলী বরবরুয়া নরকাসুর ভগদত্ত, নরনারায়ণ বজা, বভ্রুবাহন, লেকাই চুতীয়া, হিড়িম্বা, কেন্দুকলাই বাপু, বশিষ্ঠ, পূর্ণানন্দ বুড়াগোঁহাই, অনন্ত কন্দলী, মণিরাম দেবান, শংকরদেব, কলা অধ্যাপক, রুদ্রসিংহ রজা আর শিবসাগরীয় বরুয়া এই এটাইবোর অসমীয়া। তেন্তে· ·আউর ক্যা মাংতা হেয়· · কোনরে কয় অসমত পাকা ঘর নাই। সেই বোরে পাহরে যে অসমত ভূঁইকঁপ আছে।· ·

'আকৌ কয় অসমীয়ার টাকা নেই· ·অসমীয়া মানুহ ইমান মূর্খ হোবা নাই যে টাকা উপার্জন করি চিন্তাচর্চা বঢাই অর্থের গুটিসিঁচি লব। কারণ 'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং'।

কবি হিসাবেও লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার স্থান অতি উচ্চে—

কি কাম দীঘল মেঘ বরণীয়া সাগরর ঢউ চুলি,
প্রেম পগলার হৃদয় তরণী বুরি পায় গয় তলি
মৃণাল দু বাহু কি কাম সাধিব মত্ত প্রণয়ীর ডোল
মিহি মউ মাত বিয়াধর বাঁহী বাঘে কবি মুঠে ভোল।

বেজবরুয়ার আর-এক কীর্তি হইতেছে যে, তিনি নূতন করিয়া স্বদেশবাসীদের মহাপুরুষ শংকরদেব মাধবদেবের বাণী শুনাইলেন ও শংকরী সংস্কৃতির দিকে দেশের চোখ ফিরাইতে সাহায্য করিলেন। যদিও সেই যুগের কথাসাহিত্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছেন রজনীকান্ত বরদলৈ, তবু 'পদ্মকুমারী' প্রভৃতি উপন্যাস সার্থক সৃষ্টি না হইলেও তখনকার দিনের বাংলা উপন্যাসের ভাব ভাষা আঙ্গিক ও রচনাশৈলীর অনুকরণে তাহা লিখিত এবং স্বদেশপ্রীতির পরিচয় বহন করে। গৌহাটির একটি সুন্দর বর্ণনা আমরা লক্ষ্মীকান্ত বেজবরুয়ার উপন্যাসে পাই—

"প্রকৃতির কাম্যকানন, গগনভেদী পর্বতমালারে পরিবেষ্টিত, পবিত্রসলিল ব্রহ্মপুত্র নদর পবিত্র জলেরে বিধৌত, অসংখ্য তীর্থস্থানের সমাকীর্ণ কামরূপর প্রধান নগর গুৱাহাটিত, যার প্রাগজ্যোতিষ নাম ভুঁবনবিদিত, যার রজা ষোল হাজার কন্যার, অধিপতি পৃথিবীর পতি নরকাসুর আরু মহাভারতর যুদ্ধর বিখ্যাত হস্তী-রথারোহী মহাবীর বৃদ্ধ ভগদত্ত, যি গুৱাহাটির নিলাচল পর্বতত মহামায়া ভগবতীর প্রধান পীঠস্থান কামাখ্যা বর্তমান; যার পশ্চিমদক্ষিণ ফালে প্রাচীন রাজ্যর বিজয়ঘোষণাকারী নরকাসুর পর্বত নির্ভয় চিত্তে দণ্ডায়মান, যার অগ্নিকোণে সন্ধ্যাচল পবতত ত্রিসন্ধ্যা পরিপূতহৃদয় বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম, যি গুৱাহাটির বেলতলা নামেরে স্থান ষষ্টি সহস্র শিষ্য পরিবেষ্টিত মহামুনি গাল্ববর অমৃতনিষ্যন্দিনী বেদধ্বনিরে প্রতিধ্বনিত হৈছিল; পূজনীয় গোকর্ণ ঋষির সামবেদগীতত যি গুৱাহাটির হাজো নামক হয়গ্রীব মাধবর পুণ্যভূমির কর্ণ আপ্লুত ."

কিন্তু তার পরেই anti-climax—এই অবতারণা কিসের জন্য, না উপন্যাসের নায়ক 'কায়স্থকুলোদ্ভব' হরদত্ত এইখানে বাস করিত!

সাহিত্যসম্রাট লক্ষ্মীনাথের 'দণ্ডিনাথের ফুল', সাধনা চিন্তাহরণের সংসার-চিত্র, 'বুঢ়ি আইর সাধু' প্রভৃতিও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রজনীকান্ত বরদলৈর নাম পূর্বেই করিয়াছি। তাঁহার 'মিরিজিয়রী', 'রঙ্গিলী' 'তাম্রেশ্বরীর মন্দির' প্রভৃতি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সুখপাঠ্য উপন্যাস। লক্ষ্মীকান্তের সঙ্গে সঙ্গে বিহারী কবি রঘুনাথের কথাও উল্লেখ করা উচিত। তাঁহার 'সাদরী' 'কেতেকী' 'দাহিকতরা' অনবদ্য রসের উৎস। মহিলা কবিদের মধ্যে নলিনীবালা ও ধর্মেশ্বরী দেবী প্রখ্যাতা। দুজনেই অতীন্দ্রিয়বাদী। নলিনীবালার 'সপোনর সুর' ও 'সন্ধিয়ার সুর' ও ধর্মেশ্বরীর 'ফুলের শরাই' সমধিক প্রসিদ্ধ। আরো বহু কবি, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক ও প্রবন্ধলেখক অসমীয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে দিনে দিনে সমৃদ্ধ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। সেইজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তবে বুরঞ্জী সাহিত্যের সম্পাদনে ও ঐতিহাসিক উপাদান সংকলনে ডক্টর সূর্যকুমার ভূইঞা যে বিরাট্ কাজের অবতারণা করিয়াছেন তাহার কিছু পরিচয় ভারতের অন্য প্রদেশেও জানা উচিত।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থপরিচয়

গান্ধীচরিত। শ্রীনির্মলকুমার বসু। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। তিন টাকা।
বাপু-দর্শন। কাকা কালেলকর। অনুবাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ। সুপ্রকাশন। দুই টাকা।
অমৃতপথযাত্রী। শ্রীসুবোধ ঘোষ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি। তিন টাকা।

জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে ইতিহাসের ক্রান্তির সময় এমন এক-একজন মানুষ এসে উপস্থিত হন যাঁরা সেই যুগবদলের উপলক্ষ্য হিসেবে ইতিহাসে চিরকাল চিহ্নিত হয়ে থাকেন। তাঁরা যেমন আসেন ইতিহাসের তরঙ্গে ভেলা ভাসিয়ে, অন্যদিকে তাঁরা আবার নতুন তরঙ্গের সৃষ্টিও করে যান। নেতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেইজন্য লেনিন বলতেন, নেতা ইতিহাসের সৃষ্টি যতখানি ইতিহাসের স্রষ্টাও ততখানি। যুগ বদলাতে বদলাতে নতুন নতুন তরঙ্গ উঠতে থাকে, তার ফলে বাইরের ও ভিতরের চেহারা বদল হতে থাকে, এইভাবে সামাজিক ও মানসিক পরিবেশ বদল না হতে থাকলে সত্যকার বড় নেতার জন্ম হয় না। কিন্তু যিনি এই তরঙ্গে শুধু গা ভাসিয়েই চলে যাবেন, অথচ চারপাশের বদলের সুযোগ নিয়ে সমাজকে নতুন পথে ঠেলে দেবার চেষ্টা করবেন না, তিনি সাময়িক যতই হাততালি পান না কেন, ইতিহাসের পাতায় তাঁর স্থায়ী স্বাক্ষর শেষ পর্যন্ত থাকবে না। সেইজন্য দীর্ঘকালের ইতিহাস শুধু তাঁদেরই স্মরণ করে যাঁরা ক্রান্তির মুখে আবির্ভূত হয়েছেন এবং সেইসঙ্গে নতুন যুগের পত্তন করে গিয়েছেন।

বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসের কথা আলোচনা করলে এইরকম নেতার নাম খুঁজতে গেলেই গান্ধীজির কথা মনে আসে। বস্তুতঃ এ প্রসঙ্গে তাঁর নামই কেবলমাত্র মনে আসে, আর কারও নামই মনে আসে না। সামাজিক-অর্থ নৈতিক বিবর্তনের নিয়ম অনুসারে ভারতবর্ষের সামাজিক ও আর্থিক সংস্থান অবশ্য অনেকদিন থেকেই বদলাচ্ছিল। সেইসঙ্গে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে— এমন কি আরও পূর্ব থেকে— ছোট বড় অনেক নেতা নানা দিক থেকে মানসিক হাওয়া বদলের চেষ্টা করে আসছিলেন, তাঁদের দান আজও আমরা সকৃতজ্ঞ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে থাকি ও ভবিষ্যতেও করব। কিন্তু সারা ভারতবর্ষময় ঝড়ের ঢেউ তুলে এলেন একমাত্র গান্ধীজি। দেশ এমন প্রবল বেগে নাড়া পেল, ঐ কটিবাসসম্বল ক্ষীণ মানুষটির শুদ্ধ শুভ্র তেজ সারাদেশময় এমন উৎসারিত হল যে, সমস্ত ভারতবর্ষের আমূল বদল হয়ে গেল। সেইজন্য অন্য নেতার সঙ্গে গান্ধিজীর তুলনা হয় না—ইতিহাসের পাতায় গান্ধীজির স্বাক্ষর সেইজন্য স্বতন্ত্র।

কিন্তু এইটুকু বললে গান্ধীচরিত্রকে ছোট করা হয়। এইরকম ক্রান্তিকারী রাজনৈতিক নেতার সন্ধান জগতের ইতিহাসে হয়তো আরও মিলবে। বর্তমান কালের মধ্যে এই প্রসঙ্গে লেনিনের নাম অনেকেরই মনে হবে, কেননা তাঁর চিন্তা ও কর্মের ফল শুধু রুশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমস্ত জগৎকে প্রবলভাবে নাড়া দিচ্ছে। কিন্তু সকলেই জানেন, গান্ধীচরিত্রের আর একটি দিক আছে। সেটা হল তাঁর জীবনদর্শন। রাজনীতির প্রয়োজনমত রাজনীতি করতে হবে, এ নীতি গান্ধীজি কখনও মেনে নেন নি। কারণ, তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল মানুষ। যেখানে মানব সম্পূর্ণ মানবিকতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না সেইখানেই

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অঙ্কিত
পেন্সিল স্কেচ হইতে, ১৯৪৭

সে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ, সেখানেই তার স্বধর্মচ্যুতি ঘটছে, তাকে আবার নিজের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে— এই ছিল গান্ধীজির মূল কথা। আর, যে পারিবারিক ব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার ফলে এইরকম স্বধর্মচ্যুতি ঘটেছে সে ব্যবস্থার বদল ঘটাতে হবে, তার সঙ্গে কোনও রফা নেই, এই ছিল গান্ধীজির কর্ম। কিন্তু এইরকম স্বধর্মপ্রতিষ্ঠার পথ অধর্মের মধ্য দিয়ে হয় না। সেইজন্য গান্ধীজির পথ ছিল অক্রোধের পথ, অহিংসার পথ, শীলের পথ। এই মাপকাঠিতে যে জিনিস ছোট হয়ে গিয়েছে সে জিনিস তখনই তিনি পরিত্যাগ করেছেন, আপাতলাভের লোভে তিনি কখনও সে জিনিস আঁকড়ে থাকেন নি। এইক্ষেত্রে গান্ধীজি একহিসেবে অনন্য। ধর্মগুরুরা সাধুসন্ন্যাসীরা এইরকম শুদ্ধশীলের আচরণের উপদেশ দিয়ে থাকেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁদের উপদেশ সংসারত্যাগীদের পক্ষে। অনেকক্ষেত্রেই সমাজকে পাশ কাটিয়ে তাঁদের কারবার। কিন্তু গান্ধীজি অসমসাহসে ঐ শুদ্ধশীলাচরণকে সমাজ, এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রেও, ভাস্বর সততার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন যার তুলনা অন্য কোথায়ও আছে কি না জানি না। বহু রাজনৈতিক নেতার উত্তুঙ্গ মহিমা হয়তো অনেককালই আমাদের মুগ্ধ করতে থাকবে— কিন্তু তার উপরেও শুদ্ধশীলের এই রকম ব্যাপক প্রতিষ্ঠার অসামান্য চেষ্টার অপরূপ দ্যুতি মানবেতিহাসে অনন্য।

তবু এ কথা স্বীকার করাই ভালো যে গান্ধীজির জীবিতকালে এদেশে— বিশেষ করে বাংলাদেশে— তাঁর এই ধর্মাচরণে অনেকেরই মন সায় দিচ্ছিল না। বস্তুতঃ তা না হলে তাঁর ওরকমভাবে দেহান্ত হত না। ছলে বলে কার্যসিদ্ধির স্থবিধা থাকতেও আমরা একটা নীতিগত আদর্শের মরীচিকায় পিছিয়ে পড়ে থাকব, যেখানে দুটো ফ্যাক্টরি চালালে কাজ হয় সেখানে একহাজার চরকা চালাবার বৃথা চেষ্টা করব, যখন একজায়গায় একটা বোতাম টিপে দেশটাকে চালানো যায় তখনও বিকেন্দ্রীকরণের পিছনে ছুটব— এইসব কথায় অনেকেরই চিত্ত, বিশেষ করে তরুণ সমাজের চিত্ত, অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। এ যেন ইতিহাসের পথে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার বদলে পিছন টানে আটকে থাকা। এরই নাম কি প্রগতি? সেইজন্য অনেকে— এমন কি গান্ধীজির শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের মধ্যেও অনেকে— গান্ধীজিকে মানলেও গান্ধীজির কথাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। যা গান্ধীজির পক্ষে ছিল creed, তা তাঁদের পক্ষে ছিল policy।

আজ গান্ধীজি আমাদের মধ্যে নেই, আমরাও পাঁচ বছর স্বাধীনতাকে হাতে-কলমে নাড়াচাড়া করছি। একটা লক্ষণ কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই চার-পাঁচ বছর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই হয়তো গান্ধীজির কথা ও গান্ধীজির জীবন সম্বন্ধে ভালো করে বোঝবার একটা নতুন চেষ্টা দেখা দিচ্ছে— এমন কি, এই নিষ্ফল তার্কিকের দেশ, অবিশ্বাসীর দেশ বাংলাদেশেও তা প্রচুর পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। হয়তো চারপাশের পঙ্কিল আবহাওয়ায় আমরা ক্রমশঃ অনুভব করতে শুরু করেছি যে রাজনৈতিক স্বাধীনতাই হোক আর যাই হোক যতক্ষণ না আমাদের আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে শুদ্ধ পবিত্র বায়ু বইতে শুরু করবে ততদিন হাজার চেষ্টা করলেও দেশের কাজ কিছুতেই এগোবে না। আমরা তো কিছুদিন ধরেই বড় বড় কল-কারখানা ও দেশজোড়া পরিকল্পনা চালাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে তাদের ফল যতই ভালো হোক না কেন সে ফল দেশের লোকের কাছে এত অল্প এবং এত ধীরে ধীরে পৌঁছচ্ছে যে এখন আরও দ্রুতগতিতে সমস্ত গ্রামগুলিকে নাড়া না দিতে পারলে আমাদের দেশের ভাঙনের ধারাকে ঘুরিয়ে দিয়ে আমরা দেশ গড়তে পারব না। হয়তো এইসব কথা আমাদের অবচেতনে সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে, তাই

গান্ধীকথায় নতুন করে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কারণ নিয়ে তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন; ব্যাপার হল যে ইদানীং বাংলাতেও গান্ধীকথা নিয়ে অনেকগুলি বই রচিত হয়েছে। আলোচ্য বইতিনখানি তারই নিদর্শন।

১৯৪৬ সালে কলিকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার শ্মশানে এসে গান্ধীজি যখন নীলকণ্ঠের রূপে দাঁড়ালেন তখন তাঁর সেক্রেটারি হিসেবে শ্রীনির্মলকুমার বসু তাঁর সহগামী হয়েছিলেন। 'গান্ধীচরিত' প্রধানতঃ সেই সময়েরই কাহিনী। একদিকে যেমন গান্ধীজির দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ও সেই-সময়কার ছোটখাট ঘটনা এই বইটিতে আছে, তেমনি অন্যদিকে আছে গান্ধীজির ঐ কঠিনতম প্রচেষ্টার বিবরণ। ভোরবেলার প্রার্থনা থেকে শুরু করে দিনশেষে কার্যাবসানে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত সারাদিন গান্ধীজি কিভাবে দিনযাপন করতেন তার অনবদ্য কাহিনী মনোমুগ্ধকর। ভুল বা বিকৃত উচ্চারণে গীতাপাঠে গান্ধীজি কষ্ট পেতেন, ঐরকম বিকৃত উচ্চারণকারীকে তিনি তিরস্কার করে বলেছিলেন কোনও কাজ দায়সারাভাবে করা উচিত নয়, তাতে অপরে প্রতারিত হয় না, নিজেই প্রতারিত হতে হয়। ভোরবেলা গান্ধীজি নোয়াখালিতে বাংলা শিখতেন ও বাংলা হাতের লেখা অভ্যাস করতেন। তাঁর এইসব বিষয়ে আগ্রহ চিরাচরিত। বাঁ হাতে লেখা তাঁর অভ্যাস ছিল, ডান হাত ক্লান্ত হয়ে পড়লে বাঁ হাতে তিনি লিখতেন, যাতে শারীরিক অক্ষমতার জন্য সময়ের অপব্যয় না ঘটে। বহুকাল পূর্বে তাঁর রচিত বই হিন্দ্ স্বরাজের পাণ্ডুলিপি এইভাবেই লিখিত। কাকা কালেলকরকে তিনি গুজরাতি ভাষায় দক্ষ করে তুলেছিলেন, কেননা তিনি জানতেন কাকা কালেলকরকে গুজরাতে কাজ করতে হবে। তেমনি বাংলাদেশে এসে সেই আগ্রহেই তিনি বাংলা অভ্যাস করছিলেন। চিকিৎসা করবার আগ্রহ তাঁর চিরদিনের, নোয়াখালিতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। একটা সেফটি রেজর ব্লেড বা একটি দাঁতন যতক্ষণ চলতে পারে তিনি ততক্ষণ তাকে চালাতেন, সহজে নতুন আর-একটা নিতেন না। খাওয়ার বেলাও তাই, কিন্তু শরীরটাকে কাজের উপযুক্ত রাখবার জন্য যেটুকু দরকার তার চেয়ে বেশি কৃচ্ছ্র সাধন করবার পরামর্শ তিনি দিতেন না, কারণ তিনি জানতেন শরীরটা হল কাজের অস্ত্র। প্রয়োজন মত শরীরের যত্ন করতে তিনি ত্রুটি করতেন না। অন্যদিকে, তিনি অপ্রতিগ্রহের যে আদর্শ সর্বক্ষেত্রে প্রচার করে এসেছেন তাঁর ব্যক্তিজীবনের ছোটখাট ব্যাপারেও তার কঠোর অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় নানা ঘটনার মধ্যে। কর্মবীর তিনি, সারাদিন ছিল তাঁর কঠোর কাজের নিয়মে বাঁধা, কোনও কারণেই তিনি সে শৃঙ্খলা থেকে চ্যুত হতে চাইতেন না। গান্ধীজি বলেছিলেন, নোয়াখালি হল তাঁর জীবনের কঠিনতম পরীক্ষা, "আমি এরূপ নীরন্ধ্র প্রাচীরের সম্মুখে জীবনে কখনও উপস্থিত হই নাই।" কিন্তু তিনি একদিকে যেমন সাহস ও শুভবুদ্ধির পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে লাগলেন অন্যদিকে তেমনি স্পষ্টাক্ষরে বলতে দ্বিধা করেন নি যে সমস্যাটা যেখানে রাজনৈতিক সেখানে তার উপরের আবরণ খুলে না ফেললে সমস্যার সমাধান হবে না, কারণ আর্তত্রাণের বুদ্ধিতে জনসেবা করলে চলবে না (১৮৭ পৃষ্ঠা)। তিনি সেইসঙ্গে আরও উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আক্রমণাত্মক মনোভাব শান্ত করবার চেষ্টায় যেন মান বিসর্জন দিয়ে মাথা নীচু করে কিছু করা না হয়। আঘাতের বিরুদ্ধে আঘাত দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথাও কোনও ফললাভ হয় না বটে, কিন্তু তাই বলে কাপুরুষতারও কোনও স্থান নেই। একমাত্র বীরের অহিংসা দ্বারাই সমাধান সম্ভব (১৯৯ পৃষ্ঠা)। বাস্তবিক, যাঁরা গান্ধীজীবনের গভীর আলোচনা করেছেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে গান্ধীজীবনের দুটি অধ্যায় আছে। একদিকে গান্ধীজি প্রেম ও করুণার অবতার, মানুষকে খারাপ ভাবতে কিছুতেই রাজী নন,

অপরাধীকে আত্মসংশোধনের সুযোগ দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। এ হল গান্ধীচরিত্রের একটা দিক। কিন্তু তাঁর চরিত্রের আর-একটা দিক আছে, যেখানে দেখা যায় তাঁর এই করুণাকে ভেদ করে নীতির কাঠিন্য অসির ঝলকের মত দীপ্ত হয়ে উঠছে, সেখানে কোনও রফা নেই। মৃদু কুসুমের মধ্যে এই বজ্রকাঠিন্য, এই দুই ধারার প্রবাহ তাঁর মধ্যে আছে। শ্রীযুক্ত বসুও এসম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বলেছেন যে নোয়াখালিতে গান্ধীজির করুণামূর্তিই বেশি পরিস্ফুট। শ্রীযুত বসুর কথায় "গান্ধীজিকে উত্তরোত্তর বিদ্যুৎ-শিখার পরিবর্তে বরং মহামহীরুহের মত মনে হইতে লাগিল" (১৬১ পৃষ্ঠা)। বিশাল গান্ধীচরিত্রের নানা দিক এই বইটিতে আলোচনা ও ঘটনা বিবরণীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও পরিস্ফুট, সেইজন্য এ বইটি একালের পাঠকদের অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থের তালিকাভুক্ত। রচনার গুণে বিষয়বস্তু মনোরম হয়ে উঠেছে।

কাকা কালেলকরের 'বাপু-দর্শন' গান্ধীজির জীবনদর্শনের আলোচনা নয়, গ্রন্থকার গান্ধীজির দীর্ঘকালের সহযোগী হিসেবে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দর্শন করবার সুযোগ পেয়েছিলেন, সেই দর্শনের টুকরো টুকরো কাহিনীতে বইটি ভরা। এই বইটিতে উল্লেখ আছে, গান্ধীজির জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ মার্টিন একবার বলেছিলেন—'Triflings make perfection and perfection is not a trifling'। এই বইটির মূল সুরও তাই। শ্রীযুত বসুর বইতে এইসব ছোটখাট ঘটনার কিছু কিছু উল্লেখ আছে এই বইটিতে সেরকম আরও অনেক ঘটনার বিবরণী আছে। দাঁতনের জন্য রোজ নিমের ডাল ভাঙা গান্ধীজি পছন্দ করতেন না, সামনের দিকটা কুচি করে একদিন ব্যবহার করে সেটুকু কেটে ফেলে দিয়ে বাকীটুকু আবার পরদিন ব্যবহার করতেন। নিমগাছের কয়েকটি পাতার জন্য কাকা সাহেব রোজ অনেকগুলি ডাল ভেঙে আনতেন, তাতে গান্ধীজি বেদনা পেয়ে বলেন, ঠিক যে ক'টি পাতার দরকার তার বেশি পাতা ভাঙা যেন না হয়। চম্পারণ আন্দোলনের সময় একদিন তাঁর জন্য খুব চড়া দরের আম আসে; তিনি তা জানতে পেরেই তা বন্ধ করে দেন ও বলেন জনসাধারণের অর্থ এভাবে খরচ হওয়া অসংগত। কিন্তু যখন সত্যকারের দরকার পড়ত তখন গান্ধীজির কার্পণ্য ছিল না—দীর্ঘ টেলিগ্রাম করতে এবং স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করতে তিনি সেরকম ক্ষেত্রে একটুও দ্বিধা করেন নি। কি অসাধারণ নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধ ছিল তাঁর! একবার কাকা-সাহেবের বালেশ্বর থেকে ভদ্রক যাবার কথা ছিল একটি জনসভায় যোগদানের জন্য। সময়মত গাড়ি না আসায় কাকাসাহেব বসে আছেন, গান্ধীজি সেই শুনে বিরক্ত হয়ে বললেন এভাবে কাজ চলে না। মোটর যদি না এসে থাকে তাহলে তৎক্ষণাৎ পায়ে হেঁটে রওনা হওয়া উচিত ছিল; না হয় দুদিন লাগত। "সময়মত রওনা হওয়া আমাদের হাতে, পৌছান আমাদের হাতে নয়।" গান্ধীজি নিজেও এরকম বহুবার করেছেন, তার কাহিনীও বইটিতে আছে। রুক্ষ নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে তাঁর করুণার বিগলিত ধারার অভাব হত না। গান্ধীজি সদলবলে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করতে করতে গিরসোপ্পা জলপ্রপাতের কাছে একটি জায়গায় উপস্থিত হয়েছেন; মহাদেব দেশাইকে জলপ্রপাতটি দেখতে পাঠানোর প্রস্তাব হতেই গান্ধীজি তৎক্ষণাৎ তা নামঞ্জুর করে দিলেন, কেননা সেদিন মহাদেব দেশাই-র সামান্য কিছু কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু গান্ধীজি সে কথা ভোলেন নি; দীর্ঘ পনের বছর পরে মহাদেব দেশাইকে তিনি একবার মহীশূরের দেওয়ান স্যার মির্জা ইসমাইলের কাছে পাঠান, সেসময় মহাদেবকে তিনি নির্দেশ দিলেন এবার যেন তিনি গিরসোপ্পা না দেখে ফিরে না আসেন, আর তাঁর যাতায়াতের ব্যবস্থার জন্য তিনি দেওয়ান-সাহেবকে লিখেও দিলেন। চীকু ফল পেলেই তিনি মহাদেবের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, ও বস্তুটি তাঁর প্রিয়

ছিল। আচার্য কৃপালনি আশ্রমে এসেছেন খবর পেলেই তিনি নিজেই দৈ আর লেবু সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। কিন্তু এরকম ব্যস্ততা শুধু তাঁর অন্তরঙ্গদের জন্যই ছিল না—অতি সাধারণ, এমন কি প্রায় অচেনা লোকের সম্বন্ধেও তাঁর একই ব্যগ্রতা ছিল। এমনই নানা গান্ধীজীবন-কণিকার উজ্জ্বল কাহিনীতে বইখানি পরিপূর্ণ; অনুবাদের প্রসাদগুণে সুখপাঠ্যও। একটি মজার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে এলেন। তখন তিনি ফলাহারী, তাঁর ধারণা ঘি বা তেলে পুরী ভাজলে তা বিষ হয়। রবীন্দ্রনাথকে এই কথা বলায় রবীন্দ্রনাথ গম্ভীরস্বরে উত্তর দিয়েছিলেন, 'It must be a very slow poison. I have been eating *puris* whole of my life and it has not done me any harm so far'।

শ্রীসুবোধ ঘোষ তাঁর বই 'অমৃতপথযাত্রী'র ভূমিকায় লিখেছেন "বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে ভারতীয় গান্ধীর জীবনে কর্মে ও বাণীতে সদ্ধর্মের যে নবতমরূপ প্রকাশ লাভ করেছে, তারই এক মহাকাহিনী গান্ধীর স্বলিখিত রচনাবলীর হাজার হাজার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। লেখকের এই পুস্তক সন্ধিৎসু পাঠককে সেই মহাকাহিনী অধ্যয়নে উৎসাহিত করবার জন্য রচিত একটি আবেদন মাত্র।" পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে লেখক গান্ধীজির জীবনকাহিনী ও জীবনদর্শনের বড় বড় কথাগুলি আলোচনা করেছেন। সুপরিচিত সাহিত্যিকের লিপিকুশলতার ও ভাষামাধুর্যের পরিচয় বইখানিতে আগাগোড়া। প্রথম দিকটায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গান্ধীজির জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির বর্ণনা আছে। শেষের দিকে আছে গান্ধীদর্শনের মূল কথাগুলি, যেমন, বিকেন্দ্রীকরণ, সত্যাগ্রহ, মধ্যপথের আদর্শ, গঠনকর্মপদ্ধতি, কর্মতত্ত্ব ও সাধুশ্রম, শ্রেণীতত্ত্বের বিচার, ব্যক্তি ও সমষ্টি—ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। প্রধানতঃ গান্ধীজির রচনা থেকেই এই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তবু স্বীকার করতেই হয় যে লেখক যে ভাবে গান্ধীদর্শনকে প্রতিভাত করেছেন তাতে মধ্যে মধ্যে যেন হোঁচট খেতে হয়। যেমন, ৯৩ পৃষ্ঠায় লেখক বলছেন যে, "লক্ষ্য বা আদর্শে শুধু সফলতা লাভ করতে পারাই জীবনের সাফল্য নয়। বৃহৎ এবং সৎ লক্ষ্যমাত্রই দুরূহ, সুতরাং সে লক্ষ্যে সহজে উপনীত হওয়া যায় না, এমন কি উপনীত হওয়াই সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু লক্ষ্য লাভের জন্য প্রয়াসের এই ব্যর্থতার অর্থ জীবনের ব্যর্থতা নয়।" এই প্রসঙ্গে লেখক ব্রাউনিঙের কবিতা উদ্ধৃত করেছেন—

This low man goes on adding one to one
His hundred is soon hit.
This high man, aiming at a million
Misses an unit.

কিন্তু গান্ধীজি নিজেই বারবার বলেছেন যে তিনি বাস্তববাদী লোক। তা না হলে তো তাঁকে অপেক্ষা করতে হত মানুষের পরম শুদ্ধির জন্য, তার আগে তিনি কিছু করতেই পারতেন না, এমন কি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কোনও আন্দোলন করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। কিন্তু গান্ধীজি তো এ ধরনের অবাস্তব আদর্শবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কেজো লোক, কিন্তু আদর্শকে কাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন। সেটা কিন্তু কাজেরই অভিনব পদ্ধতি, কাজ ছাড়া নয়। তা যদি তিনি না হতেন তাহলে তো তাঁর দৈনন্দিন রাজনীতির ক্ষেত্রে আসাই চলত না, পরমশুদ্ধির অপেক্ষায় তিনি বাস্তবক্ষেত্রে এক unit ফললাভও করতেন না। কিন্তু গান্ধীজি এক ইউনিট কেন, বহু ইউনিটের ফল পেতে চাইতেন এবং তা

পেয়েছেনও। আদর্শকে তিনি বাস্তবে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন, যদিও তিনি জানতেন যে বাস্তব অনেক পরিমাণেই অপরিশুদ্ধ এবং সেজন্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে থাকবেই। তবু সেই খণ্ডিত অপরিশুদ্ধ বাস্তবকে নিয়েই কারবার করতে হবে এ কথা তিনি কখনও ভোলেন নি। তাঁর নিজের কথায়—'The non-violence that I have preached from Congress platforms is non-violence as a policy· ·I have not put before India the final form of non-violence. Non-violence being a policy means that it can upon due notice be given up when it proves unsuccessful or ineffective. But simple morality demands that whilst a particular policy is persued, it must be pursued with all one's heart.'[১] তাঁর মনে কোনও সংশয় ছিল না যে ব্রাউনিঙ-কথিত পরমশুদ্ধি এ জগতে অসম্ভব। 'Perfect non-violence is impossible so long we exist physically'.[২] সেইজন্য গান্ধিজী স্পষ্টই বলছেন 'In dealing with living entities, the dry syllogistic method leads not only to bad logic but sometimes to fatal logic· ·you never reach the final truth, you reach only an approximation'.[৩] সেইজন্য এই অপরিশুদ্ধ বাস্তব নিয়ে আন্দোলন শুরু করতে তাঁর দ্বিধা হয় নি; বরং তার মধ্যেই তিনি যেটুকু ফল পেয়েছেন তাতেই তিনি খুশী। 'I have no sense of disappointment in me over the results obtained. If I had started with men who accepted non-violence as a creed, I might have ended with myself'.[৪] আর অন্যত্র শ্রীযুত ঘোষই গান্ধীজির উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, "আমি নিছক কল্পনাবিলাসী নই, আমি কাজের আদর্শবাদী"।

তেমনি অহিংসবিপ্লবের কথা আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীযুত ঘোষ বলেছেন যে, "বিত্তবানকে বিত্তভ্রষ্ট করার ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর নীতিতে নিছক আঘাতবাদের কোনও স্থান নেই এবং সমাধানের বিষয়টিকে একপক্ষের দায়িত্ব বা কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন না।" গান্ধীজি নিশ্চয়ই বহুবার বলেছেন যে তিনি বড়লোকের বিনাশসাধন চান না, কিন্তু বড়লোকও চান না, তাদের হৃদয় পরিবর্তন করে তাদের জনসাধারণের অছিস্বরূপ রাখতে চান মাত্র। তাঁর এই ট্রাস্ট্রিশিপ থিয়োরি বহু উপহসিত হলেও তিনি মত বদলান নি। এই হৃদয় পরিবর্তনের জন্য দুপক্ষের চেষ্টারই প্রয়োজন আছে এ কথাও গান্ধীজি বলেছেন। কিন্তু এই রকম ভাবে সমাধানের দায়িত্ব এক পক্ষের নয় একথা বললে শেষ পর্যন্ত তার তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, যদি এক পক্ষের হৃদয় বদল না হয় তাহলে আর কোনও কিছুই করা যাবে না। গান্ধীজি কিন্তু একথা কখনও মেনে নেন নি। তিনি বলেছেন, এ রকম হৃদয়-বদলের জন্য চেষ্টা সব পক্ষই প্রথমে করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি মালিকদের হৃদয় বদল না হয় তাহলে শ্রমিকেরা আর অপেক্ষা না করেই অগ্রসর হবে, তখন একতরফা কাজ করা ছাড়া উপায় নেই। গান্ধীজির নিজের কথা হল এ রকম ক্ষেত্রে

১ Bose : *Selections from Gandhi*, p. 123

২ ibid p. 147

৩ ibid p. 45

৪ ibid p. 46

'nor need the worker wait for his [the capitalist's] conversion'[৫] এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তি যদি প্রয়োজনমত violence ব্যবহার করেন তাতেও ক্ষতি নেই। 'The state will, as a matter of fact, take away those things; and I believe it will be justified if it uses the minimum of violence'.[৬]

গঠনকর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীযুত ঘোষ বলেছেন যে তাঁর আঠারো দফা কর্মপদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে যেন কয়েকটি ভারতীয় সমস্যা সমাধানের, বর্তমানের কতকগুলি লৌকিক ভ্রান্তি দূরীকরণের প্রয়াস বলে মনে হবে। "কিন্তু, একটু চিন্তা করে বিচার করলেই বোঝা যায় যে, এই গঠনপদ্ধতি হল সার্বজাতিক ঐতিহাসিক সাধনার সুনির্দিষ্ট কয়েকটি পদ্ধতি· ·এই গঠনকর্মপদ্ধতি মানবিক সভ্যতাকে সংগঠন করারই পদ্ধতি, সুতরাং বিশ্বের সর্বদেশের কর্মীর পক্ষে গ্রহণীয়।" এর সার্বজনিক ও সার্বকালিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীযুত ঘোষ বলেছেন, মাদকতা সম্বন্ধে আধুনিক সাইকো-অ্যানালিসিস বিজ্ঞানেও বলা হয়ে থাকে যে মাদকতা হল বস্তুতঃ একটি আত্মহত্যা-কম্‌প্লেক্স—মাদকবর্জন আহার্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুযুগব্যাপী এক ভ্রান্ত আচারের লুপ্তি। খাদির সার্বজনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে স্নান ও প্রসাধনের মত নিজ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদের সৃষ্টিও বস্তুতঃ একটা শিল্পকলা; গত মহাযুদ্ধে 'শক্‌-প্রাপ্ত' বৈমানিক যোদ্ধাদের চিকিৎসার পদ্ধতিরূপে সুতাকাটা লেস্‌বোনা এবং এমব্রয়ডারি কাজ দেওয়া হত। সুতাকাটার মত ঐ সাধারণ কারুশ্রমের ভিতর দিয়েই শক্‌-প্রাপ্ত বৈমানিক রোগীরা ধীরে ধীরে তাদের মানসিক সুস্থতা ফিরে পেত। খাদি হল এই কাজের পদ্ধতিগত বিজ্ঞান। এই রকম ভাবে গঠনকর্মের অন্যান্য কাজেরও একটা সার্বজনিক ও সার্বকালিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু গান্ধীজি নিজে কি তাঁর গঠনকর্মসূচীর এই রকম ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন? ভারতবর্ষের বাইরে অন্য দেশে এ কর্মসূচী চালাবার কথা গান্ধীজি কোথাও বলেছেন বলে দেখি নি। এমন কি ভারতবর্ষের পক্ষেও এই কর্মসূচী প্রয়োজন মত বদলে নেওয়া যেতে পারে একথা তিনি বলেছিলেন। তাঁর নিজের কথায়, তাঁর এই কর্মসূচী হল exhaustive নয়, illustrative মাত্র।

গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীযুত ঘোষ বলেছেন যে, তিনি ছিলেন মধ্যপথবর্তী। "সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি শিক্ষা শিল্প ইত্যাদি সকল বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী সমস্যার সমাধান পরিবর্তন ও উন্নতির জন্য যে চিন্তা করেছেন, তার সবই মধ্যপথের নিয়মে সমাধান সন্ধানের প্রয়াস। যেমন মানুষের চরিত্রের মধ্যে, তেমনই প্রত্যেক নতুন বা পুরাতন প্রথা ও ব্যবস্থার উপর সমগ্রভাবে আঘাত দিয়ে পরিবর্তনের কোনও অর্থ হয় না। দুইয়ের বিরোধ সমাধান করার নিয়ম হল দুইয়ের মধ্যে নিহিত সৎকে একসূত্রে সমন্বিত করা।" উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন, গান্ধীজি পুঁজির অবসান চাইতেন না কিন্তু পুঁজিবাদের অবসান চাইতেন। প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য, স্বদেশীয়ানা, বৃহৎ শিল্প, সর্ববিষয়েই গান্ধীজি এ ধরনের কথা বলতেন। সেইজন্যই তিনি মধ্যপথে চলতেন এই কথা লেখক বলেছেন। কিন্তু গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গী কি শুধু তাই ছিল? অর্থাৎ, সব সময়ই কি তিনি মাঝামাঝি রফার পথ ধরেই চলতেন? গান্ধীজির রচনা পড়ে, এমন কি তাঁর কর্মজীবন থেকেও, সে কথা মনে হয় না। আসলে তাঁর কতকগুলি আদর্শ

৫ Bose, p. 85

৬ Bose: *Studies in Gandhism*, p. 202

ছিল, সেই আদর্শের কষ্টিপাথরে তিনি সব জিনিস যাচাই করে নিতেন। সেই পরীক্ষায় যা উত্তীর্ণ হত তা-ই তিনি গ্রহণ করতেন, কিন্তু যা উত্তীর্ণ হত না তাকে তিনি সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলতে একটুও দ্বিধা করতেন না। তাতে পুরোনোকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হলেও তাঁর আপত্তি ছিল না, নতুনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। যেমন, রাজনীতির ক্ষেত্রে। তিনি সব সময়েই হৃদয়-পরিবর্তনের কথা বলেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও তো বলেছেন যে যদি হৃদয় বদল শেষ পর্যন্ত নাই হয় তাহলে রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক বলপ্রয়োগেও তিনি কুণ্ঠিত হবেন না। পুঁজির অবসান না ঘটিয়ে তার চেহারা বদল করে দেবার চেষ্টাই তাঁর প্রবল ছিল, কিন্তু তিনি বলেছেন যে যদি তা শেষ পর্যন্ত সম্ভব না হয় তাহলে জনসাধারণের স্বার্থে তাকে ধ্বংস করা অন্যায় নয়। তাঁর উক্তি হচ্ছে, 'Every interest that is hostile to their interest [i. e. the interest of the dumb millions] must be revised or must subside if it is not capable of revision'। বিপ্লবে তাঁর ভয় ছিল না, কারণ তিনি জানতেন যে জাতির অগ্রগতির জন্য ইভলিউশন যেমন দরকার রেভলিউশনও তার চেয়ে কম দরকারী নয়। 'The nations have progressed both by evolution and revolution. The one is as necessary as the other'.।

আসল কথা, গান্ধীজির চরিত্রের মধ্যে একদিকে যেমন বিগলিত করুণাধারা ছিল তেমনি অন্যদিকে একটা কঠিন অনমনীয় দীপ্তি ছিল যা তিনি কোনও ভদ্রতা শিষ্টাচার বা সৌজন্যের খাতিরে কখনও ত্যাগ করতেন না। তা না হলে সমগ্র জাতির জীবনে ন্যায় সত্য ও শুদ্ধশীলাচরণের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সমস্ত চেষ্টাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়াত। শ্রীযুক্ত বসু ঠিকই বলেছেন যে ইদানীং তাঁর করুণাঘন মূর্তিই আমরা এত বেশি দেখেছি যে তাঁর চরিত্রের অপর দিকটা আমাদের চোখে কম পড়েছে। শ্রীযুত ঘোষের দৃষ্টি সেই করুণাময় মূর্তির দিকেই বেশি সমাকৃষ্ট। কিন্তু তার ফলে আমরা যদি গান্ধীচরিত্রের অপর দৃষ্টির যথাযথ গুরুত্ব না দিই, তাহলে গান্ধীচরিত্রের প্রকৃত অনুধাবন আমরা করতে পারব না। এমন কি তাঁর বহু অন্তরঙ্গ শিষ্যও ইদানীং এই নিয়ে গান্ধীজির কাছে অনুযোগই করেছেন। ভারতবিভাগে গান্ধীজির সম্মতি ছিল না, তবু শেষ পর্যন্ত সেই ঐতিহাসিক এ-আই-সি-সি'র অধিবেশনে তিনি ভারতবিভাগকে সমর্থন করেছিলেন এবং এ নিয়ে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গদের কাছে যেসব কৈফিয়তপত্র লিখেছিলেন সেইসব পত্র কোনোদিন প্রকাশিত হলে গান্ধীচরিত্রের এই কারুণ্যের বিবর্তন আরও উদ্‌ঘাটিত হবে। কিন্তু সে কথা যাক। তাঁর প্রকাশ্য উক্তি ও কার্যাবলীর মধ্য থেকেও আমরা তাঁর কঠোর দীপ্তির যে আভাস পাই তার যথাযথ স্থান না দিলে আমরা গান্ধীচরিত্রের অসাধারণত্ব ও বৈপ্লবিক মহিমাকে খর্ব করব।

পরিশেষে ছোট দুই-একটা কথা। শ্রীযুত ঘোষের মত লিপিকুশলী সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্সের বাংলা প্রতিশব্দ 'সবিনয় অবজ্ঞা' করলেন কেন? শুনেছি, হিন্দিতে নাকি ঐরকম একটা প্রতিশব্দ চলছে, কিন্তু বাংলায় তো আরও ভালো প্রতিশব্দ হতে পারে। উর্দুতে নাকি সম্প্রতি point of view কথাটার প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'নোখ্‌তা-ই-নজর' (অর্থাৎ নজরের নোখ্‌তা, অর্থাৎ ফুট্‌কি, point), কিন্তু বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য তো বিপুল, তাতে কেন এ ধরনের প্রতিশব্দ চলবে? শ্রীযুত ঘোষ এক জায়গায় বলেছেন যে পশ্চিমের কম্যুনিস্টের সাম্যতত্ত্বের যুক্তির একটা কথা হল সম্পত্তিমাত্রেই চৌর্য (property is theft)। ঐ কথাটি বোধ হয় প্রুদোঁ-র, কিন্তু নৈষ্ঠিক কম্যুনিস্টরা কি প্রুদোঁকে তাঁদের দলভুক্ত বলে মনে করেন?

কর্মফলের উপর অধিকার নেই গীতোক্ত এই নীতিকে আধুনিক জড়বাদী দার্শনিক—যথা মার্ক্সও—সাধারণ সমাজবিজ্ঞানের একটি সূত্ররূপে আবিষ্কার করতে পেরেছেন, এ কথাও কি ঠিক? তাহলে কম্যুনিস্ট শাস্ত্রে কর্মকাণ্ডের উপর এত জোর দেওয়া হয়েছে কেন? বলা হয়েছে কেন, যে স্বতঃস্ফূর্তির তত্ত্ব (theory of spontaniety) হল সর্বনাশা তত্ত্ব, সেইজন্য বর্তমান শ্রেণীব্যবস্থাকে সজ্ঞান সচেতনভাবে জোর করে ভেঙে দেওয়াই কম্যুনিস্টদের একমাত্র কর্তব্য?

কিন্তু এসব তর্কের কথা ছেড়ে দিলে স্বীকার করতে হবে যে শ্রীযুত ঘোষ তাঁর উদ্দেশ্যে সফল হয়েছেন। তাঁর এই মধুর রচনাটি পড়ে পাঠক গান্ধীজীবনের মহাকাহিনী গান্ধীজির স্বলিখিত রচনা হতে পড়তে উৎসাহিত হবেন।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

ভ্রম সংশোধন: পৃ ১৮৪, ছত্র ৬। 'মেইটল্যাণ্ডের পূর্বে ইংলণ্ডের' স্থলে 'মেইটল্যাণ্ডের পর ইংলণ্ডের' হইবে।